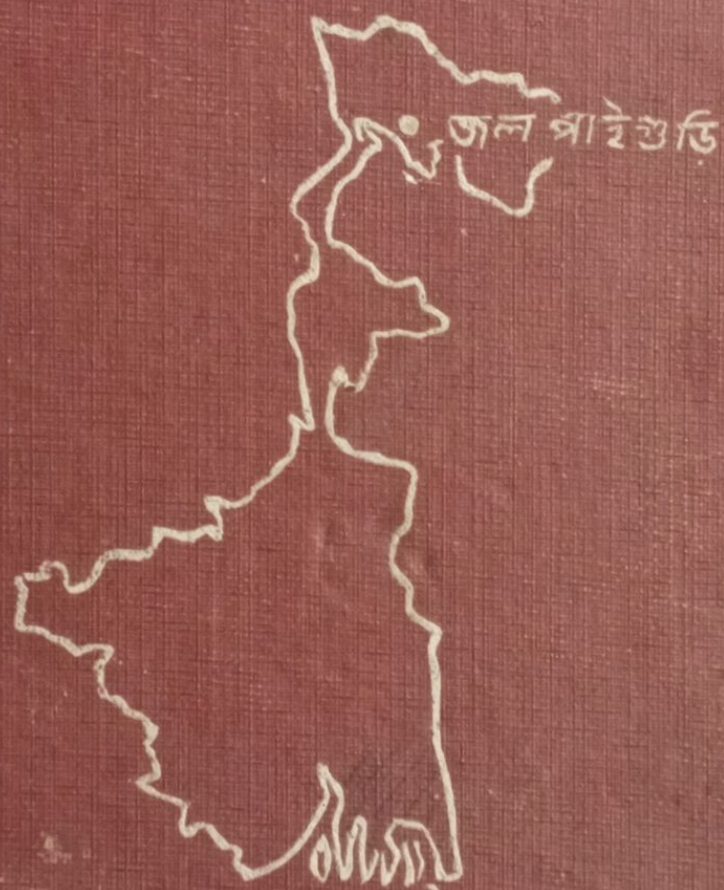
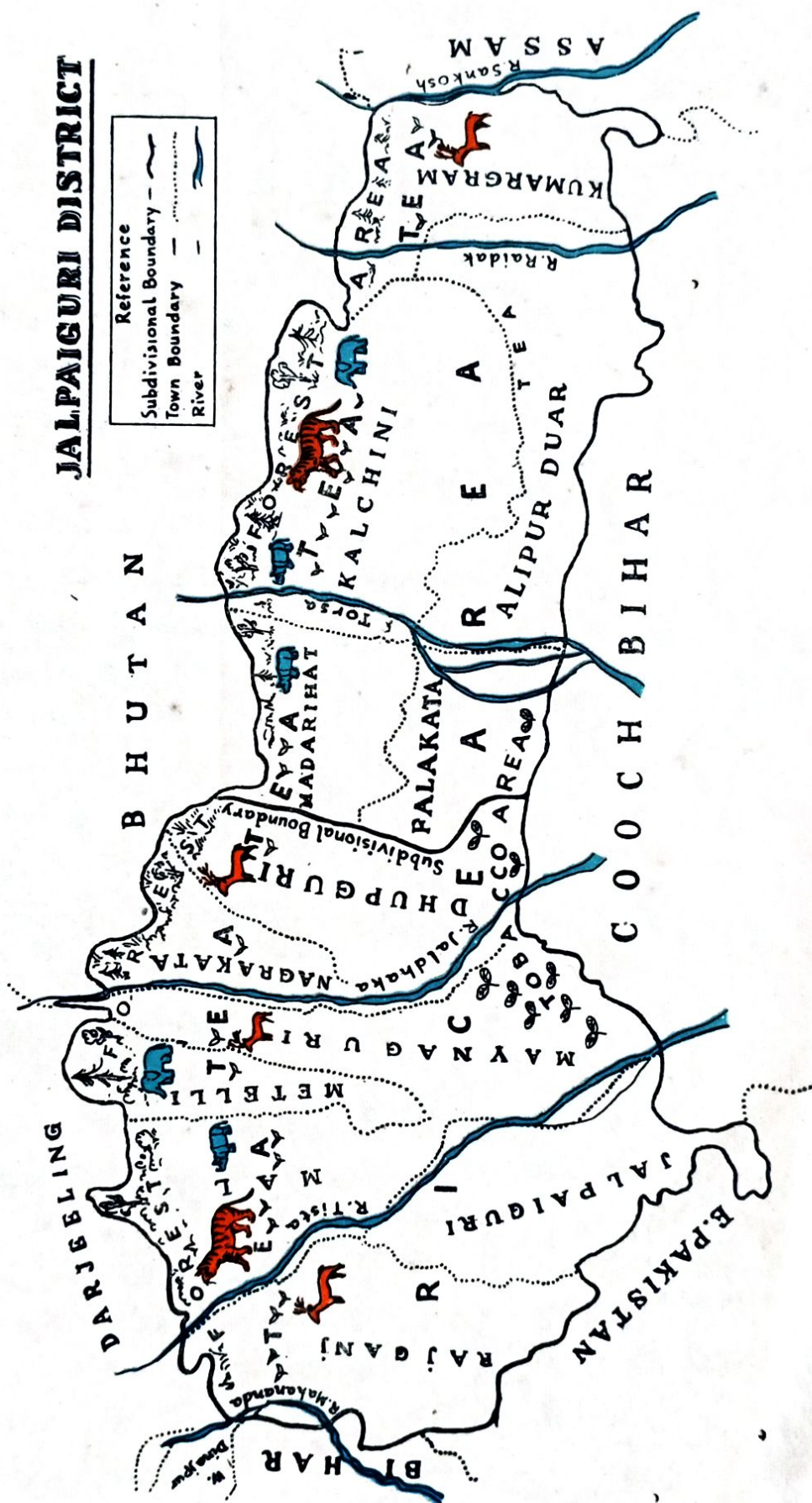


জলপাইগুড়ি জেলা
শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ



১৮৬৯-১৯৬৮

Reference
Subdivisional Boundary — — —
Town Boundary — — —
River — — —



সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ— ‘হে অতীত কথা কও’

১। জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস		শ্রীরেবতী মোহন লাহিড়ী	১
২। The Boundaries of Jalpaiguri	...	Sri S. P. Mallik	১২
৩। উনবিংশ শতাব্দীর বৈকুণ্ঠপুর	...	শ্রীঅরুণ ভূষণ মজুমদার	৩০
৪। The Birth of the District	...	Sri Abdul Bari	৩২
৫। Western Duars—Past & Present	...	Sri Aswini Kumar Sen	৪৮
৬। Administrative and Jurisdictional Changes in the District of Jalpaiguri since its formation	...	Sri Dipak Kumar Roy	৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— ‘A Tale of Two Cities’

৭। জলপাইগুড়ি সহরের একশো বছর	...	শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল	৮০
৮। শহর আলিপুরছারের অতীত এবং বর্তমান	...	শ্রীস্বরঞ্জন দত্ত রায়	১০২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— ‘জেলার দেব দেউল’

৯। জলেশ মন্দির	...	শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ	১১১
১০। ইতিহাসের দৃষ্টিতে জলেশ মহাপীঠের প্রাচীনত্ব	...	শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরী	১২৪
১১। জলপাইগুড়ির দেবদেবী	...	শ্রীবীরেন্দ্র প্রসাদ বসু	১৩৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— ‘জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা’

১২। জলপাইগুড়ি জেলার একশো বছরে দ্বী শিক্ষার ক্রমবিকাশ		শ্রীসুনীতি বালা চন্দ	১৪৭
১৩। জলপাইগুড়ি জেলায় শিক্ষা বিস্তারের রূপরেখা	...	শ্রীঅমিয় কুমার পাকড়াশী	১৬৭
১৪। জলপাইগুড়ি জেলার সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	...	শ্রীভবরঞ্জন গাঙ্গুলী	১২৫

সূচীপত্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— 'জেলার জনবিশ্বাস'

১৫। Tribes and Tribal Settlements at Jalpaiguri	...	Sri S. K. Bhattacharya	১২২
১৬। রাভা ও তাদের দেবী 'কন্থুক বাশেক'	...	শ্রীমুনীল পাল	২১৫
১৭। জলপাইগুড়ি জেলার একটি অনগ্রসর জাতি	...	শ্রীমণীন্দ্র নাথ মিত্র	২২৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'জয়যাত্রায় লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠান'

১৮। শতবর্ষের দর্পণে জেলার স্বায়ত্তশাসন		শ্রীমন্তোষ ঘোষ	২৩৩
১৯। জলপাইগুড়ি জেলায় সমবায় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত	...	শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায়	২৫৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ— 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' জলপাইগুড়ির জনসমাজ

২০। ধনসিং অধিকারীর চোখে রাজবংশী সমাজ	...		২৬২
২১। ধনসিং মেচের চোখে মেচ সমাজ	...		২৭৪
২২। একজন শিক্ষকের চোখে সহরের আদিম রূপ	...	শ্রীযতীন্দ্র নাথ সিংহ	২৭৬
২৩। আমার কথা		শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭২

অষ্টম পরিচ্ছেদ— 'দুইটি পাতা একটি কুঁড়ি'

২৪। The Development of the Tea Industry in the District of Jalpaiguri : 1869-1968	...	Sri B. C. Ghosh	২৮১
২৫। চা শ্রমিকদের পরিবার সংগঠন		শ্রীদিনেশ চন্দ্র রায়	৩১১
২৬। জলপাইগুড়ির চা-শিল্প ও তার শ্রমিক	...	শ্রীদেবেন সরকার	৩১৭

নবম পরিচ্ছেদ— 'স্বাধীনতা আন্দোলনে জিলাবাসী'

২৭। স্বাধীনতা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি	...	শ্রীমুকুলেশ সান্যাল	৩২১
২৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে আলিপুরদুয়ার	...	শ্রীঅনিল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৪

দশম পরিচ্ছেদ— 'Taming of the Shrew'—'অশান্ত তিস্তার কথা'

২৯। জলপাইগুড়ি জেলার নদীর গতিপথ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা		শ্রী কে. এল. মিত্র	৩৪৫
৩০। তিস্তা-করতোয়ার রূপরেখা	...	শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল	৩৪৮

নিবেদন

অবশেষে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া “জলপাইগুড়ি জিলা শতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ” প্রকাশিত হইল। এই স্মারকগ্রন্থ (Souvenir) প্রকাশিত হইবার কথা ছিল ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারীতে—প্রথম নির্ধারিত শতবর্ষপূর্তি উৎসবের প্রথম দিনে। বিসর্জনের বাজনা বন্ধ হইতে না হইতেই এক “মহাবিসর্জন” আসিয়া গেল। ১৯৬৮, ৪ঠা অক্টোবর রাত্রিশেষে এক আকস্মিক নৈসর্গিক ঘটনায় এই সহরের জীবনধারা স্তব্ধ হইয়া গেল—উৎসব উন্মুখ জলপাইগুড়ি নগর এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া গেল। সেই কালরাত্রির কথা স্মরণ করিতে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সহর যে আবার জাগিবে, আবার কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিবে—ইহা সেদিন অতি বড় আশাবাদীর মনেও উদ্ভিত হয় নাই।

এই গ্রন্থ প্রকাশের দিনে প্রথমেই মনে হয় এই জিলার তদানীন্তন সমাহর্তা শ্রীযুত এস,পি, মল্লিক মহাশয়ের কথা যিনি এই উৎসবের প্রধান পুরোধা ছিলেন। পরবর্তী জিলা সমাহর্তা শ্রীযুত এস, বি, মজুমদার মহাশয় যিনি এই মহাশ্মশানে আবার প্রাণের স্পন্দন আনিলেন এবং পরিত্যক্ত উৎসবসূচীতে নবজীবন দান করিলেন এবং সর্বতোভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশনে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি অগ্ৰত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যিনি আসিলেন (শ্রীযুত এস, ব্যানার্জী) তিনি যদিও স্বল্পকাল এই জিলার কর্ণধাররূপে ছিলেন তথাপি আমাদিগকে সতত উৎসাহ দান করিতেন। এই সঙ্গেই স্মরণ করিতেছি আরও অনেক পদস্থ রাজকর্মচারীকে বিশেষ করিয়া শ্রীযুত ডি, কে, সান্যাল ও শ্রীযুত নিরুপম কুশারীকে যাঁহারা লেখকরূপে, কর্মীরূপে আমাদিগকে নানাতাবে সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু কার্যান্তরে অগ্ৰত চলিয়া গিয়াছেন। এই ‘প্রবাসী’দের জলপাইগুড়িপ্রীতি জলপাইগুড়ি বাসীদের চাইতে কোন অংশে কম ছিলনা।

আমরা জানি এই স্মারকগ্রন্থটি সর্বোৎসাহে তৈরি হয় নাই এমনকি আমাদের পূর্ব কল্পনানুযায়ীও হয় নাই। যে সব পুস্তক এই ‘সাহিত্যের ডালি’ সাজাইবার বাসনা ছিল তাহা সব চয়ন করা সম্ভব হয় নাই। বহু প্রবন্ধ যাহা এই স্মারক গ্রন্থকে বিশিষ্ট মর্যাদা প্রদান করিত, বহু কবলিত হইয়াছে—লেখকদের উৎসাহ নির্বাপিত হইয়া গেল ; অনেক লেখক প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাঁহাদের নির্দিষ্ট প্রবন্ধ

নির্দিষ্ট সময়ে আমাদেরকে প্রদান করিতে পারেন নাই। Flora and fauna of Jalpaiguri; জলপাইগুড়ির সাংস্কৃতিক জীবনধারা; উত্তর-স্বাধীনতা যুগে জলপাইগুড়ি জিলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইতিহাস (১৯৪৭-৬৮) এই তিনটি প্রবন্ধের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভূত হইতেছে। প্রথমে এক বিরাট উৎসবসূচী গ্রন্থীত হইয়াছিল—অর্থাভাবে উৎসবসূচীরও বহুধা পরিবর্তন এবং সংকোচন ঘটিয়াছে। গ্রন্থের এবং উৎসবের এই অঙ্গহানি আমাদেরকে বিশেষভাবে পীড়া দিতেছে।

এই গ্রন্থ-সম্পাদনে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত চারুচন্দ্র সান্যালের দান অপরিসীম। মণ্ডলীর অন্য দুই সভ্য এই সহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী শ্রীযুত প্রীতিনিধান রায় এবং এই নগরীর গৌরবভাজন শ্রীযুত কুমুদিনী চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয় প্রবন্ধ নির্বাচনে এবং সম্পাদনে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। যে সমস্ত লেখক এই নগরের এবং জিলার অধিবাসী তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদানে বিরত রহিলাম কারণ তাঁহারা লেখার মাধ্যমে মাতৃঋণ শোধ করিলেন। অন্যান্য লেখকদের আমরা বিশেষভাবে সাধুবাদ জানাইতেছি। এই বিপুল গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে এবং অনেকস্থলে প্রবন্ধ পরিমার্জনে আমার পরম স্নেহভাজন অধ্যাপক শ্রীমান শঙ্করলাল চৌধুরী আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে বিরাট কর্তব্যহানি হইবে। শ্রীযুত প্রীতিনিধান রায় প্লাবনবিধ্বস্ত পারিবারিক গ্রন্থস্তুপ হইতে স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রথম এবং দুপ্রাপ্য সংখ্যাগুলি উদ্ধার করিয়া এই স্মারক গ্রন্থের একটি মূল্যবান অঙ্গবর্ধনে আমাদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পরিশেষে আমার দ্বিতীয় আবাসস্থল (Second Home) এবং কর্মভূমি এই জলপাইগুড়ি সহরের (যেখানে আমার শিক্ষক জীবনের এক চতুর্থাংশ শতাব্দী অতিবাহিত হইল) এই উপলক্ষ্যে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। এই গ্রন্থ সম্পাদন শেষ হইবার সঙ্গে এই সহরে আমার কর্ম-জীবনের উপরও যবনিকা নামিয়া আসিল। এই জনপদের জয় কামনা করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। ইতি—

মহালয়া, ১৩ই আশ্বিন, ১৩৭৭

জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক, স্মারকগ্রন্থ সম্পাদন উপসমিতি

বন্দে জলপাইগুড়িম্ !

ব্যক্তির যেমন জন্মতিথি ও জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়, দেশ বা নগরীরও তেমনি হওয়া উচিত—ব্যক্তির চাইতেও দেশ বড়, এই কথা ভুলিতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি !

একটি জনপদের শতবর্ষপূর্তি শেষে জনপদের প্রসারের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তির কীর্তি কাহিনী ভীড় করিয়া আসিতেছে। জনপদের বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে যে ঘটনার ধারা বহিয়া চলিয়াছে, ব্যক্তির তাহাতে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে বটে কিন্তু জনপদকে আশ্রয় করিয়াই ঘটনা-প্রবাহ উৎসারিত হইতেছে—তাই আমরা এই জিলার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ব্যক্তিবিশেষের কীর্তি কলাপের বর্ণনা না করিয়া প্রাচীন এথেন্স (Athens) নগর রাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জনপদের এবং জলপাইগুড়ি নগরের গৌরব ও কীর্তির কথা সমষ্টিগতভাবে স্মরণে আনিবার চেষ্টা করিব। যদি বর্তমান ও অনাগত বংশীয়েরা তাহাদের ত্যাগ ও নিরলস চেষ্টার দ্বারা সে কীর্তিস্তম্ভকে আরও বিরাট ও প্রসারিত করিতে পারে তবেই এই জনপদপূজা ও শতবার্ষিকী উৎসব সার্থক হইয়া উঠিবে।

প্রায় সার্ব্বদ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে—প্রধানতঃ দুইটি গ্রীক নগররাষ্ট্রের (এথেন্স ও স্পার্টা) মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের (ইতিহাসখ্যাত পেলোপোনেসীয় যুদ্ধ) প্রথম বার্ষিকী পালন করিতে গিয়া এথেন্স নগরীর রাষ্ট্রপতি পেরিক্লিস্ যুদ্ধে নিহত যুবকদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর বর্ণনা না করিয়া ইহাদের জন্ম ও কর্মভূমি এথেন্স মহানগরীর গৌরব ও মহত্বের কথা—যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল যুগে যুগে নিহত বীরবৃন্দের অসামান্য নিষ্ঠা ও ত্যাগের ফলে—এথেন্সবাসীদের নিকট বর্ণনা করিয়া শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পুরাতন ইতিহাস বিস্তৃত পন্থারই অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বৃহৎ বঙ্গজনপদের কনিষ্ঠতম সন্তান এই জলপাইগুড়ি (জিলা) প্রাচীনকালে আমাদের নিকট অপাংক্তেয় ছিল—এই অংশ ছিল ব্রাত্য, পাণ্ডুবর্জিত দেশ। প্রাচীন রাঢ় জনপদের মত ইহার আভিজাত্য নাই বটে, কিন্তু এই জনপদও নগণ্য নহে।

একশত বৎসর পূর্বে যখন এই জিলার সৃষ্টি হইল ইতিহাসের অমোঘ নিয়মাবলীর বিবর্তনে, তখন কি ছিল ইহার স্বরূপ! কি ছিল ইহার ভবিষ্যৎ! সংখ্যালঘু ছিল ইহার জনগোষ্ঠী, প্রায় সমস্ত ভূখণ্ড ছিল ভীষণ স্বাপদ সংকুল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ও সর্বনাশা বেগবতী নদনদী দ্বারা অযথা প্লাবিত ও ক্লিষ্ট, কুখ্যাত করাল ব্যাধি মূর্তিমান যমের আয় সতত ছিল সংহারকার্য্যে লিপ্ত। খাণ্ড সম্ভার ছিল নিতান্ত স্বল্প, বৈচিত্র্যহীন ও অপুষ্টিকর। অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ছিল আদিম ও মন্থর; অশিক্ষা ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল জনমানস। এমন কি প্রকৃতিও ছিল কৃপণ, ষড়্ঋতুর মধ্যে প্রধান ও ব্যাপক ছিল বর্ষা এবং শীত—শরৎ ও বসন্ত ছিল চির অনুপস্থিত। স্বল্প কথায় এই জিলার ছয়ার

প্রধান অঞ্চল ছিল অগ্ন্যাগ্ন বঙ্গবাসীর নিকট দূর আন্দামানের মত বিভীষিকাময় ও দুর্গম।

আজ একশত বৎসরের মধ্যে এ ভূখণ্ডের কি বিপুল এবং ব্যাপক পরিবর্তনই না ঘটিয়াছে! কি উজ্জল ভবিষ্যৎই ইহার জন্য অপেক্ষমান! ছুয়ার আর জনশূন্য যমছুয়ার নহে—বহু সম্পদশালী এবং কর্মব্যস্ত গ্রাম ও বন্দর এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। বহুদিনের বহু ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর অবিরাম চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এই অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং জলপাইগুড়ি নগরী ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

আজ শতবর্ষ পরে আমরা অভিনন্দন জানাই সেই খুব দুঃসাহসী ও উৎসাহী যাত্রীদলকে— বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী, ভারতীয় ও অভারতীয় যাহারা নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া এই দুর্গম, অনগ্রসর অরণ্য অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন ও চা বাগানের পত্তন করিয়াছিলেন—বিশেষ করিয়া আমরা অভিনন্দন জানাই সেইসব মধ্যভারতীয় উপজাতিতে যাহারা প্রায় “ক্রীতদাসরূপে” এই ভয়ঙ্কর ছুয়ার অঞ্চলে আসিয়া “চা শিল্প” গড়িয়া তুলিতে নিজেদের প্রাণ বলিও দিয়াছিলেন—যাহারা সময়মত তৃষ্ণার জল পান নাই, উপযুক্ত খাদ্য পান নাই আর গর্বোদ্ধত বিদেশী বণিকদের হস্তে যাহাদের লাঞ্ছনা ছিল অঙ্গের ভূষণ। শতাব্দীর বধির যবনিকা ভেদ করিয়া আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন কি তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছিবেনা?

শতবর্ষ পরে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করিতেছি সেই দেশীয় চা-কর দিগকে—ভারতীয় চা-শিল্প প্রবর্তনের প্রথম পথিকৃৎ—যাহারা শ্বেতাঙ্গ চা-করদের সঙ্গে অসম এবং অসীম প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে নিজেদের বিশিষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। ছুংখের বিষয় আজ ইহাদের উত্তরপুরুষগণ শোষণকারী হিসাবে দিকৃত। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য ইহাদের পূর্বগামীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্বল—স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় নিষিদ্ধ শিল্প জগতে ইহাদের অনুপ্রবেশ ছিল সমগ্র দেশবাসীদ্বারা অভিনন্দিত। ইহাদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে কি বিপুল বাধাই না ইহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল!

আমরা সাধুবাদ জানাই সেই সমস্ত অখ্যাত ও মুষ্টিমেয় শিক্ষককে যাহারা শিক্ষার বৃত্তিকা হস্তে লইয়া শিক্ষা বিস্তারকেই জীবনের ব্রত মনে করিয়া এই অনগ্রসর ও দুর্গম অঞ্চলে আসিয়া ছিলেন। আজ আমাদের পরম আনন্দের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে আজও একজন “শতং শরদঃ জীবতু” পূর্বপুরুষের এই আশীর্ব্বাণীকে সার্থক করিয়া আমাদের মধ্যে বিচরমান*। শতবর্ষের প্রারম্ভেই যিনি ছিলেন অবহেলিত, শতবর্ষ পরেও কি তিনি অবহেলিত থাকিবেন? আমরা এইদিকে জলপাইগুড়ি নগরের সুধীবৃন্দের এবং প্রশাসনীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আজও এই সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি তাঁহাদিগকে যাহারা এই অঞ্চলে মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে নির্ভীকভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসেবা করিয়া গিয়াছেন

রাজরোষকে উপেক্ষা করিয়া। ইহারা সংখ্যায় ছিলেন মুষ্টিমেয় কিন্তু জনচেতনা উদ্বোধনে ইহাদের অবদান অবিস্মরণীয়। যাঁহারা ইহলোকে ছিলেন লোভ ও ক্ষতির উদ্বে তঁাহারা যদি উত্তর পুরুষদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি না পান তবে সে দোষ তঁাহাদিগকে স্পর্শও করিবেনা—আমাদেরই শাস্ত্রে বর্ণিত ঋণ পরিশোধ হইবেনা। ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন অনমনীয়—অনু ইম্পাতে গঠিত—ইংরেজ রাজপুরুষদের জন্ত সংরক্ষিত পথে ইনি অনধিকার পদক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং কারাবরণ করিয়াছিলেন—যে যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম সহরে ইংরেজী সাপ্তাহিক ছিল না তিনি সেই যুগে এই ক্ষুদ্র সহরে নির্ভীকতা এবং অশেষ যোগ্যতার সহিত এক বৎসর কাল ইংরেজী সাপ্তাহিক পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রস্তুত “দেশলাই” জ্বলে নাই বটে কিন্তু ইহারা দেশের চিত্তকে রাজাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় এই সব বিষয়বুদ্ধিহীন আপনভোলা লোকদের স্মরণ করিয়াই কবি গাহিয়া গিয়াছেন—

“সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো,

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—”

আজ অশেষ নম্রতার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি সেই সমস্ত নির্ভীক অহিংস মস্ত্রে দীক্ষিত দেশ-প্রেমিককে যাঁহারা অর্দ্ধশত বৎসর পূর্বে এই অন্ধকারময় অঞ্চলে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, দুর্গম বনজঙ্গলে হিংস্র ব্রিটিশ বেয়নটকে অগ্রাহ্য করিয়া। ইহাদের কিছু কিছু কার্যকলাপ এই স্মারকগ্রন্থের অন্তর্গত বর্ণিত হইয়াছে—সেই বর্ণাঢ্য সংগ্রামের দিনে যাঁহারা নেতা বা কর্মী ছিলেন আজ তঁাহাদের অনেকেই অশীতিপর বৃদ্ধ—পাবলিক ফুট লাইটের অনেক পিছনে—বিগত দিনের স্মৃতি হিসাবে আজও তঁাহারা সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, তঁাহারা শতশরৎ দর্শন করুন এই কামনা করি।

বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলা ও জলপাইগুড়ি নগরী এই বিভিন্ন গোষ্ঠির এবং কর্মীর অর্দ্ধশতাব্দ-ব্যাপী নিরলস প্রচেষ্টার ফল; আজ জলপাইগুড়ি নগরী বা জনপদ অপাংক্তেয় নয়—‘যমের ছয়ার’ ছয়ার অঞ্চলেও ঘটিয়াছে চমকপ্রদ পরিবর্তন। আজ ডলার উপার্জনকারী জলপাইগুড়ি জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগে নয় দিল্লীরও টনক নড়ে! নানা শ্রেণীর নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষায়তন পরিপূর্ণ এই জলপাইগুড়ি নগরী আজ উচ্চ শিক্ষা জগতে সমগ্র উত্তর বঙ্গের এক গৌরবের বস্তু। জিলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তের অনতিদূরে অবস্থিত নবপ্রতিষ্ঠিত উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এই জলপাইগুড়ি নগরীর বিদগ্ধ ব্যক্তিগণেরই মানস কন্যা—ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

এই জলপাইগুড়ি জনপদ যখন গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন ইহার সম্ভাবনাপূর্ণ দুর্গম অরণ্য অঞ্চল বাংলার El dorado—হাতছানি দিয়া যেমন অসংখ্য ভাগ্যার্থীকে আহ্বান করিয়াছিল নূতন ভাগ্য গড়িবার জন্ত তেমনি দেশ বিভাগের পরে বাঙ্গালীজাতির এক বেদনাময় মুহূর্ত্তে আবার অসংখ্য গৃহচ্যুত ছাত্র, শিক্ষক ও গৃহস্থকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিল এই জিলাই—নূতন ভাগ্য পরীক্ষার জন্ত। (এই জলপাইগুড়ি জেলার এক মহাসভায় সর্বপ্রথম ইংরাজকে ‘ভারত ছাড়ার’ নির্দেশ দেওয়া

হইয়াছিল। তাহার ফল যে ইহাই হইবে তাহা তখন কেহই ভাবিতে পারে নাই। আবার এই জলপাইগুড়ি সহরেই এক মহাসভায় বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল) সে আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার আগমনে এই জলপাইগুড়ির জনপদ এবং সহর নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। এই নব ইহুদীদের আগমন না ঘটিলে জলপাইগুড়ির উন্নতি এত ব্যাপক এবং ত্বরান্বিত হইত না। এই নব জনশ্রোত জিলার 'ভার' না হইয়া সবদিক দিয়াই এই জেলাকে "ভারী" করিয়া তুলিয়াছে। আজ তাহাদের একাংশ যেমন এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বক্ষ্যা অঞ্চলে সোনা ফলাইতেছে তেমনি অপর অংশ জিলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক নূতন মেল বন্ধনের সূচনা করিয়াছে। আজ এই জিলার প্রধান ও প্রাচীন অধিবাসী রাজবংশীদের 'জনমানস চরিত' বিশ্বের দরবারে উপস্থিত ও অভিনন্দিত। প্রকৃতিও আর কৃপণ নহে—এই অঞ্চলে শুভকরী ও সুখদ নৈসর্গিক পরিবর্তন ঘটয়াছে। শরতের মেঘমুক্ত নীলাকাশ আর বসন্তে মলয়ানিল এখানে আর নিষিদ্ধ নহে। ছরস্তু তিস্তা আজ লৌহ প্রস্তর বন্ধনে শাস্ত; বনাঞ্চলের দ্রুত বিলোপে আজ বর্ষা ও শীতও স্তিমিত।

এই সেই জলপাইগুড়ি ভূখণ্ড এবং জলপাইগুড়ি নগরী নিজের মহিমায় মহিমান্বিত। একদা দাঙ্গা বিধ্বস্ত ও ভূমিকম্পে ক্ষতবিক্ষত এবং সাম্প্রতিক মহাপ্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই জনপদ ও নগরী উপকথার ফিনিক্সের মত আবার নবজীবন লাভ করিয়া শতবর্ষপূর্তি উৎসবে মত্ত।

উৎসব প্রাক্কালে (১৯৬৯ ১লা জানুয়ারী প্রথম উৎসব দিন) সেই মহাপ্লাবনের কালরাত্রে যে অসংখ্য কুলবধু যাহারা শংখ ধ্বনি করিয়া উৎসবের সূচনা করিত, যে অসংখ্য বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যাহারা আকুল আগ্রহে উৎসবের দিন গণিতে ছিল, যে অসংখ্য তরুণ তরুণী যাহারা উৎসবের শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করিয়া উৎসবকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিত—ভাসিয়া গেল চিরদিনের জন্য—আজ এই মহালয়ার দিনে অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে তাহাদের স্মরণ করিতেছি সমগ্র জিলা বাসীর পক্ষে এবং তাহাদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। তাহাদের আত্মার সদগতি হউক।

পরিশেষে এই প্রাচীন ভূখণ্ডের এবং জিলার কেন্দ্রবিন্দু জলপাইগুড়ি নগরীর সহস্র শতবর্ষপূর্তি কামনা করিয়া প্রাচীন রাষ্ট্রবিদ পেরিক্লিসের অমর ভাষার কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাই—

“Such is the city and the land for whose sake those men nobly toiled and died and every one of us who survive should gladly toil on her behalf. I would have you day by day fix your eyes upon the greatness of the city, until you become filled with the love of her; and when you are impressed by the spectacle of her glory, reflect that this glory has been acquired by men who knew their duty and had the courage to do it and freely gave their lives to her as the fairest offering which they could present at her feast.....”

প্রথম পরিচ্ছেদ

“হে অলীত কথা কও”

জেলায় ইতিকথা

জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস

(প্রাচীনকাল হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)

শ্রীরেবতী মোহন লাহিড়ী

প্রস্তাবনা

“উত্তরে দেবতা আ হিমালয় যদি ধ্যানমগ্ন মহাকালের মহিমময় মূর্তি—তবে জলপাইগুড়িকে বলিতে হয় মহাকালের পাদমূলে প্রণামরতা অনন্তকালের পূজারিণী।” সেই পূজারিণীরই ইতিহাস নিম্নলিখিত ছত্রে বিবৃত করিবার এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার (পাকিস্থান কবলিত অংশ সহিত) আরম্ভ ১৮৬২ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলার “দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সন্তে পাকানো”—এই আরম্ভ সেই সকালবেলার সন্তে পাকানো। যে বিশাল জনপদ হইতে জলপাইগুড়ি উদ্ভূত হইয়াছে, সেই বিশাল জনপদের এবং ইহার প্রাচীন অধিবাসীগণের ইতিহাস ঐশ্বর্যশালী—নানা কীর্তিতে উজ্জ্বল। বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার কোচ, রাজবংশী প্রভৃতি আদি অধিবাসীগণ সেই বিরাট বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যের অধিকারী। জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস লিখিবার সময় ঐতিহাসিককে জলপাইগুড়ি জেলার জন্মভূমির বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অবদানের কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে। ভারতের এই পূর্বাচলের ইতিহাসে বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে বহু ঘটনা প্রবাহ বিভিন্ন খাতে বহিয়া চলিয়াছে—অন্তরঙ্গে এইখানে আর্ঘ্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, ও মঙ্গোলীয় জন ও সভ্যতার সংঘাত ও সংমিশ্রণ নিরন্তর চলিয়াছে—আবার বহিরঙ্গে এই জনপদের কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্য ও রাজবংশের উদয় ও বিলয় ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ এই ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ড মহাভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এইখানে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দর্শন করা যায়। দুঃখের বিষয় নানা কারণে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বা দক্ষিণপথের কথা যেমন দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের ও শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এই পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিবর্তন নানা কারণে বহিজর্গতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ কি ঐতিহাসিক, কি নৃতত্ত্ববিদ, কি ভাষাবিদ সকলের পক্ষেই ইহা সমান জ্ঞাতব্য—গবেষকদের পক্ষে ইহাতো বিরাট সম্ভাবনাময় স্বর্ণখনি। এই অঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস কেহ লিখিয়া যান নাই—তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত কঠিন কিন্তু পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, নানা তন্ত্র, বিদেশীগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রচলিত ছড়া, গান, কবিতা ও গাথার মাধ্যমে এবং সংসাবশেষ হইতে এবং আভাষে ইঙ্গিতে আমরা কেবলমাত্র ইহার রূপরেখা (outlines) পাইতেছি। এই রূপ-

আদিপর্ব

ভারতীয় জন, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে আর্ঘ্য দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক ও ইন্দো-মঙ্গোলীয় এই তিন জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে। আমরা তিনটি জনের অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে জানি, কিন্তু

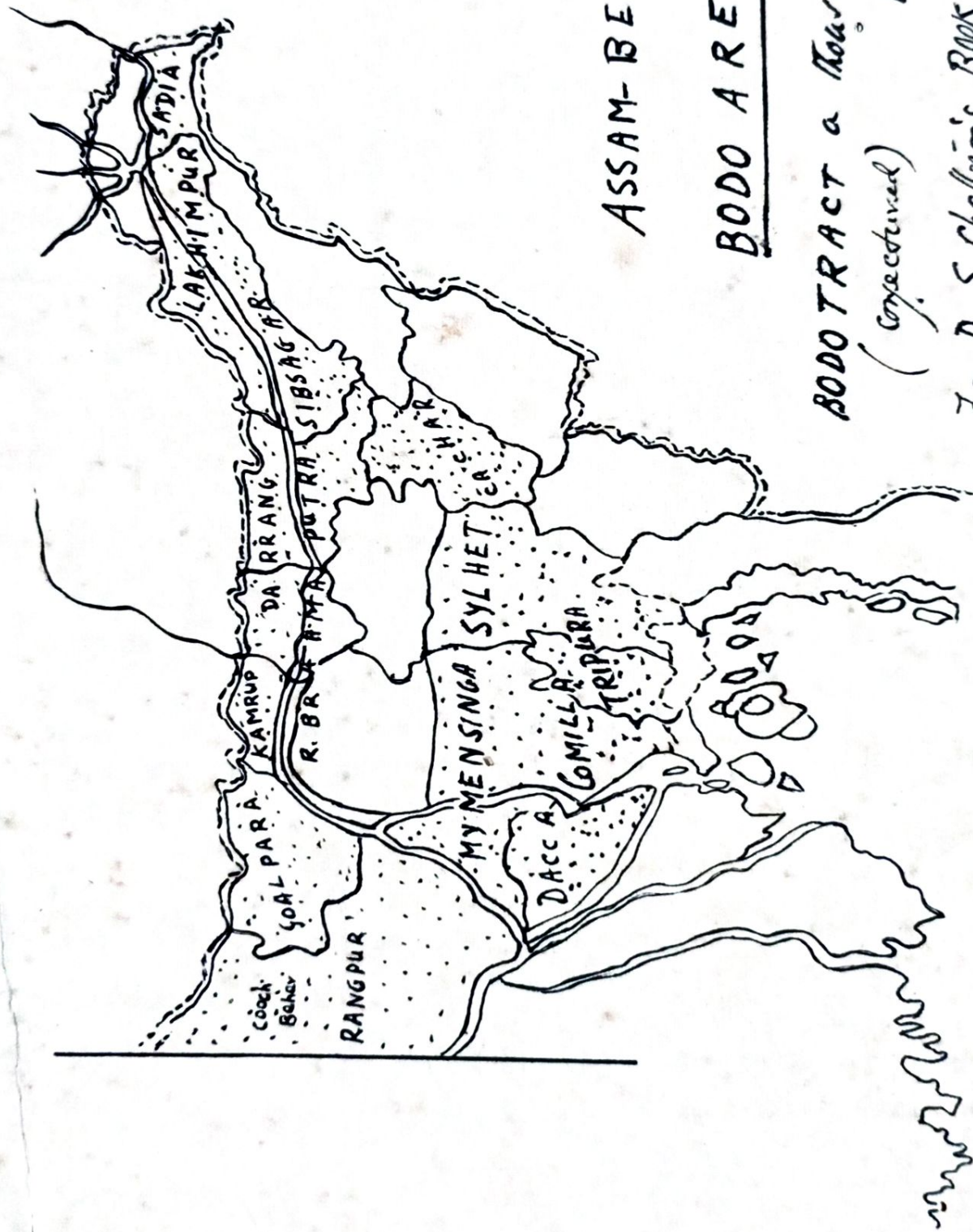
নানাকারে ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনের অবদানের কথা আমরা অল্পই জানি। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতীয় ও ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদগণের চেষ্টায় এই শাখার অবদানের কথাটা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মতে—সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীর পূর্বেই এই ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনপ্রবাহ ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই জনগোষ্ঠী আসাম, উত্তর-বঙ্গ, পূর্ব-বঙ্গ, উত্তর বিহার এবং হিমালয়ের সান্ন্যদেশে নেপাল অঞ্চল পর্যন্ত আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—বেদ রচনাকালেই। নানাকারে ইহারা ভারতের ইতিহাসে উপযুক্ত স্থান পায় নাই। প্রথমতঃ এই জনপ্রবাহ ভারতের অবজ্ঞাত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল—আর্য্য সভ্যতার উৎস কেন্দ্র হইতে বহুদূরে; দ্বিতীয়তঃ ইহাদের খ্যাতির কাল আরম্ভ হয় বহু পরে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে। তৃতীয়তঃ আর্য্য, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক সভ্যতার সঙ্গে ইহাদের মিলন ঘটিয়াছিল বহু পরে, আর্য্য-সভ্যতার ঢেউ সিঁকু উপত্যকা হইতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পৌঁছাইতে অনেক সময় লইয়াছিল।

প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ

মহাভারতীয় যুগে এই ইন্দো-মঙ্গোলীয় জাতির সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ইহাদের ভারতীয় নাম ‘কিরাত জন’। প্রাক্ জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্যের নৃপতি ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে (২০০ খৃঃ পূর্ব) কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন। ভগদত্তের সময় প্রাক্-জ্যোতিষ একটি বিরাট রাজ্য ছিল—বর্তমান আসাম, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, মনিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার অংশ বিশেষ লইয়া এই বিরাট রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভগদত্তের স্বেচ্ছ বাহিনীর কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে। এই স্বেচ্ছ বাহিনী প্রধানতঃ কিরাত-জাতির দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এই কিরাত জাতির রূপ ও শৌর্য্যের বর্ণনা আছে। ইহারা ছিল সুদর্শন, বর্ণ ছিল স্বর্ণাভ, সাহস ছিল দুর্জয়, প্রকৃতি ছিল কঠোর। জলে ও স্থলে ইহাদের গতি ছিল অবাধ। প্রথম শতাব্দীতে লেখা এক গ্রীক্ নাবিকের বিবরণেও ইহাদের উল্লেখ আছে।

পরবর্তীকালে এই ইন্দো-মঙ্গোলীয় বা কিরাত জনের শাখা বোদো জাতি ক্রমশঃ সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বর্তমান কোচবিহার, জলপাইগুড়ি,* রংপুর এবং দিনাজপুর জনপদে ইহাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এই বোদো জনপ্রবাহ একদা ময়মনসিংহ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই বিরাট জনগোষ্ঠী এক সময়ে একটি বিরাট রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিল—যাহার বিস্তৃতি ছিল বর্তমান আসামের পূর্ব সীমা হইতে বাংলা ভূ-খণ্ডের করতোয়া নদীর পূর্বতীর অবধি। করতোয়া ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অঞ্চল বাসী এই বিরাট গোষ্ঠী কালক্রমে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র এই মহা-ভারতের সাংস্কৃতিক ধারাকেই সমৃদ্ধিশালী ও প্রবলতর করে নাই, পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রেও এই গোষ্ঠী শৌর্য্য ও বীর্যের জলন্ত স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। পরবর্তী যুগে আগত কিরাতজনের অন্ততম শাখা অহম্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহারা বারবার মোগল শক্তিকে পরাধীন করিয়াছে। উত্তরবঙ্গের কোচ ও রাজবংশীদ্বারা গঠিত “পাইক” উপাধিদারী সৈন্যবাহিনী মোগল শক্তিকে বহুবার প্রতিরোধ করিয়াছে। ভারতের বহুখ্যাত সামরিক জাতি—পাঞ্জাবী, জাঠ, রাজপুত, শিখদের সহিত ইহাদের কীতি একত্রে স্মরণ করিবার যোগ্য। প্রখ্যাত কোচ নরপতি নরনারায়ণ আকবরের অধোগা সমসাময়িক ছিলেন না। এই বোদ-কৌম অধ্যুষিত ত্রিপুরা রাজ্যের নরপতি ধনমাণিক্য এবং আকবরের সমসাময়িক বিজয়মাণিক্য প্রবল পরাক্রম নৃপতি ছিলেন। ইহারা বিরাট ত্রিপুরা রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—যাহাকে অনায়াসে সাম্রাজ্য আখ্যা দেওয়া যাইত।

* জলপাইগুড়ির কোন পৃথক রাজনৈতিক সত্তা ছিল না—ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।



ASSAM-BENGAL

BODO AREA

BODO TRACT a thousand years ago
(conjectured)

From Dr. S. Chatterjee's BOOK

পারে। পার্শ্ববর্তী বোদো প্রধান জয়ন্তীরাষ্ট্র ক্ষুদ্র হইলেও শক্তিশালী ছিল। কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও ত্রিপুরা রাজ্য কখনও মুসলিম পদানত হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ জয় করিয়া বখ্তিয়ার খিলজির নেতৃত্বে মুসলমানগণ যখন কামরূপ আক্রমণ করে তখন কোচ এবং মেচ প্রভৃতির শাখা জাতিরা তাহাদিগকে বিপুলভাবে বাধা প্রদান করে, এবং তুর্কী বাহিনীকে প্রায় বিনষ্ট করিয়া ফেলে। আবার যখন আহমগণ প্রথম আসাম প্রবেশ করে তখন দুইটি পরাক্রমশালী বোদো রাষ্ট্র ইহাদের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করে। উত্তরবঙ্গের বর্তমান আদি অধিবাসীদের (রাজবংশী, কোচ, মেচ, প্রভৃতি) পূর্বসূরীদের কীর্তি কাহিনীর উদাহরণস্বরূপ এই প্রসঙ্গে আমরা গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি যে এই ইন্দো-মঙ্গোলীয় জন বা কিরাত গোষ্ঠির এক উপশাখা—অহম জাতির নরপতি রুদ্রসিংহ মধ্যযুগে পূর্বভারতে ত্রিপুরা, কোচবিহার, নেপাল, বিষ্ণুপুর বরনগর (রাজসাহী) এবং বর্তমান প্রভৃতি রাষ্ট্রকে লইয়া এক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিয়া ভারতের পূর্বাঞ্চল হইতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে মোগলদিগকে দূরীভূত করিবার এক বিরাট পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অকালমৃত্যু তাহার এই পরিকল্পনার উপর যবনিকা টানিয়া দিল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে পূর্ব ভারতের “শিবাজী” হইতে পরিতেন।

যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে এই পূর্বসূরীদের বিরাট দান ছিল, তেমনি ভারতের পূর্বখণ্ডে নব-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরও অবদান কিছুমাত্র কম নহে—বরং মহত্তর। দ্রাবিড়ীয় ও অষ্ট্রিক সভ্যতার ধারা আর্ঘ্য সভ্যতার সঙ্গে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু উত্তর বঙ্গের বর্ণাঢ্য লোক সংস্কৃতির* ধারা নিজের মহান ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে—রাজবংশী ও কোচ গোষ্ঠির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও ধর্ম আচরণের মধ্য দিয়া। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। ইহা ইহাদের অদম্য প্রাণ শক্তির আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঐতিহাসিক যুগ

এই বিরাট বোদো জাতির প্রতিভূ কামরূপ নৃপতি ভাস্কর বর্মণ (সপ্তম শতাব্দী) নিঃসন্দেহে তৎকালীন ভারতবর্ষের অগ্রতম বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। হর্ষের সমসাময়িক এই নৃপতি সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সুরমা উপত্যকার কিয়দংশ ও বাংলার উত্তর অঞ্চল লইয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ভাস্কর বর্মণের কৃতিত্ব পরিচিতির অবকাশ রাখে না। ভাস্কর বর্মণের তিরোধানের পর হইতে এবং কোচরাজ নর-নারায়ণের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত উত্তর বঙ্গের ইতিহাসের এই অধ্যায় অত্যন্ত অস্পষ্ট; ইহার কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

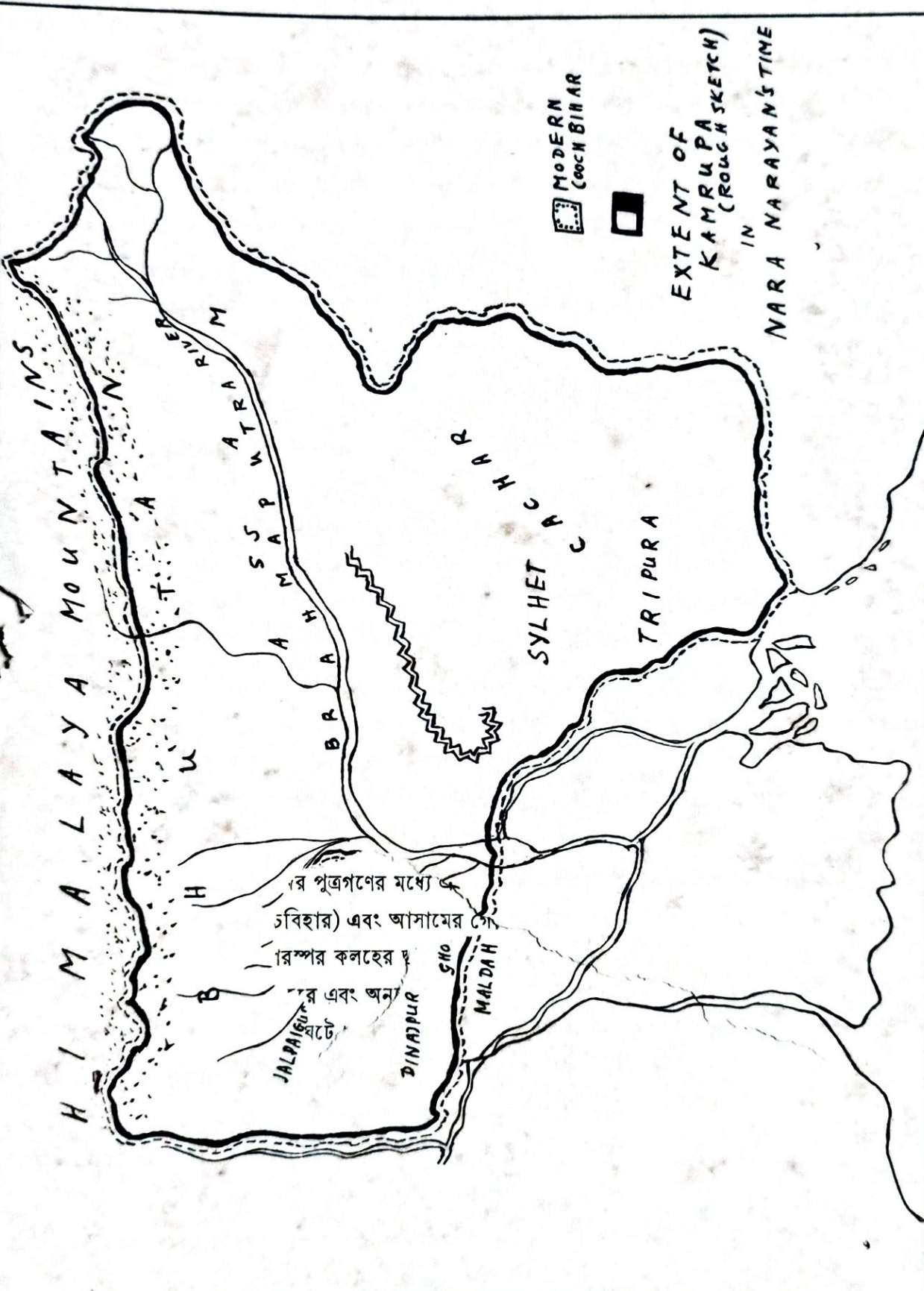
ইতিহাসের অস্পষ্ট ধারা হইতে আমরা জানিতে পারি, পালবংশের সময়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর-ভূখণ্ড কিরাত ও বোদো কোমের শাখা প্রশাখার দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল কোচ কোম। উক্তের সূর্য্যনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অগ্রাণ্ড মনীষীদের মতেও এই ভূখণ্ড প্রধানতঃ বিরাট বোদো কোমের শাখা প্রশাখা দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। ইহাদিগকে প্রধানতঃ কোচ নামে অভিহিত করা হয়। এই কোচরা ছিল বিরাট বোদো জাতির পশ্চিম শাখা। বাংলার পালবংশীয়দের রাজত্বকাল হইতেই কোচরা শক্তি সংগ্রহ করিতেছিল, এবং দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরবঙ্গ হইতে পাল শক্তিকে উৎখাত করিয়া এই অঞ্চলে নিজেদের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্থাপন করে। মহাপরাক্রমশালী পালবংশীয়দের উত্তরবঙ্গ হইতে উৎখাত করিবার এই সফল প্রয়াস কোচদের বিপুল সংগঠন শক্তি এবং প্রাণ প্রাচুর্যের এক উজ্জল স্বাক্ষর। ত্রয়োদশ-শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভরালী নদী হইতে তিস্তা-করতোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিভিন্ন কোচ প্রধানদের অধীন ছিল। এই যুগের ইতিহাস নিতান্ত কম গৌরবময় নয়। কিছু গাথা উপগাথা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ঐতিহাসিক সত্য বাহির করা কঠিন। সম্ভবতঃ এই যুগেই (দশম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত) কয়েকজন বিখ্যাত রাজা বা রাজবংশ বর্তমান রংপুর—জলপাইগুড়ি—কোচবিহার জনপদে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। একজনের নাম ছিল জল্লেশ, যিনি জল্লেশের বিখ্যাত শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নৃপতি রাজা পৃথু বর্তমান বোদা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানীর বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তালমা নদীর উভয় তীর জুড়িয়া। ইহার পর এক পালবংশের নৃপতিগণের রাজত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পালবংশের সহিত গোঁড়ের পালবংশের কোন যোগাযোগ নাই (?) যদিও এই বংশের প্রথম নৃপতির নাম ছিল ধর্মপাল। রংপুরের অন্তর্গত ডিমলার নিকট ধর্মপালের আমলের একটি সুরক্ষিত সহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই পালবংশের রাজত্বকালীন ইহার একটি শাখাবংশের রাজা ছিলেন ‘হবুচন্দ্র’ এবং তাঁহার মন্ত্রী নাম ছিল ‘গবুচন্দ্র’। ইহাদের নিবুদ্ভিতা কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। এই যুগের ইতিহাস গবেষণার অপেক্ষায় আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এই জনপদের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করা যাইতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দলুজমদর্ন নামে এক বিখ্যাত শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য এ দলুজমদর্নকে লইয়া ঐতিহাসিক মহলে নানা মতভেদ আছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই দলুজমদর্ন ছিলেন দিনাজপুরবাসী এক কোচ প্রধান। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে দলুজমদর্ন তাঁহার অল্পবয়সে কোচ পাইকের সাহায্যে মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গোঁড়ে মুসলমান শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই যুগেই পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নীলধ্বজ নামে এক খেন বংশীয় প্রধানের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া ওঠে। এই রাজ্য গোয়ালপাড়া, কামরূপ সমগ্র রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুরের অংশ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। করতোয়ার পশ্চিম পারে অবস্থিত ঘোড়াঘাট ছিল এই রাজ্যের উত্তর প্রান্তীয় জেলা। ১৪৬০ খৃঃ অব্দে গোঁড়ের নরপতি বরবক শাহের আমলে এই অঞ্চল বিখ্যাত পীর ইসমাইল গাজী কর্তৃক বিজিত হয়। নীলধ্বজ বর্তমান কোচবিহার সহর হইতে ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে ধরলা নদীর পশ্চিমতীরে কামতাপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। এই খেন বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ছিল কামতেশ্বরী, এবং রাজবংশের পদবী ছিল কামতেশ্বর। নীলধ্বজের পুত্র নীলাধর ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। হুঃখের বিষয় তাঁহার আমলেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার সুলতান হুসেন শাহের হস্তে এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে এই খেন বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অঞ্চল হইতে মুসলমান শক্তি পরবর্তীকালে বিতাড়িত হয় বটে, কিন্তু সমগ্র অঞ্চলে নামিয়া আসে মাংস্ত্রাণ্য। বিরাট কামরূপ রাষ্ট্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বিভিন্ন অংশে কোচ প্রধানদের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

এই কোচ প্রধানদের মধ্যে একজন ছিলেন ‘হাজো’। তাঁহার দুই কন্যা ছিল জীরা ও হীরা—জীরার পুত্র চন্দন, আর হীরার পুত্র ছিল বিশ্বসিংহ। এই বিশ্বসিংহ ছিলেন বর্তমান কোচ রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি খেন বংশের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য “কামতেশ্বর” উপাধি গ্রহণ করেন। এই বিশ্বসিংহের অভিষেকের সময় তাঁহার ভ্রাতা শিশুসিংহ ছত্রধারণ করিয়া-



H I M A L A Y A M O U N T A I N S

JYOTIRPUTRA RIVER

B R A H M A P U T R A R I V E R

S Y L H E T

T R I P U R A

জয়পুত্রের মধ্যে
(বিহার) এবং আসামের
রক্ষার কলহের
এবং অন্য
জালপাইগুড়িতে

D I N A B U R

S H O

M A L D A

MODERN
COCHIN BIRAR

EXTENT OF
KAMRUPA SKETCH
IN
NARA NARAYAN'S TIME

ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'রায়কত' বা 'দুর্গাধিপতি' পদবী দেওয়া হয়। ইনি রাজার প্রধান মন্ত্রীর পদে বৃত্ত হন। শিশুসিংহ তিস্তার পশ্চিম পারে বৈকুণ্ঠপুর পরগণায় বসতি স্থাপন করেন। এইভাবে বৈকুণ্ঠপুরের 'রায়কত' বংশের পত্তন হয়। বিশ্বসিংহ পূবে অহম্ রাজাদের সঙ্গে এবং দক্ষিণে গোড়ের সুলতানদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। তিনি ছিলেন শিব এবং দুর্গার উপাসক। কোচদের সামরিক ধাঁচে সংগঠন ছিল তাঁহার বিরাট কীর্তি। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে নরনারায়ণ, গুরুধ্বজ এবং নরসিংহ ছিলেন ইতিহাস খ্যাত।

নরনারায়ণ কোচবংশের অত্যন্ত পরাক্রান্তশালী রাজা ছিলেন (১৫৩৮—৮৭)। তিনি তাঁহার স্বেযোগ্য ভ্রাতা এবং প্রখ্যাত যোদ্ধা চিলারায়ের* (গুরুধ্বজ) সহায়তায় জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের নৃপতিগণকে পরাস্ত করিয়া এক বিরাট রাজ্য গড়িয়া তোলেন। তিনি 'নারায়ণ' নামে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রার প্রচলন করেন। এই নারায়ণী মুদ্রা সমগ্র পূর্বভারতে ও ভূটানে ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভকাল পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। মহারাজা নরনারায়ণ গোড়ের মুসলমান শক্তিকে পরাস্ত করিয়া এক অংশ অধিকার করিয়া লন এবং এইভাবে ঘোড়াঘাট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হিন্দুদের পুনর্দখলে আসে। ইংরাজ পরিব্রাজক Ralf Fitch তাঁহার সময়ে কোচ রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া যান। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে নরনারায়ণের নানাবিধ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে পশুদের জন্তুও চিকিৎসালয় ছিল। নরনারায়ণের আমলে এই অঞ্চলে হিন্দু সংস্কৃতির এক নূতন জোয়ার আসে। নরনারায়ণের অনেক অভিযানের ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকিলেও ইহা অনস্বীকার্য যে তিনি উত্তরবঙ্গ (রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চল), ভোটান, পশ্চিম আসাম, খাসি-জয়ন্তিয়া অঞ্চল, কাছাড়, শ্রীহট্ট, মনিপুর এবং ত্রিপুরা লইয়া পূর্বাঞ্চলের এক বিরাট রাষ্ট্র (সাম্রাজ্য বলিলেও চলে) গঠন করিয়া যান।

নরনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এই সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও পরাক্রমশালী নৃপতি নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা রণকুশলী গুরুধ্বজের নিরলস চেষ্টায় গঠিত কোচ সাম্রাজ্য নিঃসন্দেহে বোদো-গোষ্ঠীর একটি বিরাট কীর্তি। জলপাইগুড়ি, রংপুর এবং কোচবিহার প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বর্গহিন্দুর আগমন ও অবদান পরবর্তীকালে প্রধানতঃ ইংরেজ অধিকার কাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

নরনারায়ণ ও গুরুধ্বজের পুত্রগণের মধ্যে এই বিরাট রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার (রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার) এবং আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে কোচ-হাজো নামে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্র এইভাবে গড়িয়া উঠে। পরস্পর কলহের দ্বারা এই দুইটি রাষ্ট্র ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে—এক অংশ সাময়িকভাবে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে এবং অন্য অংশ অহম্দের পদানত হইয়া যায়। রাষ্ট্রীয় সংহতি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংহতিরও অবসান ঘটে। এই অঞ্চলের বিরাট মানব গোষ্ঠীও রাজবংশী, কোচ ও মেচ প্রভৃতি নানাশাখায় বিভক্ত হইয়া যায়।

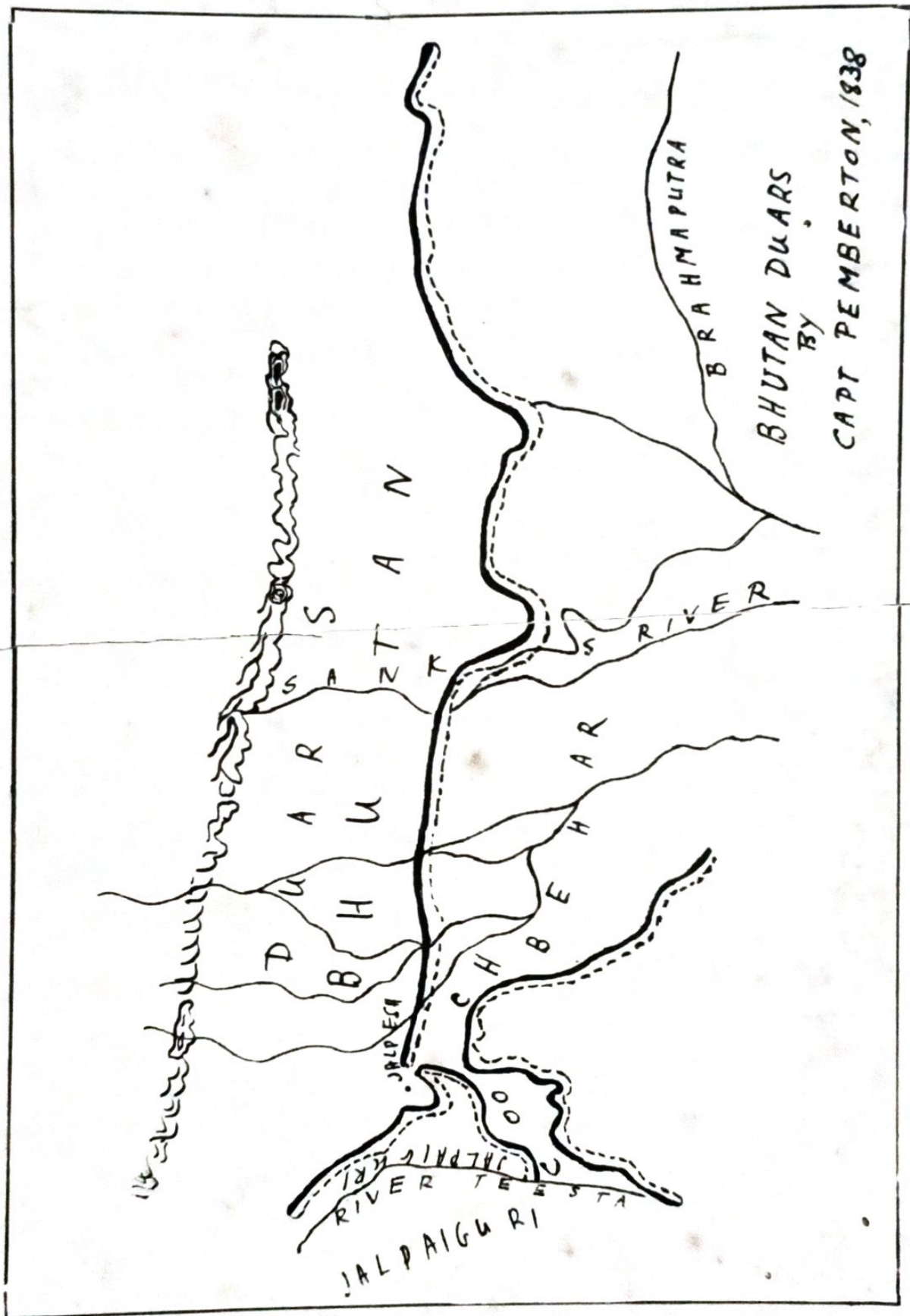
ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মীনারায়ণের আমলে কোচবিহার রাজ্যের আরও অবনতি ঘটে। তিনি পারিবারিক দ্বন্দ্ব ক্ষত বিক্ষত হইয়া জাতি ভ্রাতা বহুদেবের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত আকবরের সেনাপতি মানসিংহের শরণাপন্ন হন এবং সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। বহুদেব মানসিংহ প্রেরিত মোগল সৈন্যের কোচবিহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই পলায়ন করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নিষ্কণ্টক হইলেন বটে কিন্তু কোচ-

* তিনি গত বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সেনানায়কগণের অনুসৃত "Blitz" পদ্ধতি অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন।

বিহার মোগলদের আশ্রিত রাজ্যে (Vassal State) পরিণত হইল। আকবরের আমলে ঘোড়াঘাট অঞ্চল আবার মোগলদের অধিকারে আসে। আইন-ই-আকবরিতে বাংলা সুলতান অল্পতম সরকার ঘোড়াঘাটের বিশেষ উল্লেখ আছে। ঘোড়াঘাট* বিখ্যাত ছিল রেশম ও পাটের জন্ম। ঘোড়াঘাটের অল্পতম বিখ্যাত ফল ছিল লটকনা। ইহা স্বাদে ও গন্ধে ছিল পরম উপভোগ্য। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র বীরনারায়ণের সময় রাজ্যের বিশেষ অবনতি ঘটে। ভোটান পৃথক হইয়া যায় এবং কর প্রদানে বিরত থাকে। রায়কতরাও কোচবিহারের প্রভুত্ব অস্বীকার করে এবং অভিষেকের সময় আর ছত্র ধারণ করে না। “ছত্রধারী রায়কত” এইভাবে স্বাধীন “ছত্রপতি” হইয়া যায়। কোচবিহারের দুর্দশার এইখানেই শেষ হইলনা—বরং আরম্ভ হইল বলিতে পারা যায়। মহারাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে—আওরঙ্গজেবের সময়ে বাংলার শাসনকর্তা মিরজুমলা আসাম আক্রমণের প্রাকালে কোচবিহার আক্রমণ করেন এবং রাজধানী অধিকার করিয়া লন; কিন্তু কোচবিহারবাসীগণ শীঘ্রই মুসলমানদিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে মোগলরা ইরাদাদখাঁর (এবাদদ?) নেতৃত্বে ঘোড়াঘাট হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কোচবিহারের ফতেপুর, কাজিরহাটা এবং কাকিনা চাকলা (রংপুর) অধিকার করিয়া লয়। এই অংশ সম্পূর্ণভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া ইহার বোদা, পাটগাঁ ও পূর্বভাগ (জলপাইগুড়ি) অঞ্চল অধিকার করিবার চেষ্টা করে। এই অংশ অধিকার করিতে মোগলদিগকে তীব্র বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই চাকলাত্রয়ের অধিকার লইয়া বহুকাল ধরিয়া মোগল-কোচ সংঘর্ষ চলে। এই সংঘর্ষ প্রায় পঁচিশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ঘোড়াঘাটের ফৌজদারের পর ফৌজদার বদলী হইয়া গেল, কিন্তু মোগল সীমান্ত আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। এই সময়ে আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈকুণ্ঠপুরের অধিপতি কোচবিহার আক্রমণ করেন। কতিপয় পাঠান সেনানায়কের সাহায্যে রাজা রূপনারায়ণ (১৬৯০-১৭১৪) রায়কতদের পরাভূত করেন এবং মোগলদিগকেও সম্মানজনক সর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। ১৭১১ খৃঃ অব্দে (আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর) এই তিনটি চাকলা আইনতঃ মোগলদের অধিকারে আসিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোচবিহার রাজ্যেরই দখলে থাকিল। মোগলদের অধিকৃত কোচবিহারের এই অংশ প্রথমতঃ ফকিরাকুণ্ড নামে অভিহিত হয়। পরে ইহার নাম হয় সরকার—কোচবিহার।

মহারাজ রূপনারায়ণের আমল হইতেই কোচবিহারের রাজ্য সীমা সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই কোচবিহার রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ যেমন ক্রমশঃ মোগলদের পদানত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া আসে, তেমনি রাজ পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া ভুটিয়ারা সমতল অঞ্চলে নামিয়া আসিয়া বার বার রাজ্য আক্রমণ এবং গ্রাস করিতে থাকে। রাজ পরিবারের একদল ভুটিয়াদের সাহায্যে সিংহাসন দখল করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতদের সাহায্যে এই ভুটিয়া আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিহত হইলেও তাহাদের আক্রমণ ক্রমাগত চলিতে থাকে। উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল হইতেই (১৭১৪-১৭৬০) ভুটিয়ারা ক্রমশঃ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। দুর্বল কোচ নরপতি কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে যখন দেবেজ নারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন (তখন তিনি শিশুমাত্র) তখন ভুটিয়াদের আধিপত্য সমস্ত কোচবিহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তখন হইতে প্রকৃতপক্ষে ভুটান রাজ্যের প্রতিনিধি রাজধানীতে অবস্থিত একদল ভুটিয়া সৈন্তের সাহায্যে

* আকবরের আমলে ঘোড়াঘাট সরকার গঠিত ছিল দক্ষিণ রংপুর, দক্ষিণ-পূর্ব দিনাজপুর এবং উত্তর বগুড়া জিলার অংশ বিশেষ লইয়া।



শাসনকাৰ্য্য পরিচালনা করিতে থাকে। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে দেবেন্দ্রনারায়ণ গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন।

কোচবিহার রাষ্ট্রের রক্তমঞ্চে যখন এই রক্তম পট পরিবর্তন চলিতেছিল, তখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিধাতার অদৃষ্ট ইঙ্গিতে এক বৃহত্তর পট পরিবর্তন ঘটিল—“পোহালে শৰ্বরী বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।” ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিল। কোচবিহার রাজ্য প্রেরিত বোদা, পাঠগ্রাম ও পূর্বভাগ (জলপাইগুড়ি) চাকলা ত্রয়ের রাজস্ব কোম্পানীর খাজনা খানায় জমা পড়িতে লাগিল। এই ভাবে প্রকারান্তরে পূর্বাঞ্চলে মোগল শাসনের অবসান হইয়া কোম্পানীর শাসন (শোষণ?) আরম্ভ হইল এবং তাহার শুভ ও অশুভ প্রতিক্রিয়া স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যেও শীঘ্র দেখা দিল।

ইংরেজ অধিকার কাল

(১৭৬৫-১৮৬৮)

অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে যখন ভূটিয়াদের ক্রমাগত অত্যাচার ও আক্রমণের ফলে কোচবিহারের নাভিস্থান উপস্থিত, তখন হঠাৎ বাংলার রাজনৈতিক রক্তমঞ্চে কেবল এক বিরাট পট পরিবর্তনই হইল না, বিরাট রাজনৈতিক বিপর্যায়ও নামিয়া আসিল—ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলস্বরূপ।

কোচবিহার রাজ্য ও রাজ্য ভূটিয়াদের কবলিত। প্রতিবেশী বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য এ ব্যাপারে ইন্ধন জোগাইলেও বৈকুণ্ঠপুরও নিরাপদ ছিল না। সেখানে নেপালের সামুদ্রদেশ মোরং হইতে লুণ্ঠনকারীরাও অনবরত হানা দিতেছিল। এই সময়েই বৈকুণ্ঠপুরে সন্তাসীদেরও অনুপ্রবেশ আরম্ভ হইল। বাংলার উত্তরপূর্ব অঞ্চলের এই করুণ ছবি শুধুমাত্র এই ভূ-খণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্তুতঃ সমগ্র বাংলা জুড়িয়াই এই ভূতের খেলা চলিতেছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে যে অশান্তি ও অসন্তোষ সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া ধুমায়িত হইতেছিল, তাহার কালোছায়া এ অঞ্চলের উপরও পড়িয়াছিল। এই নূতন অবস্থার পরিপেক্ষিতে এই অঞ্চলের ঘটনাবলী বুঝিতে হইবে—কারণ এক রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়াই প্রায় এক শতাব্দী পরে বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম হইল। জলপাইগুড়ি জেলা কোচবিহারের কন্ঠা বটে—কিন্তু এ কন্ঠার জন্ম বহু দুঃখের মধ্যে এবং মাতার বিরাট অঙ্গচ্ছেদ দ্বারা।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর দেওয়ানীর পদ প্রাপ্তির পর হইতে বাংলায় ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ বলিয়া ধরা হয়। অনেকের ধারণা পলাশী যুদ্ধের সময়ে নবাবের অত্যাচারের ফলস্বরূপ বাংলার অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল—চারিদিকে অরাজকতা, অত্যাচার ও লুণ্ঠন চলিতেছিল, ইংরাজ আসিয়া দেশকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিল। কিন্তু ইহার সহিত বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুতঃ ১৭৬৫ হইতে ১৮১৮ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাংলায় মাংসাত্ম্য চলিয়াছিল। এ যুগের ইতিহাস এখনও প্রকৃতভাবে লিখিত হয় নাই। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে এ যুগের প্রকৃত চিত্র ফুটিয়া উঠিবে।

—The first half century of the British rule forms one of the most informative and interesting but saddest chapters in the History of Bengal. Practically speaking, there was no trace of Pax Britannica in the early years of the Company's administration in the Suba of Bengal. The hopeless and helpless inhabitants of this fair province were harassed during this period by the organised gangs of Dacoits and the internal commotions occasioned

by the Chuars and the Sannyasis, and also by the occasional raids across the frontiers by the Mahrattas from the west, Gurkhas and Bhutias from the north, and Garos and the Mugs from the east. In spite of the series of reform and in spite of the best efforts of Lord Cornwallis, who alone, of the early Pro-consuls of British India, realised seriously the gravity of the situation and tried to create an efficient (?) system of Police in his own way, peace did not dawn on Bengal—everywhere ‘Might was right’; the conditions became so alarming that in 1813 the Court of Directors appointed a special committee of their own to institute an enquiry into the administration of justice and police in the Company’s territories in India. Radical measures were adopted based partly on the indigenous police system and from 1818 the custodians of law and order in Bengal were in a position to state and report to their weary masters at home that the matters had greatly improved, though it took half a century more to evolve a workable system of police in Bengal through numerous experiments and commissions.

It is not a little curious to behold that the mighty arms of the British, before whose successive onslaughts kingdom after kingdom fell, and by 1818 the greatest of the indigenous powers—the Mahrattas had been crushed, could not, in spite of their sustained and serious endeavours bestow peace and tranquillity—the first and foremost requisites of an orderly government on the thirty million people of Bengal—the first and the greatest of their conquests. The causes were numerous and peculiar and require a deep study. What is hard to believe, the British Land revenue system was to a great extent responsible for this deplorable state of affairs.—

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল শক্তির অবনতির সময় বাংলা দেশেও আইন ও শৃঙ্খলা পূর্বের মত দৃঢ় না থাকিলেও দেশের শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। নবাবের থানাদারী ফৌজ ছাড়াও বড় বড় জমিদারের বিরাট পুলিশ বাহিনী (পাইক) ছিল। অর্ধ বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানী ও বর্ধমান মহারাজার বিস্তীর্ণ জমিদারীতে শান্তিরক্ষা খুব ভাল ভাবেই চলিত। বাংলা শাসন হইয়া গেলে শাসনে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লুক্ক বিদেশী বণিক স্বর্ণখণ্ড কুড়াইতে আসিত না। দেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। দেশে শান্তিও ছিল, কিন্তু ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে দেওয়ানী প্রাপ্তির পর হইতেই এই সমস্তের অবসান ঘটিল। নবাবের জন্ত যে সামান্য ভাতা নির্দিষ্ট হইল তাহাতে আর বিরাট ফৌজ রাখা সম্ভব হইল না—থানাদারী পুলিশ উঠিয়া গেল, বড় বড় জমিদারের অবস্থা কোম্পানীর অত্যাচার ও শোষণে ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে লাগিল। কোম্পানী রাজত্বের লোভে পাইক পোষণকারী বহু চাকরান জমি খাস (Resumption) করিয়া লইলেন। জমিদাররা বাধ্য হইয়া তাহাদের পুলিশ বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিলেন। নবাবের থানাদারী পুলিশ ও বড় বড় জমিদারদের পাইক ফৌজ-এর বিকল্পে কোম্পানী কোন নূতন শান্তিরক্ষক বাহিনী সৃষ্টি করিলেন না। আইনতঃ ইহা তাহাদের দায়ও ছিলনা। কোম্পানীর দায় ছিল রাজস্ব আদায়ে—শান্তি রক্ষার ভার থাকিয়া গেল নবাবের উপর। কিন্তু নবাবের অর্থ নাই, ইজ্জতও নাই। বক্সিচন্দ্রের ভাষায় নবাব গুলি খায় আর ঘুমায়, কোম্পানী খাজনা আদায় করে—শান্তি রক্ষা করে কে?—যাহারা ছিল পাইক—শান্তিরক্ষক, তাহারা সীলিকা নির্বাহের জন্ত দস্যুদলে যোগদান করিল। অধিকতর মুনাফার আশায় জমিদারী সাময়িকভাবে ইচ্ছা দেওয়ার ফলে বহু বনেন্দী জমিদার বংশ ধ্বংস হইয়া গেল। নূতন ইজারাদারের জমির বা প্রজার প্রতি কোন মায়া ও মমতা ছিল না, থাকিবার কথাও নয়। উপরে জমিদারের উপর কোম্পানীর নিপীড়ন,

নীচে সাধারণ প্রজার উপর কোম্পানীর ব্ল্যাক গোমস্তার (দেশী-আমলা) অত্যাচার—এই দুই নির্মম যাতাকলের মধ্যে পড়িয়া বাংলার জমিদারকুল ও প্রজাবৃন্দ এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখে পড়িল। দুঃখের পাত্র পূর্ণ করিতে সেই সময় “হিয়াত্তরের মন্বন্তর” দেখা দিল — বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া গেল ; এক তৃতীয়াংশ ভঙ্গলে পরিণত হইল। দেশ ডাকাত দলে ভর্তি হইয়া গেল। এই সময়ে আবার বাংলার বাহির হইতে সন্তাসী ফকিররা আসিয়া লুটতরাজ আরম্ভ করিল। এই সন্তাসীরা বন্ধিমচন্দ্র বর্ণিত ‘দেশোদ্ধারকারী সন্তান’ ছিল কি-না ইহা ইতিহাসে বিতর্কিত বিষয়। বাংলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল সন্তাসীদের অত্যাচারে যে জর্জরিত হইয়াছিল তাহাতে অহুমান্ব সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানী শাসিত বাংলার ইহাই ছিল বাস্তব চিত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি এই বেদনাময় চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ভূখণ্ডের অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই ভূখণ্ডের উপর দিয়াও এক নির্মম অত্যাচারের স্রোত বহিতেছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে ভূটিয়াদের কোচবিহার সীমান্তের উপর অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মোরং হইতে গোখরাও দলে দলে নামিয়া আসিতেছিল। প্রতি বৎসর সন্তাসীরা তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষে বাংলার উত্তর-ভূখণ্ডের উপর দিয়া আক্রমণকারী সৈন্তের মত চলিতে ফিরিতে লাগিল। তাহাদের আচরণ ও পরিচ্ছদ ঠিক ভক্তিকামী, শান্তিবাদী তীর্থযাত্রীদের মত ছিল না। ইজারাদারদের উৎপীড়ন ও দস্যুদলের অমাহুষিক অত্যাচার তো লাগিয়াই ছিল। ইহার পর দেখা দিল সমগ্র রংপুর-জলপাইগুড়ি ভূখণ্ড জুড়িয়া এক দারুণ প্রজা বিদ্রোহ।

রংপুর-জলপাইগুড়ির প্রজা বিদ্রোহ

মোগলযুগে বর্তমান বোদা, পাটগাঁ, পূর্বভাগ (জলপাইগুড়ি অঞ্চল) ও বৈকুণ্ঠপুর ; রংপুর বা ফকির কুণ্ডর ফৌজদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে যখন কোম্পানী দেওয়ানী পাইলেন, তখন এই অঞ্চলও বাংলার অগ্ন্যাগ্ন অংশের জমিদারীর মত গৃহীত ইজারাদারদের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। মোগল আমলের কর ছিল সহনীয়, কিন্তু লভ্যাংশ বণ্টনকারী কোম্পানী অধিকতর মুনাফার আশায় যাহারা বদ্ধিত হারে খাজনা দিতে স্বীকার করিত, তাহাদেরই সাময়িকভাবে বিভিন্ন চাকলা বা মহল পত্তনী দিতেন। এই সময় সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া এক নূতন জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কলিকাতার বেনিয়ান এবং কোম্পানীর উপর মহলের প্রিয়পাত্র। দেবীসিংহ ছিলেন এই যুগের একজন নির্মম ও অত্যাচারী ইজারাদার ও ওয়ারেন্ হেস্টিংস-এর প্রিয়পাত্র। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে দিনাজপুর রাজার মৃত্যু হইলে হেস্টিংস ইহাকে কেবল বালক রাজার অভিভাবক (ভক্ষক ?) নিযুক্ত করিলেন না, তাঁহার লালসার মাত্রায় পূর্ণাঙ্গ দিবার জন্য তাঁহাকে বৈকুণ্ঠপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলসহ সমগ্র রংপুরের ইজারাদার নিযুক্ত করিলেন। যমসদৃশ কামাল-উদ্দিন ছিল রাজা দেবীসিংহের বিশ্বস্ত অহুচর ও প্রধান রাজস্ব সংগ্রাহক। পূর্ববর্তী বৎসরের (১৮৭০) জমা অপেক্ষা ৭০,০০০ বদ্ধিত জমা অঙ্গীকার করিয়া দেবীসিংহ এই অঞ্চল ইজারা লইলেন। মাত্র ৬০,০০০ টাকার মুনাফার ব্যবস্থা রাখিয়া দেবীসিংহ এই সমস্ত অঞ্চল আবার ছোট ছোট জমিদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। এই বদ্ধিত খাজনা আদায় করিবার সময় প্রজা-নিগ্রহ পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। প্রজারা কি ভাবে নিষ্পেষিত হইত তাহার একটি নির্মম চিত্র — রংপুরের তৎকালীন কালেক্টার ‘Goodland’ সাহেবের বর্ণনায় পাওয়া যায়। —“একটি ঘরের দরজা খোলা হইল; ঘরের ভিতরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাঁচ-ছয়জন অস্থি-কঙ্কালসার লোককে গাদাগাদি

অবস্থায় দেখা গেল ; তাহারা কথা বলিতে পারিতেছিল না। ইহারা প্রায় ১০।১২ দিন এই অবস্থায় ছিল। এই বারদিনের মধ্যে তাহাদিগকে মাত্র তিনবার খাবার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও আবার দেবীসিংহের অজ্ঞাতে। এই লোকগুলিকে প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হইত।” সমস্ত রংপুর জলপাইগুড়ি অঞ্চল জুড়িয়া এই তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল। অবশেষে সহের মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে সমগ্র রংপুর-জলপাইগুড়ি অঞ্চল জুড়িয়া বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিল। বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও ভয়াল রূপ দেখিয়া রংপুরের শাসনকর্তা আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়মে সংবাদ পাঠাইলেন। Goodland এর মতে “It was the most formidable riot ever happened in Bengal.” বস্তুতঃ এই সময়ে বাংলার প্রান্তদেশ জুড়িয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে বিদ্রোহের আগুন জলিতেছিল — কোম্পানীর আমলের নির্মম রাজস্ব ব্যবস্থার প্রতিবাদ স্বরূপ।

রংপুরের প্রজাদের আসল জমার উপরে টাকা প্রতি ৥০ ‘অ’বওয়াব’ দিতে হইত এবং অত্যন্ত নৃশংসতার সহিত এই বর্ধিত খাজনা আদায় করা হইত। দেবীসিংহ যাহাকে ধরিয়া আনিতে বলিতেন, তাঁহার কালান্তক অত্যাচারের তাহাকে বাঁধিয়া আনিত। বেত্রাঘাত ছিল ইহাদের প্রতিদিনকার প্রাপ্য। বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে না পারায় বহু জমিদারের জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হইল। দেবীসিংহের অত্যাচারের এই অত্যাচারের বর্ণনা যখন মহামতি Burke হেষ্টিংস এর বিচারের সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্যদের নিকট বর্ণনা করিতেছিলেন তখন অনেকে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

অত্যাচারিত প্রজাপুঞ্জ বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া এক বিকল্প সরকার গড়িয়া তুলিল—তাহারা মহম্মদ হুসুলউদ্দীনকে নবাব এবং দয়ারামশীলকে দেওয়ান নিযুক্ত করিল ; এবং এই সরকারের ব্যয় নির্বাহার্থ এক নূতন কর বসাইল। এই করের নাম ছিল দিণ্ড (দিণ্ড শব্দের অর্থ বিদ্রোহ) খরচ। বিদ্রোহের নেতারা দিনাজপুর, কোচবিহার, বোদা এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে দূত প্রেরণ করিল এবং স্থানে স্থানে প্রজাদের জমায়েত হইবার নির্দেশ দিল ; এবং এইসব স্থানে বিদ্রোহের কার্যক্রম ঠিক করা হইত। সমস্ত অঞ্চলের প্রজারা নেতাদের নির্দেশ অনুসারে দেবীসিংহকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। ইহার পর বিদ্রোহীরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। একদল কোচবিহার অভিমুখে রওনা হইল, আর এক দল বোদা অঞ্চলে প্রেরিত হইল। বেশী সংখ্যক বিদ্রোহীরা রংপুরের উত্তরাঞ্চল জুড়িয়া এক রক্ষা প্রাচীর গড়িয়া তুলিল। একদল বিদ্রোহী অত্যাচারের প্রতীক কাছারী বাড়ী লুণ্ঠ করিতে এবং দেবীসিংহের নায়েবদের শাস্তি দিতে ছুটিল। এই বিদ্রোহী দলের সম্মুখে আমলারা ঝড়ের সম্মুখের শুষ্ক ভূখণ্ডের মত উড়িয়া গেল। যে যেখানে পারিল প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। বহু কাছারী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইল। গৌরমোহন ছিল একজন কুখ্যাত নায়েব— যাহার অত্যাচারে প্রজাকুল রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিত না। বিদ্রোহীরা ইহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল এবং চরম শাস্তি প্রদান করিল। আতঙ্কিত দেবীসিংহ সরকারের নিকট এই বিদ্রোহ দমন করিতে সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সরকার এইবার তাঁহার উপর বিরূপ হইলেন ; সৈন্য আসিল না। তখন দেবীসিংহ গতাস্তর না দেখিয়া ইজারাদারের পদে ইস্তফা দিলেন। রংপুরের কালেক্টার Goodland সাহেব ভয় পাইয়া অল্পগত জমিদারদের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বাহার বন্দের জমিদার নরসিংহ এবং বোদার নায়েব মির্জা মহম্মদের কাছে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কোম্পানীর বরকন্দাজদের সহিত বিদ্রোহী পাইকদের নানাস্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছিল। বিদ্রোহীরা বিপুলভাবে বাধা দিয়াছিল কোম্পানীর ফৌজকে বোদা অঞ্চলে ও পাটগ্রামে।

পাটগ্রামের সংঘর্ষকে যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া চলে। বিদ্রোহীরা তীর ধনুক ও বল্লম লইয়া কোম্পানীর ফৌজকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর; সন্মুখ যুদ্ধে ইহাদের সহিত লড়াই নিফল জানিয়া সিপাহী দল চতুরতা করিয়া আত্মসমর্পণের অছিলায় সাদা পোষাকে ইহাদের সন্মুখে আনিয়া উপস্থিত হয়। সিপাহীদের এই চতুরতা বিদ্রোহের নামকে রা ধরিতে পারে নাই। সাদা পোষাকের লোকদিগকে নিজের দলের লোক মনে করিয়া যখন বিদ্রোহীরা ইহাদের সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন হঠাৎ সিপাহীদের বন্দুক গজিয়া উঠিল এবং বহু বিদ্রোহী আহত ও নিহত হইল। বিদ্রোহীদের নবাব নুরুলউদ্দিন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া সিপাহীদের হাতে বন্দী হইলেন এবং দেওয়ান দয়ানীল রণক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন। নবাব পশ্চিমমুখে পতিত হইলেন। বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। সরকার নানাবিধ আশ্বাস দিয়া বিদ্রোহীদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিলেন। খাজনার হার কমানিয়া দেওয়া হইল। সরকার-নিযুক্ত কমিশন দেবীসিংকে এই সমস্ত অনিষ্টের মূল বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করিলেন। দেবী সিংকে বন্দী অবস্থায় কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। আস্তে আস্তে এই বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। বলা বাহুল্য এই বিদ্রোহের ফলে ফোর্ট উইলিয়ামস্থ কর্তৃপক্ষের টনক নড়িয়াছিল লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় কমিশনের রায় বাহির হইল। তাঁহারা দেবীসিংকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার অনুচরকে শাস্তি দিলেন। অতিরিক্ত করদার্য্য এবং দেবী সিংহের অনুচরদের নির্যাতন করিয়া খাজনা আদায়, ইহাই যে বিদ্রোহের মূল কারণ তাহা কমিশনের বৃষ্টিতে দেবী হয় নাই। তাই তাঁহারা ইজারা প্রথা তুলিয়া দিলেন। জমার পরিমাণও অনেক কমিয়া গেল, এবং পূর্বতন জমিদারদের মধ্যে জমিদারী বিলি ব্যবস্থা হইল। ইহার পরও এই অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড ভাবে আরও বিদ্রোহ হয়, তবে ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহের তুলনায় এগুলি নিতান্ত নগণ্য ছিল।

এই বিদ্রোহে বহুসংখ্যক মুসলমানও যোগ দিয়াছিল। এই রংপুর বিদ্রোহ হইতেছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের (কোচ, রাজবংশী প্রভৃতি) ক্ষাত্রবীর্যের ও সংগঠন শক্তির শেষ পরিচয়। এখানে ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সময়কার প্রজাবিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সাধারণতঃ বাংলার প্রান্তবাসী দুর্দম চুয়ার, সাঁওতাল, কোচ, রাজবংশী প্রভৃতি কৌমগণ, যাহাদের রক্তধারা তখন পর্য্যন্ত স্তিমিত হইয়া যায় নাই। সমতলবাসী বাঙ্গালীরা এইসব বিদ্রোহে কম অংশই গ্রহণ করিয়াছিল, যদিও তাহারা একইভাবে অত্যাচারিত হইয়াছিল। বাংলার অভ্যন্তরস্থ সমতলবাসীগণ বহুদিন যাবৎ মুসলমানদের পদানত ছিল, কিন্তু মেদিনীপুর অঞ্চলের চুয়ারগণ এবং কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী ও মেচ ও কোচরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। তাই তাহারা অমিতবিক্রমে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সিপাহীদের সহিত লড়িয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই—রংপুর, জলপাইগুড়ি প্রজা বিদ্রোহের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই, লিখিত হইলে ইহা বহু অজ্ঞাত ঘটনার উপর আলোকপাত করিবে।

সন্ন্যাসী-ফকির-গোষ্ঠী-ভূতিয়া হামেলা

বৈকুণ্ঠপুর-কোচবিহার-ভোটান সংঘর্ষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত এই একশত বৎসরকাল রংপুর, বৈকুণ্ঠপুর ও কোচবিহার ভূ-খণ্ড জুড়িয়া নানা হান্সামা চলিয়াছিল, পূর্বেই বলিয়াছি—কখনও কখনও সন্ন্যাসী ফকিরের অত্যাচারে এই অঞ্চলে ব্যাপক অশান্তি দেখা দিত; কখনও বা নেপালের মোর! প্রদেশ হইতে গুর্খারা

নামিয়া আসিয়া লুঠতরাজ করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া চলিয়া যাইত। ইহার পর প্রায়ই লাগিয়া থাকিত ভোটিয়াদের আক্রমণ ও জবরদারী দখল। সর্বোপরি কোচবিহার, ভোটান ও বৈকুণ্ঠপুর রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিবাদ এবং বিশেষ করিয়া ভোটানের আগ্রাসবৃত্তি এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে দুর্যোগপূর্ণ ও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭৭২ খৃঃ অব্দের পর হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই প্রদেশের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনা সমূহ নূতনভাবে আবর্তিত হইতে লাগিল। বিবাদমান ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলি কল্লনাও করিতে পারে নাই যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘণীজলে এক তিমিজিলের আবির্ভাব হইল। এই অঞ্চলের এই একশত বৎসরের ইতিহাস (১৭৭২-১৮৬৮) কম জটিল ও কম চিত্তাকর্ষক নহে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার পাওয়ার পর হইতে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে এক নূতন অশান্তি দেখা দিল। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ জুড়িয়া এই অশান্তি চলিয়াছিল। এই সময় হইতেই প্রতিবৎসর বাহির হইতে দলে দলে সন্তাসীরা রাজসাহী—রংপুরের উত্তর দিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত যাইত তীর্থস্থান দর্শন করিতে। উত্তরবঙ্গে সন্তাসীদের এই দল রংপুর, ঘোড়াঘাট, শিলবাড়ী, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চল দিয়া যখন ময়মনসিংহের অভিমুখে অগ্রসর হইত, তখন ইহাদের পথের গ্রামগুলি জনশূণ্য হইয়া যাইত। সন্তাসীদের দলপতিগণ অশ্বপৃষ্ঠে সজ্জিত হইয়া অস্ত্রধারী সহস্র সহস্র অলুচর লইয়া সৈন্যবাহিনীর ন্যায় চলাফেরা করিত। যথেষ্ট পরিমাণে ভিক্ষা বা দান না পাইলে ইহারা কাছারী গোলাবাড়ী এবং গৃহস্থদের ঘরবাড়ী লুঠ করিয়া চলিত। ইহাদের অত্যাচারে বহু জমিদার কাছারী বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। বহুস্থানে খাজনা আদায় বন্ধ হইয়া যাইত। কোম্পানীর ফৌজদের সঙ্গে ইহাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। অনেক খণ্ডযুদ্ধে ইহারা কোম্পানীর ফৌজকে বহুবার নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসকে ইহাদের দমন করিতে বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইহাদের দলপতি ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর কাহিনী লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস ‘দেবী চৌধুরাণী’ রচিত হইয়াছে। ফকিরদের দলপতি মঞ্জুশা কোম্পানীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাণী ভবানীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল—সরকারী নথিপত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সন্তাসীরা বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলেও হানা দিত। আবার এই সন্তাসীর সাহায্যে বৈকুণ্ঠপুর-রাজ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া কোচবিহার রাজ্যকে হীনবল করিবার চেষ্টা করিতেন। আবার ইহাও শোনা যায় কোচবিহার সেনাপতি নাজিরদেব বহু সন্তাসীকে বেতন দিয়া পুষিতেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সময়ে (১৭৬৫-১৭৭২) ভোটিয়াগণ প্রায় সমগ্র কোচবিহার অধিকার করিয়া লইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ভোটানের প্রতিনিধি কোচবিহারের রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। এই চক্রান্তের মূলে ছিল বৈকুণ্ঠপুররাজ দর্পদেব। তাঁহার অধিকার পূর্বাঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল। তিনি কোচবিহার রাজের শক্তি খর্ব করিবার জন্ত নিজ রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল—বর্তমান আমবাড়ী ফালাকাটা ও বিখ্যাত জলেশ মন্দির সহ—জলেশ্বর অঞ্চল ভোটিয়াদের অধিকার করিতে দিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে কোচবিহারে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যে, তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের নাজিরদেব অন্তোপায় হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শরণাপন্ন হইলেন। কতকগুলি সর্ভাধীনে কোচবিহার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করদরাজ্যরূপে গণ্য হইল। এইখানে ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে একটা কথা বলা আবশ্যিক যে নামে করদরাজ্য হইলেও কোচবিহার প্রকৃত পক্ষে রংপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল এবং কোচবিহার হইতে আদায়ীকৃত রাজস্ব (রাজপরিবারকে দেয় ভাতা বাদে) রংপুর কালেক্টরীতে জমা হইতে লাগিল। সন্ধির চুক্তি অনুসারে কোম্পানী কোচবিহার হইতে ভোটিয়াদের

বহিষ্করণের উদ্দেশ্যে ভোটান ও বৈকুণ্ঠপুরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিলেন। Capt. Jones এর নেতৃত্বাধীনে ইংরাজ সৈন্য কোচবিহার দখল করিয়া লইল এবং ভোটিয়াদের কোচবিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া দিল। ভোটিয়ারা দুয়ার অঞ্চল অতিক্রম করিয়া নিজরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। এইখানে ডালিমকোট নামক স্থানে তাহাদের সঙ্গে ইংরাজদের তীব্র সংঘর্ষ হয়। প্রবল বাধা দিলেও শেষ পর্য্যন্ত ভোটিয়ারা পরাজিত হয়। ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে ভুটিয়াদের মনোবল ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইংরাজের সঙ্গে সন্ধির জন্য তাহারা তিব্বত সরকারের শরণাপন্ন হয়। অবশেষে ১৭৭৪ সালে তিব্বত সরকারের মধ্যস্থতায় ইংরাজদের সঙ্গে ভোটিয়াদের সন্ধি হয়। এই সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী মহারাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা দেওয়ানদেব স্বর্ঘ্যেন্দ্র নারায়ণ ভোটিয়াদের কবল হইতে মুক্ত হন। এই সন্ধির সর্তাবলী পাঠ করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, ইংরাজ সরকার কোচবিহার রাজ্যকে বিপন্ন করিলেও আক্রমণকারী ভোটান সরকারের প্রতি কোন কঠোর ব্যবহার করেন নাই; বরং ভোটিয়াদের বহু প্রকারে খুসী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ সন্ধির সর্ত অনুসারে সংকোশ নদী হইতে তিস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চল (পশ্চিম দুয়ার) যাহা পূর্বে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং যাহা গত পঞ্চাশ বৎসর ভোটিয়ারা বলপূর্বক দখল করিয়া লইয়াছিল এবং ত্রায়তঃ যাহা কোচবিহারের প্রাপ্য ছিল তাহার সবই ভোটান সরকারকে দেওয়া হইল। কোচবিহারের প্রাপ্য দুয়ার অংশ ভোটানকে দেওয়া বিষয়ে নীতিগত প্রশ্নও উত্থাপিত হইতে পারে। কোচবিহার হইতে ভুটিয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোচবিহার রাজ্যের ও রাজ্যের নিশ্চয়ই পরম উপকার সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কৃতজ্ঞতার মূল্য বোধ হয় অত্যধিক হারে ধার্য্য করিয়াছিলেন—অর্দ্ধেক রাজস্ব নহে (৭২০০০ মূদ্রা) অর্দ্ধেক রাজস্বও কোচবিহারকে হারাইতে হইল। কৃতজ্ঞতার পণ আদায়ের একরূপ নির্মম দৃষ্টান্ত আরও বহু আছে। গণতন্ত্রের আদর্শস্থল প্রাচীন এথেন্স রাষ্ট্র যখন বহু রাষ্ট্রগুলিকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল, তখন এথেন্সের এই দুই আচরণ ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছিল। এথেন্সের প্রতি নিম্নলিখিত নিন্দাত্মক ভাষা—

“Tough Imperial Conscience of a profit sharing democracy was untroubled by the thought that it was sacrificing the Virtue of honesty to teach the allies the Virtue of gratitude”* বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য হইলেও ইহা নিছক ব্যবসায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিবেক দংশনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ওয়ারেন হেস্টিংস এর ভোটান সরকারের প্রতি এই উদার ব্যবহারের পশ্চাতে গুরুতর রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভোটানের মধ্য দিয়া তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করিবার স্বযোগ খুঁজিতেছিল। তিব্বতের সম্ভাব্য স্বর্ণ খনি ও বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনা ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রলুব্ধ করিতেছিল এবং এই স্বর্ণ-মুগের পিছনে কোম্পানীকে বহুদিন ছুটিতে হইয়াছিল। রংপুরের শাসনকর্তা Goodland সাহেব এক চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, হেস্টিংস তাঁহাকে বার বার বলিয়া দিয়াছেন যেন কোনও প্রকারেই ভুটিয়াদের বিরক্ত করা না হয়। তাঁহার এই ভুটিয়া তোষণ নীতি বহুকাল অব্যাহত ছিল। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে হেস্টিংস এক চিঠিতে রংপুরের তৎকালীন কালেক্টার পারলিং সাহেবকে লিখিতেছেন যে, তিনি যেন ভুটিয়াদের সব দাবীদাওয়া মানিয়া চলেন, কারণ ভোটানীদের রাজা এক দূতের মারফত তাঁহার কতকগুলি অশ্ববিধার কথা কোম্পানী বাহাদুরের গোচরে আনিয়াছেন। কোচবিহারের টাকশালের তৈরী মূদ্রার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে ভোটান সরকারের খুব অশ্ববিধা হইতেছিল। হেস্টিংস রংপুরের খাজাঞ্চিখানা হইতে ভোটান সরকারকে বিনিময়ে উপযুক্ত পরিমাণ

নারায়ণী মুদ্রা সরবরাহের নির্দেশ দেন। ভোটানীদের ইতিপূর্বেই কোম্পানীর মূল্যে অবাধ বাণিজ্য করিবার অধিকার দেওয়া হয়। তাহারা যাহাতে বিনাশুল্ক ঘোড়া ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় কিংবা ক্রয় করিতে পারে তাহার জগু হেষ্টিংস সাহেব রংপুরের কালেক্টরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন। ভোটায়ারা বাংলাদেশ হইতে তেল এবং শুকনা মাছ পাইতেছিল না — যাহাতে ঐ দ্রব্যগুলি ভুটিয়ারা বিনা বাধায় উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য হেষ্টিংস রংপুরের কালেক্টরকে ঐ অঞ্চলের সমস্ত জমিদারদের উপর পরোয়ানা জাহির করিতে নির্দেশ দেন। তৎকালে রংপুর অঞ্চলেই ছিল ভুটিয়াদের বাবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। ভোটয়াদের প্রতি হেষ্টিংস-এর এই তোষণ নীতি পরবর্তী ইংরাজ শাসক কর্তৃগণও অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

কোচবিহার রাষ্ট্রও প্রথম ভোটান যুদ্ধের ফলে ভোটানীদের কবল হইতে মুক্ত হইল বটে — কিন্তু শান্তি আসিল না। কোচবিহার রাজ্যের উত্তর সীমান্তে ভুটিয়াদের দৌরাণ্য ও হামলা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং ইহার পরিণতি হইল দ্বিতীয় ভোটান যুদ্ধ। এইবার বৈকুণ্ঠপুরে আসা যাউক।

বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য বৃটিশ অধিকারকাল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল—যদিও কিছুকালের জন্য বৈকুণ্ঠপুর মোগলদিগের নিকট নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বৈকুণ্ঠপুরের স্বাধীন রাজ্য হিসাবে অস্তিত্ব কতকাল ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেননা আমরা দেখিতেছি যখন ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে ইরাদদ্ খান কোচবিহার রাষ্ট্রের নিকট হইতে ফতেপুর, কাজিহাট এবং কাকিনা রাজ্য ছিনাইয়া লইলেন তখন পান্ডা এবং বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই বশ্যতার স্বরূপ কি তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। আবার দেখা যায় যে, বাংলার নবাব সাজাউদ্দৌল্লাহর সময় (১৭২৭-১৭৩৫) ঘোড়াঘাটের নায়েব ফৌজদার দিনাজপুর এবং কোচবিহারের রাজাদের বাংলার সুবেদারের অধীনে আনয়ন করিলেন — ইহারা এতকাল বাংলার সুবেদারের নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করে নাই। এই রাজাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা ছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। অথচ ১৭৭২ খৃঃ অব্দে বোদার নায়েব রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে এক চিঠিতে জানাইতেছেন যে যখন সাজাখাঁর আমলে বৈকুণ্ঠপুর বাংলার নবাবের অধিকারে আসে তখন দর্পদেব ও তাহার ভ্রাতাকে রংপুরে বন্দী করিয়া আনা হয় এবং এই বন্দী অবস্থায় তাহার ১৭ বৎসরকাল রংপুরে কাটাইয়াছিলেন; পরে কাশেম আলির সময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই খবর সত্য হইলে মোগল আমলে বৈকুণ্ঠপুরের স্বাধীন সত্তা সন্দেহ সন্দেহ জাগে। কিন্তু বোদার নায়েব ছিল কুচবিহার রাজ্যের অধীন এবং বৈকুণ্ঠপুর রাজ ছিল কুচবিহারের প্রবল শত্রু। শত্রুপক্ষের উক্তি সন্দেহের অতীত নয়। কিন্তু সন্দেহ সন্দেহ এ প্রশ্নও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রাজনৈতিক বিপর্যয়ে কোচবিহার রাজ্য স্বাধীন সত্তা হারাইলেন এবং পার্শ্ববর্তী ভূভাগ বোদা, পাটগাঁ এবং পূর্বভাগ অঞ্চল মোগলদের অধীনে আসিল; সেখানে বৈকুণ্ঠপুরের মত ক্ষুদ্র রাজ্য কি করিয়া মোগলদের শ্যেন দৃষ্টি এড়াইয়া নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিল? অথচ একাধিক ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন—বৈকুণ্ঠপুর মোগলদের আমলে স্বাধীন ছিল। বিষয়টি নিবিড় গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ড (৩২৮ বর্গমাইল) যাহার অপর নাম ছিল বত্রিশ হাজারী, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। কখনও ভোটয়া এবং কখনও সন্ন্যাসীদের সাহায্যে কোচবিহার রাজ্যকে দুর্বল করিয়া বৈকুণ্ঠপুর ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতে থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি কোচবিহারের উপর ভোটানীদের আক্রমণের ইন্ধন জোগাইতেছিল বৈকুণ্ঠপুররাজ দর্পদেব। দর্পদেবের দর্প খবর করিবার প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাড়া বৈকুণ্ঠপুরের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি রংপুর ও দিনাজপুর জেলার নিরাপত্তার ব্যাঘাত করিতে পারে—এ আশঙ্কায়

কোম্পানী Capt. Stewartকে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন। এই সৈনিক পুরুষ জলপাইগুড়িকে ঘাঁটি করিয়া সহজেই বৈকুণ্ঠপুর অধিকার করিয়া লইলেন। স্বাধীন বৈকুণ্ঠপুর সাধারণ জমিদারীতে পরিণত হইল। প্রথমতঃ ইহার রাজস্ব ধার্য্য হয় দশ সহস্র মুদ্রা; বৈকুণ্ঠপুরের তীত্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও পরে ধাপে ধাপে বাড়িয়া ত্রিশ সহস্রে পৌঁছে। অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ইহা হ্রাস হইয়া প্রায় ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যখন বৈকুণ্ঠপুর কুচবিহারের অধীন ছিল তখন ইহার রাজস্ব ছিল দশ সহস্র মুদ্রা। ৩২,০০০ টাকা ছিল ইহার মোট আদায় (ইহার অপর নাম বত্রিশ হাজারী)। বৈকুণ্ঠপুরের উপর অত্যাধিক মাত্রায় কর ধার্য্য হইয়াছিল ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই—বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের পুনঃপুনঃ কাতর আবেদন এবং রংপুরের কালেক্টার সাহেবের জোরালো সুপারিশ কোম্পানীর খাজনা কমাতে সক্ষম হয় নাই। বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের প্রতি কোম্পানীর এই অযৌক্তিক কঠোর আচরণের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ও বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা রাখে। সন্ন্যাসীগণের সহায়তায় বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধিই কি কোম্পানীর রোষ বহিতে পতিত হইবার একমাত্র কারণ? হেষ্টিংস এর এক চিঠিতে আমরা জানিতে পারি যে, বৈকুণ্ঠপুরের রাজা কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের প্রশ্রয় দিতেছিলেন না—তিনি নানাভাবে কোম্পানীর আদেশ অমান্য করিতেছিলেন। বৈকুণ্ঠপুর রাজা কোম্পানীর কিছুমাত্র অনুকম্পার পাত্র নহেন—একথা স্মরণ করাইয়া দিয়া হেষ্টিংস রংপুরের শাসনকর্তাকে শীঘ্রই বৈকুণ্ঠপুর দখল করিতে এবং রাজা দর্পদেবকে বন্দী করিতে আদেশ দেন। অবশ্য কুচবিহারের নাজিরদের এই সময়েই কোম্পানীকে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছিলেন; আবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করিবার আছে—সন্ন্যাসীরা বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল সমাকুল উত্তরাংশ অধিকার করিয়া সেখানে বহু ঘাঁটি নির্মাণপূর্বক অবস্থান করিতেছিল। এই ঘাঁটিগুলি অত্যন্ত স্বরক্ষিত ছিল। সন্ন্যাসীদের কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন বিশেষ পরিকল্পনা ছিল যাহার ভয়ে ভীত হইয়া কোম্পানী পার্শ্ববর্তী রংপুর ও দিনাজপুরের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য অধিকার করিতে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন?

বৈকুণ্ঠপুরের ভাগ্যে আরও বিপদ অপেক্ষা করিতেছিল। এই সময়েই বৈকুণ্ঠপুররাজ বন্ধিত হারে খাজনা দিতে অসমর্থ হওয়াতে কোম্পানী এক সেজোয়াল প্রেরণ করেন রাজস্ব সংগ্রহের জন্য। এই সেজোয়াল বৈকুণ্ঠপুর হইতে পলায়ন (?) করিয়া আসিয়া রংপুরে সংবাদ দেয় যে, বৈকুণ্ঠপুর রাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে এবং তাহার অনুচর ও সিপাহীদের মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, বৈকুণ্ঠপুরের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরিত হইল, কিন্তু পরে দেখা গেল সেজোয়াল মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে।

ইহার পর বৈকুণ্ঠপুরে চলিল মোরাংদের আক্রমণ। ১৭৮০ হইতে ১৭৮৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসর গোখাঁদেরও ক্রমাগত আক্রমণ চলিয়াছিল। এই সমস্ত আক্রমণের প্ররোচনা জোগাইত বৈকুণ্ঠপুর জমিদারদের ভ্রাতৃপুত্র।

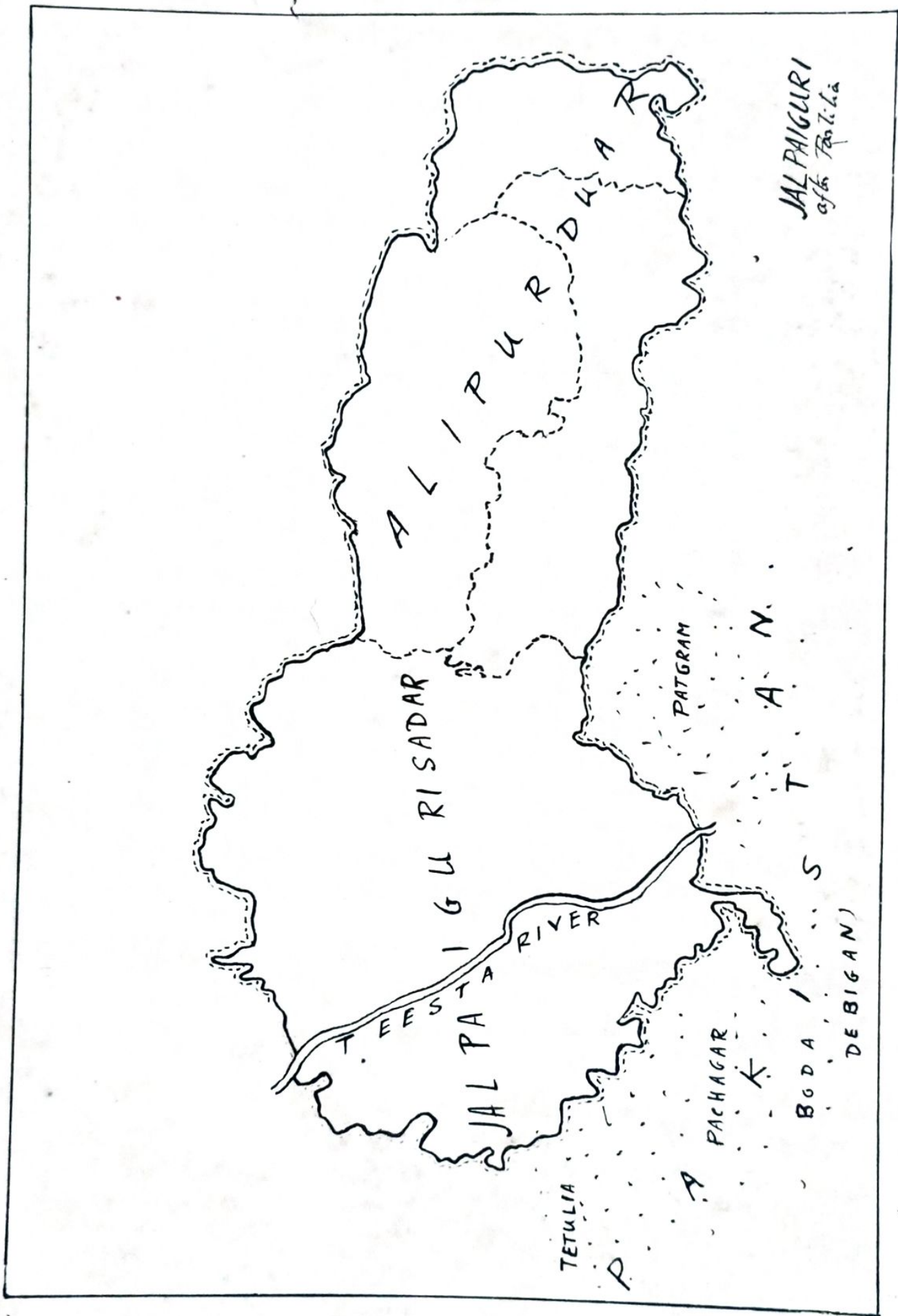
১৭৮৬ খৃঃ অব্দে গোখাঁদের অত্যাচার চরমে পৌঁছিল। এইবার গোখাঁরা অধিক সংখ্যায় জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত নামিয়া আসে এবং বহুসংখ্যক প্রজা এবং গবাদিপশু হরণ করিয়া লইয়া যায়। গোখাঁদের দলপতি ছিল গঙ্গারাম খাপা। প্রজারা ভীত হইয়া দলে দলে গ্রাম পরিত্যাগ করিতে থাকে, সংবাদ পাইয়া রংপুর হইতে Dunkan সাহেব একদল ফৌজ লইয়া ঝাড়ের মত দ্রুতবেগে আসিয়া জলপাইগুড়ি উপনীত হন। গোখাঁরা লুটতরাজ করিয়া ইতিপূর্বেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। Dunkan সাহেব মহানদীর (মহানন্দা) পার্শ্বাংশ অগ্রসর হইয়া যান,

কিন্তু গোর্থাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া জলপাইগুড়িতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। Capt. Alexander এর নেতৃত্বে নূতন সৈন্যদল জলপাইগুড়িতে পৌঁছিলে গোর্থাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরিত হয়। মহানদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোম্পানীর ফৌজের সহিত গোর্থাদের এক তীব্র সংঘর্ষ হয় এবং অনেক গোর্থী হতাহত হয়। যাহা হউক নেপাল রাজার সহিত এই বিষয় লইয়া সরাসরি দূত বিনিময় হয় এবং এই অভিযানের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। নেপালরাজ এই আক্রমণকে অগ্রায় বলিয়া ঘোষণা করেন এবং গঙ্গারাম থাপাকে বন্দী করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধৃত বৈকুণ্ঠপুরবাসীদের মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে সন্তাসীদের বহু ঘাঁটি ছিল। এই সমস্ত দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত অঞ্চল হইতে তাহারা নিকটবর্তী অঞ্চলে অভিযান চালাইত। অবশেষে Macdowall এর নেতৃত্বে একদল ফৌজ এই সন্তাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। বহুস্থানে খণ্ড যুদ্ধ হয়; অবশেষে সন্তাসীরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া নেপাল ও ভোটান অভিমুখে পলায়ন করে। দলপতি কুপানাথ ইংরেজ হস্তে বন্দী হয়। ইহা ১৭৮২ খৃঃ অব্দের কথা। ইহার পর হইতেই বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলে মোটামুটি শান্তি বজায় থাকে।

কোচবিহার প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রথম যুদ্ধের ফল স্বরূপ পূর্বে সঙ্কোশ নদী হইতে পশ্চিমে তিস্তা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ যাহা পশ্চিম দুয়ার নামে খ্যাত হয়—ভুটানীদের অধিকারে আসিয়া গেল। পশ্চিম দুয়ারের অপর প্রান্তে ছিল পূর্ব দুয়ার। এই দুয়ারগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার, কারণ সেখানেও অনুরূপ খেলা চলিতেছিল।

ভোটান পর্বতমালায় সাহুদেশ দিয়া যেমন পশ্চিমে তিস্তা হইতে পূর্বে মানস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এগারটি দুয়ার, তেমনি মানস নদীর পূর্বপার হইতে আসামের অন্তর্ভুক্ত দিওসান নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল আরও পাঁচটি দুয়ার। এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও অত্যন্ত উর্বর ছিল এবং ইহাতে বহু মূল্যবান বৃক্ষ ছিল; কোচবিহার রাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী স্বাধীন আসাম রাজ্যেরও অবনতি ঘটে। এই দুই রাজ্যের প্রশাসন ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ভুটিয়ারা আস্তে আস্তে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জোরপূর্বক অধিকার করিয়া লয়। আসামের স্বর্গদেবগণ (আসামের নৃপতিগণ এই নামে অভিহিত হইতেন) ভোটাদিাদের কবল হইতে এই উর্বর অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিতে না পারিয়া ভোটান রাজাকে “উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ” হিসাবে এই অঞ্চল “দেবসেবার” জন্ত দান করেন। ভোটান সরকার করস্বরূপ ২৪ তোলা স্বর্ণচূর্ণ, ২৪টি পার্বতীয় অশ্ব, ২৪ খণ্ড মৃগনাভি, ২৪টি চমরি গরুর পুচ্ছ, ২৪টি ভোজালি, ২৪ খণ্ড কষল ও ২৪০০ রোঁপ্যমুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। ১৮২৪ খৃঃ অব্দের প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের ফলস্বরূপ আসাম কোম্পানীর অধিকারে আসিল। তখন প্রথমতঃ এই কর লইয়া আসামের নূতন প্রভুর সঙ্গে ভোটাদিাদের সংঘর্ষ বাধিল। প্রথমতঃ করস্বরূপ যাহা কোম্পানীর বালাখানায় জমা হইত তাহা প্রায়ই হইত নিকট ধরণের ইহা ছাড়া সমতল ভূমিতে কোম্পানীর খাস অধিকারে ভোটানীদের হামলা নিয়মিত লাগিয়া থাকিত। ভোটান সরকারের নিকট নালিশ করিয়াও কোন ফল হইত না। ভারত সরকারের রংপুরস্থিত প্রথম এজেন্ট Mr. Scott আসাম বিজয়ের কিছুকাল পরেই ভোটাদিাদের বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু ভারত সরকার ভোটান সরকারের বিরুদ্ধে যাইতে রাজী হইলেন না। তাহারা Capt. Pembertonকে এই সমস্ত বিষয়ে ফয়সলা করিবার জন্ত বিশেষ দূত হিসেবে ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ভোটানে প্রেরণ করিলেন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস Mr. Boglesএর নেতৃত্বে প্রথম বাগিজ্য দল প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রথম দৌত্যের স্মারক দ্বিতীয়



JALPAIGURI
after Teesta

DEBIGAN)

দৌত্যও ব্যর্থ হইল। অনন্তোপায় হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই আসামের দুয়ার কোম্পানী একে একে দখল করিয়া লইলেন। অবশ্য ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু অর্থ ভোটান সরকারকে দিবার ব্যবস্থা হইল। এই দুয়ারগুলি দখল করিতে কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই; প্রায় বিনা রক্তপাতেই এগুলি কোম্পানীর অধিকারে আসিল। পশ্চিম দুয়ার অঞ্চলেও ভোটাদিয়ার অধিকার খেলা চলিতেছিল এবং ফল একই প্রকার হইল — অবশ্য রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্যে।

প্রথম ভোটান যুদ্ধের ফলস্বরূপ পশ্চিম দুয়ারগুলি ভোটান সরকারের অধিকারে আসিল বটে — কিন্তু ভোটানদের আক্রমণ স্পৃহা বিন্দুমাত্রও কমিল না। ভোটানরা সমতল ভূমিতে আরও আগাইয়া আসিয়া কোচবিহার রাজ্যে নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল। এই কোচবিহার-ভোটান সীমান্ত বিবাদে কোম্পানীকে বহুবার হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ভোটাদিয়ারা কোচবিহার হইতে বহু লোককে ধরিয়া লইয়া যায়। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বড়লাটের রংপুরস্থ প্রতিনিধি Mr. Robertsonএর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভোটাদিয়ারা ধৃত ব্যক্তিগণকে মুক্তি দিল না। বাধ্য হইয়া কোম্পানীকে সৈন্য পাঠাইতে হয়। এইবার ভোটাদিয়ারা নরম হইল এবং ভোটানদের সঙ্গে সীমান্ত লইয়া এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইল। কিন্তু এই চুক্তিপত্র কার্যকরী হইল না। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে এই সীমান্ত চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া ভোটাদিয়ারা আবার সমতল ভূমিতে নামিয়া আসে। এই হামলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোম্পানীর উত্তর-পূর্ব সীমান্তের প্রতিনিধি Col. Jenkins ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ভোটাদিয়ারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এবং অনতিবিলম্বে দুয়ার অঞ্চল অধিকার করিয়া লইতে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেন। বলাবাহুল্য ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের প্রতিনিধিদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু ভোটানের এই দৌরাণ্ড্য কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন চরমে পৌঁছিল যে, ব্রিটিশ সরকারেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। এবারও তাঁহারা প্রথমেই চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না; ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে তাঁহারা Eden সাহেবকে ভোটানে পাঠাইলেন। ব্রিটিশ সরকারের এই দূত ভোটান দরবারে প্রকাশভাবে অপমানিত হইলেন। ভোটান দরবার জোর করিয়া ইডেন সাহেবের নিকট হইতে দুটি চুক্তিপত্র আদায় করিয়া লইলেন — একটিতে ভারত সরকার বাংলা ও আসাম দুয়ার অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে ভোটাদিয়ারের ছাড়িয়া দিলেন — এইরূপ স্বীকৃতি ছিল (বলাবাহুল্য এই চুক্তি সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার নাকচ করিয়া দিলেন)। এই দৌত্যও পূর্বের ত্রায় ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইল। অনন্তোপায় হইয়া ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ১২ই নভেম্বর এক বিশেষ ঘোষণার দ্বারা ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলের সমস্ত দুয়ার অধিকার মানসে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং অর্থ প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন। ভোটানদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরিত হইল। ভোটাদিয়ারা বিনাযুদ্ধে এই অঞ্চল পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা নানাস্থানে যুদ্ধ চালায়। দুই এক স্থলে ব্রিটিশ ফৌজের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল; অবশেষে যখন ব্রিটিশ সরকার ভোটানদের অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন, তখন ভোটান সরকার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি করিতে রাজী হইল। এই সন্ধির চুক্তি অল্পসারে সমগ্র বাংলা দুয়ার (পশ্চিম দুয়ার) ব্রিটিশ সরকারের অধিকারভুক্ত হইল। ব্রিটিশ সরকার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ভোটান সরকারকে বার্ষিক পনের হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই অর্থ নব গঠিত জলপাইগুড়ি জেলার কমিশনারের মাধ্যমে প্রতি বৎসর ১০ই জাহুয়ারী বাক্সাতে ভোটান সরকারের প্রতিনিধিকে দেওয়ার ব্যবস্থা হইল।

প্রথমে এই নব অধিকৃত অঞ্চল লইয়া ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে “পশ্চিম দুয়ার অঞ্চল” গঠিত হয়; ইহার তিনটা মহকুমা ছিল। সদর মহকুমা স্থাপিত হয় ময়নাগুড়িতে, দ্বিতীয় বাক্শা মহকুমার প্রধান সহর ছিল আলিপুর

(বর্তমান আলিপুরদুয়ার) এবং তৃতীয় মহকুমা ছিল ডালিমকোট অঞ্চল লইয়া। এই ডালিমকোট অঞ্চল তিন বৎসর পর দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী আলিপুর দুয়ার, বক্সা এবং ময়নাগুড়ি মহকুমার সহিত যোগ হইল রংপুর জেলার অধীন জলপাইগুড়ি মহকুমা এবং এই ভাবে তিস্তার পূর্ব ও পশ্চিম পার অঞ্চল লইয়া জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হইল। এইভাবে জননী কোচবিহারের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বহু যুদ্ধ ও দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা জন্মগ্রহণ করিল। আমরা জানি না শতাব্দী না হউক—তোপধ্বনি করিয়া এই নবজাতকে কেহ অভ্যর্থনা করিয়াছিল কিনা। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ হইতে এই অঞ্চলে 'ব্রিটিশ শান্তি' (Pax-Britannica) পূর্ণমাত্রায় নামিয়া আসিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে জুড়িয়া বাংলার অগ্রাগ্রা অঞ্চলের মত এখানেও নিবিড় শান্তি বিরাজ করিতেছিল — যেন ঘটনা প্রবাহ শুরু হইয়া গিয়াছিল। নিস্তরঙ্গ ঘটনা সমুদ্র ঐতিহাসিকের অবগাহনের পক্ষে প্রশস্ত নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে নূতন ঘটনা প্রবাহ অঙ্কুরিত হইতেছিল। যখন ঊনবিংশ শতাব্দী পার হইয়া দেখা দিল বিংশ শতাব্দী তখন পট পরিবর্তন ঘটিয়াছে — বাংলার রাজনৈতিক জীবনে জোয়ার আসিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবের হোলিখেলায় সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিয়াছে, বলাবাহুল্য তাহার ঢেউ আসিয়া এই শান্তিপূর্ণ জেলাতেও ছড়াইয়া পড়িল। সেই গৌরবময় এবং বর্ণাঢ্য আখ্যায়িকা এই স্মারক পুস্তিকার অপর অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে এবার কল্যা-জলপাইগুড়িরও অঙ্গচ্ছেদ হইল। র‍্যাডক্লিফ্‌ রোয়াদাদের ফলে পাটগ্রাম, বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া ও দেবীগঞ্জ থানা রংপুরে ও দিনাজপুরে (পাকিস্থান) চলিয়া গেল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

গ্রন্থপঞ্জী

- ১। District Handbooks (Jalpaiguri)
- ২। District Handbooks (Cooch-Bihar)
- ৩। Proceedings of the Committee of Circuit at Rangpur, Dinajpur, Purnea and Rajmahal. Dec. 1772 to Feb. 1773.
- ৪। Unpublished Records at the West Bengal Archives and National Archives, India.
- ৫। Kirāta-Jana-Kriti—by Dr. Suniti Kumar Chatterji.
- ৬। The Totos—Dr. Charuchandra Sanyal.
- ৭। Civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1857)—Dr. S. B. Chaudhuri.
- ৮। The Annexation of Assam (1824 - 1854) — Dr. R. M. Lahiri.
- ৯। Ain - I - Akbari — Translated by H. S. Jarret — Edited by — Sir Jadunath Sarkar
- ১০। Fifth Report — E. I. Affairs, Vol. II — Firminger
- ১১। Bengal District Records — Rangpur, Vol. I — 1770 - 1779
- ১২। The Cooch - Bihar State — Harendranarayan Chowdhury.
- ১৩। History of Bengal. Vol. II — Dacca University, Edited by — Sir Jadunath Sarkar
- ১৪। Law & Order in Bengal (Ms.) (1765 - 1818) — Dr. R. M. Lahiri
- ১৫। Annals of Bengal — Hunter
- ১৬। উত্তরবঙ্গ — চৌধুরীলালা
- ১৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস — ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

সূচীপত্র

একাদশ পরিচ্ছেদ— 'জলপাইগুড়িতে রেলপথের প্রসার'

৩১। জলপাইগুড়ি জিলার রেলপথের ইতিহাস ... শ্রীহিমাংগু চক্রবর্তী

৩৫২

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ— 'জনকল্যাণে জিলাবাসী'

৩২। শতবর্ষের জনকল্যাণ ... শ্রীসরোজিৎ বাগচী

৩৬২

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ— 'খেলাধুলায় জলপাইগুড়ি'

৩৩। খেলার মাঠে ... শ্রীজিতেন মহলানবীশ

৩৮৩

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ— 'শত বৎসরে জেলার জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন'

৩৪। A Century of Public Health Service
in the land of Kala-Azar and
Black Water Fever—1870-1970.

Sri M. N. Nandy

৩৯৩

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ— 'পাষাণের কথা'—প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি

৩৫। জলপাইগুড়ির প্রত্নকীর্তি শ্রীসমীর ভট্টাচার্য ও শ্রীমন্দিরা ভট্টাচার্য

৩৯৯

ষোড়শ পরিচ্ছেদ— 'অতীতের পৃষ্ঠা হইতে'

৩৬। স্থানীয় সংবাদপত্রে জলপাইগুড়ি ...

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—Lest we forget

৩৭। স্মরণে ...

'ক'—'চ'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—

৩৮। Personae & Programme of the
Centenary Celebration ...

i—vii

৩৯। Our Contributors ...

viii—ix

৪০। Corrigenda ...

xi—xiii

ম্যাপ ও ছবির সূচীপত্র

জলপাইগুড়ি জেলার তিনরঙা মানচিত্র	...	সূচীপত্রের পূর্বে
Assam - Bengal Bodo Area	...	২-৩ পৃ: মাঝখানে
Extent of Kamrupa (Rough Sketch) in Naranarayan's time.	...	৪-৫ পৃ: মাঝখানে
Bhutan Duars by Capt. Pemberton, 1838		১৬-১৭ পৃ: মাঝখানে
Jalpaiguri after Partition.	...	১৮-১৯ পৃ: মাঝখানে
বৈকুণ্ঠপুর-রাজ সর্বদেব নির্মিত দেড়শত বৎসরের প্রাচীন শিবমন্দির		২৬ পৃষ্ঠার পরে
জলেশ মন্দির	...	'জলেশ-মন্দির' লেখার ১১১ পৃ: উপর
রাভাদের ঘরের নক্সা	...	২১৮ পৃ:
Certificate of Registration of Bonapara Gramya Samabay Dharma Bhandar	...	২৫২ পৃ:
সমবায় ক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রের লগ্নীর পরিমাণ রেখচিত্র		২৬৩ পৃ: উপরে
ব্যয় বরাদ্দ সংক্রান্ত চিত্র সেচনক্ষম জমির চিত্র	}	৩৪৬ পৃ: পরে
Graph Showing the Distribution of Rain- fall of Jalpaiguri from June to September 1968	...	৩৪৭ পৃ: উপরে
বৈদিক যুগে করতোয়া পাহাড়ে তিস্তা ১৯৬৮-৬৯ বৎসর পরে	}	৩৫৬-৩৫৭ পৃ: ভিতর



GOVERNOR OF WEST BENGAL

RAJ BHAVAN,
CALCUTTA.

April 23, 1970.

I am glad that the North Bengal district of Jalpaiguri is celebrating this year its centenary. This district has always been important for its tea and forests. Today it has assumed a greater importance for strategic reasons. I am glad that the Jalpaiguri District Centenary Celebration Committee has decided to bring out a Souvenir Magazine on this occasion.

I send my greetings to the people of the District of Jalpaiguri and hope that the District will continue to have peace and prosperity through years to come. I wish the organisers of the Centenary Celebration all success.

Shanti S. Dhavan

(Shanti S. Dhavan)

THE BOUNDARIES OF JALPAIGURI

BY SRI S. P. MALLIK

Writing about a hundred years ago in the "Bangadarshan" (Jaistha, 1289 B. S.) Bankim Chandra made the following observation :

"..... এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। পূর্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মনিপুর জয়ন্তা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রংপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখা যে ভগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথু নামা রাজার পূর্বে কোন রাজার নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তন্মা নামে নদী তীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অতপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে, কীচক নামে এক স্নেহজাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হইলেন। স্নেহের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।"

Sahityasamrat was no doubt trying to re-construct Bengal's past from whatever fragmentary historical sources available and to spotlight on the need of a competent history of Bengal.

The historical evolution of the North-eastern tract known as Pragjyotisha or Kamarupa can be traced first to mythological traditions supplemented by the Puranas, Jogini Tantra and the accounts left by the Chinese traveller Hiuen Tsiang. Modern researches on ancient ethnic settlements have thrown light on the historical geography of this region. Ancient Kamarupa was bounded on the north by the Kanjagiri, on the east by the hill stream Dikshu and on the west by the Karatoya; and it stretched southward as far as the junction of the Laksha with the Brahmaputra. The western boundary of the kingdom lay along the course of the Karatoya for a considerable distance. The upper portion of this course lay more to the west. According to Martin (Eastern India, Vol. II, page 362) the stream Pathraj, which now meets the present channel of the river about seven miles south of Debiganj in Pargana Boda in the District of Jalpaiguri marks the old bed of the Karatoya. Besides Rungpore, Kamarupa included Assam, Muni-pore, Jayantea, Cachar and parts of Mymensingh and Sylhet.

The history of the three dynasties-Prithu, Pal and Kamatapur Rajahs-mainly based on genuine local traditions preceding the close of the Fifteenth Century reveal internecine struggle for power which ultimately paved the way for the Afgan onslaught. The disastrous expedition of Hossain Shah, the Afgan King to Assam had an unsettling effect on their occupation of Rungpore. They were beaten back and Assam was overrun by wild tribes; in the turmoil Cooch Behar dynasty was born being founded by Hajo, the Koch Chieftain.

At the same time troubles were brewing in the Brahmaputra Valley and the last quarter of the Eighteenth Century and the first two decades of the Nineteenth Century were marked by intrigues, insurrections and conspiracies. As Dr. R. M. Lâhiri puts it (The

Annexation of Assam) the people of the sleepy hollows of Assam faced the menace of the Moamarias in the east and the *Barkandazes* in the west ; being requested by Raja Gourinath, Lord Cornwallis despatched Captain Welsh in 1792 who very soon restored order. But with the adoption of non-interference policy by Sir John Shore, Captain Welsh was very soon recalled. This resulted in "confusion, devastation and massacre" in Assam again. The reign of King Chandra Kanta (1810-1818) saw the infiltration of the Burmese power into Assam. Purander Singh took refuge at Chilmari in the district of Rungpore and Chandra Kanta fled to Bengal through Gauhati. With the intervention of Scott, Civil Commissioner of Rungpore both the fugitives found a base in Bengal to procure arms and ammunition. By 1823 Burmese forces were already hammering on the frontier line from Goalpara to Cox's Bazar. Their overture to Cachar ultimately led to the declaration of war by the British and the land of Svargadeva passed into the hands of the British with the treaty of Yandabo in 1826.

At this period Rungpore Proper (Cooch-wara or Sarkar Cooch Behar) included six *Chaklas* (fiscal division)—Boda, Patgram, Purubhag from the Zamindary of Cooch Behar Rajah and the other three being Futtehpore, Kankina and Cazeerhat.

An old suit decided by Charles Purling, Collector, in June 1778 gives some fragmentary information of the Moghul incursion in 1687 which led to the occupation of three central *Chaklas*.

From 1576 (with Akbar's conquest) to 1707 (the death of Aurangjeb) Bengal was the province of the Moghul empire under Governors who were known first as *Shipahasalar* (Commander-in-Chief), then *Subadar* and later *Nawab-e-Nazim*. The office of the Dewan was also gaining in importance as an authority to grant trade licences. In 1698 the East India Company acquired the tenure in terms of Moghul Revenue Law of the three villages of Calcutta, Sutanati and Govindpur that really laid the foundation of British Rule in India. As Firminger (Historical Introduction of the Fifth Report) puts it — by acquisition of these three villages, the East India Company obtained for the first time a legal position within the Moghul Empire and thus brought into existence a working theory in the development of which the acceptance of Diwani was the final logical completion. From the grant of Diwani in 1765 to 1793 when Settlement was made permanent a series of efforts were made in Bengal to obtain knowledge of rent paid by the Raiyats to the Zaminder as the basis of Land Revenue assessment and collection.

At the heart of Indian administration lay the Land Revenue System. By inheriting a position in which the main revenue of the State consisted of a large portion of the produce of the land, the British found themselves confronted with problems touching fundamental principles of political society. How far were they to go on relying on land as the chief fiscal source and, more important, on what principles were they to regulate the assessment and collection of revenue? There were two contrasting solutions — the authoritarian paternalism evolved by Munro and the impersonal liberterianism applied by Cornwallis ; but they proceeded on certain common assumptions. There was no question of continuing existing Indian practice unaltered. Greatly decayed by years of anarchy, its uncertainty and

irregularity afforded scope for the greatest corruption and serious damage to the revenue resources of the State. It was generally agreed that certainty and regularity could be restored by some formal definition of the State demand which made a clear line of distinction between public and private rights.

All revenue systems agreed on the truth of the rent doctrine which was shaped and influenced by the English Utilitarians ; the differences arose over the method by which it should be put into effect. The systematic way in which the inchoate but aristocratic classes were set aside after 1822 owed a great deal to the rent theory with its doctrine of the parasitic nature of rent-receivers and of the right of the State to dispose of the rent fund at its own discretion. The rent doctrine had triumphed in large measure in the forming of the assessment theory and methods of land revenue system of India, which together constituted the great administrative achievement of British Rule.

Apart from determining the precise pitch of assessment for securing for highest amount of revenue to State without giving rise to a contraction of cultivation or the growth of balances in arrears there was the need to give sufficient inducement to reclamation of extensive jungles in Bengal (Cornwallis estimated it as 1/3). There were other political considerations also. At home England was passing through worse days with France, Holland, Spain and Italy allied against her and U. S. alienated. In India the Rohilla War, the two campaigns against Tippto Sultan, the prevention of hostile Maratha demonstration against Oudh, the Mission despatched to Nepal and the reduction of Pandichery—all these brought the finances to a low ebb. As the economic historian R. C. Dutt succinctly pointed out ... "in India an empire was being acquired, wars were waged and the administration carried on at a cost of the Indian people without the British national contributing a shilling." This is what later gave rise to "drain theory" in national wealth by Nawroji. As Hunter puts it, Lord Cornwallis came out to India as the heir of these 20 years' varied experiments in rural administration (Bengal Manuscript Records, Vol. I). How many historical houses fell under the guillotine of the Revenue Sale Law and how many extinguished by private Collectors and Civil Courts in the aftermath of the Permanent Settlement are now part of history.

Bengal during this time comprised sixteen districts with Salt Agency of Hijli as one of them. At the time pargana was the basic unit of a Zamindary which in turn was regarded as the unit of a district or a province. Since then every district has gone through a process of jurisdictional changes necessitated by dacoities, violent disturbances of public peace, condition of the police and pressure of work. High floods in the Teesta from 1784 onwards brought in a series of changes in this region. Later on such changes in the Zilla were regulated first by Act 21 of 1836 and supplemented by Act 4 of 1864 and Act 7 of 1912.

Although the district of Rangpore was formed on 12th August, 1765, criminal jurisdiction (Magistracy) was created on 27th June, 1787 (and 1st May, 1793) and Civil jurisdiction on 6th April, 1781 (and 1st May, 1793). Regular records of the district commence with the year 1777 when Charles Purling was appointed Collector of Rungpore for the second time. The tract known as Jalpaiguri Sub-division had been formed in 1854 with headquarters

at Sookanee (now Sukhani, J. L. No. 28 in Rajganj P. S.) and was called Sookanee Sub-division. The formation of Military Cantonment at Jalpaiguri led to the shift of the headquarters and also change of the name of the Sub-division. The district of Western Dooars was formed in 1864 after the Dooars war against Bhutan with three Sub-divisions—Sadar with headquarters at Mainaguri, Buxa with headquarters at Alipur and Dalimkote which was later transferred to Darjeeling—all comprising the submontane tract between the Teesta and Sankos Rivers. The district of Jalpaiguri as an administrative unit came into being on 1st January, 1869 on the amalgamation of the Western Dooars district with the Jalpaiguri Sub-division of Rungpore (Notification of 8th December, 1868). Out of administrative convenience Eastern Dooars was transferred to Goalpara in Assam in 1872 and on 1st September, 1883 (Calcutta Gazette, January 9, 1884) the following notification was published :

Notification

The 1st September, 1883—The Lieutenant-Governor directs that the following specification of the district and thana boundaries of Julpaigori be notified for general information :

District Boundaries

On the West—Commencing from the south, at the village of Changtinagar on the Bhotai nuddee, the boundary runs northward along the boundaries of the following villages, viz : Changtinagar, Bagduha taluk, Nagar Madakha, Dhonoochangti, Dandopal taluk, Jonoki Jote, and Huzurki kismat ; thence along the Sutai nuddee northward to the village of Jote Joykisto-Bolohurree : thence along the boundaries of villages Jote Joykisto-Bolohurree, Balabhir-Jote-Joychundi, and Chandanbari, thence along the east bank of the Pathraj nuddee northward to the village of Dabikant Jote ; thence along the limits of the following villages, viz : Radhanath Ray Arazi, Mokrori Jote Radhamohan, Kharija-Daburbhanga, Bahadoor Naranikismat, and Suba Sujan Arazi ; thence along the east bank of the Tangan nuddee up to the village of Kharija Magura Upanchauki ; thence along the boundaries of village Magura taluk, Goonti taluk, Thatipara, Gurnabari, and Mollani Arazi ; thence along the east bank of the Kurto river till it touches the south-east angle of village Babud Bhajanpur ; thence westward along the boundaries of villages Babud Bhajanpur and Titulia to the Mohanuddee river (present R. Mahananda) ; thence along the left bank of that river up to the point where the northern boundary of Jote Azimprodhan touches the river ; thence along the northern boundary of jotes Azimprodhan, Chandbar Shaha, Chunda Gope of the jote of Robadally Prodhan known as Kornari Jote, and of the jote of Chabu Dass known as Nobo Chand Babut up to the Jorapani nuddee ; thence along that nuddee northward to where the western boundary of Jote Aolu Doss touches it ; thence along the western boundary of that jote and of the jotes of Kholye Sing known as Bhandari Babut and Gope Babut ; thence along the southern and south-eastern boundaries of jotes Goodar Boyragi and Soja Mea, Ramdhan Prodhan, and Modon Shaha to where the boundary of the latter touches the Mohanuddee ; thence again along the left bank of the Mohanuddee river up to its junction with the Gulma nuddee ; thence along the left bank of the Gulma nuddee to its junction with the Goramara nuddee ; thence along the left bank of the Goramara nuddee and the boundary of village Subonukuri-

Goradan-Maheshchurani-Bykantpur and Simulkoori, to the Jhenaichoori nuddee : thence along that nuddee to its junction with the Teesta river ; thence along the right bank of the Teesta river up to its junction with the Sevoke river—thence,

On the North—Across the Teesta river, the boundary runs eastward along the new demarcated lines, as surveyed in seasons 1879-81, and defined in a notification, dated the 9th January 1882 (published at page 16, Part 1 of the Calcutta Gazette, dated the 11th idem), to the Juldhoka river ; thence along the right bank of the Juldhoka river southward to its junction with the Jiti nuddee ; thence along the boundaries of the following villages, viz : Taluk Nagarkata Chakla Toondoo, Chengamari Chakla Moraghat, Hortalgoori Chakla Moraghat, Nepanea, Doomchi Chapagoori, Topabasa, Sontarabari, Jaigaon-Dooar Bala, Majgamee, Rangamati, Kadobari, Chooarpar-Jajangi, Buxa Hills, Suniasijhar, Borojhar, Bangabari, Choitgaon, and Huldi-barijhar to the Sunkus river.

On the East—From the north-east corner of Huldi-barijhar, the boundary runs southward along the right bank of the Sunkus river to the village of Bhulka.

On the South—The boundary passes along the limits of the following villages, viz : Bhulka Barobisa, Chukchaka, Naratoli, Kamikiagoori, Parokata, Boorjkoti, Chikligoori, Koomarijan, Bhatibari, Borochoiki, and Chalnipak to the western side of the Kalajani river ; thence along the right bank of the Kalajani river up to the south-east corner of village Porarpar ; thence along the boundaries of the following villages, viz : Porarpar, Topsikhata, Pachkalgoori, Sonapur, and Patlakowa Doarballa to the western side of the Toorsa river ; thence along the boundaries of villages Raichenga, Borodoba, Butunir Ghat, Balasundar, Purundibari, Salbari, Khaliagaon, and Boragari Chakla Moroghat to the Juldhoka river ; thence along the left bank of that river to the south-west corner of village Baroghorla Chakla Moroghat, where it crosses the Juldhoka river and then runs in a southeasterly direction following the boundaries of villages Baikur, Baroghorla Baikur for the second time, Bormopur, and Baikur Taluk ; thence crossing the Teesta River, it follows the limits of the following villages, viz : Boalmari, Banskatia-oh-Kharija-Borobari, Borobari Taluk, Chilahati, Kote Bhajuni, Bholapara, Upanchaki-Bhajuni Taluk Arazi, Bhajuni-Upanchaki Arazi Taluk, Dabidoba Digur Taluk, Sonahar Taluk, Kharija Sonahar, Sonahar Taluk for the second time, Mulkaduha Taluk, Changti Arai Lakhinarani kismat, Changti Taluk, and Changtinagar on the Bhotai nuddee.

THANA BOUNDARIES :

Thanas.	Boundaries.
ALIPORE	On the North, East, and South—The boundary of the di On the West—The right bank of the Toorsa river.

Thanas	Boundaries.
SALBARI	On the North—The boundry of the district. On the East—Thana Alipore. On the South—The boundary of the district and the Juldhoka river. On the West—The right bank of the Juldhoka river. On the North—The northern boundary of village Tundu west—Chakla Tundu. On the East and South—Thana Salbari and the boundary of the district.
MYNAGORI	On the West—The left bank of the Teesta river northward to its junction with Dharla river ; thence the left bank of the Dharla river northward to the village of Chatterpara, thence the boundaries of villages Chatterpara, Bolbari, Banglajhar, and Borgilajhar to the Indoong river ; thence the right bank of the Indoong river eastward to its junction with the Moorti river ; thence the right bank of the Moorti river up to the north-western corner of village Tundu west—Chakla Tundu.
KYRANTI	On the North—The boundary of the district. On the East—Thanas Salbari and Mynagori. On the South and west—The right bank of the Teesta river. On the North—The northern boundary of village Baropatia Notunbas. On the North-east and East—Thanas Kyranti and Mynagori.
LPAIGORI	On the South—The boundary of the district. On the West—The boundaries of the following villages, viz : Barobari Taluk, Singimari, Arazi Komlapokhur, Singimari, Arazi Marua Komlapokhur, Gurlabari Taluk, Sathkhamar Taluk, Bahadur Taluk, Bhelakoba Taluk, and Baropatia Notunbas.

Thanas.	Boundaries.
SHIKARPUR	On the North and East—The boundary of the district and thanas Kyranti and Julpigori. On the South—The boundaries of the following villages, viz : Kukurjan Taluk, Sukani Taluk, Bhajanpur-gird - Debnagar. Bhajanpur - Kharija Jote Haricharn, and Bhajanpur-gird - Debnagar for the second time, and then the boundary of the district. On the West—The boundary of the district. On the North and North-east—Thanas Shikarpur and Julpigori. On the East and South—The boundary of the district.
BODA	On the West—The boundary of the district and Thana Shikarpur. On the North—Starting from the west, the boundaries of the following villages, viz : Jhulungi, Srirampur, Jote Nijuma, Srirampur for the second time, Jote Radhakant, Tepurgari, Jagat Bair, and Pocha Bhundar. On the East—The boundaries of the following villages, viz : Pocha Bhundar, Bhothat, Nazir Gomani, Kukoabari, Gurupersad Sarma, Ramkant Karkun, Jangurrah, Dhubulkuri, Jote Petamber, Jangurrah for the second time, Sibram, Tepamari, Sibram for the second time, Jote Sibnath, Sibram for the third time, and Jamgram.
PATGRAM (This thana lies within the boundaries of the Cooch Behar State.)	On the South and West—The boundaries of the following villages, viz : Jamgram, Sibram, Jangurrah, Kuchnibari Panbari, Dhubulsoti, Ukarmara, Bamundal, Boorimari, Srirampur, Khengti, Srirampur for the second time, and Jhulungi. <i>Note</i>—The villages Mirgipur (Thakbast No. 51), Dahagram (Thakbast No. 46), Balapokuria (Thakbast No. 47), Mahesvari (Thakbast No. 50), Fulnapur (Thakbast No. 48), and Nalgram (Thakbast No. 49), of pergunnah Patgram, and the village Arazi Khuribari Kismat Augrapara (Thakbast No. 45) of pergunnah Tepa lie out of the general boundaries of thana Patgram, but nevertheless, belong to that thana.

Note—In the above description the villages named are included within the boundaries of the district and thanas to which reference is made.

A. P. MacDonnell.
Offg. Secretary to the Govt. of
West Bengal.

In 1896 Taluk Chotaguma in Pargana Bhalka forming part of Alipur Sub-division was transferred to the district of Goalpara (Notification No. 1484-J dated 10th March, 1896).

The evolution of the land tenure in Bengal pointed to the necessity of scientific survey and correct record-of-rights. Starting from Major James Rennell (1764-1777), the father of Indian Cartography the Revenue survey of Bengal was taken up in 1835-1878. With the passing of Bengal Tenancy Act, 1885 a detailed survey of lands in the province of Bengal was taken up under Chapter X of that Act and was completed in the course of 50 years (1888-1940)—the first being taken up in Chittaganj in 1888 and the last operation was completed in Dinajpur in 1940. Although there were 'Previous Surveys' for Jalpaiguri like—Map of Military Cantonment by J. Pemberton in 1858-1859, Map of Cooch Behar and Western Dooars by R. H. Renny in 1872-73, Map of Cooch Behar-Jalpaiguri Boundary by R. H. Renny in 1873-1874, Tea Gardens of Jalpaiguri by George Forbes in 1878-79, Map of Jalpaiguri-Darjeeling Boundary by Lt. Harman in 1879-1881 scientific Revenue Survey for the first time for the whole of Jalpaiguri was taken up in 1865-1868 by J. H. O'Donel followed by the District Settlement Survey in 1906-1916 by J. A. Milligan of the Indian Civil Service. The Cadastral Survey of the Western Dooars by W. C. A. Beckett being inaccurate it was taken up and completed by D. H. E. Sunder the then Settlement Officer in 1889-1895. Simultaneously there was a welding of authorities into a firm disciplined chain of command and Directorate of Land Records and Surveys was born out of Survey of India and efficiently organised by Col. Hirst in 1907. Colonization and survey of virgin lands bristled with difficulties and the want of legal sanction led to the passing of the Bengal Survey Act, 1875. The "Statement of objects and reasons" of the Bill runs as follows :—

"Much of the value of the Survey operations which have been carried on in Bengal has been lost owing to the boundaries and Mouzahs and Estates, as ascertained and settled at the time of survey, not having been secured by permanent marks. In every other province such marks are erected at the cost of the land-holders, who are bound to maintain them when erected. There is no reason that these provinces should form an exception to this general rule and should remain longer without the benefits which its enforcement will secure. The bill therefore provides for the erection of marks to secure the boundaries which may be ascertained by future surveys, and the apportionment of cost thereof on land-holders".

From the old records available on the eastern boundary of the district it appears that the Assam Government in 1922 (in their letters No. 1462-R dated 19. 4. 22 and 7290-R dated 13. 9. 22) requested the Government of Bengal to fix a permanent boundary line as shown in the preliminary edition of the Survey of India Map No. 78F/14, following the right bank of the bed of river Sankos as it existed at the time of survey and to demarcate it properly (with double row of Reference Pillars irrespective of changes in the course of the river).

The Government of Bengal in their reply accepted the proposal. The Director, Eastern Circle, Survey of India, having declined to undertake the work, the matter was referred back to Government of Bengal in 1930 (Letter No. 3202-Jun. dated 7. 3. 30). Government of Bengal agreed to take up the work of demarcation through the Survey Department. The boundary was accordingly demarcated by I. Newton in 1931 on the scale of 4" inches to a

mile and complete in 5 sheets and a portion by Major Sexton on the scale of 16" inches to a mile in 1942-43 complete in 5 sheets. In his demarcation work Newton did neither permanently mark any traverse station nor put any boundary pillar. Sexton connected his traverse data with the district survey of 1906-1916 and put Boundary and Reference Pillars along the boundary.

After about a decade the Deputy Commissioner, Jalpaiguri, took up the broken thread and broached a proposal for re-demarcation of Jalpaiguri-Goalpara boundary in 1952-53 on administrative reasons. For various factors this operation could not be taken up. A tentative programme of traverse work was however drawn in 1957 with an estimated cost of Rs. 18,000/- as West Bengal's share for the cost of survey and construction of pillars excluding the areas covered by Reserve Forests of about 12 Sq. miles. Nothing happened. The proposal was re-opened by the Government of Assam in 1958 (their letter No. RSS-215/54/19 dated 9. 10. 58) to the Director of Land Records and Surveys, West Bengal. A tentative programme was again drawn up by the Director of Land Records and Surveys, West Bengal and sent to his counterpart in Assam in 1959 (in D. O. letter No. 139/42/D/58 dated 30.1.59).

Before the Joint Survey work could be taken up the basis of such re-demarcation needed thrashing out. The Director of Land Records and Surveys, West Bengal clarified that the basis could be the Jalpaiguri-Goalpara demarcation maps of 1931 by Newton on the scale of 4" inches to a mile and those of 1942-43 by Major Sexton on 16" inches to a mile. This basis having been agreed upon a traverse party was sent by the Director of Land Records and Surveys, West Bengal in May, 1959 for preliminary traverse. The work had to be postponed as monsoon had set in. The subsequent developments of the re-demarcation project are confined to a series of bilateral meetings of Directors of Land Records and Surveys of both the States to review the progress of survey work already undertaken. The first such conference was held on 13. 8. 59 at Calcutta and since then 12 such conferences have been held bringing the work almost to a close.

The first conference held in Calcutta on 13. 8. 59 dwelt mainly on the nature of boundary—whether it was firm or fluid and whether notification dated 1st September, 1883 (Reference para 12) should be followed in the re-demarcation. It was decided to examine and scrutinize all important correspondence and papers, and to draw up a programme of work later on.

In the second conference held in Shillong (29th and 30th December, 1959), it was decided to compare Newton's demarcation maps of 1931 with the Survey of India Topographical sheet No. 78F/14 of 1924 and to start joint preliminary traverse along the Jalpaiguri-Goalpara boundary within 13. 1. 60.

In the next conference held in Calcutta (22. 1. 60) it was decided to base the work on Newton's demarcation maps of 1931 and Major Sexton's maps of 1942-43. The cadastral maps of Jalpaiguri district of the season 1906-1916 would also be consulted. It was also decided to start work on 20. 1. 60 and finalise co-ordinate values of pillars by February, 1961.

The preliminary traverse though completed in March, 1960 further work had to be postponed due to disturbances.

In the fourth Conference held at Shillong (28th and 29th March, 1961) it was decided that Deputy Director of Surveys, West Bengal would prepare relaying sheets by plotting new traverse stations on blue prints obtained from Newton's original demarcation map of 1931 (Scale 4"=1 mile) which would be sent to Deputy Director of Surveys, Assam for scrutiny and for preparation of offset field books showing probable location of pillars. It was also decided that final demarcation maps would be prepared on the scale of 16" inches to a mile for the entire length of the boundary. It was decided to commence work in November, 1961 along with construction of pillars.

The fifth one held at Darjeeling (16th—18th June, 1961) decided to relay all the missing traverse stations as much time had elapsed since March, 1960 and run fresh traverse where traverse lines run in 1959-60 were far off the actual boundary line. This work was carried out and computation work completed upto the co-ordinate stage which were accepted by the respective Deputy Directors of Surveys.

The sixth conference held at Shillong (17th and 18th March, 1964) decided that—

(a) the demarcation of boundary from Pillar No. 1 at the trijunction of Cooch Behar-Jalpaiguri-Goalpara upto Boundary Pillar No. 16 situated between traverse station "V" and "W" of season 1959-60 would be based on Major Sexton's maps of 1942-43 (Scale 16"=1 mile) and on Newton's maps of 1931 (Scale 4"=1 mile) for the remaining portion of the boundary, mainly forest area.

(b) Two Survey parties from each side would be sent to the area in November, 1964 to start work simultaneously from the southern end and from the middle from where West Bengal would construct pillar northwards.

(c) All arrangements for the construction of pillars paripassu with the demarcation work would be finalised.

(d) All the 343 accepted offset points would be marked on the ground of which Boundary pillars would be constructed on 150 selected offset points and the two feet long iron posts in cement concrete base on the remaining 193 offset points. Pairs of Reference Pillars would be constructed as required where the boundary passed through water-logged areas.

Director of Land Records and Surveys of both West Bengal and Assam met at Kumargramduar Forest Bungalow on 27. 4. 65 to inspect field work and discussed about dismantling of old pillars, numbering of Boundary, Iron and Reference Pillars.

The seventh conference held at Calcutta (2nd and 7th December, 1965) the pillar position plotted on the original maps, agreed that the responsibility of fixing number plates on Boundary Pillars (like— $\frac{1}{\text{W.B.}-\text{A}}$, $\frac{2}{\text{W.B.}-\text{A}}$) would be with West Bengal and that of Reference Pillar and subsidiary Iron Pillars would be with the Assam along the entire length of the Jalpaiguri-Goalpara boundary. The numbering would commence from the trijunction

of Jalpaiguri-Goalpara-Bhutan and proceed southwards. It was also decided to prepare strip maps about 20 chains astride the boundary to help identification of plots in case of disputes. Traverse and field work (Kistwar) would be done separately by each State for this work.

The eighth conference dealt with details of plot sheets showing pillar positions, their symbols etc. The ninth Conference held at Calcutta (10th — 12th October, 1966) decided following figures for different kinds of pillars along the entire length of the Jalpaiguri-Goalpara boundary :

Boundary Pillars	... 169
Subsidiary Iron Pillars	... 185
Reference Pillars	... 24 pairs

Out of these 85 Boundary Pillars 79 Iron Pillars and 14 pairs of Reference Pillars were constructed by West Bengal through the Public Works Department and the rest were constructed by Assam departmentally.

With the completion of strip maps (17 sheets) and the numbering of different types of pillars by iron number plates the re-demarcation of Jalpaiguri-Goalpara boundary has now been complete. The Sankos like the Rhine forms a natural fl... on the eastern boundary of Jalpaiguri well and scientifically marked.

Although the narrative of this joint re-demarcation of this region is complete in detail, what is sadly lacking is a comprehensive and competent history of the district of Jalpaiguri. Pramatha Chowdhury addressing a gathering of distinguished litterateurs in Rajshahi made the following observation :

“.....উত্তর বঙ্গের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে বরেন্দ্র অহুসন্ধান সমিতি কর্তৃক আবিষ্কৃত বরেন্দ্র মণ্ডলের পূর্বগৌরবের নিদর্শন বলে উত্তর বঙ্গের মনে হঠাৎ অহংজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে। একথা সত্য কিনা তাহা আমি জানি না। যদিই বা উত্তরবঙ্গ তাহার অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করে তাহাতেই বা ক্ষতি কি। সমগ্র বঙ্গের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রদেশ মাত্রেই অহংকার স্বপ্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য(অভিভাষণ ; উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত ; ১৩২১, ফাল্গুন)”

A district which is almost awakening to a new life after one hundred years of existence needs a history liberalised from the chronicles of casual occurrences and mythology and depicting a faithful record of the life and times of its people. Apart from pride, this gives us the power that goes to the making of the future.

উনবিংশ শতাব্দীর বৈকুণ্ঠপুর

শ্রীঅরুণ ভূষণ মজুমদার

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সূচনা হইতে জলপাইগুড়ি জেলা ১০০ বছর অতিক্রম করিল। শাসন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং প্রতিরক্ষার বিচারে বাংলার অগ্রাগ্র জেলা হইতে ইহা আজও একটু স্বতন্ত্র। কিন্তু, ইহা জলপাইগুড়ির জীবন-কাহিনীর আধুনিক পর্বমাত্র, ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় ইঙ্গ-ভোটান যুদ্ধ এই পর্বের ভূমিকা। ইহার পূর্বের ইতিহাসও রহিয়াছে। সেই ইতিহাসই জলপাইগুড়ির জীবন-কাহিনীর আদিপর্ব।

পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজকে যাহা দেয় নাই, বক্সার এর যুদ্ধ (১৭৬৪) তাহা স্বদে-আসলে ইংরেজের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক যুগও তখন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট দিল্লী হইতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানীর সনদ আনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের সঙ্গে প্রশাসনিক দিকের কথাও চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু দখলী সত্ত্ব হাতে লইয়া নূতন জমিদার মহলে গিয়া দাঁড়াইলেও যেমন প্রজা নিমেষে তাহার নূতন প্রভুকে চিনিতে চাহে না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল উত্তর বাংলায়। পলাশী, এবং বিশেষ করিয়া বক্সার, ইতিহাসে যে বিপ্লব আনিয়াছিল, সুবা বাংলার উত্তর প্রান্ত তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মুর্শিদাবাদ এবং হিমালয়ের সান্নিধ্যবশত অবস্থিত জলপাইগুড়ির মধ্যে যে প্রাক-আধুনিক দূরত্ব ছিল তাহার দরুণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন প্রশাসনিক অধিকার জলপাইগুড়ির কাছে স্পষ্ট ও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় নাই। কারণ ইতিপূর্বেও বাংলাদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছে। কিন্তু তাহার উত্তাপ জলপাইগুড়িকে দগ্ধ করে নাই। সুতরাং সুবা বাংলার চৌহদ্দির মধ্যে জলপাইগুড়ি অবস্থিত, একথা জানিতে পারিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জলপাইগুড়ির মনোভাবে প্রথমে একটু আশ্চর্য হইয়াছিল বৈকি। তবে, পুরাতন ইতিহাসের সূত্র ধরিয়া কোম্পানী জলপাইগুড়ি সম্পর্কে পাকা ব্যবস্থা করিয়া লইল।

আধুনিক জলপাইগুড়ির ইতিহাস-গত নাম বৈকুণ্ঠপুর। রাজস্ব-সংক্রান্ত কাগজে বৈকুণ্ঠপুর একটি পরগণা এবং আয়তনে ৪৫০ বর্গমাইল^১। ষোড়শ শতাব্দীতে কুচবিহার রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম সীমানা আরও বিস্তৃত ছিল^২। কিন্তু কখন বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম সীমানা সঙ্কুচিত হইয়া মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরে আসিয়া থামিয়াছিল, সে ইতিহাস পাওয়া যায় না। কোচ রাজবংশের একটি শাখা রায়কত উপাধি লইয়া বংশানুক্রমে কুচবিহারের এই প্রত্যন্ত প্রদেশ শাসন করিত, এবং কোচ রাজার অভিষেকের সময় ছত্রধারণ করিত। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ্বে গৃহ-বিবাদে কোচ রাজশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে। উত্তর হইতে ভোটান তাহার পার্বত্য উপত্যকা হইতে সমতলভূমিতে নামিয়া আসিল এবং কোচ রাজনীতিতে জড়িয়া পড়িল। দক্ষিণে ঘোড়াঘাট হইতে মুঘল সীমানা কুচবিহারের রংপুর প্রদেশে বিস্তৃত হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত, ১৭১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের

১। Milligan, J. A. Final Report on the Survey and Settlement of the Jalpaiguri District. P. 74.

২। Stuart, C. H.—History of Bengal. P. 211.

বৃহৎশ মুঘলকে সমর্পণ করিয়া কুচবিহার নিজের সর্বনাশ রোধ করিল। কিন্তু, সেই স্বযোগে বৈকুণ্ঠপুরও কুচবিহারের প্রভুত্ব অস্বীকার করিল। তখন হইতে বৈকুণ্ঠপুরের স্বতন্ত্র ইতিহাসের আরম্ভ।

কুচবিহারের সরকারী ইতিহাসে বলা হইয়াছে যে মুঘলের কাছে সপ্তদশ শতকে কুচবিহারের লাক্ষনার সময় বৈকুণ্ঠপুরও মুঘলের কাছে নতি-স্বীকার করে^৩। প্রমাণের অভাবে অবশ্য ইহা অনুমান। উপরন্তু, উত্তরে হিমালয়, পূর্বে তিস্তা ও পশ্চিমে মহানন্দা নদীর বেটনীর মধ্যে নিবিড় অরণ্য-অঞ্চলে বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী ছিল। পরগণার দক্ষিণ ভাগ অব্যবহিত হইলেও প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক কারণে রাজধানী সাধারণ শত্রুর কাছে দুর্গম ছিল। বৎসরের যে কোন সময়ে রায়কতদিগের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা সম্ভব ছিলনা^৪। স্বতরাং মূল কোচ রাজবংশের কিছা ইহার কামরূপ শাখার মুঘলের হা- দিয়া দুর্ভাগ্য যতই আসুক, বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম শাখাটি নিরাপদে রহিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ, ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নূতন করিয়া উত্তরবঙ্গ কিছা আসাম জয় করিবার আগ্রহ দিল্লীর ছিল না। সুবা বাংলার শাসক মুর্শিদকুলি খাঁও (১৭১৩—১৭২৬) সুবার ব্যয়-ভার অনাবশ্যকভাবে বাড়াইয়া তুলিতে চাহেন নাই। স্বযোগ বুঝিয়া ত্রয়োদশ রায়কত ধর্মদেব (১৭০২-২৪), রাজধানী উন্মুক্ত এলাকায় জলপাইগুড়ি নামে জায়গায় লইয়া গেলেন। ইতিহাসে বৈকুণ্ঠপুরের ইহা হইল দ্বিতীয় পদক্ষেপ। কিন্তু রায়কত ধর্মদেব (ধরমদেও) ঐ রাজধানী বদলের বিপদ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। তবে, বিপদ ঘনাইয়া উঠিবার আগেই তিনি মারা গেলেন।

সুবা বাংলার মুর্শিদকুলি খাঁর পরবর্তী শাসক সাজাউদ্দিন (১৭২৭—১৭৩২)। সাজাউদ্দিন রাজমহলের ফৌজদার আলিবর্দী খাঁর ভ্রাতৃপুত্র সৈয়দ আহম্মদ ওরফে সৌলত জংকে ঘোড়াঘাট ও রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সৌলত জং সুবা বাংলার প্রভাব প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিতে বিস্তারের জন্ত চেষ্টা করেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া দীন নারায়ণ নামে কোচ রাজবংশের এক ছেলেকে সিংহাসনে বসাইলেন^৫। ইহার পর বৈকুণ্ঠপুরের পালা। সৌলত জং এর বৈকুণ্ঠপুর অভিযানের তারিখ জানা যায়না। তবে, ইহা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ঘটিয়া থাকিবে। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে নবাব সাজাউদ্দিন মারা যান, এবং তাঁহার পুত্র সর্ফরাজ নবাব হন। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যে নূতন নবাব এর বিরুদ্ধে একটি গুরুতর ষড়যন্ত্র দানা বাঁধিয়া উঠিল। আলিবর্দী খাঁ এবং তাঁহার ভাই দেওয়ান হাজী আহম্মদ প্রধান ভূমিকা লইলেন। নবাবের সহিত আলিবর্দীর আত্মীয়বর্গের সম্পর্ক তিক্ত হইয়া গেল^৬। স্বতরাং সৌলত জং এর পক্ষেও রংপুরে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব ছিল না। গিরিয়া যুদ্ধের (১৭৪০ খৃঃ, এপ্রিল) পর আলিবর্দী সিংহাসন দখল করিলে সৌলত জং আর উত্তর বাংলায় আসেন নাই। আলিবর্দীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যুর পূর্বে তিনি সাত বৎসর পূর্ণিয়ায় থাকিতেন^৭। স্বতরাং অনুমান করা যায় যে ১৭৩৬-৩২ এর মধ্যে সৌলত জং বৈকুণ্ঠপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে চতুর্দশ রায়কত ভূপদেব মারা গিয়াছিলেন। অভিভাবক-শূন্য বৈকুণ্ঠপুরকে আক্রমণ করার ঐ সময় প্রশস্ত ছিল।

৩। Choudhury, H. N.—Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement. P. 240.

৪। Hooker, J. D.—Himalayan Journal, Vol. II. P. 18.

৫। Mercer & Chauvets. Report on Cooch Behar in 1788. Vol. II. P. 169.

৬। Hossain Ghulam. Siyar Mutakerin. Vol. II. P. 489.

৭। Ibid. 602-5.

সৌলত জংকে বাধা দিতে না পারিয়া বৈকুণ্ঠপুর ঐ সর্বপ্রথম স্বা বাংলায় অধীনতা স্বীকার করিল। বৈকুণ্ঠপুরকে জয় করিবার জন্ত সৌলত জং রায়কত পরিবারের দুই ছেলেকে রংপুরে লইয়া গেলেন। ইহাদের নাম বিক্রমদেব এবং দর্পদেব।^৮ উত্তরকালে ইহারাই বৈকুণ্ঠপুরের পঞ্চদশ ও ষোড়শ রায়কত। রায়কত পরিবারের দুই উত্তরাধিকারীকে রংপুরে পাঠাইয়াও বৈকুণ্ঠপুরের শাস্তিভোগ শেষ হয় নাই। পরগণার রাজস্ব রংপুরের ফৌজদার ফৌজের সহযোগিতায় আদায় করিতে লাগিলেন। কোন কোন বৎসর পরগণা বোদার ভারপ্রাপ্ত কুচবিহারের নায়েব বৈকুণ্ঠপুরের খাজনা আদায় করিয়া রংপুরের কোষাগারে জমা দিতে লাগিলেন^৯।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করিবার পর আলিবর্দী নিজের বেগমের ভাই কাশিম আলি খাঁকে রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশিম আলি একটানা ঐ পদে ছিলেন^{১০}। তবে কোন ফৌজদারই রংপুরে স্থায়ীভাবে বাস করেন নাই বলিয়া অনুমিত হয়। কাশিম আলিও ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার রক্তম জং এর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আলিবর্দীর সঙ্গে ছিলেন^{১১}। ফৌজদার বৎসরের কিছু সময়ও যদি রংপুরে কাটাইতেন তাহা হইলে অন্ততঃ রংপুর সহর শ্রীমঙ্গল হইত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে রেনেল রংপুরের দুর্দশার ছবি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। একটি “উল্লেখযোগ্য ব্যবসা-কেন্দ্র” ছাড়া রংপুরে আর কিছু ছিল না। ইটের তৈরী বাড়ী মাত্র একটি রেনেলের চোখে পড়িয়াছিল^{১২}। রংপুরে ফৌজদারের অনুপস্থিতি, এবং আলিবর্দীর সিংহাসনে আরোহণের পরবর্তী ১১ বৎসর মারাঠা বর্গীর হাঙ্গামা ও বিহারে আফগান বিদ্রোহ দমনের জন্ত মুর্শিদাবাদের ব্যস্ততা বৈকুণ্ঠপুরের মনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সাহস সঞ্চার করিল। বৈকুণ্ঠপুরের এই সাহস মুর্শিদাবাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় নাই। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে মুর্শিদাবাদ একটু অবসর পাইল। রংপুর ফৌজদার কাশিম আলি বৈকুণ্ঠপুরের দিকে মন দিলেন। বৈকুণ্ঠপুরে ফৌজ প্রেরণ করা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সৌলত জং এর বৈকুণ্ঠপুর অভিযানের সময় যেমন অনিশ্চিত ভাবে জানা যায়না, তেমনই কাশিম আলির অভিযানের সময়ও জানিবার উপায় নাই। তবে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বোদার নায়েব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার কর্তৃপক্ষের নিকটে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু অনুমান করা যায়^{১৩}। কাশিম আলি তখন বৃদ্ধ। দীর্ঘ ১৭ বৎসরের বন্দী-দশা হইতে তিনি রায়কত ভ্রাতৃত্বকে মুক্তি দিলেন। রায়কত ভ্রাতৃত্ব রংপুর ফৌজদারের সঙ্গে স্বদেশে ফিরিলেন, এবং ফৌজদারের অনুমতিক্রমে বিক্রমদেব রায়কত হইলেন। জীবনের সর্বাপেক্ষা সুন্দর দিনগুলি বন্দী হিসাবে কাটাইবার পর রংপুর ফৌজদারের বিরুদ্ধাচারণ করিবার উৎসাহ বিক্রমদেবের ছিল না। রায়কত ভ্রাতৃত্বের ১৭ বৎসরের বন্দী-জীবন গণনা করিলে আনুমানিক ১৭৫৩-৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে রায়কত বিক্রমদেবের মৃত্যুর পর দর্পদেব (১৭৫৮-৬৩) বৈকুণ্ঠপুরের ভার লইলেন। তাঁহার আমল হইতে স্বা বাংলা এবং বৈকুণ্ঠপুরের সম্পর্ক আবার ভিন্ন পথ ধরিল। প্রথমতঃ, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে

৮। Letter from the Committee of Circuit to Purling, 23 December, 1772.

৯। Ibid.

১০। Firminger, Fifth Report. Vol. I. P. XXXIII.

১১। Hossain Ghulam. Op. Cit. Vol. II. P. 497.

১২। Touche, La, T. D.—The Journals of Major James Rennell, (Asiatic Society of Bengal, 1910. P. 55.)

১৩। Letter from Committee of Circuit to Purling at Rangpur, 23 December, 1772.

পাঁচ বৎসর কাশিম আলি ফৌজদার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, পলাশী যুদ্ধের পর হইতে ছয় বৎসর মুর্শিদাবাদ কিছা রংপুরের দৃষ্টি বৈকুণ্ঠপুরের দিকেও ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যড়যন্ত্রে এবং নবাবের অক্ষমতার দরুন নবাবী শাসনেরও মর্যাদা কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তৃতীয়তঃ, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাশিমের পরাজয়ের পর কিছু সময়ের জন্য রংপুর মীরজাফরের দ্বিতীয়বার নবাবী গ্রহণকে অগ্রাহ্য করিল। ফলে, রংপুরের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংরেজ তথায় সৈন্য প্রেরণে করিবার কথা চিন্তা করে^{১৪}। রায়কত দর্পদেব অবশ্য স্ববা বাংলার অধীনতা অধীকার করিলেন না। তবে, বাংলার রাজনীতিতে আবার বড় রকম পরিবর্তনের আভাস পাইয়া কিছুটা স্বাধীন আচরণ আরম্ভ করিলেন। পূর্বের মত বৈকুণ্ঠপুর হইতে রংপুর রাজকোষে রাজনা জমা পড়িতে লাগিল, কিন্তু কত প্রাপ্য এবং কত আসিল তাহা লইয়া রংপুর উচ্চ-বাচ্য করিল না। এই অবস্থা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরও কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদে ইংরেজ প্রতিনিধি রিচার্ড বিচার এর কাছে রংপুর হইতে সুপারভাইসর গ্রোস যে অভিযোগ করেন তাহাতে বৈকুণ্ঠপুরের এই আচরণের উল্লেখ আছে^{১৫}। দুই বৎসর পর রংপুর ম্যাজিস্ট্রেট পারলিং বৈকুণ্ঠপুরের নিকট হইতে বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা রাজস্ব প্রাপ্তির সংবাদ ওয়ারেন হেষ্টিংসকে দিয়াছিলেন^{১৬}। অথচ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুরের জমার পরিমাণ ছিল ৩০,৬৫১ টাকা^{১৭}।

স্পষ্টতঃ মনে হয়, দর্পদেব বাংলার ইতিহাসের গতি অলুধাবন করিতে পারেন নাই। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ছয়-সাত বৎসর যুগ-পরিবর্তনের অনিয়মে এবং বিশৃঙ্খলায় বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল। অবশেষে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কলিকাতার কর্তৃপক্ষ দেশের ভাল-মন্দ সম্পর্কে কিছুটা দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন^{১৮}। এই দায়িত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্কার আরম্ভ হয়। স্ববা বাংলার এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত কোম্পানীর রাজস্ব বাস্তব এবং সম্পূর্ণ করিয়া তোলা তখন ইংরেজের লক্ষ্য। তাই, জেলাগুলিকে সুপারভাইসরের পরিবর্তে একজন কালেক্টরের দায়িত্বে দেওয়া হইল। কমিটি অফ মার্কেট ভূমি ও রাজস্বের সঠিক বন্দোবস্তের জন্য জেলাগুলি ভ্রমণ করিতে লাগিল। কলিকাতায় স্ববা বাংলার জন্য একটি রেভিনিউ বোর্ড স্থাপিত হইল। রাজকোষ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। একদিকে মুর্শিদাবাদ হতশ্রী হইয়া পড়ে, অন্যদিকে কলিকাতা কেবল বাংলার রাষ্ট্রধানী নয়, ভারতে ইংরেজের কার্যকলাপের সদর দপ্তরে রূপান্তরিত হইতে লাগিল।

দর্পদেবের সেদিকে খেয়াল ছিল না। কুচবিহারের রাজনীতিতে ভোটানের প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস এবং কুচবিহারের আত্মরক্ষার করণ চেষ্টা সমকালীন বিশিষ্ট ঘটনা। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কোচ রাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ এবং তাঁহার দেওয়ান সুরেন্দ্র নারায়ণ বন্দী হইয়া ভোটানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কুচবিহারের প্রধান দুর্গ ভোটানের সৈন্যবাস। নাজির খগেন্দ্র নারায়ণ ইংরেজের সাহায্য লাভের আশায় রংপুরে পারলিং এর শরণাপন্ন হইয়াছেন। কুচবিহারের এই দুর্গতির সুযোগে দর্পদেব ভোটানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না, কলিকাতার কর্তৃপক্ষ তাঁহার স্বাধীন আচরণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট পারলিং কুচবিহারকে স্ববা বাংলার অন্তর্ভুক্ত এবং হিমালয়কে কোম্পানীর উত্তর সীমানা করিবার জন্য ওয়ারেন

১৪। Bengal Past And Present, Vol. V, P. 209.

১৫। Letter No. 2, Supervisor's Correspondence, Murshidabad Comptrolling Council of Revenue.

১৬। Letter from Purling to Warren Hastings, 31 July, 1772.

১৭। Firminger—Fifth Report, Vol. II. P. 343

১৮। Firminger—Fifth Report, Vol. I, Introduction X.

হেষ্টিংসের নিকটে সুপারিশ করিলেন^{১৯}। পারলিং এর সুপারিশ কর্তৃপক্ষের বিচারে যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কুচবিহারকে ভোটানের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত নেয়^{২০}। বৈকুণ্ঠপুরকে সম্পূর্ণ নতি স্বীকারে বাধ্য করিবার জন্য এবং সম্ভব হইলে দর্পদেবকে বন্দী করিবার জন্য কোম্পানী শক্তি প্রয়োগ করিতে স্থির করে^{২১}।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইংরেজের কাছে ভোটানের পরাজয়ের আভাস পাওয়া গেল। দর্পদেবের পক্ষেও ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়ান সম্ভব ছিল না। দিনাজপুর হইতে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট এবং কুচবিহার হইতে ক্যাপ্টেন জোন্স বৈকুণ্ঠপুরের দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে দর্পদেবের ভাড়া-করা সন্ন্যাসী সৈন্য কুচবিহারের পাটগ্রাম হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া জলপাইগুড়িতে আশ্রয় লইল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী বৈকুণ্ঠপুরের বাহিনী জলপাইগুড়িতে একটি সংঘর্ষের পর ইংরেজের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় আর সাহসী হইল না। যুদ্ধের সূচনাতে ১৪ জন হতাহত সঙ্গীকে ফেলিয়া সন্ন্যাসীরা উত্তরের জঙ্গলে পলাইয়া গেল^{২২}। দর্পদেবও জলপাইগুড়িতে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। সুবা বাংলার তরফ হইতে তৃতীয় এবং শেষবারের মত বৈকুণ্ঠপুর অধিকৃত হইল। এক বৎসর পর দর্পদেবের উকিল কিংকর বক্সী ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন পেশ করিয়া অধিক রাজস্ব দিবার সত্বে রায়কত পদে দর্পদেবের পুনর্বহালের প্রার্থনা জানাইলেন^{২৩}।

রায়কতের অহংকার চূর্ণ করা ইংরেজের কাছে খুব বড় ব্যাপার ছিল না। বরং বৈকুণ্ঠপুরে অভিযান পাঠাইয়া ইংরেজ একটি বড় সত্য উপলব্ধি করিল। সন্ন্যাসী এবং ফকিরের ছদ্মবেশে যাহারা পুর্ণিয়া, দিনাজপুর এবং রংপুরে লুণ্ঠ-তরাজ করিয়া বেড়াইত, তাহাদের জঘা ওয়ারেন হেষ্টিংস উদ্বিগ্ন ছিলেন^{২৪}। দেশীয় রাজা ও জমিদারদের বেতনভুক হইয়া ঐ সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া উত্তর বাংলায় অরাজকতার সাহায্য করিতেছিল। আইন ও শৃঙ্খল রক্ষার প্রয়োজনে ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানীর এলাকা হইতে ইহাদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর কিম্বা কুচবিহার হইতে সন্ন্যাসীরা বহিষ্কৃত হইলেও মহানন্দা ও মেচি নদীর মধ্যবর্তী নিবিড় তরাই অরণ্যে ইহাদের অন্তানা গড়িয়া উঠে। পূর্বে তিস্তা নদী পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এলাকাটি তখন সিকিমের, এবং স্থানীয় লোকেরা ভোটগং বলিয়া জানিত^{২৫}। সিকিমের দৃঢ় শাসনের অভাবে তরাই এর ঐ অংশ দুর্জন ব্যক্তি মাত্রেরই নিরাপদ আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছিল। রংপুর জেলার নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া ক্যাপ্টেন জোন্স বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম সীমান্ত এলাকার বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে অবহিত করেন। মহানন্দা নদী অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে প্রবেশের মুখে সন্ন্যাসীকাটা এবং আশে-পাশের তিনটি দুর্গের সামগ্রিক বিশেষত্ব ক্যাপ্টেন জোন্স নিজ অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিয়াছিলেন^{২৬}। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংসের তখন অগ্নি চিন্তা। তিনি তিব্বতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা বিস্তারের উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। কোম্পানীর প্রতি নেপালের মনোভাব মিত্র-শুলভ ছিলনা; সিকিমের মধ্য দিয়া বাংলা হইতে তিব্বতে যাইবার পথে সন্ন্যাসী

১৯। Committee of Circuit Proceedings. P. 24.

২০। Warren Hastings to Purling, 27 October, 1772.

২১। Committee of Circuit to Purling, 23 December, 1772.

২২। Committee of Circuit Proceedings. PP. 172-3.

২৩। Revenue Board Proceedings, 22 April, 1774 (13).

২৪। Calendar of Persian Correspondence. Vol. IV. PP. 706-7.

২৫। Firminger, Rangpur Records, Vol. I. P. 41. Letter from Purling to Warren Hastings, 28 March, 1778.

২৬। For Secret Consultations. 22 July, 1773 (2).

ও ফকিরের ভেকধারী দস্যুদের উৎপাত। একমাত্র ভোটানের মাধ্যমে বাংলা ও তিব্বতের যোগ স্থাপন সম্ভব ছিল। ইহার জন্ত ওয়ারেন হেস্টিংস ভোটানকে যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং কেবল ছয়ার অঞ্চল নয়; এমনকি জলেশ এবং আমবাড়ী-ফালাকাটা, যাহার উপরে ভোটানের অধিকার কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারীরা পর্যন্ত মানিতে পারেন নাই, ওয়ারেন হেস্টিংস ভোটানকে দান করিলেন^{২৭}। পরে অবশ্য এই ভুলের মাশুল কোম্পানীকে দিতে হইয়াছিল।

স্বা বাংলায় কোম্পানীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িককালে নেপালে গুখারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে পুর্ণিয়া জেলার সংলগ্ন উত্তরে মোরাং অঞ্চলে গুখা অনুপ্রবেশ ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল^{২৮}। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহা পছন্দ করে নাই, কিন্তু কোশী হইতে মেচিনদী পর্যন্ত নেপালের রাজ্য বিস্তারেও বাধা দেয় নাই। ক্রমে মেচি অতিক্রম করিয়া নেপাল তিস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। সিকিমের সাধ্য ছিলনা নেপালকে বাধা দেয়। অঞ্চল প্রধানদের ব্যক্তিগত বিরোধের সুযোগে নেপালী সৈন্য ভোটগংএ প্রবেশ করে এবং মেচি হইতে মহানন্দা পর্যন্ত ভূভাগ দখল করে^{২৯}। নেপাল এবারে বৈকুণ্ঠপুরের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল। উপরন্তু, ভোটগংএ আশ্রিত দস্যুদল গুখাদের সঙ্গে আঁতাত করিল। এমন কি রায়কত পরিবারের ভীমকুমার পিতৃব্য দর্পদেবের বিরুদ্ধে ইহাদের দলে গিয়া মিশিয়াছিল। ১৭৮০ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর রংপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় ইহারা অবাধে হানা দিতে লাগিল।

বৈকুণ্ঠপুর সীমান্তে এই ঘনায়মান বিপদের সঙ্কেত ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। নেপালের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা তাঁহার মনে আসিয়াছিল^{৩০}। কিন্তু বোধহয় প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ তাঁহার সামনে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে তিনি ফক্স ক্রফ্ট এর নেতৃত্বে একটি শুভেচ্ছা মিশন নেপাল দরবারে পাঠাইবার কথাও চিন্তা করিলেন^{৩১}। আশা ছিল, নেপাল দরবারের সহিত সৌহার্দ স্থাপিত হইলে বৈকুণ্ঠপুর সীমান্তের বিপদও কাটিয়া যাইবে। কিন্তু ফক্সক্রফ্ট মিশনের সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না^{৩২}। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংসও বিলাতের উদ্দেশে কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। ইহার দুই বৎসরের মধ্যে ভোটগং হইতে লুণ্ঠনকারীদের দল একযোগে বোদা, কাজির হাট এবং বৈকুণ্ঠপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এই অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্ত রংপুর হইতে কোম্পানীর বরকন্দাজী সৈন্য ক্ষিপ্ৰগতিতে উপদ্রুত অঞ্চলে গেল। দিনাজপুর এবং বহরমপুর হইতেও সৈন্যবাহিনী বৈকুণ্ঠপুর সীমান্তে যাত্রা করিল। আঘাতের জবাবে আঘাত, ইংরেজের এই সংকল্প বুঝিতে পারিয়া ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে নেপাল, রংপুর সীমান্ত হইতে উপদ্রবকারীদের সরাইয়া লইল^{৩৩}। অদূর ভবিষ্যতে তিব্বত অভিযানের পরিকল্পনা ছিল বলিয়া নেপাল দরবার পিছনে ইংরেজকে শত্রু করিয়া রাখা সঙ্গত মনে করিল না।

সীমান্ত লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্বেগের অবসান হয় নাই। বরং তিব্বত-নেপাল যুদ্ধ (১৭৮৮-৯৩) ইংরেজের উদ্বেগ দ্বিগুণ করিয়া তুলিল। পূর্ব হিমালয়ে ঐ যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া চীনের আবির্ভাবে কোম্পানী

২৭। Letter from W. Harewood to Warren Hastings, 20 May, 1777.

২৮। Calendar of Persian Correspondence. Vol. IV. P. 137.

২৯। Letter from Bogle to Rooke in Purnea, 7 April, 1780. (Rangpur Records, Vol. IV)

৩০। Journal of the Royal Asiatic Society (London), 1958, Parts I-II, P. 27.

৩১। Calendar of Persian Correspondence. Vol. VI. P. 324.

৩২। Regmi, D. R. Modern Nepal, P. 152.

৩৩। Letter from Macdowall at Rangpur to Cowper, 14 May, 1786. (Rangpur Records—Vol. VI.)

বিস্মিত এবং সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় চীনের সামান্য প্রভাবও কোম্পানী স্বীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া বিশ্বাস করিত। সুতরাং ঐ উপত্যকায় নিজের জন্ত একটু স্থান করিয়া লইবার অপেক্ষায় কোম্পানী স্বেচ্ছা সন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে, ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ (১৮১৪-১৫) সে স্বেচ্ছা আনিয়া দিল। পরাজিত নেপাল সিংগৌলি সন্ধি (মার্চ, ১৮১৬) অনুসারে মেচি ও তিস্তার অন্তর্বর্তী তরাই ভূখণ্ডের অধিকার প্রত্যাহার করিল। পর বৎসর, তিতালিয়া (তৈতুলিয়া) সন্ধি (ফেব্রুয়ারী, ১৮১৭) সূত্রে কোম্পানী ঐ ভূখণ্ড সিকিমকে প্রত্যাৰ্পণ করিল। বৈকুণ্ঠপুরের নিরাপত্তার দিক হইতে ইংরেজের কাছে ঐ ভূ-খণ্ডের গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল; কিন্তু সিকিমের বন্ধুত্বের গুরুত্ব তাহা অপেক্ষাও বেশী। পূর্ব হিমালয়ের রাজ্যগুলির মধ্যে সিকিম ছিল তিব্বতের ঘনিষ্ঠতম। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কোম্পানী এবং সিকিম পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। পূর্ব হিমালয় সংক্রান্ত কোম্পানীর নীতির দিক হইতে তিতালিয়া সন্ধিপত্রটি তাই একটি মূল্যবান দলিল। ইহার ফলে ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রভাব নিঃসন্দেহে পূর্ব হিমালয়ে প্রসারিত হইল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে লর্ড বেণ্টিঙ্কের বিশেষ অনুরোধে সিকিম দানপত্র করিয়া দার্জিলিং পাহাড় ইংরেজের হাতে সমর্পণ করিল। আরও পনেরো বৎসর পরে মেচি ও তিস্তার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ইংরেজ দখল করিল, যাহার ফলে পূর্ব হিমালয়ে ৬৪০ বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।* হিমালয়কে উত্তরের সীমারেখা করিবার জন্ত একদা পারলিং ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে যে প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তাহা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আংশিক কার্যকরী হইল। তবু, বৈকুণ্ঠপুরের জন্ত কোম্পানীর দুর্ভাবনা গেল না। বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে ১৫ বর্গমাইল জায়গা জুড়িয়া আমবাড়ী - ফালাকাটা। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস ভোটানের প্রীতার্থে আমবাড়ী-ফালাকাটা এবং জলেশ্বর, বৈকুণ্ঠপুরকে বন্ধিত করিয়া, ভোটানকে দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন তখন হইতে ভোটান এবং বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে মনান্তর শুরু হইল। ইংরেজ অবশ্য রাজস্বের পরিমাণ কিছু কমাইয়া বৈকুণ্ঠপুরকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর শান্ত হয় নাই।

ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের পর প্রথমতঃ ভোটানের দুর্ভাবহারে এবং দ্বিতীয়তঃ, তিব্বতে কোম্পানীর বাণিজ্যের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হওয়ায় ভোটান সম্পর্কে ইংরেজের মোহ ছিন্ন হইতে থাকে। আসাম, কুচবিহার এবং রংপুর সীমান্তে ভোটানীদের তরফ হইতে হয় চুরি-ডাকাতি, না হয় জমি জবরদখল প্রায়ই ঘটিতে লাগিল। দুয়ারের ভোটানী কর্মচারীদের কাছে অনুরোধ-উপরোধে কোন প্রতিকার হইল না। ভোটানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদনও বারংবার নিষ্ফল হইতে থাকে। কারণ, সীমান্তের কর্মচারীদের কার্য-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল না। উপরন্তু, আসামের দেওয়ানগিরি এবং বাংলার বক্সা অঞ্চলের ভোটানী কর্মচারীদের মারফৎ ইংরেজকে অভিযোগ-পত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাইতে হইত। ইংরেজের অভিযোগ-পত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সর্বদা পৌঁছাইত না; পৌঁছাইলেও আঞ্চলিক কর্মচারীরা পত্রের যে ব্যাখ্যা করিতেন কেন্দ্রীয় সরকার তাহাই বিশ্বাস করিত। কখনও বা আঞ্চলিক কর্মচারীরা নিজেরাই চিঠি পত্রের জবাব পাঠাইয়া দিতেন। ভোটান দরবারে কোম্পানীর তরফ হইতে ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের পেয়ারটন মিশন গিয়াও কিছু করিতে পারিল না।

* পাদটীকা—মেচি ও তিস্তার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড হাতে না আসা পর্যন্ত কেবল দার্জিলিং পাহাড় লইয়া ইংরেজের দৃষ্টিস্ত ছিল। মিত্র রাষ্ট্র হইলেও সিকিমের ভোটগংএর মধ্য দিয়া রংপুর ও দার্জিলিংএর যোগাযোগ ক্রটিপূর্ণ এবং অস্বস্তিত ছিল।

Aitchison—Treaties, Engagements, etc. (Treaty of Segouli, Vol. II, LIV).
(Treaty of Titalya, Vol. I, LVIII).
(Deed of Grant of Darjeeling, Vol. I, LIX).

বরং উনিশ শতকের চমিশে ভোটানীদের অত্যাচার এবং ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়াইয়া গেল। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভোটানের হাত হইতে কামরূপ ও দারাং জেলার দুয়ারগুলি কাড়িয়া লইল। তবু, বামেলা কমিল না। কুচবিহার ও রংপুর সীমান্তে গোলযোগ অব্যাহত রহিল।

ভোটানের প্রাক্তন এবং বর্তমান দুই রাজার ক্ষমতার লড়াই রংপুর সীমান্তেও বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলার দুয়ার অঞ্চলের প্রধান জমিদার হরগোবিন্দ কাঠাম প্রাক্তন রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রায়কত পরিবারের দুর্গাদেব ভোটানের নিকট হইতে আমবাড়ী-ফালাকাটার ইজারা লইয়া বর্তমান রাজাকে সমর্থন জানাইলেন। উদ্দেশ্য, হরগোবিন্দ কাঠামের সম্পত্তি গ্রাস করা। তিস্তার পূর্বপারে একদা বৈকুণ্ঠপুরের যে সম্পত্তি ছিল তাহা রায়কতেরা ভুলিয়া যান নাই। ইহার ফলে তিস্তা ও জলঢাকা নদীর মধ্যবর্তী এলাকা দুর্গাদেব এবং হরগোবিন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল^{৩৪}। শেষ পর্যন্ত দুর্গাদেবের ষড়যন্ত্রে হরগোবিন্দ প্রাণ হারাইলেন, এবং হরগোবিন্দের সম্পত্তি দুর্গাদেব নিজের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু হরগোবিন্দের দুই উত্তরাধিকারী গৌরমোহন এবং কৃষ্ণকান্ত (প্রভু কান্ত) রংপুরে পাটগ্রামে আশ্রয় লইলেও ভোটানের প্রাক্তন রাজা, ডালিমকোট এবং চামুচির শাসকদের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া দুর্গাদেবকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন^{৩৫}। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রংপুরের স্বার্থে এ অবস্থা বেশীদিন সহ্য করিতে পারিলনা। কোম্পানীর প্রজা এবং ভোটানের ইজারাদার হিসাবে দুর্গাদেব নিজেকে এবং কোম্পানীকে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং বাৎসরিক ৮০০ টাকা জমায় ভোটানের নিকট হইতে আমবাড়ী-ফালাকাটার ইজারা গ্রহণ করিল^{৩৬}। কোম্পানীর চাপে দুর্গাদেব ভোটানের অধীনে জমিদারী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পাটগ্রামে বসবাসকারী এই দাবীতে রংপুর ম্যাজিষ্ট্রেট গৌরমোহন এবং কৃষ্ণকান্তের নিকট হইতে ৩০০০ টাকার ব্যক্তিগত জামিনে এই স্বীকৃতি আদায় করিলেন যে উভয়ের কেহই ভোটানে সশস্ত্র অত্যাচার লইয়া যাইবে না^{৩৭}।

বৈকুণ্ঠপুর লইয়া বামেলা মিটিলেও রংপুর বা কুচবিহার সীমান্তে ভোটানীদের উৎপাত বন্ধ হইল না। আসামের দুয়ারগুলি অধিকার করিয়া লইবার পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় কুড়ি বৎসর প্রতিকারহীন ভোটানী অত্যাচারে ইংরেজ অতিষ্ঠ হইল। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার কথা চিন্তা করিয়াও তাহাকে পিছাইয়া আসিতে হইল,—একবার শিখদের সহিত চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্ত, দ্বিতীয়বার সিপাহী বিদ্রোহের জন্ত। কুচবিহারের কথা ইংরেজ বিশেষ ভাবিল না; কেবল রংপুর রক্ষার জন্ত বাকালী, জিরানগঞ্জ এবং চুড়াভাণ্ডারে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করিল। ইহা ছাড়া জলপাইগুড়িতে একটি স্থায়ী সেনানী বাস গড়িয়া তুলিবার জন্ত 73 Native Infantry এবং II Irregular Cavalryকে জলপাইগুড়িতে পাঠানো হইল। কিন্তু, সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনা জলপাইগুড়ির সিপাহীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়^{৩৮}। এই পরিস্থিতিতে আপাততঃ ভোটানের বিরুদ্ধে ইংরেজের আর কিছু করিবার ছিল না। তবে, ইহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল যে তিস্তা হইতে আসামের মানস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত দুয়ারগুলি হইতে ভোটানীদের বিতাড়িত করা এবং তাহাদের পর্বত-ভূমিতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা ছাড়া

৩৪। Foreign Political Consultations. 16 Oct. 1839. (98)

৩৫। Foreign Political Consultations. 18 Oct. 1841. (60). Ibid. 7 Feb. 1842. (138)

৩৬। Ibid. 24 Aug. 1842. (139)

৩৭। Ibid. 24 Aug. 1843. (143)

৩৮। Buckland, C. E. Bengal under Lt. Governors. Vol. I. PP. 130-31.

সীমান্তে শান্তিরক্ষার চেষ্টা গ্রহণ মাত্র। কিন্তু, লগুনের কর্তৃপক্ষ হয়তো বিদ্রোহের সমস্ত কথা ভাবিয়া ভোটানের কোন এলাকা স্থায়ীভাবে দখল করিবার বিরোধী ছিলেন^{৩৯}। তাহা ছাড়া, সিকিমের সহিতও ঐ সময়ে ইংরেজের সম্পর্ক খুব তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল^{৪০}। একই সঙ্গে সিকিম এবং ভোটানকে শত্রু করিয়া তোলা সমীচীন হইতনা। তাই, সাময়িকভাবে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ইংরেজ আমবাড়ী-ফালাকাটার উপরে ভোটানের অধিকার অস্বীকার করিল^{৪১}।

পরবর্তী পাঁচ বৎসরের ইতিহাস ঘটনা-বহুল, এবং পৃথক জেলা হিসাবে জলপাইগুড়ির জন্মের ইতিহাস। আমবাড়ী সম্পর্কে ইংরেজের সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় ভোটানের কেন্দ্রীয় সরকার অবিচলিত রহিল। মনে হয় আমবাড়ী-ফালাকাটার রাজস্ব ভোটানের পশ্চিমাঞ্চলের কর্মচারীরা নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছিলেন^{৪২}। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের ইহার জ্ঞাত কোন আগ্রহ ছিলনা। অগত্যা, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ইংরেজ এ্যাসলি ইডেনের নেতৃত্বে ভোটান দরবারে শেষবারের মত একটি মিশন পাঠাইল। কিন্তু ভোটান দরবারে ইডেন নাস্তানাবুদ হইলেন, এবং ভোটানের অভিপ্রেত একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রাণ লইয়া পালাইয়া আসিলেন। ইহার পর ভোটান এবং ইংরেজের দ্বন্দের নিরসনের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন উপায় রহিল না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে ইংরেজ বাহিনী দুয়ারগুলি আক্রমণ করিল। ইংরেজের শক্তির তুলনায় ভোটানের শক্তি অনেক কম। তবুও, প্রাকৃতিক বাধা এবং দুয়ারের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জ্ঞাত যুদ্ধ এক বৎসর ধরিয়া চলে। অবশেষে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে বক্সার অদূরে সিঞ্চুলায় উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল^{৪৩}। ডালিমকোটের পাবর্ত্য উপত্যকা হইতে হিমালয়ের সীমারেখা ধরিয়া পূর্বে আসামের মানস নদী পর্যন্ত দুয়ার ইংরেজ পাইল। প্রায় চার বৎসর পর তিস্তা ও সঙ্কোশ নদীর মধ্যবর্তী দুয়ার এলাকার সহিত পুরাতন বৈকুণ্ঠপুর, এবং তেঁতুলিয়া, বোদা সংযুক্ত করিয়া জলপাইগুড়ি জেলা গঠন করিবার আয়োজন হয়। পারলিংএর স্বপ্ন এতদিনে সফল হইল। রংপুর এবং ভোটান পাহাড়ের মধ্যে অরণ্য-সঙ্কুল ভূমিখণ্ড যতই অস্বাস্থ্যকর হোক, সুবা বাংলার উত্তর সীমানার দিক হইতে ইহার অপারিসীম মূল্য। সুবা বাংলার নবাবদের এ বিষয়ে সচেতনতা ছিল না, সুরক্ষিত সীমান্ত গড়িয়া তোলা পরের কথা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও প্রথমে খুব সচেতন হন নাই। কিন্তু হিমালয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন যত বাস্তব হইতে লাগিল, তত ঐ অরণ্য-সঙ্কুল ভূমিখণ্ডের গুরুত্ব তাঁহাদের কাছে অসাধারণ হইয়া উঠিল। কেবল রংপুর বা কুচবিহার সীমান্তে ভোটানীদের দৌরাডা বন্ধ করিবার জ্ঞাত নয়, ভবিষ্যতে হিমালয়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির খবরাখবর লইবার জ্ঞাত এবং ভোটানের সহিত যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত রাখিবার জ্ঞাত ইংরেজ জলপাইগুড়ির নতুন মূল্য ধার্য করিল।

৩৯। Letter from the Secy. of State., 12 Jan. 1860 (2).

৪০। Bengal Lt.-Governor's Proceedings (Pol), Jan. 1861 (18-20)

৪১। Parliamentary Papers (House of Commons) Vol. 39, 1865, P. 258.

৪২। Bengal Lt.-Governor's Proceedings (Pol), March, 1862 (59).

৪৩। Aitchison. op. cit. Vol. II, CX.

The Birth of the District

By—Shri Abdul Bari

The district of Jalpaiguri as an administrative unit came into being on January, 1869 by the amalgamation of the Western Duars district with the Jalpaiguri sub-division of Rangpur district (Notification of December 8, 1868). The Jalpaiguri sub-division had been formed in 1854 with headquarters at Sookanee and was called the Sookanee sub-division. When a military cantonment was established at Jalpaiguri, the headquarters of the sub-division was transferred from Sookanee to Jalpaiguri and the name of the sub-division was changed to Jalpaiguri sub-division. The 3 police thanas Fakirganj (now Jalpaiguri), Boda and Sanyasikata (now Rajganj) comprising the sub-division were transferred to the newly formed district of Jalpaiguri at the commencement of 1869. The thana of Patgram was also separated from Rangpur and added to Jalpaiguri on April, 1870.

The Western Duars district formed in 1864 comprised that tract of land taken from Bhutan at the end of the war with her which lies between the Tista and the Sankosh rivers. The district had three sub-divisions—Sadar with headquarters at Mainaguri, Buxa with headquarters at Buxa and sometimes at Alipur, and Dalimkote, the present-day Kalimpong. In 1867 Dalimkote was transferred to Darjeeling district. In the same year the criminal jurisdiction of Jalpaiguri sub-division of Rangpur was transferred to the Deputy Commissioner of the Western Duars district.

Jalpaiguri district comprises two well-defined tracts which differ alike in history and administration. The portion which was separated from Rangpur was known as the Regulation or permanently settled tract as it was administered under the ordinary laws and regulations in force in Bengal. It lies for the most part on the west of the Tista, though it included Patgram thana on the east of the river. The two chaklas of Boda and Patgram belonging to the Cooch Behar Raj and the Baikunthapur estate between them cover nearly the whole of the permanently settled portion of the district. Although the touzi toll bore the names of 340 other estates, none of them was of any size. The other tract known as the western Duars is bounded on the west by the Tista, on the east by the Sankosh, on the north by Kalimpong and Bhutan and on the south by the Cooch Behar state and Baikunthapur. This sub-montane tract was, together with the Eastern Duars which now forms part of Goalpara district of Assam, taken away from Bhutan at the end of the Bhutan war (1864-65).

The Permanently settled portion of the district.

A historical sketch

In ancient times, the district formed part of the powerful kingdom of Pragyothisha and later of Kamarupa. The western boundary of both the kingdoms extended upto the Karotoa. According to one legend Raja Jalpeswar built a temple at the site of the present temple at

Jalpesh. Bhitargarh, now in East Pakistan, where extensive remains are found, formed the capital of a Sudra King named Prithu. The district was included in the later Kingdom of the Khen Rajas Niladhvaj, Chakradhwaj and Nilambar—the first of whom founded the city of Kamatapur in Cooch Behar. It subsequently formed part of the Koch Kingdom founded by Biswa Singh. The historical watershed which divided the two parts of the district commenced when the Bhutias from the north and the Mughals from the southwest began to annex chunks of territory of the once powerful Cooch Behar kingdom.

Akbar's General Ali Kooli Khan, Sher-e-Afgan, conquered Gour and other territories in the west of the Cooch Behar kingdom. At that time the large Cooch Behar kingdom was bounded on the east by the Brahmaputra, on the south by Ghoraghat, on the west by Tirhut and on the north by the mountains of Tibet and Assam. Maharaja Lakshminarayan (1587-1621) who succeeded his father Naranarayan, the most powerful of the Cooch Behar kings, was a weak prince. When Gour was wrested by the Mughals in 1576, he took fright and professed himself a vassal of the Mughal Emperor in 1596. This conduct gave offence to his relatives. The Maharaja took refuge in a fort and asked for help from the Mughal Governor of Bengal at Gour. A detachment was sent under the command of Jehaj Khan who quickly dispersed the rebels. During the reign of Emperor Jehangir the Mughal Governor of Gour invaded Cooch Behar and subdued Ghoraghat. A treaty was made between the Emperor and the king to the effect that they would not seize each other's territory.

In 1638 Islam Khan, the Mughal Governor of Chittagong and in 1661 Mir Zumla, the Mughal Governor of Bengal invaded Cooch Behar during the reign of Maharaja Prannarayan (1625-1665). In 1687 the Mughals under the leadership of Ebadat Khan advanced from Ghoraghat and took area after area belonging to Cooch Behar. The officers in charge of these areas played a treacherous part and took sanads in their names and became zamindars under Gour. The officers of Chaklas Boda, Patgram and Purbabhas however put up a stiff resistance and after a hard struggle to retain their independence for 17 years, a treaty was made in 1711 with the Mughals. By this treaty made by Raja Rupnarayan (1693-1714) the status quo was maintained. The lands of which the Mahammadans had obtained possession were settled with the Koch kings as a subordinate zamindari, while the lands of which the Koch king had retained possession were confirmed as part of Cooch Behar kingdom. In the settlement with the Mughals, the Raja took the zamindari benami in the name of his Nazir Deo. At the time of permanent settlement in 1793 the East India Company settled the zamindari with the Cooch Behar king in his own name. This is the origin of the Chaklajat estates of Cooch Behar in Rangpur district and of presentday Indian and Pakistani enclaves in this region. From this time the extent of the Cooch Behar kingdom was virtually confined to the present Cooch Behar district.

Let us now turn to Baikunthapur estate which, along with Chaklas Boda and Patgram, covered almost the entire area of the permanently settled tract of the district. The Baikunthapur Raikat family owed its importance to its connexion with the Cooch Behar Raj. At the coronation of Visu, his brother Sisu held the royal umbrella over his head and assumed the title of Raikat. Sisu became his brother's Prime Minister and Commander of his army; he

obtained from the king the Baikunthapur Pargana. After Sisu's death, the Raikats became more and more powerful until, in the reign of Raja Bir Narayan (1621-1625) they ceased to be tributary to Cooch-Bihar. About 1680 they acted as the protectors of the Cooch Bihar State and for the time being completely overshadowed it. Baikunthapur was conquered by Sakat Jung at the time of Suja Khan. Darpa Dev and his brother Bikram were made prisoners and were brought to Rangpur where they remained prisoners for 17 years. They were afterwards released by Kasim Ali Khan when he undertook an expedition to reduce Baikunthapur to a more avowed subjection. Darpa Dev became a nominal Raikat. Afterwards the Raikats of Baikunthapur became zamindars under the East India Company.

The Muhammadans included their conquests from the Cooch Bihar kingdom in the fouzdari (magisterial jurisdiction) of Fakirkundi or Rangpur. These were transferred to the East India Company with the grant of Diwani by the Mughal Emperor Shah Alam II on August 12, 1765.

The permanently settled portion of Jalpaiguri which included parganas Baikunthapur, Boda and Patgram has no history of its own apart from the parent district of Rangpur. This area was administered from 1765 to 1868 as part of Rangpur district.

When the East India Company received the Diwani in 1765, the Mughal administration in Bengal was nothing more than a name. The Company was still a trading organisation which lacked both the talent and desire for setting up an administrative net-work. Even Seven years after the grant of the Diwani, Warren Hastings was appointed Governor-General primarily because of the good opinion the Board of Directors had formed about his brisk business activities in Madras.

The village commune which once flourished in Bengal broke down. The resident cultivators were jointly and severally responsible for the whole revenue from the lands of the village commune. The village register of lands and rents was kept by a village officer generally known as the Patwari who received his emoluments from allowances paid by the cultivators and from a small grant of the village lands. The patwari was regarded as the representatives of the village commune in its dealings with the zamindars and revenue agents of the State. The State Agent was the Kanungo.

Owing to the fast extension of merchant capital, and the tyranny and exactions of the revenue farmers and their agents, the village commune fell into pieces. One of the greatest famines of Bengal occurred at this time ; the famine of 1769-70 left one-third of Bengal bare of inhabitants. In many places of Bengal the peasantry rose in revolt. Rangpur was no exception. Some account of this troublesome period of Rangpur district is found in the report of Mr. Glazier, the Collector of Rangpur. It is found in Mr. Glazier's report (1873) that, when the revolts of the peasantry took a serious turn, a party of sepoys under Lt. Macdonald marched against the principal body of insurgents. A decisive battle was fought near Patgram on February 22, 1783. The peasants lost the battle. Har Ram, a sub-farmer under Raja Debi Singh, the farmer, whose oppressions had brought about the uprising, was punished.

Rangpur, according to Mr. Glazier, was peculiarly liable to be infested with banditti who ravaged the country in armed bands numbering several hundreds. The tract lying south of Dinajpur and Rangpur and west of Bogra district, towards the Ganges, was a favourite haunt of these banditti. In 1787 Lt. Brenan was employed in this region against a noted leader of dacoits named Bhawani Pathak. He despatched an Indian officer with sepoy. Pathak and his followers were surprised in their boats and he was killed with three of his followers. Pathak was in league with another dacoit named Majnu Singh. We catch a glimpse from Brenan's report of a female dacoit named Debi Chaudhurani, also in league with Pathak. In 1789 a large body of bandits occupied the Baikunthapur forest. The Collector got together a force of 200 barkandazes and held all the entrances to the forest. Some months elapsed. Several skirmishes took place. In the end the bandits were starved out ; some escaped into Nepal and Bhutan and many were captured. In one year, in this and other parts of the district, the Collector captured and brought to trial 549 bandits.

There were many other operations against the dacoits whose oppressions were eliminated so that in 1876 Hunter in his Statistical Account of Bengal, Vol VII could with apparent complacency wax eloquent on the beneficial effects of the Company's administrative measures on the maintenance of law and order, the peaceful arbitrament of disputes according to law, the spread of education among the people and the general development of the country.

The history of Boda and Patgram after 1765 is not of particular interest, but a brief historical sketch of the Baikunthapur estate will be of interest.

The aggressions of the Bhutias on Cooch Behar kingdom had been going on in increasing degree even since the beginning of the 18th Century, and by 1765 Bhutan was supreme in Cooch Behar and nothing could be done without the sanction of her representative stationed in Cooch Behar. The Raikat of the time, Darpa Deo, had become very powerful with the help of sanyasis. He entered into an alliance with the Dev Raja of Bhutan and ceded to him a considerable portion of Baikunthapur on condition of being supported in overthrowing the Raja of Cooch Behar. With the Bhutia troops, he invaded Cooch Behar. The Raja of Cooch Behar in despair appealed to the East India Company for help. A treaty was concluded in 1773 whereby Cooch Behar became a feudatory State of the English. The latter ejected the Bhutia forces from Cooch Behar. A treaty was made by the Company with Bhutan in 1774. The Raikat, Darpa Deo, who was at the bottom of the events leading to these troubles, was confined in those parts of Baikunthapur as had not already been ceded to Bhutan. A revenue was however assessed on his lands and he was placed on exactly the same footing as an ordinary zamindar while being deprived of all authority on Cooch Behar proper. Darpa Deo in a petition of remonstrance against the heavy revenue assessed on him, which he addressed to the Collector of Rangpur, called himself the Raja of Batris-hazari.

The Bhutias were not satisfied with the terms of the treaty and soon set to work to wrest more lands from the zamindars of Baikunthapur. The English were at the time desirous of reaching Tibet through Bhutan and followed a conciliatory policy towards Bhutan. The result

was that by the persistent representation on the part of Deb Raja, the Bhutias obtained a large tract of Baikunthapur east of the Tista, containing the celebrated temple of Siva at Jalpesh, and Ambari Falakata village west of the Tista which was in the centre of Baikunthapur estate.

When Baikunthapur was annexed in 1772, the zamindar paid an annual tribute of Rs. 10,000/- which was increased to Rs. 25,000/- in 1774 and to Rs. 30,000/- in 1775. This was maintained in disregard of the protests lodged by the Raja. In 1770 occurred what Mr. Glazier describes as "the fictitious rebellion of Baikunthapur." Balances of revenue had accrued for 3 years and in 1779 Sezawal (rent-collector) was appointed to collect the revenue from the country direct. The Sezawal sent in reports that the zamindar had employed dacoits to murder him. He retired to Narea in Pargana Boda, but his people were attacked. One barkandaj was murdered, some were wounded and some were thrown into the river. The Collector of Rangpur adopted vigorous measures. The Raja was caught and brought to Rangpur. Two amins who were sent to enquire into the matter reported that the Sezawal himself had sent dacoits to Baikunthapur who plundered the country. In 1780 some reduction in the revenue was made.

Baikunthapur was, during the latter part of the 18th century, not much more fortunate in its relations with its western neighbour Nepal than in those with Bhutan. From 1780 to 1786 the Nepalese made almost annual raids into Baikunthapur on the pretence that the foudjar of the Sikkim Raja had taken refuge there.

An interesting link between Baikunthapur and the outer world is revealed in a letter which came in 1783 from the Governor General to convey the thanks, and some presents, from the Emperor of China to the Zamindar of Baikunthapur for helping on some elephants which had been sent from the Raja of Nepal to the Emperor, and had passed through Baikunthapur.

The history of Baikunthapur estate in the 19th century is chiefly a record of frequent and protracted litigations among claimants to the estate. On two occasions the estate was under the Court of Wards—between 1801 and 1812 during the minority of Sarba Dev and again between 1857 and 1863 during the minority of Chandra Sekhar Dev, and once again in the twentieth century from 1904—1914 during the minority of Prasannadev Raikat.

The Western Duars.

The Western Duars was wrested by the British Government from Bhutan at the end of the Bhutan war of 1864-65 which culminated in the treaty of Sinchula signed on November 11, 1865.

The lands which now comprise the district of Darjeeling once belonged to Sikkim. Her eastern neighbour Bhutan gradually occupied her lands east of the Tista since 1707. These lands now comprise the Kalimpong sub-division of Darjeeling. Her western neighbour is Nepal. The Gurkhas after overrunning Nepal began to intrude into Sikkim's territory from 1780 and by 1813 the lands upto the west of the Tista including the present Siliguri subdivision of Darjeeling district passed into Nepal's occupation. By 1814 the Rangpur district got Nepal and Bhutan as her northern neighbours.

From 1780 to 1786 raids were almost annually made by the Gurkhas of Nepal in Baikunthapur on the plea that the fouzdar of Sikkim had taken refuge there. Owing to a variety of reasons war broke out between Nepal and the East India Company. The Company's forces expelled the Gurkhas from all the territories of Sikkim which Nepal had added to its possessions. The war ended in a treaty of peace signed at Segowli on December 21, 1815 by which Nepal had to part with all lands of Sikkim which it had annexed. These lands were transferred to Sikkim by the treaty of Titaliya between the Company and Sikkim which was signed on February 10, 1817 in the Dak Bungalow situated on a hillock overlooking the Mahananda. Sikkim was made a buffer state between the Company's possessions in the South and Nepal and Bhutan in the North. In February 1835 the Raja of Sikkim executed a deed of grant in favour of the Company giving unconditional possession of Darjeeling. In 1841 the Company granted the Raja an annual allowance of Rs. 3000/- as compensation which was raised in 1846 to Rs. 6,000/- before it was stopped in 1850.

Meanwhile the relations of the Company with Sikkim deteriorated. Criminals were harboured in Sikkim and British subjects were kidnapped for the purpose of slave trade between Sikkim and Bhutan. Demands from the Sikkim Darbar for the return of slaves were frequent. The climax was reached when in November 1849 Dr. Campbell, Superintendent of Darjeeling, and Dr. Joseph Hooker, the great botanist, while travelling in Sikkim with the permission of the Raja and the Company, were taken prisoners by Namguay, popularly known as the Pagla Dewan (mad minister). The treachery was punished by the annexation by the Company of the entire Terai and a large area bounded on the north by the great Rangit river. Thus by the deed of grant of 1835, and annexation effected in 1850 the present-day Darjeeling district except Kalimpong sub-division (which would come as a result of the treaty of Sinchula, 1865) came into the Company's possession.

Many complications continued even thereafter until in 1860-61 the Government of India ordered the occupation of Sikkim by force under Colonel Gawler accompanied by Ashley Eden as Envoy and special messenger. In March, 1861 a treaty was concluded at Tamlong, Capital of Sikkim, which regulated the relations of the Company with that country.

Bhutan was a more troublesome neighbour. In the course of implementing the treaty entered into with Cooch Behar in 1773 the Company came into contact and conflict with Bhutan. The first war with Bhutan ended by the signing of the treaty of peace in 1774. By this treaty the southern boundary of Bhutan was amicably settled. But the boundary question was raised by Bhutan from time to time. The Company for some time followed a conciliatory policy towards Bhutan and some territories of Cooch Behar and Baikunthapur were made over to Bhutan. In 1783 Captain Turner was deputed to Bhutan with the purpose of promoting commercial intercourse, but his mission failed. From this period, little intercourse took place until the occupation of Assam by the English in 1826. It was then found that the Bhutias had usurped several tracts of low land lying at the foot of the mountains, called the Duars or passes; for these they agreed to pay a small tribute. They failed to do so however and availed themselves of command of the passes to commit depredations within the company's territory. Captain Pemberton was accordingly deputed to Bhutan to adjust the

points of difference. But his negotiations yielded no result. As all attempts to obtain redress and ensure security to the inhabitants failed, the Assam Duars were wrested from the Bhutias and the English agreed to pay Rs. 10,000/- per annum to Bhutan, during good behaviour, and as compensation for the loss.

The Bhutias however continued outrages and aggressions on British Subjects and properties as well as those of Cooch Behar state and Sikkim. Despite repeated protests and threats by the Company, raids headed by Bhutia officials occurred every year in which the raiders plundered the inhabitants, massacred them and carried many of them off as slaves.

In December 1863 Ashley Eden was sent to Bhutan as an envoy to put a stop to the depredations and outrages and to demand reparation. In April 1864 Eden returned from Bhutan and reported the failure of his mission. He had been subjected to gross indignities and obliged to sign two papers, agreeing to make over the Assam and Bengal Duars to Bhutan and to surrender all run-away slaves and political offenders. On Eden's return the Governor General at once disavowed the treaty which Eden had been forced to sign. Negotiations continued fruitlessly for the settlement of the disputes. In June 1864, the Government addressed letters to Deb and Dharma Rajas announcing the permanent annexation of the district of Ambari Falakata (Bengal Duars) held on farm by the Government from Bhutan and declaring the stoppage of annual payments to Bhutan of Rs. 2,000/- as rent for Ambari Falakata and Rs. 10,000/- as revenue for the Assam Duars. On 12th November, 1864 the British Government issued a proclamation permanently annexing the Bengal Duars; and it was decided that an expedition should advance and take up their several posts at Diwangiri, Sidli, Phasakhawa and Dalimkot. The expeditions were successful. The Deb and Dharma Rajas ultimately yielded and concluded a treaty of peace at Sinchula on November, 11, 1865.

The treaty contained 10 Articles. The following sentence quoted from the 2nd Article will be of interest : "...it is hereby agreed that the whole of the tract known as the Eighteen Duars bordering in the districts of Rangpur, Cooch Behar and Assam, together with the taluk of Ambari Falacottah and the hill territory on the left bank of the Tista upto such points as may be laid down by the British Commissioner appointed for the purpose is ceded by the Bhutan Government to the British Government for ever."

The 4th Article provided for the payment of subsidy to the Bhutan Government which, after some initial payments, reached Rs. 50,000/- per annum.

A remark at this point upon the accounts of the happenings between the Company and Sikkim and Bhutan will not perhaps be out of place. From the accounts left by British writers one gets the impression that it was the actions of Bhutan and Sikkim which compelled the British to engage in hostilities with those countries. Thus Hunter in his statistical Account of Bengal, Vol X, describing the events leading to the war with Bhutan, stated that Bhutan committed depredations, outrages and aggressions in British territories and that "notwith-

standing repeated remonstrances and threats (by the English) scarcely a year passed without the occurrence of several raids on British territory, headed by Bhutan officials, in which they plundered the inhabitants, massacred them, or carried them off as slaves." The proclamation of Nov. 12, 1864 annexing the Bhutan Duars expressly accused Bhutan of deceiving British Government and perpetrating all sorts of hostile activities which left no choice for the government but to annex the said territory for its own security. When relations with Sikkim deteriorated, the Company accused that country of kidnapping British subjects from Darjeeling and harbouring criminals. It was as though the British desired to live with neighbouring states in peace, but found it impossible to do so because of the nibbling at the British territories by those small states. There is no doubt about it that the British sought excuses for their expansionist policy, but we get one-sided accounts of the events left by them. As we do not get to know the other side of the shield, we have to rely on the British accounts of the events.

The formation of the district.

After the annexation of the Duars in November, 1864, they were divided into Eastern and Western Duars. The Eastern Duars containing an area of about 1568 square miles were, by Govt. Notification dated December 3, 1866, attached to Goalpara district of Assam.

Mr. F. A. Donough, Assistant Commissioner, was deputed to Mainaguri for criminal and civil work. He was relieved shortly after by Mr. J. Tweedi who was appointed in 1866 the first Deputy Commissioner of the Western Duars. From Mainaguri Mr. Donough was transferred to Buxa as Civil Officer and was there till the end of 1867 when he was succeeded by Colonel Hedayet Ali Khan (after whom Alipur was named). In 1867-68 Mr. W. M. Clay took charge of Buxa which was then created a regular sub-division. His headquarters were at Buxa, but he worked also at Alipur. In 1867 Dalimkot was transferred to Darjeeling.

On January 1, 1869 the District of Jalpaiguri was formed. By gazette notification of December 8, 1868 the Western Duars and Jalpaiguri sub-division of Rangpur were amalgamated. The Buxa Sub-division was abolished. The Deputy Commissioner removed his headquarters from Mainaguri to Jalpaiguri town and the district was divided into two sub-divisions—Sadar which included the former Jalpaiguri sub-division of Rangpur and that part of the Western Duars which lies between the Tista and the Jaldakha rivers ; and the Falakata sub-division which comprised the rest of the Buxa-division. The headquarters of the Falakata sub-division were removed from Buxa to Falakata. The regulation pargana of Patgram of Rangpur district was included on April 1, 1870 within the Falakata sub-division and in 1874-75 it was attached to Sadar sub-division. The headquarters of Falakata sub-division were again transferred to Alipur in 1876.

Since its formation, Jalpaiguri district has undergone enormous changes.

Materials for this article have been collected from the following books :—

1. Report on the Survey and Settlement of Jalpaiguri district (1906.16) by Milligan.
 2. Settlement Report of the Western Duars, Jalpaiguri District (1895) by D. H. E. Sunder.
 3. The Statistical Account of Bengal Vols VII and X by W. W. Hunter.
 4. Imperial Gazetteer (1905)
 5. Jalpaiguri District Gazetteer by John F. Gruning.
 6. A summary of the changes in the jurisdiction of districts in Bengal. 1757-1916 (1918) by Rai Mon Mohan Chakraborty Bahadur.
 7. The Cooch Behar State and its land revenue settlements by Harendra Narayan Choudhury.
 8. Aitchison.
 9. A Hand Book of Census, 1961 by A. Mitra.
-

WESTERN DUARS—PAST & PRESENT

SRI ASWINI KUMAR SEN

On the occasion of the Centenary celebration of the Jalpaiguri district, it will not be improper to probe into the past history of the Western Duars which now forms the major and the most important part of the district.

The Duars region is a strip of land about 20 miles in breadth, from north to south. It is about 180 miles in length from west to east. Beginning from the eastern bank of the Tista River, it extends east-ward along the entire southern boundary of Bhutan. It comprises the eastern part of Jalpaiguri district known as the Western Duars and it extends further east, covering the northern strips of Goalpara and Kamrup and a north western slice of Darrang district of Assam. This portion of the Duars is known as the "Eastern Duars" or "Assam Duar." The East and West-wise length of the Western Duars is about 80 miles. Its area is about sixteen hundred square miles or about ten lakh acres.

The region is called the Duars, because, at its northern boundary there are several passes or "doors" leading to the hill state of Bhutan.

A look at the relief map of India will show that this region is a very low plain with an altitude of about 200 feet above the sea level at the southern border. At the northern border, its altitude varies between 500 and 2000 feet. The Himalayan mountain ranges rise abruptly, several thousand feet high, just beyond its border, in Bhutan. The annual rainfall in this region varies from 150 inches to 300 inches. The climate was wet, the land was damp and for ages the region had been covered with dense forest, inhabited by dangerous wild beasts, reptiles and numerous insects and pests. In the past, the region had been notorious for the life taking virulent diseases like Malaria, Kala-azar, Black water fever and the like.

From the hoary past, the Indians had begun to establish their habitations along the northern bank of the "Lohit" or Brahmaputra river. They also pushed north-wards upto the foot hills of the Himalayas in the region west of the Tista river.

If there be any historical background for the great Indian epic the Mahabharata, then there must have existed Indian kingdoms along the northern bank of the Lohit river upto Pandughat and across that river at Pragjyotishpur (near Gauhati) and further east-ward upto Manipur, the land of Babrubahana.

Even if it is conceded that the great epic had been merely the product of the poet's imagination, then also it cannot be denied that when the great poet composed the epic, those places and kingdoms had existed and that the Indian influence and civilization at that time extended to these places.

In the past, human habitations must have been established in many places of the Duars from time to time. Naturally the damp and unhealthy climate of the place did not permit the long existence of those colonies. So they got extinct in course of time. Heavy rainfall, damp climate and frequent changes of the course of its turbulent rivers and the luxuriant growth of vegetation would naturally lead to the speedy decay of all signs of such old human habitations. Still there exist some ruins at various places in the jungles of the Duars to prove that once the region had been inhabited by the Indians.

There exist the ruins of an old fort in the dense forests at Chilapata on the east bank of the Torsa river a few miles south of the Indo-Bhutan border. It is popularly called "Nal Rajar Garh". The Britishers called it "the Mendabari ruins". Recent excavations at this place undertaken by the archaeological department have shown that these brick constructions belonged to the "Gupta Age". It was identified to be one of the frontier fortifications of the region then known as "Pundrabardhan Bhukti". (Vide. West Bengal weekly Independence issue 1958, page 26.)

There have also been discovered recently another very old ruins on the east bank of the Tista river in the Moynaguri region.

From the debatable past, let us come down to the subsequent ages, when from various recorded sources the history of the land may be fairly deduced. The materials from which the history of Assam and Coochbehar Raj State had been built up do also throw some light on the contemporaneous history of the Duars. The Chronicles of the Coochbehar Raj family show that Bishu, the grandson of the King Hajo, became the king of Kamrup in the year 1522 A.D. and he was the founder of the Coochbehar Raj family. His brother Sishu was the founder of the Raikat family of Baikunthapur, the Rajas of the Jalpaiguri. Sishu and his descendants held the Baikunthapur sub-kingdom originally as vassals under Coochbehar Raj. Baikunthapur sub-kingdom of the Raikats in these days included Moynaguri-Jalpesh areas of the Western Duars.

Western Duars (situated on the eastern bank of the Tista River). In earlier days, kingdom of the Raja of Coochbehar extended further north upto Dalinkot, on the east bank of the Tista river (now the Darjeeling district), and it is said that the Deb Raj of Bhutan also paid tribute to the Maharaja Prannarayan of Coochbehar. The construction of the famous temple of the Lord Siba at Jalpesh was begun during the reign of the said king in the sixteenth century and was completed during the reign of his son Maharaj Modnarayan. For the said construction, the services of Moghul architects had been requisitioned. In those days, the territory of Coochbehar Raj included half of Assam, and it extended beyond the Karatoya river in the west and upto the foot hills of the Himalayas, comprising the Western sector of the Western Duars. (Vide. Sunders' settlement report, page 30.) We know that prior to the creation of Jalpaiguri district in 1869, the region west of the Tista river appertained to Rangpur district. The original inhabitants of Rangpur, Coochbehar, Goalpara, Kamrup and Darrang districts had been predominantly the "Koches" subsequently known as the Rajbansis or Rajbansi-Kshatriyas.

The Rajas of Darrang and Coochbehar, the Raikats of Baikunthapur and many other smaller chiefs of this clan ruled over the entire region lying on the southern and western side of the Duars including the Western sector of the same. In the forests of the eastern sector lying between the Jaldhaka and Sonkos rivers, there existed stray colonies of the Meches (the Bodos), the Garos and the Ravas. These people had a fair knowledge of agriculture, the art of weaving, carpentry and many other crafts and they lived partly on agriculture and partly on hunting. They also collected forest products and sold them in the southern and Western localities. The Solitary Toto tribe of Totopara, off Madarihat, must have been there from very old times.

Subsequently, another class of people, the "Dobhasias" also settled in Salsalabari, Bhelukdabri, Dhalkar and Kayakhata region. These people had originally been Rajbansis. During the Bhutia inroads into the territories of the Raja of Coochbehar, on one occasion, a large number of Rajbansi men and women were taken away by the Bhutias as captives and they were detained in Bhutan for a number of years.

Later on, in another fight, the Koch king Najir Deo Sahib defeated the Bhutias. According to the treaty that followed, the Bhutias released these captive Rajbansis. But when they came back, they were considered as "Patit" (outcast) due to their long captivity in Bhutan and were not accepted by their kinsmen. So they were allowed to settle in the Duars. These people, during their long stay in Bhutan, had acquired knowledge in Bhutia language and were used as interpreters, in all communications between the Bhutias and the people of the plains. Hence they went by the name "Dobhasias" or interpreters. The Dobhasias are still found in the villages Kayakhata, Bhelukdabri, Dhalkar and some other places. They are similar to the Rajbansis almost in every way.

The population in the southern kingdoms had been very thin in those days and the protection of their extensive frontiers had been a great problem to the rulers. So the kings and chiefs of the southern regions were not keen on extending their territories further north into the unhealthy forest areas of the Duars. Yet the more enterprising persons of the southern localities were tempted by the fertile soil of the Duars to come and settle there. Initially, they had some advantages in so doing. The southern kings and chiefs did not demand any tax or revenue from those who would go to hazard their life and fortune in the unhealthy forest areas of the Duars. These settlers had to depend entirely on their own power and resources for their protection. The bandits and out-lawed anti-social elements also left the southern territories to settle there for safe shelter. Thus numerous colonies and vilages of the southern people sprang up in the forests of the Duars and the region was called "ভজুরের দেশ" or the land of independence.

Now let us look into the contemporaneous history of Bhutan on the north.

Gait in his History of Assam, has shown conclusively that four hundred years back Bhutan was invaded by her northern neighbours. The old inhabitants were defeated and massacred and the country was occupied by the victorious new-comers. According to him, the original inhabitants of Bhutan had been exterminated by the new-comers. And the present day Bhutias are the descendants of the new-comers. The theory

proposed by some that the 'Kiratas' of the Sub-Himalayan region described in the Mahabharata and other old books, might have been the ancestors of the present day Bhutias cannot be supported in the face of the above historical fact. The ancestors of the present day Bhutias came to Bhutan barely four centuries ago from further north. So their ancestors could have never been in the jungles of the Indian plains in the days of the "Puranas."

Again, the Kiratas are said to have been the worshippers of the god "Siba". The ancestors of the present day Bhutias had not been such. On the other hand, the Meches had been living in this region from time immemorial and they had been the worshippers of the god "Siba." This fact, together with the similarity of appearance, colour etc. of the Meches with the description of the Kiratas as found in the Puranas, does amply suggest that the ancestors of the Meches had been those "Kiratas."

The religion practised by these new conquerors of Bhutan was Buddhism akin to that practised in Tibet. Like the Dalai-Lama and the Panchen-Lama of Tibet, there had been the "Dharam Raj" and "Deb Raj" in Bhutan. Originally the Dharam Raj was the religious head. He was also the supreme authority of the nation while the Deb Raj was the secular head having the administrative control of the country and had been subordinate to the Dharam Raj. Both the dignitaries were chosen through some particular ceremonial form. Later on, the Deb Raj assumed all political powers and became all powerful in the affairs of the State. Ultimately this Office has been superseded by king-ship.

The inhabitants of Bhutan had been inured to the hardship naturally expected in a cool and hilly country. They could not conceive of the ease and comfort that was enjoyed by the people of the southern plains. For many necessities of life, like salt, iron, cotton cloths and consumers' goods, they had to come to the southern people. They would also bring their own commodities, like musk, skin, wool, and other hill products for sale or exchange. For this, there had been regular trade routes passing through the plains of Duars.

Through the mountain passes at the northern boundary of this region, lay the pony tracks entering into the hilly country of Bhutan. Properly speaking, these passes of Duars began from those frontier points and meandered through the hill north-wards. These trade routes had been in existence from very old times. The traders had friendly attitude towards the people of the plains.

But the behaviour of the ruling class and the military chiefs of Bhutan had been quite different. From the sixteenth century onward, they found it more easy and profitable to swoop down on the peace-loving villagers of the plains, and to plunder away their valuables. Sometimes, they carried away men and women and treated them as slaves. If those villages would lie within the territories of the king of Coochbehar or any other powerful chief, there would be resistance and fighting. But many poor inhabitants of the Duars had no powerful chief to protect them. So they had to resign to their fate and to the mercy of the marauders. Subsequently, when the inroads of the Bhutias became more frequent towards the end of the eighteenth century, these poor inhabitants had to purchase peace on payment of taxes demanded by the Bhutias. Later on, the Bhutias made arrangements for regular collection of these taxes as land-revenue and capitation taxes. We have seen that the Western

sector of the Western Duars extending upto Dalinkot, had once been within the kingdom of the Raja of Coochbehar. We have also seen that the Raikats had originally been subordinate to the Raja of Coochbehar. With the decline of his power, the king of Coochbehar lost his control over the northern region. The Raja of Baikunthapur who was also holding Jalpesh and Moynaguri region, became independent. He even adversely interfered with the affairs of the Coochbehar Raj State.

At the time of the Moghul invasion of Coochbehar kingdom in the first decade of the eighteenth century (1710-11) the Raja of Baikunthapur tried to grab a portion of the territory of the king of Coochbehar by joining with the Moghuls. But his tricks ultimately misfired. The Moghuls had to make a treaty with the king of Coochbehar, the details of which do not matter here. But it is worth noticing that on that occasion, the Raja of Baikunthapur had to take in a large number of Mahomedans as his subjects, for whom he arranged for settlement in his territories and a large number of them was sent beyond Moynaguri areas of the Duars. But the majority of the settlers there had been the Rajbansis and the reclamation of jungles from the western sector proceeded east-ward in a systematic way. In this way, the region between the Tista and the Jaldhaka rivers became thinly colonised with patches of forest and waste land remaining in between these colonies. The colonisation proceeded even further east-ward upto the western bank of the Torsa river, the population being more and more thin east-wards.

But in the eastern sector, there had been only sporadic colonisation here and there, the settlers being mostly Rajbansis coming from the Coochbehar State. There had been sprinkling of "Kayasthas" and Mahomedans amongst these settlers. In Bholardabri, Cheche-khata, Bhatibari and Chakoakheti areas, such colonies had been established long ago. The ruins of a brick structure are found at Majidkhana, near Bhatibari. It is now known as the ruins of a mosque. But on a closer observation it appears to have been originally a temple of the Hindus. There existed old "Bel" trees near the ruins even upto 1930. There was also a local folksong known to the old people of the locality

“চাঁদ কায়ত ভেলা কায়ত হুজুরেতে থানা
বেটা নাই পুত্র নাই কান্দে মজিদ থানা”

Which means that the two Kayastha gentlemen "Chand" and "Bhela" had settled in the land of Independence. And as they had no issue they built the said Temple.

Mr. Sanders, in his settlement report (page 61) described Chand Kait and Bhela Kait as two Muslims having played the role of mediator between the Bhutias and the king Nazir Deo of Coochbehar but the names "Chand" and "Bhela" are Hindu names. Moreover, the Title "kait" affixed thereto would suggest that these two gentlemen must have been Hindu Kayasthas.

The place Alipurduar was named after colonel Hedyet Ali who was a political officer connected with the Indo—Bhutan war of 1865. Even before that, there existed Hindu or Rajbanshi Colonies in these localities. In the year 1950, in course of the jungle clearing for

the present Surja Nagar colony, adjacent to Alipurduar New town, some the debris of an old brick structure was found. The bricks found there were of the Moghul era some 300 years old. It was gathered from the local old people that there existed a small old broken Hindu temple at that place. It was further gathered that the subsequent Mahomedan inhabitants of the locality had removed, for their own use, the major portion of the bricks of that unclaimed ruins and only the debris stuck in the roots of the banian tree grown on the ruins had been left. The ruins were not worth preserving and were therefore cleared off.

The inhabitants of these old colonies had been mostly Rajbansis. They were the kinsmen of the king of Coochbehar and the Rajbanshis of the villages of Coochbehar kingdom were the kinsmen and relatives of these settlers. So they would be naturally sympathetic to the king and people of Cooch Behar.

The king of Coochbehar also found it advantageous to secure forward information of the Bhutia aggressors coming from the north, from these friendly colonies and to oppose the enemies in the jungles of the Duars before they could enter into his own territory.

Thus, many battles between the Bhutias and the army of the king of Coochbehar were fought in the jungles of the Western Duars. One battle was fought between the heroic king Na zir Deo Saheb of Coochbehar and the formidable Bhutia General "Sonapinda", in which battle, the Bhutia general was slain and his army routed. A raised embankment called "Bhotemali" still exists at Barachowki near Bhatibari. This was erected to commemorate the said victory.

Another such battle was fought at the place now under Bholardabri Mouza and there was erected another such raised pathway which, too, is known as "Dhote-Mali". It is situated at a small distance from Alipurduar Court boundary.

In the western sector, the Rajas of Baikunthapur fought many pitched battles with the Bhutias at different times, and the villages established under the patronage of the Raja of Baikunthapur in the region, north of Moynaguri—Jalpesh area changed hands many times in course of such engagements. But Moynaguri—Jalpesh area could not be occupied by the Bhutias by any such battle.

In spite of many local victories, the kings of Coochbehar and Baikunthapur could not stop the aggressors because it was impossible for them to reach the mountain abode of the enemies in Bhutan and to fight them to a finish. All along, they had to fight defensive battles in which, even if the enemies got defeated on one occasion, they would come back next time further reinforced.

In 1765, the British East India Company secured the Dewani of Bengal, Bihar and Orissa and they virtually became lord of this country. The company was very eager to extend its rule all over India.

Owing to internal dissensions, the kingdom of Coochbehar had become very much weak by that time and the Bhutias became supreme there. They would not allow the king to do anything without their permission. To drive away the Bhutias, the king of Coochbehar made a treaty with the company in 1773 whereby Coochbehar became a feudatory State of the

Company and the British forces drove away the Bhutias from Coochbehar. In 1774 a non-aggression pact was entered into between the Company and the Bhutias whereby the Bhutias also agreed not to molest the territories of the Raja of Baikunthapur who, by that time, had become a rent-paying Zamindar under the East India Company.

At that time, the Britishers were contemplating to reach Tibet through Bhutan. So they were trying to oblige the Bhutias in every way. Understanding this, the Debraj of Bhutan claimed Ambari-Falakata area on the West bank and Jalpesh-Moynaguri area on the east bank of the Tista river and asked the company to procure these places for them from the possession of the Raja of Baikunthapur. Without examining the propriety of the claim of the Bhutias, the Company readily agreed and directed the Raja, in 1779, to make over the possession of these places to the Bhutias. The Raja of Baikunthapur made repeated protests and delayed the making over of the regions on various excuses upto 1790 when he was compelled by the company to hand over the places to the Bhutias. About this unjustified act of the Company Mr. Perling wrote as follows :—

"I was at Rungpur both before and since Coochbehar district was brought under the company's protection and I never till now, heard of any claim of the Bhutias upon Jalpesh and Falacotta. Jalpesh is a pagoda of the Hindoo worship with which the Bhutias can have nothing to do." (Page 6 of Mr. Milligan's Settlement report).

From that time onward, upto 1864 the Rajas of Baikunthapur and Coochbehar were debarred by the Britishers from dealing with the Bhutias directly and the latter had free hand in the Western Duars. Upto 1826, the Britishers did not bother about the patent fact that this region originally and naturally belonged to India and that the inhabitants of this region had been Indians and they had no affinity with the Bhutias. In fact the claim of the Britishers to rule in this country was as bad as that of the Bhutias in the Duars.

During these long years, the helpless inhabitants of the Duars region had to undergo endless sufferings under the Bhutia Control. The Bhutias never cared to understand the sufferings and difficulties of the inhabitants. They did not mean to establish any kind of good Government in the region. They were interested only in the Collection of taxes in their own way. Where there had been any previous revenue settlement, as in the regions formerly owned by the Zamindar of Baikunthapur, they would collect taxes at that old rate. But where there was no such revenue settlement, as in the eastern zone, the Bhutias would impose taxes on the inhabitants by counting the number of ploughs (hal), looms and houses of worship (Puja Ghars) possessed by the people. (The rate of Taxes being Rs. 1/14 for each plough, Re. 1/- for each loom and Rs. 2/- for each Pujaghar and the like, one hal constituting 15 Bighas or 5 acres of land and the measurement of land in terms of "Hal" is still prevalent in the villages of this region.

During their control of the Duars for so many years, the Bhutias did not stay in the plains during the rainy season. They would generally come down from their mountain abodes, at the beginning of the dry season, collect their taxes and do their commercial business in the winter and would invariably retire to their northern native places before the rainy season

would set in. They very much disliked these places because of the damp climate, low altitude, hot spell during the summer and devastating floods during the rainy season. They were also afraid of the many virulent mortal diseases that prevailed in this region. They occupied only some frontier out-posts in the north. But they never liked to settle or to establish any permanent abode here. For the collection of taxes they generally employed local people as their agents who would also oppress the poor inhabitants and during the long absence of the Bhutias in the wet-season, these agents gave a free rein to their nefarious activities.

The exact amount of annual taxes and rents collected by the Bhutias at the time of their retirement is not known. But the Britishers, who collected revenue mostly at an enhanced rate, after the Bhutia withdrawal, and before the arrangement of the temporary settlement of 1871 realised an annual revenue to the tune of Rs. 39,525/- in the year 1870. This total included also the revenue of uncultivated settled areas. It is estimated that only about fifty thousand acres out of the total ten lakh acres of the land of the Western Duars or only five percent of the total area had been reclaimed by 1865, the time of Bhutia withdrawal.

There was no arrangement for the protection of the subjects during the long absence of the Bhutias from these places. The poor inhabitants were left at the mercy of the dacoits and other anti-social elements who would be out during this time. In the neighbouring Cooch-behar State and Rangpur district, all sorts of improvement were being effected for the good of the people but in the Duars there was none. The people of the Duars got none of the amenities that were available beyond the southern and western border. On the other hand, the border areas had become the dens of dacoits who would commit crimes not only in the Duars region but also in Coochbehar and Rangpur districts. Thus in 1789 the collector of Rangpur had to send a detachment of "Barkandazes" for overpowering these dacoits and about 549 dacoits were apprehended and brought to trial in the said year.

Subsequently in 1826, when the Britishers occupied Assam they discovered their mistake. It was found that the Bhutias had usurped several tracts of low land lying at the foot of the mountains in the Eastern Duars. At first, the payment of a small tribute was arranged. But actually they did not pay it ; on the other hand, taking advantage of the mountain passes, the Bhutias would come down within the British territory and carry on depredations. They plundered the inhabitants, massacred them and carried many of them away as captive slaves. Similar occurrences were also taking place in Rangpur district, beyond the Western Duars. In spite of repeated protests and requests, the Bhutan Government would not stop these. The deputation of Captain Pemberton did not yield any result. Every year, several raids involving plunder, massacre and kidnapping of the inhabitants of the plains by the Bhutias, mostly led by the Bhutanese Officials, took place.

In 1863 Mr. Ashly Eden, sent as an envoy to Bhutan, was grossly insulted in the Bhutan Durbar. At the dinner table where he was invited, all on a sudden, barley paste was thrown at his face by Tongsa-Penlo and he was compelled to sign two documents purporting to make over entire Assam and also Bengal-Duars to the Bhutias by the Britishers and to do certain things

according to the orders of the Bhutan Government. It is said that Mr. Eden had signed the said document with an endorsement that he was being compelled to sign it under duress. (vide. the Land of the Thunder-bolt by Lord Ronaldshay).

About 300 Indians and several Britishers had been detained as captives in Bhutan at that time. All requests for their release went unheeded. Thus the previous time-serving treaty, made by the Britishers with the Bhutias, was put to an end. The Britishers now admitted that the Duars region was populated by a race closely allied to the people of Bengal and having no affinity with the Bhutias, and that they had been subjected to the tyranny of the Bhutias. They also asserted that the said region had been an integral part of Bengal and Assam and the Bhutias had no right to occupy it. On the 12th November 1864, the Britishers asserted that for the above reasons the Duars region would be annexed with Bengal and Assam and the people of the Duars were directed to pay taxes and show allegiance to the British Government of India. An expedition, sent in four columns, occupied the several frontier outposts at Dewangiri, Sidli, Pasakhe and Dalinkot. (Sunder's settlement report, page 19).

We need not go into the details of the hostilities. Suffice it to say, that the Bhutan Government at last came to terms with, and conceded to the demands of, the Britishers. On 11. 11. 1865, a treaty of peace and friendship was concluded between the Britishers and Bhutan, according to which the Indo-Bhutan Boundary was permanently settled along the mutually accepted line and the Bhutanese gave up all claims to the Duars region. It was a treaty of friendship and fair dealings for the future. An annual subsidy of Rs. 5000 was granted which was to depend entirely on the will and pleasure of the British Government and on the good conduct of the Bhutias. Shortly after this, the Indo-Bhutan boundary was permanently marked by a joint survey and by fixing permanent boundary pillars along the entire Indo-Bhutan border.

It is a happy thing that no further troubles, worth noticing, ever cropped up between the two countries and since that time, very cordial relations have been existing between India and Bhutan.

After Independence, when a fresh treaty was concluded between free India and Bhutan, the latter claimed the small border area of Dewangiri in the Assam Bhutan border. After friendly discussions, this claim of Bhutan was conceded to. By the existing treaty, India has responsibility in the defence of Bhutan against foreign aggression and India has been paying her best attention to the all-round development of Bhutan.

During the last 100 years that elapsed after the Bhutanese withdrawal from the Duars, outstanding changes and developments have taken place in the Western Duars. Its soil and climate, specially in the northern belt, were found to be ideally suited to tea cultivation. Along the said belt covering over one fourth of the total area, numerous tea gardens have sprung up.

Soon after the Bhutanese withdrawal, agriculturists from the south and western districts began to pour into the Duars. New settlements and reclamation of the waste lands speedily proceeded.

The rich forests of the Western Duars which cover about another quarter of the total area yield high quality timber and other valuable forest products. These reserve forests are being worked out and developed according to plan. Coal, lime and other mineral wealth are also being tapped in its northern zone. The remaining area has been converted into rich agricultural fields. Villages, towns and commercial centres, grew up rapidly all over the region. With the growth of tea industry and timber business, workers and traders from all parts of India came and settled here. The population figure began to shoot up rapidly.

No census figure was available of the Western Duars at the time of the Bhutanese withdrawal in 1865. But it is estimated that the figure was then about fifty thousands. This figure rose up, in 1871, to about one lakh. By 1892 it rose up, roughly to three lakhs. Since then, there has been a steady and rapid growth of population in this region.

After the partition of Bengal in 1947, a huge number of East Bengal Hindu refugees came and settled here. The present population figure of the Western Duars would be to the tune of twelve lakhs, if not more.

The sanitary condition of the region has greatly improved. Railways have been established. A network of roads have been constructed and bridges have been built over numerous turbulent rivers, connecting all parts of the region with the main towns. Hospitals have been opened, Postal and Tele-communication established and schools and colleges have been set up. Towns, and important commercial centres and almost all tea gardens have been electrified and have been given telephonic connection. The Jaldhaka Hydro-Electricity project is the biggest source of electric energy for the North Bengal region. The Western Duars is also the connecting link of Assam Region with the rest of the Indian Republic. There are infinite possibilities of further development and the utilisation of the rich forest and mineral resources and the water power of the Duars region.

Administrative and Jurisdictional changes in the District of Jalpaiguri since its formation

BY SRI DIPAK KUMAR ROY

A brief History of the formation of the District :—

The Duars was annexed with the British territory by the treaty of Senchula dated the 11th November, 1865, entered into between the Government of India and the Government of Bhutan. For administrative convenience, this territory was divided into two parts—Eastern Duars and Western Duars, the demarcating line between the two being the river Sankosh. The Western Duars was divided into three Tehshils, namely :—the Sadar, comprising the tract of land between the rivers Teesta and Torsa with headquarters at Maynaguri ; the Buxa Tehshil stretching from the Torsa to the Sankosh rivers with headquarters at Alipur and the Dalingkot Tehshil comprising the mountainous portions of the acquired territory. For the administration of this acquired territory one Assistant Commissioner was appointed with headquarters at Maynaguri, the Assistant Commissioner being under the administrative control of Deputy Commissioner, Cooch-Bihar. In the year 1866 the Western Duars was formed into a District and placed under the charge of a Deputy Commissioner.

In January 1867 the Dalingkot Tehshil was transferred to the Darjeeling District and at the same time the Criminal jurisdiction of the three police-stations of Rangpur district, namely, Boda, Sannyasikata (now Rajgunj) and Fakiragunj (now Jalpaiguri) was transferred to the Deputy Commissioner, Western Duars, the Civil and revenue jurisdiction remaining with Rangpur District.

In view of the strategic importance of the territories in this part of the country the need for some close co-operation between the separate administrative units situated there was felt. By the notification dated the 3rd December, 1866 a new division called Cooch-Bihar Division was formed with Western Duars, Darjeeling, Goalpara, Garrow Hills, the territory transferred from Rangpur (so far as its Criminal jurisdiction was concerned) and the native state of Cooch-Bihar.

At this stage it is worthwhile to consider a controversy which had arisen amongst the authorities regarding the name of the Sub-Division, comprising the three Police-stations, which was transferred from Rangpur. According to some it was the Titalya Sub-Division with headquarters at Titalya situated by the side of the Mahanadi river on the border of the Purnea

district. According to others the Sub-Division (formed in the year 1854 with headquarters at Sookanee) was called the Sookanee Sub-division. Subsequently, when a Military Cantonment was established at Jalpaiguri, the headquarters were shifted there and the name of the Sub-division was changed to Jalpaiguri. The Gazette announcement of the 8th December, 1869 notifying the formation of the new district of Jalpaiguri, mentions the Sub-Division as Jalpaiguri Sub-division and we may take the latter version as the correct one.

Buxa was converted into a regular Sub-division of Western Duars district in 1867-68. This administrative arrangement, i.e. Western Duars District exercising Criminal jurisdiction over the Jalpaiguri Sub-Division of Rangpur district, continued upto 31st December, 1868. On the 1st January, 1869 the new district of Jalpaiguri was born by the amalgamation of the Western Duars district and the Jalpaiguri Sub-division (the Civil jurisdiction remaining with Rangpur) of Rangpur. The headquarters of the district were shifted from Mynaguri to Jalpaiguri town and the district was divided into two Sub-divisions, namely :

- 1) the Sadar, comprising the former Jalpaiguri Sub-division and that part of Western Duars which lies between the rivers Teesta and Jaldhaka and
- 2) the Falakata Sub-division including the rest of the former Buxa Sub-division, the headquarters of the Sub-division being shifted from Buxa to Falakata.

A Non-Regulated District :—

A few years after the formation of the district of Jalpaiguri, the Western Duars part of it was included in the list of scheduled districts under the scheduled districts Act (Act XIX of 1874). Under this Act the head of the district administration was called the Deputy Commissioner. After this Act was passed some of the laws applicable in regulated territories came to be applied to the non-regulated territory of Western Duars. The Government of India Act 1919, declared the Duars of the Jalpaiguri district as a backward tract and the Governor General was vested with the powers of issuing notifications directing that an Act of the Indian Legislature shall not be applicable to the non-regulated territory except with such modifications as he may direct. The Governor-General was also empowered to authorise the Governor of a province to issue similar notifications in respect of Act of the local legislature. The position slightly changed after the passing of the Government of India Act 1935. The distinction between the regulated and non-regulated districts, was completely abolished with the coming into force of the Constitution of India on the 26th January, 1950 and the laws which are now applicable to other parts of the state are also applicable to the district of Jalpaiguri.

Change in the divisions in which the district was included :—

The notification forming the new District of Jalpaiguri placed the District under the commissioner of the division of Cooch-Bihar, he being the controlling authority in both Civil and Criminal matters. At different periods the district was included in different divisions according to administrative convenience. The table below shows the successive changes in this regard.

Year	Name of the division in which the District was included.	Headquarters	Remarks
1869	Cooch-Bihar Division	—	Notification dated the 8th December, 1868
1875	Raj-Shahi, Cooch-Bihar Division.	Jalpaiguri.	The change took place from the 10th Sept., 1875 when the two Commissionerships of Rajshahi and Cooch-Bihar were placed under the charge of a single Commissioner. Notification dated the 21st August, 1875. Mr. F. R. Cockerell became the first Commissioner.
1883	Raj-shahi Division.	Jalpaiguri. In 1885 the Hq. was temporarily shifted to Rampur - Boalia in Rajshahi, as the offices at Jalpaiguri were burnt. It was taken again to Jalpaiguri in 1888.	In Oct., 1883 the Maharaja of Cooch-Bihar attained majority and took charge of his State from the Govt. on the 8th November, 1883. Consequently Cooch-Bihar-Rajshahi division was abolished.
1947	Presidency Division.	Calcutta. There was a second Hq. at Jalpaiguri for northern districts.	This change took place as a result of the partition of India. The new division was formed with retrospective effect from the 17th August, 1947 by notification no. 9487 Jur dated the 27th Sept., 1947
1963	Jalpaiguri Division	Jalpaiguri	Notification No. 998-GA. dated the 4th March, 1963.

Changes in the external boundary of the district :—Even after the formation of the district several additions and alterations took place in the external boundary of the District. By the notification of 1st September, 1883 the boundary of the Zilla was for the first time clearly defined. No major change took place from the period till the partition of India, when a large tract of land was transferred to East Pakistan. The changes in the external boundary of the district are illustrated in the following table :—

Year	Name of the place.		Area	Authority for the change.	Remarks if any
	Added to the district.	Transferred from the dist.			
1870	Patgram P. S. from Rangpur district transferred to Falakata Sub-division.	—	—	Notification dated the 29th March, 1870.	The change took place with effect from 1st April, 1870.
1880	—	Deosthan (A small tract of hilly country east of Buxa.)	11 Sq. miles.	Agreement letter of 9th Dec., 1880	The place was held sacred by Bhutias. The land was handed over to Bhutan by an agreement between the two Governments.
1881	—	A portion of Siliguri town and some adjoining lands transferred to Darjeeling Dist.	—	Notification dated the 29th November, 1881	
1888	The tract of country known as 'Jainti'	—	21.43 Sq Miles	Purchase letter Dt. the 1st. Oct., 1888.	The land was purchased from Bhutan.
1896	—	Taluk Chotaguma in Pargana Bhalka transferred to the dist. of Goalpara in Assam.	—	Notification No. 1484 J Dt. the 10th March 1896.	
1911	—	Civil, Criminal and police Jurisdiction of some portion of Taluk Kharibari (Pargana Patgram) transferred from Patgram P. S. of Jalpaiguri to the P. S. of Dimla in the dist. of Rangpur.	870 acres.	Proclamation no. 497 PI Dated the 24th Feb. 1911	

Year	Name of the place.		Area	Authority for the change.	Remarks, if any.
	Added to the district.	Transferred from the dist.			
1947	—	The whole area covering the police stations of Boda, Pachagarh, Debigunj, Tetulia and Patgram transferred to East Bengal (new east Pakistan.)	672 Sq. miles	New dist. was formed with effect from 17th. August, vide Notification No. 9483 Jur Dt. the 27th Sept., 1947.	The transfer of territory took place under Radcliffe award on the eve of partition of India.

Besides the changes mentioned above, some main border problems arose between the Governments of Bhutan and Cooch-Bihar and they were amicably settled by minor adjustment of the boundaries.

Changes in internal jurisdictions

The district of Jalpaiguri, when formed, comprised two sub-divisions—Sadar and Falakata, the demarcating line between the two being the Jaldhaka river. The name of Falakata sub-division as also the boundary line between the two sub-divisions were changed many times during the subsequent periods. The various changes that took place in the internal jurisdictions may be best illustrated with the help of the following table :—

Year.	Nature of the change.	Remarks.
1870	Area comprising Patgram P. S. was included in the Falakata Sub-division of the district.	Change took place with effect from 1st April, 1870. Notification dated the 29th March, 1870.
1874	Sub-divisional Hq. removed from Falakata to Buxa and the name of the Sub-division changed to Buxa. (Bhalka) Patgram Police station transferred to Sadar Sub-division.	Notification dated 18th April, 1874.
1876	Sub-divisional Hq. removed from Buxa to Alipur.	The name of the Sub-division was changed to Alipur Sub-division.
1888	Nagrakata Out-Post transferred from Alipur Sub-division to Sadar Sub-division, the revenue jurisdiction remaining within Alipur Sub-division.	Notification dated the 25th July, 1888.

Year	Name of the change	Remarks.
1895	Portion of Thana Salbari lying West of the rivers Dudua and Rehti was transferred to sadarSub-division. The Dudua and Rehti rivers were declared to be the boundary between the two sub divisions.	Notification No. 4849 J dated the 2nd Sept. 1895.
1896	Dudua, Kalua and Rehti rivers were declared to be the boundary between two sub-divisions.	Notification No 4275 J dated the 27th July, 1896.
1935	Sadar Sub-division was declared to include the local areas of the police-stations of Boda, Pachagarh, Debigunj, Rajgunj, Tetulia, Patgram, Mynaguri, Nagrakata, Dhupguri, Mal and Matelli.	Notification No. 1374 Jur dated the 22nd January, 1935.

Changes in the General Administration :—

Prior to the annexation of Duars, there was practically no well co-ordinated administrative set-up in this part of the country. Hence, after the formation of the district the main task of the authorities was to lay the foundation of administration keeping in view the general backwardness of the people in this part of the territory. By the notification dated the 8th December, 1868 the following Officers were appointed for the day to day administration of the new district of Jalpaiguri.

Name of the Officer.	Substantive appointment.	Powers.
W. O. A. Beckett.	Deputy Commissioner	Overall in charge of the District.
W. M. Clay.	Assistant Commissioner in charge of Falacotta Sub-division.	A Magistrate, Dy. Collector and Moonsiff in the Jalpaiguri District.
F. J. R. Walker	Dy. Magistrate and Dy. Collector posted at Sadar Station.	To exercise the power of Magistrate in the district.
F. Grant	Extra Assistant Commissioner at Julpaigoree.	A Magistrate, Dy. Collector and Moonsiff in the district.

Thus the administration of the district started with this miniature set-up. As time passed, expansion of the set-up took place in different directions to cope with the complexities of problems that cropped up at different periods.

We shall now make a brief study of the changes under the following heads :—

- (a) Administration of Civil Justice.
- (b) Administration of Criminal Justice.
- (c) Police Administration.
- (d) Land Tenure and Land Revenue Administration.
- (e) Miscellaneous.

(a) Administration of Civil justice :—

In the year 1869 Bhutan Duars Act (Act XVI of 1869) was passed. This Act excluded the ordinary Civil Courts from the cognizance of suits relating to land in Bhutan Duars. The Old Rent Law (Act X of 1859) was in force in the Regulation portion of the District. Under this Act Deputy Collectors possessed jurisdiction to try rent suits of all types and under the provisions of the Bhutan Duars Act all suits relating to immovable property, revenue and rent, were tried by the Deputy Collectors specially empowered by the Government.

In the year 1891 a memorandum was submitted to the Lt. Governor of Bengal on behalf of the citizens of Jalpaiguri. It was urged in that memorandum that the trials of the suits relating to the immovable property, revenue and rent in the Duars be brought within the jurisdiction of the ordinary Civil Courts of the district. It was also contended that Bhutan Duars Act be repealed and the powers to try rent cases in the regulation portion of the district be vested in the Civil Courts, either by the introduction of Act VIII of 1869 or by posting in the district a Munsiff vested with the powers of a Deputy Collector under Act X of 1859.

In the year 1882, Code of Civil Procedure was extended to Jalpaiguri district, but it did not come into force in the Western Duars portion of the district. The Bhutan Duars Act was repealed by Act VII of 1895. After this the Code of Civil procedure came to be in operation throughout the entire district.

Till to-day there has never been a District Judge exclusively for the district. The district was included under the Civil jurisdiction of different districts for administrative convenience. For the sake of brevity and convenience the changes are illustrated with the help of the following table :—

Year.	Nature in the change of the administration of Civil Justice.	Authority for the Change.	Remarks, if any.
1869	Commissioner of Coochbehar was authorised to exercise within the district the powers of a Civil Judge. He was also authorised to exercise the judicial, appellate and the controlling authority in the Civil department according to the laws in force. The only exception was that the Civil judge of Rangpur continued to hear appeals from the Moonsiff of Kissengunje.	Notification dated the 8th December, 1868.	The Commissioner, retained the powers when Coochbehar Rajshahi Division was formed.

Year.	Name in the change of the administration of Civil Justice.	Authority for the Change.	Remarks, if any.
1870	Thanas of Sunnasikata and Fukeer-gunj were detached from the jurisdiction of Moonsiff of Kissengunj (Boda), and placed under the jurisdiction of the Moonsiff of Jalpaiguri whose jurisdiction comprised the above Thanas and the entire Country acquired from the Bhutias and lying between the rivers Teesta and Juldhaka.	Notification dated the 29th March, 1870.	This arrangement took effect from 1st April, 1870. Subsequently, two Munsiffs were appointed at Sadar. One post was again abolished and now there is only one Munsiff at Sadar.
1870	Appeals from all the orders passed by the Moonsiff of Kissengunj on or after 1st April, 1870 lay to the Commissioner of Coochbehar.	Notification dated the 12th May, 1870.	
1872	Dy. Commissioner was vested with the powers of a Subordinate judge within the district.	Notification dated the 2nd August, 1872.	
1875	A joint sessions judge was appointed for Jalpaiguri and Darjeeling to help the Commissioner in the discharge of his judicial functions. He was invested, under the provisions of Act VI of 1871, with the powers of a district judge within those two districts.	Notification dated the 21st August 1875	Mr. R. F. Rampini was the first joint sessions judge.
1879	The district of Jalpaiguri was included within the jurisdiction of district judge and of the subordinate judge of Rungpure. Powers of a sub-ordinate judge exercised by the Deputy Commissioner was withdrawn. Commissioner of Rajsahi-Coochbehar Division ceased to exercise jurisdiction as Civil Judge in the district.	Notification dated the 1st February 1879.	The Statement made by Rai Monomohan Chakravarty Bahadur in his book, "Jurisdiction changes in Bengal" that the jurisdiction was transferred to the judge of Dinajpur is not correct.

Year.	Nature in the change of the administration of Civil justice	Authority for the change.	Remarks, if any.
1881	Dy. Commissioner, Jalpaiguri was again invested with the powers of a Sub-judge within the district, Jurisdiction of the Sub-judge of Rangpur ceased.	Notification dated the 24th March 1881.	Took effect from 1st April, 1881.
1890	Dy. Commissioner was divested of the powers of a Subordinate judge. The sub-judge of Dinajpur, having been appointed to be also additional Sub-judge of Rangpur, was authorised to hold his periodical sittings at Jalpaiguri for the disposal of the work of the Sub-judge's Court of that station.	Notification dated the 17th December, 1889.	Took effect from 1st January 1890.
1896	Sub-divisional Officer Alipur was vested with the powers of a Munsiff within the Sub-division.	Notification No. 1955A dated the 17th Mar. 1896.	
1906	The district was included within the local limits of the jurisdiction of the Court of the district judge of Dinajpur.	Notification No. 3919 J dated the 11th April 1906 (Eastern Bengal and Assam Gazette.)	Took effect from 1st June 1906. The District Judge was authorised to hold the sittings either at Jalpaiguri or at Dinajpur.
1947	One District Judge appointed for the Circle West Dinajpur - Maldah-Jalpaiguri-Darjeeling with Hq. at Jalpaiguri.	Notification No. 5961 J dated the 17th Oct. 1947.	This arrangement was deemed to have taken effect from 17th August 1947.
1947	One Subordinate Judge appointed for Jalpaiguri and West Dinajpur.	Notification No. 5963 J dated the 17th October 1947.	Authorised to hold sittings either at Jalpaiguri or at Balurghat.

Year.	Nature in the change of the administration of Civil justice	Authority for the change.	Remarks, if any.
1956	One Judge appointed for Jalpaiguri-Darjeeling.	Notification No. 2222 J dated 28. 3. 56.	
1956	One exclusive Sub-Judge for Jalpaiguri appointed.	Notification No. 2223 J dated 28. 3. 56.	
1960	Additional District Judge appointed for Jalpaiguri.	Notification No. 9523 J dated the 15th December, 1960.	
1960	One Munsiff appointed for Alipurduar Sub-division.	Notification No. 4148A dated the 10th June 1960.	Power of the S.D.O. who was previously Munsiff (ex-Officio), was withdrawn.

(b) Administration of Criminal Justice :

By the Regulation of 1829 a new set of higher Officers, called the Commissioner of Revenue and Circuit, was constituted throughout the Presidency of Bengal. They were entrusted with the task of trying sessions cases which were previously done by the Courts of Circuit. When the district of Jalpaiguri was placed under the Commissioner of Cooch-Bihar, the Commissioner was vested with the powers of a sessions judge. He was also authorised to exercise the judicial, appellate and controlling authority in criminal departments, according to the laws in force. The following table shows chronologically the changes in the jurisdiction of the sessions division as also the creation of different posts within it :

Year	Nature of the changes.	Authority for the Change.	Remarks, if any.
1869	Commissioner of Cooch-Bihar was authorised to try sessions cases.	Notification dated the 8th December, 1868.	
1870	Buxa, Titalya, Boda and Patgram (when transferred) were declared places of sessions trial.	Notification dated the 27th January 1870	
1875	A Joint Sessions Judge appointed to help the Commissioner in the discharge of his judicial functions.	Notification dated the 21st August 1875	

Year	Nature of the changes.	Authority for the change.	Remarks , if any
1879	The district of Jalpaiguri was included within the jurisdiction of sessions judge of Rangpur. Commissioner ceased to exercise jurisdiction as sessions judge.	Notification dated the 1st February 1879	Jalpaiguri was declared to be the place for the trial of session cases arising in the district. Post of Joint sessions judge was abolished after a few months.
1906	Jalpaiguri district was included within the limits of Dinajpur Sessions Division.	Notification No. 3921 J dt. the 11th April, 1906	Took effect from 1st June 1906. Sitings were held either at Jalpaiguri or Dinajpur at the discretion of Sessions Judge.
1947	Jalpaiguri, West Dinajpur, Maldah and Darjeeling included within a single Sessions division.	Notification No. 55GA, 60-GA, 62-GA, & 64-GA, dated 17. 8. 47	Jalpaiguri declared to be the Hq. of the Division.
1956	Jalpaiguri and Darjeeling included within a single sessions Division.	Notification No. 2222 J dated 28. 3. 56	
1960	One Additional Sessions judge appointed at Jalpaiguri.	Notification No. 9523 J dated 15. 12. 60.	

Though serious offences were tried by the Sessions Court, ordinary Criminal cases were tried by Magistrates. By the notification of 8th December, 1868 some Magistrates were appointed for the trial of Criminal cases. This number did never remain stationary. It fluctuated at different periods according to the needs. After the enactment of Criminal Procedure Code in 1898, the Dy. Commissioner was vested with the powers under section 34 of the Code i.e. he was empowered to pass sentences of transportation or imprisonment for a term not exceeding seven years.

The set-up in the year 1911 is as follows :—Criminal trial was held by some Deputy Magistrates stationed at Jalpaiguri and S. D. O., Alipurduar ; in addition to this the Sub-Deputy Collector and Tahshildar at Alipurduar had powers of a second class Magistrate and the Tahshildars of Mynaguri and Falakata had powers of Magistrates of third class. Besides these, there was a bench of Honorary Magistrates at Jalpaiguri and another at Boda vested with third class powers ; the Manager of Chaklajat Estates sat singly for trying cases at Debigunj and had first class powers.

At present the Deputy Commissioner has no power under section 34 cr.p.c. The institution of Honorary Magistrates is being abolished throughout the country and at present there is no Honorary Magistrate in the district and also there is no bench of Magistrates. The Tahshildars (since replaced by J. L. R. Os) have also been divested of their powers, and the Magistrates are now stationed only at Sadar and Alipurduar for the trial of criminal cases.

The demand for the separation of the judiciary from the executive is a long standing one. It is also one of the Directive principles incorporated in the constitution of India. In accordance with this, West Bengal separation of Judicial and Executive functions Act 1968 (President's Act 8 of 1968) has been enacted. Under the provisions of this Act, criminal trials will be done by Judicial Magistrates under the Sessions Judge. The Act has not yet been extended to the district of Jalpaiguri and at present criminal trials are dealt with by Magistrates (who are members of the Executive service) under the Deputy Commissioner.

(c) Police Administration :—

Even as early as 1865, in regard to police the Eastern and Western Duars and the Districts of Rangpur, Darjeeling and Goalpara were included into one Circle of Superintendence and placed under Capt. W. R. Gordon, Deputy Inspector General of Police, Bhutan Duars. The Unit of Police administration is a Police Station. When formed, the district comprised the Western Duars and the three Police-stations of Sannayasikata, Fukeergunj and Boda. During the last one hundred years various changes took place in the Police administration of the district, the most important of which is the creation and abolition of different Police-stations and outposts. The following table gives a brief history of the creation, abolition and boundary changes of the Police-stations and outposts which are now included in the district or at some time formed a part of the district.

Sub-division	Name of the police-station	A brief history of the formation.	Boundary changes
	* Boda	A police-station in the Jalpaiguri Sub-division when the district was formed. Boundary was defined by notification of 1st September 1883.	By notification No. 2805-PL dated the 28th July, 1925
	* Pachagarh	Jagadal was formed as an O. P. under Boda P. S. By Notification No. 3222 J dated 11th July 1905; it was declared to be a P. S. By notification No. 4646 J dated the 27th December 1909 the O.P. was shifted to a new site at Pachagarh and it was designated Pachagarh O. P. Subsequently, it began to function as a P. S.	By notification No. 2806 PL dated the 28th July, 1925

Sub-division	Nature of the police-station	A brief history of the formation.	Boundary changes.
	* Debigunj	Originally an O. P. under Boda P. S. By notification No. 3222 J dated the 11th July 1905 it was declared to be a P. S.	By notification Nos. 2807 PL dated the 28th July, 1925 and 319PL dated the 31st January, 1935.
	* Titalya	Originally, an independent O. P. under Rajgunj P. S. By notification No. 3222 J dated the 11th July 1905 it was declared to be a P. S.	By notification Nos. 1330 PL dated the 18th April 1923 and 711 PL 27th Feb., 1925.
	* Patgram.	Transferred to the district of Jalpaiguri from Rangpur district in the year 1870.	By notification Nos. 1167 pl dt. the 2nd April 1925, 314 pl and 318 pl dated the 31st Jan, 1935.
Sadar Sub-Divn.	Jalpaiguri.	The original name of the P. S. was Fukeergunj. The Boundary was defined by Notification of 1st September 1883.	
	Rajgunj	Sannyasikata was the Original name of the P. S. transferred from Rangpur district. The P. S. was shifted to Shikarpur and the name changed to Shikarpur P. S. An O. P. was created at Sannyasikata. By notification dated the 29th November 1886 the P. S. was shifted to Rajgunj and the name was changed to Rajgunj P.S. The O.P. at Sannyasikata was abolished by notification No. 2158 J dated the 11th April 1895.	By notification Nos. 1331 pl dt. the 18th April 1923 and 711 pl dated the 27th Feb., 1925.
	Mynaguri.	Boundary was defined by the notification dated the 1st Sept., 1883.	

Sub-division	Name of the police-station	A brief history of the formation.	Boundary changes
	Dhupguri.	Dhupguri O. P. was formed by the portion of Thana Salbari lying West of the Dudua and Rehit Rivers (notification No. 4849 J dated the 2nd Sept. 1895) The O. P. was declared to be a P. S. by notification No. 3222 J dated the 11th July 1905.	
	Nagrakata.	Nagrakata O.P. under Mynaguri P.S, was created by notification dated the 25th July 1888. It was converted into a P. S. by notification No. 3222 J dated the 11th July 1905.	
	Matelli.	In pursuance of notification dated the 5th Aug. 1890 Matelli O. P. was created Subordinate to Dam-Dim P. S. By notification No. 3222 J dated the 11th July 1905 the O. P. was transformed into a P. S.	
	Kyranti.	Boundary of the P. S. was first defined by notification dated the 1st September 1883 ; converted to an O.P. under Dam-Dim P. S. when this P. S. was formed by notification dated the 25th July 1888. The O. P. was again declared to be a P. S. by notification No. 3222 J dt. the 11th July 1905. This notification was cancelled by notification No. 2812 J dt. the 29th Aug., 1910 (E. B. & Assam Gazette) and the Kyranti O. P. was abolished.	
	Dam-Dim	Formed on 1st July 1888 by notification dt. the 25th July 1888. In pursuance of notification No. 4647 J dt. the 27th Dec. 1909 (E. B. & Assam Gazette) the HQ of the P. S. was transferred to a new site at Mal. But the name was not changed. The name was changed to Mal P. S. in 1924.	

Sub-division	Name of the police-station	A brief history of the formation.	Boundary changes
	Mal.	By notification No. 2911 pl dt. the 21st Nov. 1924 the name of Dam-Dim P. S. was changed to Mal P. S.	
Alipur-duar.	Alipurduar.	Boundary of the P. S. was defined for the First time by notification of 1st September 1883.	By notification No. 8773 P dated 8.7.1916.
	Salbari.	Boundary was first defined by notification dt. the 1st Sept. 1883: Subsequently, an O. P. under this P. S. was opened at Falakata. By notification No. 2158 J dt. the 11th April 1895 the O. P. was abolished. By notification No. 4849 J dated the 2nd Sept. 1895 the P. S. was removed to Falakata ; Salbari P. S. was abolished and some portion of it was transferred to form Dhupguri O. P.	
	Falakata.	The P. S. was created when Salbari P.S. was transferred to Falakata and the name of the P. S. was then changed to Falakata.	By notification No. 7649 P dt. the 12th June 1916.
	Kalchini	Originally, an O. P. was created at Buxa under Alipur P. S. By Notification No. 3222 J dt. the 11th July 1905 the O. P. was declared to be a P. S. But this did not come into force. By notification No. 4648 J dt. the 27th Dec. 1909 (E. B. & Assam) the O. P. was shifted to a new place called Atiabari. The designation was also changed to Atiabari O. P. With effect from 1st March 1914 the O. P. was shifted to a place called Kalchini by virtue of notification No. 2271 P dt. the 28th February 1914. The O. P. was declared to be called Kalchini P. S.	By notification No. 8774 P dated the 8th July 1916

Sub-division	Name of the police-station	A brief history of the formation	Boundary changes
	Kumargram	Kumargram O. P., subordinate to Thana Alipur, was created from 1st Jan. 1891 in pursuance of notification dated the 25th Nov., 1890. By notification No. 3222 J dated the 11th July 1905 this was declared to be a P. S.	By notification No. 8775 P dated the 8th July 1916.
	Madarihat	By notification dated the 18th March 1890, Madarihat O. P. was created with effect from 1st April 1890, subordinate to Thana Salbari. The O. P. was abolished by notification No. 4849 J dated the 2nd September 1895. With effect from 22nd May 1909 the O. P. was again created Subordinate to Thana Falakata by notification No. 2812 J dt. the 29th August 1910 (E. B. & Assam). By notification No. 7648 P dated the 12th June 1916 the O. P. was declared to be a P.S.	Boundary changed when Birpara P. S. was formed out of it.
	Birpara	Originally, this was an O. P. under Madarihat P. S. By notification No. 162 pl dated 10. 1. 67 the O.P. was declared to be a P. S.	

The necessity of proper supervision in Police Administration can hardly be over emphasized. As the number of Police-stations increased and new problems cropped up, superior posts were created in the district Police administration to ensure proper co-ordination as also the maintenance of efficiency. The table below shows the creation of different posts :—

Name of the post	Year of creation	Remarks
1. Superintendent of Police.	Since the creation of the district.	
2. Additional S. P.	1962	G. O. No. 5433-GA., dated 20. 11. 62
3. S.D.P.O., Alipurduar.	1949	
4. First Deputy S. P. at Sadar.	Some time after 1911	Exact date not known
5. Second Dy. S. P. at Sadar.	1962	G. O. No. 5433-GA., dated 20. 11. 62

* Police-stations transferred to East Pakistan under Radcliffe award.

6. Third Dy. S. P. at Sadar
(D. I. B.)

1962

G. O. No. 1195-GA.,
dated 6. 11. 62

(d) Changes in the Land Tenure and Land Revenue Administration :—

The chief characteristic of the district of Jalpaiguri was that it consisted of two widely different tracts of land ; the area comprising the police stations of Jalpaiguri, Rajgunj, Boda and Patgram was subjected to all the changes in the policy of land administration since 1765 until it was, along with the rest of Bengal, settled permanently in 1793 under the Cornwallis Scheme of land settlement. The area included in Western Duars was, however, a large Government estate.

Bhutan Duars Act was repealed in 1895. On the 25th Oct., 1895 Act X of 1859 (Rent Law) was extended to the Western Duars portion of the district. The Bengal Tenancy Act 1885, was extended to the permanently settled portion of the district and with some modifications to the Western Duars, by two notifications on the 5th November 1898. In giving a short account of Land Revenue Administration of the district it is necessary to deal with the two different tracts of the district separately.

(1) The main characteristics of permanently settled areas may be best illustrated as follows :—

Year of settlement	Name of parganas included in it.	Settlement made with	Incidents of different classes of tenants in the Zamindaries.			Abolition
			Tenants-in-Chief (Jotder)	Sub-tenants.	Holders under Metayer system (Adhiars)	
1793	Baikunthapur	Raikat of Baikunthapur	Held land directly under Zamindars	Chukanidars held directly under Jotdars on money rent		
				They had right of occupancy and of sale or gift. Dar-chukanidars held under chukanidars. They had right of occupancy under B.T. Act. Dar-Dar-Chukanidars held under Dar-chukanidars. They had right of occupancy under B. T. Act. Sub-infeudation went on but they were not many.	Cultivated land directly under Jotder or Sub-tenants. Half the produce of the land went to Girdar (owner)	With effect from 15th April 1955 in accordance with West Bengal Estates Acquisition Act, 1953.

1793	Boda.	Coochbehar, Raja	As above	As above	As above	As above
1793	Patgram	Coochbehar, Raja	As above	As above	As above	As above

(2) As the Western Duars was not permanently settled, it stood on a different footing. To this might be added Ambari-Falakata, which though not falling within Western Duars, was annexed at the same time from Bhutan. This area also was kept under 'Khas' management. Prior to 1874 Govt. revenue in these areas used to be collected by farmers and petty Tahshildars on the basis of commission. As this system frequently led to harassment of the people and various other illegalities, it was abolished and Tehshil offices were established to look after the Govt. Estates. But the tea gardens and reserved forests were excluded from its purview. The table below shows the set-up of different Tehshil offices created in the district for the purpose of the management of Govt. Estates.

Year of creation.	Name of the Tehshil.	Parganas included in the Tehshil.	Officer-in-charge of the Office.	Remarks.	Abolition.
1874	Mynaguri.	North Mynaguri, Chengmari and South Mynaguri.	One Sub-Dy. Collector.*	The establishment was formed in pursuance of Govt. of India Revenue, Agri and Commerce Deptt. letter No. 119 of the 11th Feb. 1874.	These were replaced by land Reforms Circle Offices after the coming into operation of W.B.E.A. Act 1953.
1874	Falakata.	West Madari, Lakhipur & Moraghat.	*Do	Do	Do
1874	Alipur or Buxa.	East Madari, Chakawa kheti, Buxa & Bhatibari.	*Do	Do	Do

1875	Bhalka.	Bhalka.	One Naib Tahshildar.	Established in pursuance of department of Agri. Commerce and Revenue letter No. 286A dated the 8th May, 1875.	Do
1874-75.	Ambari-Falakata.	Ambari-Falakata.	Originally it was managed by one of the Dy. Collectors at Siliguri. But after the partition of Bengal (1905) it came to be managed by one of the Dy. Collectors at Jalpaiguri.	The Office was subsequently transferred to Jalpaiguri Sadar.	Do

For six years after the annexation of Western Duars, the policy followed was to collect all recognized dues without altering the amount. The first settlement operations started in 1871. After that several settlement operations took place at different periods and the rights of under tenants modified at different stages, each settlement being an improvement over the previous one. We need not enter into a detailed discussion of these settlements.

By notification No. 12532-L. Ref dated the 16th August, 1954, all Estates and the rights of every intermediary in such estates situated in the district of Jalpaiguri vested in the state with effect from 1st Day of Baisakh 1362 BS (corresponding to 15th April 1955). The notification was issued under the provisions of West Bengal Estates Acquisition Act, 1953. At that time there were five Khas Mahal Circles in the district and by Govt. order these existing Circles were transformed into Land Reforms Circles. Subsequently, some new circles were created by re-arrangement of the jurisdiction of the existing circles. The following table illustrates the creation of different Land Reforms Circles in the district :-

Sub Division	Name of the Circle	Comprising the police-stations	Authority for the creation	Remarks
Sadar	Jalpaiguri	Kotwali & Rajgunj	Annexure to Board of Revenue Memo No. 1649 (14)-E.A. dt. the 11th Feb., 1955	The area included in Rajgunj P. S. was separated and formed into a separate L. R. Circle in 1961.

Sub Division	Name of the Circle	Comprising the police-stations	Authority for the creation	Rsmarks
	Mynaguri	Mynaguri, Mal and Matelli	do	The area included in Mal P. S. and Matelli P. S. was formed into a separate Circle in 1957. This is known as Mal-Matelli L. R. Circle.
	Dhupguri	Dhupguri & Nagrakata	do	
Alipur-duar	Falakata	Falakata, Madarihat & Birpara	do	
	Alipurduar	Alipurduar, Kumargram & Kalchini	do	

(e) **Changes in Development programme :—**

Before independence no well co-ordinated effort was made to improve the lot of the rural people. With the dawn of independence, the programme of systematic economic and social development of the country was taken up. Rural development work was thought of largely in terms of particular items of improvement in village life and agricultural practice. It is in this context that community development projects were launched in the country in the year 1952. Along with the rest of the country the projects were also started in this district. The district has been divided into several units called community development blocks, each under the charge of an Officer designated as Block Development Officer.

The following table illustrates the formation of different blocks in the district :—

Sub-Division	Name of the Block	Name of the P. S. within which it is situated.	Date of inauguration
Sadar	Jalpaiguri	Jalpaiguri	1. 4. 1955
	Mynaguri	Mynaguri	1. 4. 1955
	Dhupguri	Dhupguri	1. 4. 1955
	Rajgunj	Rajgunj	April '59
	Mal	Mal	October 1962
	Matelli	Matelli	October 1962
	Nagrakata	Nagrakata	October 1962

Sub-Division	Name of the Block	Name of the P. S. within which it is situated,	Date of inauguration
Alipurduar.	Alipurduar-I	Alipurduar	October 1962
	Alipurduar-II	Alipurduar	October 1962
	Falakata	Falakata	31. 3. 1957
	Kumargram	Kumargram	October 1956
	Madarihat	Madarihat and Birpara	April 1961
	Kalchini	Kalchini	May 1962

Growth and changes in Local Self-Governing Institutions :—

Local Self-Governing institutions came into being in the district in the year 1885. In that year Municipality and District Board were established. Since then several Acts have been enacted to associate local people in the management of their own affairs and various self-governing institutions at different levels were established in the district. This can best be illustrated with the help of the following table.

Name of the Institution	Act of the Legislature forming them	Remarks, if any
Jalpaiguri Municipality	Bengal Local Self Government Act 1885	Previously Chairman and some commissioners were Govt. Officials ; subsequently, the office of Chairman became elective.
Jalpaiguri District Board	do	It had jurisdiction throughout the dist. outside the Municipal town. Previously Dy. Commissioner used to be the Chairman of the body.
Union Boards	Bengal Village Self Government Act 1919	
Alipurduar Municipality.	Bengal Local Self Government Act 1885.	It was constituted in 1957 having jurisdiction over Alipurduar town.
Jalpaiguri Zilla Parishad.	West Bengal Zilla Parishads Act 1964.	It was established with effect from 23.10.64. The functions of the old District Board were taken over by it. The powers of this body were also very much increased.

Anchalik Parishads.	West Bengal Zilla Parishads Act 1964.	There are 13 Anchalik Parishads in the district, each having jurisdiction over the area included in a block. These were established in pursuance of L. S. G. & Panchayat Department notification No. 2532/P/IZ-3/64 dated 2.7.64.
Anchal Panchayats.	West Bengal Panchayat Act 1957.	Anchal Panchayats have taken the place of former Union Boards. the U.Bs have been abolished. There are at present 93 Anchals in the district.
Gram Panchayats.	West Bengal Panchayat Act 1957.	Each comprises an area included within a village. There are at presents 575 Gram Panchayats in the district.

The preceeding paragraphs show briefly how administration has stretched its limbs in different directions in this district during the last one hundred years. Every improvement in administration at a particular period of time while solving the problems in hands revealed problems previously so invisible as to have been non-existent for all practical purposes. In this way progress has continued and is still continuing. New knowledge presents new problems to be solved. There is, in fact, no end to it ; the journey is continuos. The need and opportunity for individual initiative is gradually increasing in the administration and the march towards better and more efficient administrative set-up goes on.

BIBLIOGRAPHY

1. Sunder. I.—Settlement Report of Western Duars-Jalpaiguri (1895)
2. Milligan, J. A.—Final Report on the Survey and Settlement operations in the Jalpaiguri district (1919)
3. Gruning, J. F.—Jalpaiguri (1911)
4. Mitra, A.—Census Hand Book, Jalpaiguri, 1951
5. Choudhury H. N.—Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement (1903)
6. Hunter, W. W.—Statistical Account of Bengal Vol. X (1876)
7. Chakravorty, M. M.—Jurisdiction Changes in Bengal
8. Imperial Gazetted of India, Vol. XIV (1908).



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

“A TALE OF TWO CITIES”

জেলার দুইটি শহরের ক্রমোন্নতি

জনপাইগুড়ি সহরের একশো বছর

১৮৬৯-১৯৬৯

ত্রিচারুচন্দ্র সাহা

জলপাইগুড়ি সহরের একশো বছর

১৮৬৯-১৯৬৯

শ্রীচাক্রকল্প সাহা

পুরোনো কথা

সামন্ত যুগের অবসান, ইংরেজ-বণিক যুগের আগমন, তাদেরও প্রশ্রয়, ভারতীয়দের হাতে প্রজাতন্ত্রের ক্রমবিকাশ, এইসব স্তম্ভরভাবে ফুটে উঠেছে এই দেশ ও সহরের গত একশ' বছরের বির্তনের ভেতরে।

প্রাচীন কামরূপের রত্নপীঠে স্বভাবজাত জলপাই গাছের বনে যে সহরটি গড়ে উঠেছে তার কথা বলতে গেলে অনেক পুরোনো কথা মনে ভীড় করে আসে। প্রায় ১৫৪৫ সনে শিশু বা শিবসিংহ এই জেলা অধিকার করার পর শালগুড়ির কাছে গভীর জঙ্গলে বিরাট করতোয়া নদীর ধারে রাজধানী স্থাপন করেন। আসামের পরম বৈষ্ণব শঙ্করদেবের প্রভাবে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ১৫৬০ সনে মদনমোহন নামে এক বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেন। বোধহয় তাঁরই প্রভাবে জলপাইগুড়িতে বৈকুণ্ঠনাথ নামে এক বিষ্ণুমূর্তি স্থাপিত হয়; এই দেবতার নামে জঙ্গলটির ও রাজ্যটির নাম হয় বৈকুণ্ঠপুর। আজও এই নামই চলে আসছে। এ দেশে স্বভাবজাত জঙ্গলে জনপদ গড়ে উঠলে তার নাম হয় গাছের নামের সাথে 'গুড়ি' কথাটি যোগ দিয়ে। যেমন জলপাই-গুড়ি; ময়নাগুড়ি; কনঠল (কাঁঠাল) গুড়ি, পাচকোল (চালতা)-গুড়ি প্রভৃতি।

সে আমলে নদীই ছিল রাজপথ। তাই রাজধানী হত বড় নদীর ধারে। করতোয়া তখনও চলতো বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। এখনকার সমতলের তিস্তা তখনও জন্মে নাই।

ধীরে ধীরে করতোয়ার জল জমতে শুরু হল, তিস্তা ক্রমেই বড় হতে শুরু করেছে। তাই শিব বংশের এক রাজা জয়ন্তদেব প্রায় ১৬০ বছর আগে রাজধানীটি তুলে নিয়ে এলেন এই জলপাইগাছ ঘেরা 'গুড়ি'টিতে। জয়ন্ত দেব বেঁচে থাকতেই ১৭৮৭ সনে করতোয়া জীর্ণ হয়ে গেল, তার সব জল চলে পড়লো তিস্তায়, তিস্তা বিরাট নদী হয়ে উঠলো। রাজধানী জলপাইগুড়িতে আসবার সাথে সাথে এলেন বৈকুণ্ঠনাথ। রাজারা শৈব—তাই এলেন শিব, দুর্গা ও কালী। সবারই মন্দির হল, তবে খড়ের চাল। শিবঠাকুরের পরিবার পূর্ণভাবে স্থাপিত হল। তাঁদেরই কাছে শিবসিংহ পরিবার বাস করতে লাগলেন। প্রায় ১৪০ বছর আগে জয়ন্তদেবের পুত্র সর্বদেব রাজবাড়ীর বড় দীঘিটি কাটান। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৮০২ থেকে ১৮৪৮ সন পর্যন্ত। এই দীঘি কাটতে দিনাজপুর থেকে জীবন গোমস্তা নামে এক ঠিকাদার আসেন। তাঁর পুত্র এই জেলার বাকালি গ্রামের জমিদার খান বাহাদুর আবদুল করিম প্রধান সাহেব আমাদের বলেন, মজুরী বাবদ তাঁর পিতাকে ধামা ধামা কড়ি দেওয়া হয়েছিল। সে আমলে বিদেশের সাথে কারবার চলতো কোচবিহারের নারায়ণী টাকায় আর ঘরের কারবার হতো কড়ি দিয়ে। ১৮৩৬ সন থেকে ইংরেজ, মুঘলের সিকা টাকা ও কোচবিহারের নারায়ণী টাকার প্রচলন বন্ধ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৈরী টাকায় বেতন নিতে সব সরকারী কর্মচারীদের বাধ্য করেন।

২৩০ বছর স্বাধীন থাকবার পর ১৭৭২ সনে দর্পদেব রাজার আমলে এদেশে সম্রাসী বিজ্ঞোহ হয়। দর্পদেব এর সাথে জড়িয়ে পড়েন। ফলে ১৭৭৩ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট ইংলিশের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে এই সহরটি অধিকার করেন। ১৭৭৪ সনে ভুটানের সাথে সন্ধি হবার পর বৈকুণ্ঠপুরের কিছু অংশ যথা আমবাড়ি ফালাকাটা, ভুটানকে খুসী করার জন্ত দেওয়া হল আর অবশিষ্ট অংশ রংপুর জেলা সরকারের অধীনে মাজ্জ জমিদারি হিসেবে থেকে গেল। এর নাম হল বত্রিশ হাজারী। স্বাধীন বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা হয়ে গেলেন পরাধীন জমিদার মাত্র। এই অবস্থা ১৮০ বছর চলার পর ১৯৫৫ সনে জমিদারিও শেষ হল।

রংপুরের অধীনে জমিদারি থাকার সময় ইংরেজের কাছারী বসলো স্থানীয়, ময়নাগুড়ি ও ফালাকাটায়। তখনও আধা সামন্ত যুগ চলছিল। প্রায় ১২০০ থেকে ১২০৫ সনেও রাজা ফণীন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর কোর্ট অফ ওয়ার্ডে বৈকুণ্ঠপুর জমিদারি থাকা অবস্থাতেও দেখেছি রাজবাড়ির চার দিকে মাটির উঁচু দেয়াল ও তার বাইরে জলভর্তি খাল। বর্তমান দালানের সামনে ছিল বিরাট খড়ের আটচালা। দুর্গাপূজার সময় ছেলে বেলায় আমরা সেখানে বসতাম আর দেখতাম অগণিত প্রজার দল পুজার তিনদিন রাজবাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করতো। প্রসন্নদেবের বাল্যকালেও এই প্রথা চালু ছিল। বণিক মনোভাবসম্পন্ন ইংরেজের আমলে প্রজাদের খাওয়ান বাবদ 'বাজে খরচ' ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। মাটির দেয়াল ভেঙ্গে গাড়ি চলার পথ করা হল। খড়ের আটচালাটি ভেঙ্গে সেখানে ফুল বাগান হল। ধীরে ধীরে পুজার সমারোহ কমে গেল। এখন কিছুই নাই বললেও চলে। প্রজাদরদী সামন্ত যুগের বদলে এসে গেল মাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক।

ইংরেজ আমলের জেলা

ডুয়ার্স নিয়ে ভুটানের সাথে লড়াই ও সন্ধি চলতে থাকলো। ইংরেজের লোলুপ দৃষ্টি ছিল তিব্বতের সোনার দিকে। ভুটানকে বন্ধুভাবে হাতে রাখতে পারলে এ কাজে সুবিধে হবে মনে করে প্রায় একশো বছর নানাভাবে ঘুষ দেয়া চলতে থাকলো। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। লড়াই করতেই হল। ১৮৬৪ সনে লড়াইএর পরোয়ানা, ১৮৬৫ সনে পশ্চিম দুয়ার অধিকার ও ১৮৬৬ সনে পশ্চিম দুয়ারটি আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজ রাজত্বভুক্ত করা হল। কাছারী স্থাপিত হল বক্সায় ও ডালিমকোট। এই ডুয়ার্সে শাসন কাজ চালাতে হবে। তাই রংপুর থেকে বৈকুণ্ঠপুর, কোচবিহার থেকে বক্সা ও অবশিষ্ট পশ্চিম দুয়ার একত্রে ১৮৬৯ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে জলপাইগুড়ি নামে এক নতুন জেলার পত্তন হল। ডালিমকোট দেয়া হল দারজিলিং জেলাকে। পরের বছর কোচবিহার থেকে পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া ও পাটগ্রাম চাকলাগুলি জুড়ে দিয়ে জেলাটিকে বেশ একটু বড় করা হল। মহকুমা থাকলো সদর ও ফালাকাটা। ১৮৭৬ সনে ফালাকাটার বদলে ভক্সা বা আলিপুরদুয়ারে মহকুমা হল। ১৯৪৭ সনে চাকলা পাঁচটি চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত হয়ে। আবার ১৮৬৯ সনের অবস্থায় ফিরে আসা হয়েছে।

সহর সুরক্ষা হল

বর্তমান স্থানে সহর পত্তনের জায়গাটি পছন্দ করা হল নানা কারণে। পূর্ব দিকে তিস্তা নদী, ডুয়ার্সের জানোয়ারগুলি থেকে অনেক দূরে, উত্তরে সুদৃশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা, সুন্দর পানীয় জল, ভেতর দিয়ে দুইটি নিরীক্ষণীয় তরু তরু করে বয়ে চলেছে তিস্তা, রেল ও পথ তৈরী করতে বড় নদীতে পুল বাধতে হবে না, আরক্ষা হিসেবে আছে ৭৩নং পদাতিক ও ১১নং অশ্বারোহী বাহিনী। বৈকুণ্ঠপুর পরগণায় লোক বসতি তখন প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৬৫০

কিন্তু পশ্চিম দ্বারে মাত্র ৫০ থেকে ৬০ আর সবই জঙ্গল, ম্যালেরিয়া ও বন্য জন্তুর আড্ডা। কাজেই জনবহুল স্থানেই সহরের স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল।

প্রথম দিকে ছিল সবই খড়ের চাল, কাঠের মেঝে ও দেয়াল। রাজবাড়ির কিছু অংশ ও সরকারী আপিস সবই এই রকম বাড়ি। ছকার সাহেব বেড়াতে এসে এমনি সহরই দেখেছিলেন। কাঠ ছিল সস্তা, তিস্তা নদী দিয়ে ভেসে আসতো অনেক কাঠ, টিন পাওয়া যেত না। কাঠের ছাউনী দেওয়া বাড়িও ছিল অনেক। এখন এমনি বাড়ির কথা কেউ বিশ্বাসই করবে না। ভূমিকম্প হতো তখন বছরে তিন চার বার। কাঠের ঘরই ছিল নিরাপদ।

সহরের পুরোনো লোক

প্রথম দফায় :—সহর পত্তন হল ; এলো সরকারী কর্মচারী, আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী, বণিক ও সাথে সাথে অনেক বে-সরকারী লোক ; প্রায় সবাই বিদেশ থেকে। নোয়াখালির রহিম বক্স এলেন স্থানীয় থেকে পেশ্কার হয়ে। সহরের নবাব বাড়িটি এঁরই। পাবনার ভগবান সান্মাল এলেন ময়নাগুড়ি থেকে আইন ব্যবসা করতে। তাঁর পৌত্র আছেন গোপাল সান্মাল, বাড়ি বাবুপাড়ায়। পাবনার শ্রীনাথ চক্রবর্তী এলেন সেরেস্তাদার হয়ে রংপুর থেকে। এঁর কেউ নেই এ সহরে। পাবনার ভবানী ঘটক এলেন ফালাকাটা থেকে সহকারী সেরেস্তাদার হয়ে (পুত্র ললিত ঘটক—বাসা, রায়কত পাড়ায়)। এলেন রংপুর থেকে ফরিদপুরের চন্দ্রকান্ত সেন ও রামচন্দ্র সেন সরকারী কাজ নিয়ে (পৌত্র, পরিতোষ সেন, দেশবন্ধু রোড)। নাজীর হয়ে এলেন ঢাকার শ্রীনাথ রায় (পৌত্র, বাদল রায়, অটো হাউস)। এলেন পাবনার পার্বতী চরণ নিয়োগী ভুটান যুদ্ধে সরবরাহ ব্যাপারে (পুত্র ৬কামিনী নিয়োগী—রায়কত পাড়া)। পাঞ্জাব থেকে লالا লাডলী প্রসাদ (লালা বাবু)। এঁর কেউ নেই এ সহরে। পাবনার তপেশ্বর লাহিড়ী আসেন ব্যবসা করতে (প্রপৌত্র জীবন লাহিড়ী, উকিল পাড়া)।*

দ্বিতীয় দফায় :—১৮৭০ সন থেকে ১৮৭৮ সনে রেল গাড়ি এদিকে আসবার পূর্বে এলেন পাবনার জয়চন্দ্র সান্মাল, উকিল হয়ে (পুত্র, চারুচন্দ্র সান্মাল, উকিল পাড়া) ; পাবনার হৃদয় নাথ বাগ্‌চি, উকিল হয়ে (পৌত্র, নৃপেন্দ্র নাথ ও নীরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি, উকিল পাড়া) ; পাবনার যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী উকীল হয়ে (পৌত্র, প্রভাত চক্রবর্তী, উকিলপাড়া) ; পাবনার কেশবচন্দ্র ঘটক, উকিল হয়ে (পৌত্র, দেবব্রত ঘটক, উকিল পাড়া) ; পাবনার হরিমোহন চন্দ, বিভাগীয় কমিশনারের প্রধান করণিক হয়ে। এঁর কেউ নেই সহরে। মৈমনসিং থেকে মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী, উকিল হয়ে (পৌত্র, নরেশ চক্রবর্তী, উকিল পাড়া) ; ঢাকার গোপালচন্দ্র ঘোষ এলেন উকিল হয়ে (পৌত্র, বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, রায়কত পাড়া) ; ঢাকার ঈশানচন্দ্র দাসগুপ্ত, উকিল হয়ে (পুত্র, খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, মার্চেন্ট রোড)। ঢাকার রজনীকান্ত সেন, চিকিৎসা ব্যবসায় (বাড়ি মার্চেন্ট রোড)। ঢাকার কৈলাশচন্দ্র রাহত আসেন সরকারী কাজে (ভাতুপুত্র, কামিনী রাহত। প্রথমে বাড়ি সওদাগর পট্টিতে, তারপর ১৯০০ সন থেকে বাবু পাড়ায়)। এঁরা সবাই এসেছিলেন নোকায়—যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও করলা নদী দিয়ে দিনবাজার কালীবাড়ির ঘাটে। চব্বিশ পরগণার বারাসত থেকে এলেন প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায় সরকারী উকিল হয়ে (পুত্র, বিপুল বন্দোপাধ্যায়)। ইনি এসেছিলেন ভাগলপুরে গঙ্গা পার হয়ে কারাগোলা ঘাট থেকে টমটমে প্রায় একশো মাইলের বেশী। পাঞ্জাবের

* নিদর্শনের জন্ত বন্ধনীর ভেতরে বংশের একটি কি দুইটি নাম দিয়েছি। সব সময়ে বড় ছেলের নাম দেই নি। এর পরেও বন্ধনীর ভেতরে একটি কি দুটি নাম থাকবে নিদর্শন হিসেবে। অধিকাংশ সময়ে এই সহরে যারা থাকেন তাঁদের ভেতর থেকেই নাম দিয়েছি।

রোটক জেলা থেকে এলেন প্রভুদয়াল আগরওয়ালা (পৌত্র, রামসিং আগরওয়ালা, দিনবাজার) ও কানাইয়ালাল আগরওয়ালা (পৌত্র, মাতুরাম সিং আগরওয়ালা, দিনবাজার) ব্যবসা করতে। শুনতে পাওয়া যায় এঁরা অধিকাংশ পথ হেঁটে এসেছিলেন।

এঁদের অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ সাহস ও ধৈর্য্য সৃষ্টি করেছে আজকের উন্নত জলপাইগুড়ি সহর।

তৃতীয় দফায় অর্থাৎ ১৮৭৮ সনের ৪ঠা জুন ছোট রেল জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি আসা থেকে ১২০০ সন পর্যন্ত এই সহরে এলেন : -

ঢাকার তারিণী প্রসাদ রায়, উকিল হয়ে (পুত্র, সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়, বাবুপাড়া) ; শশীকুমার নিয়োগী, উকিল হয়ে (ভ্রাতুষ্পুত্র বরেন—গাদল নিয়োগী, উকিলপাড়া) ; মথুরা নাথ দত্ত, উকিল হয়ে (পুত্র, মণি দত্ত, গার্লস স্কুল পাড়া)। পাবনার উমাগতি রায় উকিল হয়ে (পুত্র, জীবনগতি রায়, রায়কত পাড়া) ; দুর্গাচরণ সাহা, উকিল হয়ে (পৌত্র, মুকুলেশ সাহা, স্টেশন রোড)। মৈমনসিংহের কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, শিক্ষক হয়ে (পুত্র, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, কদমতলা) ; মহেশ চক্রবর্তী, উকিল হয়ে (পৌত্র, অজিত চক্রবর্তী, নিউ টাউন)। ২৪ পরগণার কালিপদ বন্দোপাধ্যায়, উকিল হয়ে (পৌত্র, তুলসীপদ বন্দোপাধ্যায়, থানা রোড) ; ভাটপাড়ার শশী স্থানপতি, উকিল হয়ে (প্রপৌত্র, সমর স্থানপতি, মাষকলাই বাড়ি কলোনী)। এলাহাবাদ থেকে গুপীনাথ রায়, ঠিকাদার হয়ে (পুত্র, মোহনলাল রায়, পাণ্ডা পাড়া)। রাজস্থান থেকে মনোহর দাঁস আগরওয়ালা (পৌত্র, গণেশ প্রসাদ) ; মোহনলাল ডাগা (পৌত্র, শীতারাম ও ভগবান ডাগা) ; রতিরাম মাহেশ্রী (পুত্র, তনম্বক রায় মাহেশ্রী)। শেষের তিনজন এসেছিলেন ব্যবসা করতে, বাড়ি আছে দিনবাজারে। এঁদের কিছুদিন বাদে পাবনা থেকে আসেন গঙ্গাগোবিন্দ সেন, চাকুরী নিয়ে (পুত্র, যোগেন্দ্রনাথ সেন, উকিল পাড়া) ; রাজসাহী থেকে কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেন (পুত্র, নগেন সেন, বাবুপাড়া), বরিশাল থেকে কালী কমল সেনগুপ্ত, চিকিৎসা ব্যবসায়ে (পৌত্র, সুরেশ গুপ্ত, বাবুপাড়া)। ঢাকা থেকে হরচন্দ্র সরকার, চাকুরী নিয়ে (পৌত্র, নৃপেন সরকার, উকিলপাড়া) ; গোপাল মজুমদার, আইন ব্যবসায়ে (পুত্র, নৃপেন মজুমদার, উকিল পাড়া)। বিহারী গাঙ্গুলী, কবিরাজ নিমাই সেন, ডাঃ অতুল সরকার (এঁকে আমরা সাহেব ডাক্তার বলতাম) প্রভৃতি এসেছিলেন। এঁদের কেউ নেই এখন এই সহরে। সদর থানার কাছে অতি পুরাতন ডাঃ তারাকান্ত ডাক্তার আসেন ঢাকা থেকে। এঁর প্রাণ খোলা অট্টহাসির কথা এখনও অনেকের মনে আছে। নোয়াখালি থেকে এলেন ওয়ালিয়র রহমণ উকিল হয়ে (এঁর এখন কেউ নেই সহরে) ; মুর্শিদাবাদ থেকে আবদুল হামিদ, মোক্তার হয়ে (পুত্র, আবুল হাসনাত, মুর্শিদাবাদ হাউস)। অনেকর নাম বাদ পড়েছে—কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি নাম দেয়া হল মাত্র।

সহর গড়ে উঠল

সহরটি বেশ সরগরম হয়ে উঠলো। ১৮৭২ সনে এই সহরে লোক ছিল মাত্র সাড়ে ছয় হাজার, ১২০১ সনে দশ হাজার, ১২৪১শে আটাত্ত হাজার, ১২৪৭ এর পরে মালুঘের বত্কা এসে গেল। সহরে এখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার, আর সহরতলি নিয়ে প্রায় একলাখ। এখনও লোক বাড়ছেই। সহরের ও সহরতলির ধান খেতগুলি মালুঘের বাসায় ভরে উঠেছে। পুকুরগুলিও ভরাট করে বাড়ি উঠছে।

প্রথম দিকে সহরে ছিল জলা, জঙ্গল ও ধানখেত। উকিল পাড়া, হাকিম পাড়া, রায়কত পাড়া, বাবুপাড়া, তেলীপাড়া আর দিনবাজারের কিছু অংশ ছিল উঁচু। এখানেই লোক এসে প্রথম বসতি করলো। এখানকার

ঘন বসতি এলাকা—যথা, নূতন পাড়া, মোহান্তপাড়া, নিউ টাউন, পাণ্ডাপাড়া, কদমতলা, হাসপাতাল পাড়ার অধিকাংশই ছিল ধান খেত, জলা ও জঙ্গল। ভয়াবহ জঙ্গল ছিল শিল্প সমিতি পাড়াটি। দিনেই বাঘ দেখা যেত। ভূতের ভয়ে সন্ধ্যার পর ওদিকে সহসা কেউ যেত না। রাজবাড়ির উত্তর দিকে ছিল বিরাট আম বাগান। নীচে ঘন জঙ্গল। থাকতো বড় বড় বাঘ। বিকেল হলেই ওদিকে কেউ পা বাড়াতো না। এখন এ সবের চিহ্নও নাই। এখন হাসপাতাল পাড়ায় যেখানে প্রথমে হয়েছিল জ্যাকসন মেডিকেল স্কুল, বর্তমানে ফার্মেসী ট্রেনিং সেন্টার, সেটা ছিল জলা ও জঙ্গল, কেউটে সাপের আড্ডা। স্কুলটি তৈরী করতে এসবের সাথে লড়াই করতে হয়েছিল। ৩নং রেল গুমটি থেকে পুরোনো পাণ্ডা পাড়া গ্রাম পর্যন্ত পথের দুধারে ঘর বাড়ি ছিল না বললেই চলে। ছিল ধান খেত, জলা আর ছোট জঙ্গল। বহু বছর আগে রাজা সর্বদেব উড়িয়া থেকে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ এনে এই গ্রামে বসিয়েছিলেন। তাই গ্রামটির নাম পাণ্ডা পাড়া। এখন এখানে আরও অনেক লোকের বসতি হয়েছে বাংলার বিভিন্ন জেলার। সহরের রেল স্টেশন থেকে রাজবাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত বরাবর রাস্তার পূর্ব দিকে ছিল অসংখ্য রবার গাছ। মিঃ ম্যান্সন নামে এক চা বাগানের ম্যানেজার সখ করে এগুলি লাগিয়েছিলেন ১৮৭৯ সনে। গাছগুলি খুব বড় হয়ে উঠেছিল। ছেলে বেলায় গাছের গায়ে পাথর ঠুকে সাদা সাদা ঘন রস বের করে রবার গাছের পাতায় লাগিয়ে একটু রোদে রাখতাম তারপর একটি সুপুরীর গায়ে এই রস জড়িয়ে হুন্দের বল তৈরী করে খেলতাম। সহর বাড়বার সাথে সাথে সেই রবার গাছগুলি কাটা হতে লাগলো। এখন একটিও নাই।

পঞ্চাশ বছর আগেও রাতে সহরের ভেতরে বাঘ আসতো। ফেউ এর ডাক রোজ রাতে শোনা যেত। তাই দিন বাজারের কাজ দিন থাকতোই শেষ হতো। এখন শেয়ালের ডাকই কচিং শোনা যায়।

বছরে দু'তিন বার ভূমিকম্প হতো। তাই হয়তো সবাই কাঠের ঘর তুলেছিলেন। এখন পৃথিবীর ওপরটাতে মানুষের গরম চড়েছে কিন্তু পৃথিবীর ভেতরটা অনেক ঠাণ্ডা হয়েছে যদিও ভারতের বাইরে পাহাড় কেটে আগুন বেরুচ্ছে এখনও।

জেলেপাড়া

পাহাড়ীপাড়া যেটার নাম সেখানে থাকতো বহু জেলে। এখনকার সিকদার বাড়িতে যখন স্কুল ছিল এই পাড়ার ভেতর দিয়েই যেতে হতো। ছোট পায়ে হাঁটা পথ। মাঝে মাঝে দেখতাম এই পথের দুধারে প্রত্যেক দিকে এক বা দু'জন করে জেলেনী বুক চাপড়ে, নেচে কুঁদে, খুব ঝগড়া করতো। এদের কথা এক বর্ণও বুঝতে পারতাম না। তবে ঝগড়া হচ্ছে এটা বুঝতাম। মজার কথা, দুপুরে পুরুষরা ফিরে এলে দুই দলই একটা করে ধামা নিয়ে এসে উপুড় করে ঘর ঘর এলাকায় রাখতো। এটা হচ্ছে 'টুঙ্গ' বা যুদ্ধবিরতি। সবাই শান্ত হয়ে রান্না-বান্না করে পুরুষদের খাওয়াত ও নিজেরাও খেতো। কিছু বিশ্রামের পর পুরুষরা আবার কাজে বেরিয়ে যেত, তারপর ধামা উন্টে আবার ঝগড়া শুরু হতো সন্ধ্যা পর্যন্ত। আবার ধামা চাপা থাকতো। এইভাবে ঝগড়া চলতো প্রায় ছয়, সাত দিন। বড় হয়ে বুঝতে পারলাম 'ধামা চাপা' কথাটির সত্যিকার অর্থটি কি।

আবহাওয়া

চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর আগে ছিল মাত্র দু'টি প্রধান ঋতু। শীত ও বর্ষা। আর সবাই একটু আধটু দেখা দিয়েই পালাতো। আশ্বিন মাস থেকে লেপ গায়ে দেওয়া শুরু হতো, শেষ হতো চৈত্র। জ্যৈষ্ঠ থেকে নামতো বর্ষা,

ঠেকতো আশ্বিনে। বর্ষাকালেও রাতে লেপ বা কফল গায়ে দিতেই হতো। বর্ষায় মোটা মোটা জলের ধারা নামতো আকাশ থেকে, অনেক সময়ে বিরামহীন চলতো এক সপ্তাহ। পথে জল জমতো না, করলার খাদ ছিল গভীর, সব বাড়তি জল করলা দিয়ে তিস্তায় পড়তো, আরও বাড়তি জল শিবাজী মাঠ ও বর্তমান ইন্সটিটিউট মাঠে জমা থাকতো। এ সব মাঠে বাড়ি উঠেছে, করলার খাদ অগভীর হয়েছে। তিস্তা-করলার মুখ ভরে উঠেছে। কাজেই বাবুদের বাড়ি চড়াও করে নালিশ জানাতে হচ্ছে করলার জলের। শীতকালে অনেক সময়ে একনাগাড়ে ছয় সাত দিন কুয়াশায় ঢেকে থাকতো আকাশ, সূর্যের দেখা পাওয়া যেত না। সব ঘরে ও উঠানে কাঠ ও বাঁশের গুঁড়ির আগুন জলতো। ডিসেম্বরে স্থলে বাৎসরিক পরীক্ষা, পরীক্ষা গৃহের এক পাশে আগুন থাকতো লোহার কড়াইতে। মাঝে মাঝে হাতটি গরম করে নিতে হতো।

এখন শীতও কমেছে, বর্ষাও কমেছে কারণ মাহুঘ বেড়েছে, গাছ কমেছে। এখন অবিশ্যি জলপাইগুড়িতে বসন্তও আসে, শরৎও আসে তবে “ক্ষণকালের” জন্তু।

ব্রহ্মার কোপ

আগেই বলেছি সহরে সব কাঠের ও খড়ের বাড়ি। ১৮৯১ সনে ইংরেজ সরকার জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনারকে লিখছেন—সহরে কাছারী, সার্কিট হাউস, স্কুল ও অন্যান্য সরকারী বাড়িগুলি অস্থায়ীভাবে তৈরী, আগুনের ভয় আছে, প্রতি বছর মেরামতের ব্যয় অনেক। চার বছরের জন্তু এগুলি মেরামতের ভার জেলা বোর্ডের হাতে দেবার প্রস্তাব এল। জেলা বোর্ড এ বাবদ নয় হাজার টাকা চেয়ে বসলেন। কিন্তু আগুন এ কাজ সহজ করে দিল।

আদালতটি পুড়ে গেছে ১৮৭৪ সনে কিন্তু ট্রেজারী পুড়লোনা। ইংরেজের জোর কপাল। মুন্সিফ আদালতটি পুড়লো ১৮৯৭ সনে, সার্কিট হাউস ১৮৯৮ সনে, ডেপুটি কমিশনারের আপিস ১৯০৬ সনে। বর্তমান টাউন ক্লাব মাঠের পূর্ব দিকে ছিল বিরাট লম্বা একটি ঘরে বিভাগীয় কমিশনারের আপিস ও ডেপুটি কমিশনারের অস্থায়ী আপিস। খড়ের চাল। পুড়লো ১৯০৮ সনে। রেসকোর্সে সাহেব মেমদের রেস দেখতে বসবার জন্তু ছিল একটা লম্বা খড়ের ঘর। এটাও পুড়লো ১৯০৮ সনে।

বিভাগীয় কমিশনারের আপিসটি চলে গিয়েছিল রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ায় ১৮৭৮ সনে। ফিরে এল ১৮৮৮ সনে। কিন্তু এ আপিসটিও পুড়ে গেল।

দিনবাজারে ভাল করে বাজার তৈরী করার জন্তু রাণী জগদীশ্বরী পৌরসভার অহুমতির জন্তু আবেদন করেন ১৮৮৭ সনে। ১৮৮৮ সনে বাজারটি চালু হল। এই বাজারে বহুকাল আগের প্রতিষ্ঠিত এক কালীবাড়ি ছিল। এটিতে টিনের ছাউনী দেওয়া ও নিত্য পুজার ব্যবস্থা হল। ১৯০৫ সনে এই বাজারটি পুড়ে গেল কিন্তু কালী-বাড়িতে আগুন ধরলো না। বেশ মনে আছে কি ভয়ানক আগুন। আগুনে পুড়ে লাল লাল টিন আকাশ দিয়ে ছুটে চলেছে প্রবল বাতাসে। আমাদের বাসা বাজারের কাছেই। উঠানে বসে আছি, কখন পালাতে হয় এই আতঙ্কে। বাজারের মালপত্র সবাই এনে ফেলছে আমাদের বাইরের উঠানে। ওদের ধারণা আমাদের বাসা পুড়বে না। কেন জানি না। সত্যিই আগুন এদিকে এল না। তিনদিন ধরে বাজার পুড়লো। তখন দমকল ছিল না। বালতি বালতি জল বুথাই ঢালা হল আগুনে। ১৯১৪ ও ১৯২২ সনেও বাজার পুড়লো। এবার সওদাগর পট্টির সব দোকান শেষ হল। তখন অগ্নিবীমা চালু হয়নি। যাদের গেল, সব গেল।

এখন যেখানে বিভাগীয় কমিশনারের বিরাট সৌধ সেখানে ছিল এই সহরের একমাত্র হাই স্কুল। ইংরেজ সরকার এই স্কুল স্থাপন করেন ও পরিচালনা করতেন। এই স্কুল গৃহের ছিল কাঠের ছাউনী। তৈরী হয়েছিল ১৮৭৬ সনে। এই স্কুল স্থাপন করেন ও পরিচালনা করতেন। এই স্কুল গৃহের ছিল কাঠের ছাউনী। তৈরী হয়েছিল ১৮৭৬ সনে। ১৯০৭ সনে কাঠের ওপরে টিনের ছাউনী যোগ দেওয়া হল। আমি তখন নীচু ক্লাসের ছাত্র। টিনের ছাউনী দেখে খুব খুসী। সেই বছরেই স্কুলটি আগুনে পুড়ে গেল। কয়েক মাস ছুটির পর, এখন যেটা নরেন ব্যারাক সেখানে ছিল একটি মাঠ। নাম ছিল পল সাহেবের হাতা। পল ছিলেন পাটের ব্যবসায়ী। এই মাঠের একদিকে ছিল একটা ছোট টিনের ঘর আর অত্রদিকে (পশ্চিম দিকে) ছিল একটি বড় খড়ের ঘর। জেলা স্কুলটি এখানে উঠে এল। দু'বছর বাদে খড়ের ঘরটি পুড়ে গেল। আবার ছুটি। তিন মাস বাদে দুই নম্বর রেল গুমটির কাছে নগেন্দ্র নাথ সিকদার মহাশয়ের নতুন কেনা বাড়িতে স্কুল এল। এই বাড়িতে এখন তাঁর ছেলে নৃপেন সিকদার ও রবি সিকদার বাস করছেন। এটা পোড়ে নি, কারণ সব চাল ছিল টিনের। ১৯১১-১২ সনে তিস্তার ধারে কর্ণেল হেদায়েৎ আলীর বাসায় স্কুলটি উঠে গেল বড় মাঠ। কর্ণেল সাহেবের একটা বড় খড়ের ঘর ছিল আর মাঠের ভেতরে একটা টিনের ঘর তোলা হল (এখন এটা হয়েছে হোটেল বাড়ি)। এখানে স্কুল চলতে থাকলো আর কর্ণেল সাহেবের হাতার একধারে স্কুলের দালান উঠতে থাকে। ১৯১৪ সনের নভেম্বর মাসে অর্থাৎ ১৯১৫ থেকে বর্তমান দালানে স্কুল শুরু হল। ১৯২২ সনে ফণীন্দ্র দেব স্কুলটি পুড়ে গেল। ১৯২৪ সনে দালান উঠলো।

আগুনে পুড়ে পুড়ে সহর থেকে খড়ের ঘর লোপ পেল, সে জায়গায় উঠলো টিনের ঘর ও দালান।

কয়েকটি পুরোণো বাড়ি ও পৌর আপিস

সহরে পৌর কাজ শুরু হয় 'জলপাইগুড়ি ইউনিয়ন' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ১৮৮৪ সনে এটা বাতিল করে ১৮৮৫ সন থেকে পৌর প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মিউনিসিপালিটি হল। ১৮৭১ সনে রোড সেস আইন চলিত হবার পর ১৮৭৮ সনে এ সহরে 'রোড সেস বোর্ড' অর্থাৎ আর, সি, বি, গঠিত হল। এটা ভেঙ্গে জেলা বোর্ড হল দশ বছর বাদে ১৮৮৭ সনে। এখন যেটা জেলা স্কুল পরিদর্শকের আপিস এই বাড়িটি তৈরী করান কোচবিহারের মহারাজা ১৮৮০ সনে। এই বাড়ির নাম 'আয়রণ হাউস' আর হলটির নাম মহারাজার নামে 'নৃপেন্দ্র নারায়ণ হল'। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এই ঘরটি ভাড়া নিয়ে কিছুকাল কাজ চালান। এখন ষ্টেট ব্যাঙ্ক যেখানে, সে জায়গায় ব্যাঙ্কটি উঠে গেলে এই ঘরটি ভাড়া নিয়ে আপিস বসলো সেস বোর্ড, জেলা বোর্ড ও পৌর সভার। এর আগে সেস বোর্ডের আপিস কোথায় ছিল তার সংবাদ পাওয়া যায়নি। ১৮৮৪ সনে কোচবিহারের মহারাজা এই বাসাটি ছেড়ে দেবার নোটিস দেন! ১৮৮৯ সনে ঘরটি ভাল করে মেরামত করে দিয়ে আপিস তিনটি চলে গেল জেলা বোর্ডের বর্তমান নতুন দালানে। ১৮৯৩ সন পর্যন্ত পৌর প্রতিষ্ঠানের আপিস এখানেই ছিল। পরে নিজেদের দালানে উঠে যায়। 'আয়রণ হাউস' খালি হলে এখানে হল কোচবিহার মহারাজার জলপাইগুড়ি আপিস। এটি দিনবাজারে আর একটি দালানে চলে গেলে এখানে হল রাজসাহী-ভুক্তির ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস্ এর আপিস প্রায় ১৮৯৩-৯৪ সনে। ১৯৪৭ সনে বাংলাবিভাগের পর থেকে এখানে জেলার স্কুল পরিদর্শকের আপিস। তাই মনে হয় এইটি সহরের সব চেয়ে পুরোণো বাড়ির একটি পুরোণো চেহারা নিয়ে আজও বেঁচে আছে। অবশ্য পুরোণো রাজবাড়ি, রহিম বক্সের পুরোণো বাড়ি আর কিছু ছোট ছোট ব্যক্তিগত বাড়ি এর আগে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের চেহারা অনেক বদলে গেছে। আর একটি অতি পুরোণো বাড়ি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মত ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে সনাতন কাঠের খুঁটিগুলি ভর করে। এককালে এটি ছিল রাণী অমৃতেশ্বরীর

আমল থেকে বহু বছর বৈকুণ্ঠপুর জমিদারের সদর আপিস। রায়কত পাড়া যেতে নতুন কালীবাড়ির কাছে এই গৃহটি দেখতে পাওয়া যাবে।

জেলা হুক হবার সাথে সাথে তৈরী হল ডাকঘর। ১৮৭৮ সনের এই বড় ডাকঘরটি সহরের প্রথম দোতলা বাড়ি। এটি ভেঙ্গে ফেলে ১৯৬৭ সনে নতুন দালান উঠেছে।

সহরের নদী ও পুল

সহরের ভেতর দিয়ে চলেছে করলা নদী—সাহিত্যিক ভাষায় বলা হয় করলা। বোধ হয় তখন কলকল করে শ্রোত বহিতো। সহরের দক্ষিণ-পূবে মিশেছে তিস্তা নদীতে। উত্তর-পূব থেকে ছোট ধরধরা নদীটি মিশেছে করলায় প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। এই তিনটি নদী সহরকে করেছিল আত্মহৃদয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে নদীগুলি ছিল অনেক কম চওড়া কিন্তু গভীর, জল ছিল তক্তকে ঝকঝকে। নীচের বালি ও পাথর দেখা যেত স্বচ্ছ জলের ভেতর দিয়ে। এখন করলা ও ধরধরার জল কালো হয়েছে, কচুরী পানার দঙ্গল জল ছেয়ে ফেলেছে, জলের নীচে জঙ্গল গজিয়েছে। এরই ফলে অনেক লোক করলার জলে ডুবে মরেছে। পঞ্চাশ বাট বছর আগেও করলায় নৌকো চলতো অনেক। তিস্তা করলার মুখ খোলা ছিল। বহুদূর থেকে আসা নৌকোর ভীড় লেগে থাকতো দিনবাজার কালীবাড়ির ঘাটে।

সহরের পূব-দক্ষিণ দিয়ে চলেছে বিরাট তিস্তা নদী। পরিসর কম কিন্তু গভীর। বর্ষাকালে একটি ষ্টিমার চলতো এপার থেকে ওপার। ষ্টিমারটির নাম ছিল 'তিস্তা'। এখন যেটা পুলিশ সাহেবের কুঠি সেখানে ছিল ষ্টিমার ষ্টেশন। সেখান থেকে এক রেল লাইন এখনকার পুলিশ ব্যারাক, রামকৃষ্ণ আশ্রমের পাশ দিয়ে মিশতো জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রেলপথের আদরপাড়া গুমটিতে। এখন এর কিছুই নাই। বহু বছর আগে শীতকালে তিস্তার উঠতো বিরাট বালির চর, তাতে জন্মাত বাউ গাছের বন। শিক্ষক মশায়রা বাউএর ডাল আমাদের পিঠে ভাজতেন। তখন ছাত্রদের চাবুক মারা রেওয়াজ ছিল। এখন হলে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যেত।

করলা নদীর ওপরে তখন ছিল মাত্র দু'টি পুল। এগুলি হয় সেসবোর্ডের আমলে। ১৮৭৮ সন থেকে গবেষণা চলতে থাকে, দিনবাজারে করলার ওপর একটা কাঠের পুল তৈরী করতে হবে। ১৮৮২ সনে সেসবোর্ডের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় 'করলার পুল প্রায় তৈরী হয়ে এল'। টাকার বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪,৫০০। মনে হয় ১৮৮৪ সনে কাঠের পুলটি দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়। ১৯২১ সনে এই পুলটি ভাল করে মেরামত করা হয়। (মেরামতের সময়ে একটি অস্থায়ী বাঁশের পুলের ওপর দিয়ে যাতায়াত চলতো) ১৯৬৮ সনের বন্যায় এ পুলটি ধ্বংস হয়ে গেছে। ষ্টেশন-কাছারীর পথে করলার ওপর লোহার খুঁটি দিয়ে একটি ভাল পুল তৈরী হয় বোধ হয় ১৮৮৫ সনে। এই পুলকে সবাই বলতো 'লোহার পুল'। সেসবোর্ডের খাতায় দেখা যায় ১৮৮০ সনের ডিসেম্বর মাসে মিচেল এণ্ড কোম্পানীকে ২৪,১০০ টাকায় পুলটি তৈরী করার ঠিকা দেওয়া হয়। ১৯৪০ সনে জেলাবোর্ড এটা ভেঙ্গে ৭২,০০০ টাকা ব্যয়ে কংক্রিটের পুল করেন ও তখনকার বাংলা গভর্নরের নামে এটার নাম হয় 'ব্রেবোর্ণ ব্রিজ'। ১৯৬৮ সনের বন্যায় এই পুলটি ধ্বংস হয়েছে। আর একটি পুল তৈরী হচ্ছে পুরোণো পুলের কাছেই।*

সেস বোর্ডের আমলে ধরধরার ওপর একটি পুল তৈরী হয়। বহু সংস্কারের ভেতর দিয়ে আজও সেটা টিকে আছে। ১৯৬৮র বন্যায় পাশের রেলিংগুলি ভেঙ্গে গেছে।

* এখন পুলগুলি তৈরী শেষ হয়েছে।

কাছারীর কাছে করলার ওপর একটি হেঁটে যাবার পুল তৈরী হয় ১৯১৫-১৬ সনে। এটা দিয়ে কেবল সাহেবরা যাতায়াত করতেন। কালা আদমী এতে পা দিতে পারতেন না। এই ব্যাপার নিয়ে একটি মামলা হয়। ফলে সবার জ্ঞান পুলটি উন্মুক্ত হয়। ১৯৫০ এর বন্যায় একবার ভেঙ্গে যায়। আবার তৈরী হয়। ১৯৬৮ এর বন্যায় আবার ভেঙ্গেছে।

সদর গালস্ হাই স্কুলের কাছে করলার ওপর একটি কোলনা পুল তৈরী হয় ১৯২১-২২ সনে। দুইবার পুলটির তার ছিঁড়ে দুর্ঘটনা হয়। এটা ভেঙ্গে ফেলে এখানে কংক্রিটের পুল হয় ১৯৬৪ সনে। ১৯৬৮র বন্যায় এ পুলটি ধ্বংস হয়েছে। এই জায়গায় আর একটি পুল তৈরী হচ্ছে।

১৯৫৮ সনে মাষকলাইবাড়ি শ্মশান ঘাটের কাছে করলার ওপর একটি কাঠের পুল হয়। সেটা ভেঙ্গে ১৯৬৩ সনে একটি কংক্রিটের পুল হয়। ১৯৬৮ সনের বন্যায় এই পুলটি বেঁচে গেছে।

তিস্তা নদীর ভাঙ্গন ও পারাপার ব্যবস্থা

তিস্তার পূর্ব পাড়ে ছিল তিস্তা ঘাট স্টেশন। সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল বার্নেশ জংসন স্টেশন। তার পেছনে ছিল ডুয়ার্সের সব চেয়ে বড় বাজার 'বার্নেশ বাজার'। চোখের সামনে সবই ভেঙ্গে গেল, চলে গেল তিস্তার গর্ভে। ১৮৯৩ থেকে ১৯০১ সনের ভেতরে লালমণিরহাট থেকে মাদারীহাট পর্যন্ত বেঙ্গল ডুয়ার্স রেল পথ হয়েছিল, তারই প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় ছিল এই বার্নেশ জংসন স্টেশন ও সহরের সাথে ডুয়ার্সের একমাত্র ষোগাযোগ পথ। এখন এই স্টেশন বহুদূরে সরে গেছে, নাম হয়েছে ময়নাগুড়ি রোড স্টেশন। ১৯৪৭ সনে বাংলা বিভাগের পর লালমণিরহাটের সাথে সংযোগ নাই। মাত্র চাংড়াবান্ধা স্টেশনেই শেষ। এখন এই লাইন ভারত সরকারের। এখন তিস্তার ওপর রেল পুল হয়েছে সহর থেকে দু'মাইল উত্তরে।

তিস্তা ভাঙ্গন শেষ হবার আগে শীতকালে তিস্তার চরে বসান হত অস্থায়ী টুলি লাইন প্রধানতঃ সাহেবদের জ্ঞান। এ নিয়ে স্কুলের ছেলেদের সাথে খুব গোলমাল চলে। পরে আপোষে ঠিক হল চার পয়সা ভাড়া দিলে এই টুলিতে সবাই যাতায়াত করতে পারবে। টুলি লাইন উঠে গেল। এল 'চর ট্যাক্সী'। এসব মোটর গাড়ি ভাল রাস্তায় অচল কিন্তু চরে সচল। বালির উপরে খড় ফেলে পথ তৈরী হতো। এতে চড়ে চর পার হয়ে নৌকোয় তিস্তার জলটুকু পার হতে হত। এগুলিকে অনেকে বলতো 'টেরা প্লেন' অর্থাৎ মাটিতে চলা প্লেন। চলতে প্রায় প্লেনের মতই শব্দ হত। বহু পর্যটক আসতেন এই অভিনব বস্তুগুলি দেখতে। সহরের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে তিস্তার ওপর কংক্রিটের পুল হওয়ায় বার্নেশ ঘাটটি অচল হয়েছে, আর এসব ট্যাক্সীও বন্ধ হয়েছে।

শুনতে পাওয়া যায় প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে বার্নস ও মোলার নামে দুইজন সাহেব তিস্তা নদীর পূর্ব পাড়ে কিছু জমি নিয়েছিলেন চাষ-আবাদ করতে। এখন যেখানে সহরের সার্কিট হাউস সেখানে ছিল তাঁদের বাসা। সেখান থেকে তাঁরা নিজেদের নৌকোয় তিস্তা পারাপার হতেন। তখন এই ঘাটের নাম ছিল 'আবদুয়ার ফেরী'। লোকের মুখে মুখে এই ঘাটটার নাম হয়ে গেল বার্নস ঘাট। আর একটু বার্নিশ হয়ে নাম হয়ে গেল 'বার্নেশ ঘাট'। এই সাহেবেরা সহর ছেড়ে যান ১৮৮৬ সনে, কিন্তু নামটি আজও আছে। এমনভাবে হয়েছিল 'কিং সাহেবের ঘাট'। ডুয়ার্সের চা বাগানের ম্যানেজার পিলানা সাহেবের নামে 'পিলানস্ হাট'।

১২১০ সনের ভেতরে বার্ষিক, বার্ষিক বাজার সব খেয়ে তিস্তা আরও পূবে সরে যাবার চেষ্টা করছে। বৈজ্ঞানিকভাবে বাঁধ, পুল প্রভৃতি তৈরীর পর নদীটি পাগল হয়ে যে দিকে খুসী ভাঙ্গতে শুরু করেছে। নদীর গভীরতা একেবারে কমে গেছে। একটু বর্ষা হলেই বত্থা। দু'ধারে বাঁধ দিয়ে সব সময়ে রক্ষা করতে পারা যাচ্ছে না।

তিস্তার কথা বলতে একটি কথাই বলতে হয়। বর্ষাকালে জলের ভেতর থেকে কামানের গর্জনের মতো শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সঠিক কারণ এখনও গবেষণার জালে। একে বলে 'তিস্তা গান'। এ 'গান' সঙ্গীত নয়। এ 'গান' রণং দেহির আস্থান।

সাধারণ লোকের ধারণা তিস্তার এক দেবতা আছে নাম 'তিস্তা বুড়ি'। এখন 'তিস্তা বুড়ি' পূজা প্রায় বন্ধ হওয়ায় 'বুড়ি' রাগ করে তিস্তা নদীকে লেলিয়ে দিয়েছে প্রান্তীয় উত্তর বাংলার দিকে।

সহরে রোগ

কি ভয়ানক ম্যালেরিয়া ছিল। প্রায় সারা বছর দারুণ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। কেউ বাজার করতে যাচ্ছে; হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পথে পড়ে গেল। রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেল ভয়ানক ম্যালেরিয়া। মগজে জুটেছে ম্যালেরিয়ার বীজাণু। প্রায়ই মারা যেত। আর এক জ্বর ছিল নাম 'ব্লাক ওয়াটার'। জ্বর এল, দু'তিনবার কালো কালির মত প্রস্রাব হল। তিন-চার দিনের ভেতর এ পারে না হয় ওপারে। এই জ্বরের আতঙ্ক ছিল সবচেয়ে বেশী। আগে কলেরা, বসন্ত এখানে বড় ছিল না। আমাশয় ছিল। টাইফয়েড জ্বর খুব হতো। ১৯১৪ সন থেকে কালাজ্বর দেখা দেয় মহামারীর মতো। জেলা বোর্ডের অক্লান্ত চেষ্টায় কয়েক বছরের ভেতরেই অনেক কমে যায়। এই সব ব্যাধির ভয়ে এদিকে কেউ আসতে চাইত না। এখন এ সব ব্যারাম নেই। এখন যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ফাইলেরিয়া ও কোলাইটিস নিয়ে লোকে ব্যস্ত। টাইফয়েডও খুব কমে গেছে।

সহরে আলো

চোখের সামনে দেখলাম কাচের বড় আধারের ভেতর জলছে সরিষার তেলের প্রদীপ, বৈঠকখানা আলো করে আছে। তারপর প্রদীপের জায়গায় বসে গেল মোমের বাতি। তখন বড় বড় কাচের বাড়ি লঠনে ও কাচের হাঁড়িতে মোমবাতির রোশনাই। তারপর এল কেরোসিনের লঠন। যাতায়াত চলতো লঠন হাতে। কারবাইডের বাতি নতুন যুগের সূচনা আনলো। তারপর এলো ম্যাটেল লাগানো পাম্প করা কেরোসিনের বাতি, এলো হাজার। শেষে বৈদ্যুতিক আলো। এখনও গ্রামের উৎসবে জলে হাজার লঠন।

১৮৮৫ সন থেকে পৌরসভা ধীরে ধীরে সহরের পথে কেরোসিনের আলো দেবার ব্যবস্থা করে। অনেক সময়ে আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশী হত। তবুও নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। পথ চলতে হারিকেন লঠন দরকার হতো। তখন মনে করতাম পথের বাতিগুলি ইংরেজের সম্পত্তি, তাই টিল দিয়ে সেগুলি ভাঙতাম। পরে বুঝেছিলাম আমাদের জিনিষ আমরাই নষ্ট করতাম। এখন ৫৫৭টি বিদ্যুতের বাল্ব পথ আলো করে আছে। মাঝে মাঝে এগুলি চোখ বুঁজে পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ইলেকট্রিক ও টর্চ বাতি এখন হারিকেন লঠনগুলিকে প্রায় নির্বাসন দিয়েছে।

সহরে আলোর সাথে হয়েছে কলের জল। প্রায়ই বন্ধ থাকে। পুরোণো কুয়োগুলিকে চালু রাখতে হয়।

তাইতো পুরোণো কথা এত বলছি।

হাসপাতাল

ট্রেডিং ব্যাঙ্কের লাল দালানটির জায়গায় ছিল প্রথম হাসপাতাল। পাকা মেঝে, চাটাই-এর বেড়া, ওপরে ঝড়ের চাল আর বড় বড় কাঁচের দরজা। পরে ছাউনী টিনের হয়। পুরোণো ব্রাহ্মসমাজ, বর্তমান মেডিকেল এসোসিয়েশনের বাড়ি যেখানে সেখানে ছিল 'পোস্ট মর্টেম হাউস'। লোকে বলত 'চাকঘর'। চারদিকে ডুরাঙা হেজের বেড়ায় ঘেরা। এগুলি কাটা হতো না। গাছগুলি বড় হয়ে চাকঘরটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতো। একটা ছোট ভোম বস্তী বাদে ওদিকে বসতি ছিল না। উত্তরে ও পশ্চিমে আমের বন। ভূতের ভয়ে ওদিক দিয়ে একলা কখনই যেতাম না, সন্ধ্যার পরেতো নয়ই। একজন সাহেব ডাক্তার ও একজন কালো আদমী 'নেটিভ ডাক্তার' হাসপাতালের কাজকর্ম চালাতেন। অনেক বছর বাদে এখন যেটা জেনারেল হাসপাতালের বহিবিভাগ সেই দালানটিতে হাসপাতালটি চলে এল। হাসপাতালে নার্স একরকম ছিল না। সহরের অনেক যুবক স্বেচ্ছায় সেবা করতো। এ কাজে সাদা ও কালো উভয় ডাক্তারই উৎসাহ দিতেন। পুলিশ এই কাজে কোন এক ধরনের রাজনীতির গন্ধ পায়। ফলে এই জনকল্যাণ কাজটি বন্ধ হয়ে যায়।

এখন হাসপাতাল কত বড় হয়েছে ; কত ডাক্তার, নার্স, কত যন্ত্রপাতি, কত নতুন দালান। কিন্তু সে সময়ে রোগী, চিকিৎসক ও সহরবাসীর ভেতরে যে মধুর সম্পর্ক ছিল, সেই সহৃদয় মনটি এখন আর নেই বলে মনে হচ্ছে। কালের গতি !

টাকা-পয়সা

ইংরেজ সরকার আসবার পর রূপোর টাকা, আধুলি, সিকি, দোয়ানী আর তামার ডবল পয়সা, পয়সা, আধ পয়সা, পাই পয়সা বাজারে এসে গেল। চক্চকে পাই পয়সাগুলি দেখতে খুব ভাল লাগতো। তখনও ছোট-খাট কেনাকাটি কড়ি দিয়েই হতো। এক পাই পয়সা দিয়ে চারটে কড়ি কিনতাম। কড়ি খেলারও খুব ধুম ছিল যেমন দশ-পঁচিশ, বাঘ-বন্দী, ছক্কা-পাঞ্জা প্রভৃতি। গ্রামের ছেলেমেয়েরা কড়ি দিয়ে খেলতো ঘোলো-পাইতা, দশ-পাইতা, পাকর ঘুসা প্রভৃতি। ধীরে ধীরে কড়ি উধাও হবার সাথে সাথে কড়ি দিয়ে খেলাও। রূপো ও তামার টাকা পয়সার বদলে নানা ধাতুর মিশ্রিত আনা, পয়সা চালু হয়েছে।

কেনা-বেচা

দুধের মত সাদা তুলাপাঞ্জী ও স্বর্ণশঙ্খ কালো নেনিয়া বা হুনিয়া চালের মণ ছিল তিন টাকা, মোটা চাল দেড় টাকা মণ, ১২১০ সন পর্য্যন্তও। ১২০৫ সনে মোটা চালের মণ পাঁচ টাকা হওয়ায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। খাটা গাওয়া ঘি তিন টাকা সের, খাঁটি সরষের তেল চার আনা, খাঁটি দুধ টাকায় আট সের। খই, মুড়ি বাজারে খুব উঠতো। শামুক পুড়িয়ে চুন তৈরী হত। এ দুটো ছিল মেয়েদের ব্যবসা। মোহন্তপাড়ায় 'চুনভাটি' পুরোনো কথা মনে করচ্ছে।

সেকালের লোকদের বুদ্ধি ছিল না। ভেজাল দেয়া পাপ মনে করতো, মিথ্যে কথা বলতে চাইতো না, চুরি ছিল না বললেই চলে। ১২১০ সন পর্য্যন্ত সব জিনিষ বাইরেই পড়ে থাকতো, সহসা সেগুলি খোয়া যেত না। এখন সবাই বেশ চালাক হয়েছে। ভেজাল, চুরি, ডাকাতি হয়েছে রোজকার ব্যাপার। পুর্নিয়া থেকে গোকর গাড়ি বোঝাই আম আসতো। ১২১৪ সনের আগে এক গাড়ি আম বিক্রি হত দু'টাকা-আড়াই টাকায়। আম থাকতো এক হাজারেরও বেশী। গাছ থেকে বহু পাকা জলপাই পথে পড়ে থাকতো ; কাঁঠাল ছিল অনেক, কাঁঠাল

বাজারে বিক্রি হতো না, যার যত খুসী পেড়ে খাও। সাধারণ লোক বছরের কয়েকমাস আম, কাঁঠাল, জলপাই প্রভৃতি একরকম বিনে খরচেই খেতো। মনে হয় এইসব কারণে ভীষণ ম্যালেরিয়ায় ভুগেও শরীরটা তাজা ছিল।

দরাজ সমাজ

ছোট সময়ে দেখেছি প্রতি রবিবার কিছু চাল আর একটি নারকেল খোলার বাটি দিয়ে আমাদের বসিয়ে দেয়া হতো বাইরের বারান্দায়। ভিক্ষুক এলেই এক বাটি করে চাল তাকে দিতাম। ভিক্ষা করতো কিছু হাড়ি, মেথর ও কয়েকজন বিহারী। এদেশী গ্রামের লোকদের সহরে এসে ভিক্ষা করতে কখনই দেখিনি। রবিবার বাদে অগুনি কেউ আসতো না ভিক্ষা করতে। প্রত্যেক পূজা বা শ্রাদ্ধে দরিদ্র নারায়ণ সেবা হতো। পঞ্চাশ জনের বেশী দরিদ্র সংগ্রহই করা যেতো না। ১৯৩০ থেকে দরিদ্রের সংখ্যা বাড়তে শুরু হয়। ১৯৪৭ সনের পর থেকে এই সংখ্যা বাড়লো অসম্ভব ভাবে। গ্রামের লোকও ভিক্ষা করতে শুরু করলে। এখন মনে হয় সারা দেশটাতেই যেন দারুণ অভাব এসে গেছে। এদিকে কন্ট্রোল, বাড়তি চাল নেই, ছেলেদের দিয়ে ভিক্ষার্থীদের বলান হচ্ছে 'হবে না'। এই 'হবে না' শিক্ষা শেষকালে বুড়ো বাপ-মায়ের ঘাড়ে না চাপে। এমনি আশঙ্কা এখনই দেখা দিয়েছে।

দিনবাজারে এক পাঠশালা ছিল। নাম ছিল 'কাঁইয়া স্কুল'। রামচন্দ্র সরকার ছিলেন পণ্ডিত। তাঁর ছিল লম্বা দাড়ি। তাই তাঁর নাম দিয়েছিলাম 'দাড়িয়া পণ্ডিত'। বড় মারতেন আবার খুবই স্নেহও করতেন ছেলেদের। ছুটি হলেই সবাই যেতাম প্রভুদয়ালের বাসায়। তাঁর স্ত্রী অতি যত্নে সবাইকে 'দহিবড়া' খাওয়াতেন। তখন বাঙ্গালী-মাড়োয়ারীর ভেতরে কোন তফাৎ আমরা জানতাম না। মাড়োয়ারী ছেলেরাও আমাদের বাসায় দৌরাছু করে খেয়ে যেত।

সস্তর আশী বছর আগে সহরে লোক ছিল কম, সবাই বিদেশী। তাই সবাই মিলে সারা সহরে একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল। ধনী-দরিদ্রে তফাৎ বড় ছিল না। কারুর কোন বিপদ হলে সবাই এগিয়ে আসতো সাহায্য করতে।

নতুন সহর। হোটেল ছিল না। প্রতি বাড়িই হোটেল। চেনা বা অচেনা সবাই কোন না কোন বাসায় থাকতে ও খেতে পেতো। অবশ্য তখন আগন্তুকের দল ভোজন দক্ষিণা বাবদ কিছু জিনিষ পত্ৰ নিয়ে পালাতো না। নেমস্তন্ন লেগেই থাকতো, এ বাড়ি নয় ও বাড়ি। অর্থবান ও নামী পরিবারের গৃহিনীরা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে রান্না করতেন, বাড়ির ছেলেরা পরিবেশন করতো। সামাজিক কড়াকড়ি খুব ছিল। আগে উঁচু জায়গায় ব্রাহ্মণের দল খেতে বসবেন তারপর অন্ত্র অ-ব্রাহ্মণের দল অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গায় বসবেন। আমাদের বাড়িতে এক সময়ে এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হওয়ায় খুব ঝামেলা হয়েছিল। কোন পরিবারের কেউ সমুদ্র যাত্রা করলে ব্রাহ্মণরা সে বাড়িতে খেতেন না। এ নিয়ে সহরে বহু গোলমাল হয়েছে। ব্রাহ্মণ বাড়ির রান্না ঘরে পিঁয়াজ, রসুন, ডিম প্রভৃতি প্রবেশ করতে পারতো না।

আমার চোখের ওপরেই এই সব সামাজিক আচার ও দরাজ মনটি সবই ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে গেল। এখন সব জাত একসাথে বসে খেলে জাত যায় না। সমুদ্র যাত্রার কথা কেউ মুখেই তোলে না। 'হিন্দু মুরগী' ব্রাহ্মণেরা ঘরেও উঠেছে। জাতটা খুব পাকা হয়ে গেছে, সহসা খোয়া যায় না। কিন্তু বর্তমান আইন, রেশন ও অভাব

মাহুষের দরাজ মনটাকে ছোট করে ফেলছে। সমাজ হয়ে যাচ্ছে এক যৌথ কোম্পানীর মতো। সবাই পৃথক অথচ সমাজ।

পঞ্চাশ ষাট বছর আগে দেহটা ছিল দূরে কিন্তু মনটা ছিল কাছে। এখন দেহটা এসেছে কাছে কিন্তু মনটা চলে যাচ্ছে দূরে।

তালেবর সওদাগরের দোকান ছিল ১৯১০ সন পর্যন্ত। মস্ত দোকান। কলকাতার প্রান্তিন 'হোয়াইট এণ্ডয়ে লেইডল' এর দোকানের মত সব জিনিষ পাওয়া যেত। জুতো পায়ে দিয়ে দেখতাম কচমচ করে কিনা। না করলে সেটা জুতোই নয়। তাই চাইতাম ল্যাটিমার জুতো। বুড়ো সওদাগরের ছিল লম্বা দাড়ি। তিনি হেসে পুরোণো এক জোড়া জুতো ব্রাশ করতে করতে এনে বলতেন 'এই নেও বাঘ মার্ক জুতো'। সাথে সাথেই প্রাণ খোলা হাসি। সব হাসি, সব মেলা মেশা একেবারে উবে গেছে রাজনীতির চাপে। মনে আছে পুরোণো মধুর স্মৃতি টুক।

নবদ্বীপের মিষ্টির দোকান যেন কলকাতার পুঁটিরাম। নবদ্বীপ খাঁটি বৈষ্ণব, তাই সব খাঁটি মেঠাই বিক্রি করতো। ষোলটায় সের রসগোল্লা, এক সেরের দাম দু'টাকা; খুব ভাল ছানার বরফি, আটটায় সের, প্রতি সের দু'টাকা। ১৯২০ সনেও জলপাইগুড়ির বাজারে এই দর ছিল। নবদ্বীপের দোকান আরও আগের, দাম আরও কম, জিনিষ আরও খাঁটি। বহু বছর বাদে সেইখানে হয়েছে কাঁঠাল তলার মিষ্টির দোকান। এই নতুন দোকানের মালিক নবদ্বীপের মত খাঁটি বৈষ্ণব কিনা জানি না।

সে কালে, ১৯১৪ সন পর্যন্তও দুর্গা পূজায় মুসলমানেরা ও মহরমে হিন্দুরা প্রাণ খুলে যোগ দিত। এগুলি ছিল জাতীয় উৎসব। বছর কুড়ির ভেতরে সব আলাদা হয়ে গেল। সাথে সাথে মনটাও।

পাঠাগার

সহরে অনেক লেখাপড়া জানা লোক এসে গেল। মনের খোরাক চাই। বর্তমান দিনবাজার ডাকঘরটি যেখানে সেখানে একটি কাঠের ঘর ছিল। ১৮৯০ সনে এখানে একটি ছোট পাঠাগার খোলা হল। দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক। ১৯২২ সনে এটা বন্ধ হল। ১৯০৫ সন থেকে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। বর্তমান গুরুজাংঝোরা চা কোম্পানীর বিরাট সৌথের জায়গায় ছিল একটি টিনের ছাউনী কাঠের দোতলা ঘর। এরই নীচু তলার একটি প্রকোষ্ঠে 'ইউনিয়ন ক্লাব' নামে যে গ্রন্থাগার হয়েছিল ১৯০১ সনে সেটা অনেক বড় হয়ে উঠলো ১৯০৫ সনে। শরৎ সেন ছিলেন প্রথম অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক। এই ক্লাবের পেছনের জমিতে ছিল এক ব্যায়ামাগার। সিংহেশ্বর নামে এক পালোয়ান কুস্তি শেখাত। আর ছিল লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও অস্ত্র ব্যায়ামের ব্যবস্থা যাতে মাথা ও দেহ দুইই সবল হয়ে ওঠে। প্রতি শনি ও রবিবারে স্থানীয় উকিল মশায়রা নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। অনেক নতুন বিষয়ে জ্ঞান লাভ হতো। তখন আইন ব্যবসায়ীরাই ছিলেন অগ্রণী। ইংরেজ সরকারের শুভ দৃষ্টি পড়লো। ১৯১৪ সনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর থেকে ছোট ছোট গ্রন্থাগার অনেক হয়েছিল। এখন সারা জেলায় ১২৫টি গ্রন্থাগার নির্ভয়ে কাজ করছে।

শিক্ষা

স্কুল শিক্ষকদের ছিল খুব সম্মান যদিও তাঁরা ছিলেন দরিদ্র। অভিভাবকদের সাথে মেলামেশা ছিল। কোন বিশেষ অহুষ্ঠানে সবার আগে নেমস্তন্ন হতো শিক্ষকদের বিশেষ সম্মানিত হিসাবে। কলেজ হল এ সহরে ১৯৪২

সনে। এখন মনে হয় শিক্ষকদের সেই মর্যাদা অনেক কমে গেছে। অর্থকৌলিন্যের বাজারে বিদ্যা ও শিক্ষার স্থান অনেক নীচে নেমে গেছে। পূর্বের মত স্বাধীনচেতা শিক্ষকও এখন বড় দেখা যায় না। সহরে কলেজের অধ্যাপকগণও বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছেন না। কার দোষ, হিসেব করে বলা শক্ত। অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন রাজ-নৈতিক আবর্তে শিক্ষকদল যেন জড়িয়ে যাচ্ছেন। কার্লমার্কস ও এঙ্গেল্‌স তাঁদের কমুনিষ্ট ম্যানিফেস্টোতে প্রায় একশো বছর আগে লিখেছিলেন যে ধনতন্ত্রের শেষপাদে সব স্বাধীন ব্যবসায়ীরা অর্থের দাস হবে। অর্থবান তাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি, কুশলতা এমন কি ব্যক্তিগত মতামতও কিনে নেবে। অর্থ সবাইকে পরাধীন করবে। হয়তো এতকাল বাদে তেমনি যুগ এসে যাচ্ছে এদেশে।

পত্রিকা

১৯০০ সনে 'ত্রিশোতা' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ হয়। পত্রিকা হচ্ছে, শিক্ষিত সমাজের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু। তখন একমাত্র ছাপাখানা 'জলপাইগুড়ি প্রেস'। স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৫ সনে। 'ত্রিশোতা' এখানে ছাপা হয়। সম্পাদক ছিলেন কবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী। তিনি তখন এই সহরে থাকতেন। বছর পাঁচেক বেঁচে ছিল পত্রিকাটি। ১৯২০ সনের পর থেকে সহরে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, অনেকের অকাল মৃত্যুও ঘটেছে।

স্বদেশী জোয়ার ও নাট্য সমাজ

যুবকদল উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বিপথে চলছিল। শশীকুমার নিয়োগী মশাইএর চেষ্টায় খোলা হল এক নাট্য সমাজ। যুবকদের ভিড়িয়ে দিলেন এখানে এই নেশায়। প্রথমে নাটক হতো শশীবাবুর বাসাতেই। ১৯০৫ সনে হল 'আধ্যনাট্ট সমাজ' গৃহ। সেখানেই তখন নাটক হতো। ষ্টেজের সামনে লেখা থাকত 'উদ্ভিষ্টত জাগ্রত প্রাপ্য বরণ নিবোধত'; 'মত্তমদেয়মপেয়মগ্রাহম'; 'বন্দে মাতরম'; সদা সত্য কথা বলিবে'; 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'; ইত্যাদি যাতে সব দর্শকের সামনে এগুলি থাকে, সবারই নীতি-শিক্ষা হয় ও দেশপ্রেম জাগে। ১৯০৭ সনে এই গৃহেই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি ভেঙ্গে গেল ১৯১১ সনে। এর পর হয়তো আদর্শের পরিবর্তন হল। গৃহটি পুনরায় সংস্কারের সময় অনাবশ্যক বোধে ঐ লেখাগুলি মুছে ফেলা হল। এই ঘরটি ভেঙ্গে বিরাট 'রবীন্দ্র ভবন' হচ্ছে। এখন আদর্শের লক্ষ্য কি হবে এখনও জানা নেই। এখন সহরে আরও নাট্ট মন্দির হয়েছে।

১৯০৫ সন থেকে স্বদেশী বক্তৃতা হ'ত ম্যাজিক লর্ডন সহযোগে। বক্তৃতা শোনার চেয়ে সে কালের এই অভিনব বস্তুটির প্রতি বেশী আকর্ষণ ছিল। সম্প্রতি যাত্রাগান, কবিগান প্রভৃতি হচ্ছে সরকারী প্রচেষ্টায়। মনে হয় এগুলির পেছনে বড় আদর্শের অভাবে লোককে আনন্দ দিচ্ছে বটে কিন্তু মনে নাড়া দিতে পারছে না। অথচ ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সনের ভেতরে কথকতায় 'সিংহের দাপটে প্রাণ যায় মা' গানটি আজও মনে গেঁথে রয়েছে।

যানবাহন ও চলাচল

পাকী এখন দেখা যায় না। পঞ্চাশ বছর আগে পাকীই ছিল প্রধান বাহন। সহরে পাকী ছিল অনেক। বেহারা সবাই বিহারী। উড়িয়াদের মতো চিংকার করে পাকী বইত না। কবি সত্যেন দত্ত এই পাকী বহা দেখলে বোধ হয় আর একটি কবিতা লিখতেন। মেয়েরা ছিলেন ভীষণ পর্দানশীন। পথের এপার থেকে ওপার

যেতেন বন্ধ করা পাকী চেপে। যাত্রা, থিয়েটার, কথকতায় যেতেন পাকীতে, বসতেন বাঁশের চিকের আড়ালে। এ জিনিষটি এখন দেখাই যায় না। এখন চিক টাঙ্গিয়ে দিলে মেয়েরা ঘোর আপত্তি জানাবেন, হয়ত ভেদেই ফেলবেন। ঘন বসতি এলাকায় মেয়েরা এ বাড়ি ও বাড়ি ভেতর দিয়ে অনেক দূর যেতে পারতেন। এটা ছিল মেয়েদের বিশেষ পথ। এক এক বাড়িতে বসতো মহিলা পার্লামেন্ট। এই ভাবে মেলামেশা নিবিড় হতো। পুরুষেরা প্রায়ই পদাতিক। নৌকোতেও যাতায়াত চলতো। তাকিয়া ঠেস দিয়ে, গড়গড়ায় ফৌজদারী বালাখানা তামাক টানতে টানতে চলায় একটা আমীরী ভাব ছিল। উকিল বাবুদের পোষাক ছিল ঢিলে পা-জামা, কালো চোগা,—চাপকান ও গোল করে পাকান সাদা চাদর গলা থেকে ঝুলতো, মাথায় থাকতো লাল-কালো মেশান পীর-আলি টুপী যেমনটি বক্সিমচন্দ্র, রামমোহনের ছবিতে দেখা যায়। এমনি পোষাক পুরোণো বাড়িগুলিতে খোঁজ করলে হয়ত এখনও পাওয়া যেতে পারে। চোগার ফাঁকে সোনার গার্ভ চেন দেখা না গেলে আভিজাত্যই প্রমাণ হতো না। লম্বা দাড়ি বা ফ্রেন্চ কাট তখন ছিল সম্রাস্ত বংশের রেওয়াজ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, সবারই ছিল দাড়ি। এখন ওসব জঞ্জাল টেঁচে সাফ করা হয়েছে। ঘড়ি গেছে কজিতে, জামার অন্তরালে।

বড় বড় ফর্সি বা আলবোলা ও তার সুন্দর লম্বা নল ছিল বৈঠকখানায় ফরাসের শোভা। হুগন্ধি তামাকের সৌরভ ছিল ঘরের আমেজ। কেউ এলেই সবার আগে তামাক দিয়ে অভ্যর্থনা, তারপর কথা। এখন হয় চায়ের টেবিলে কথা, তখন ছিল ফরাসে বসে আলাপ। জাতের বিচার বড় ছিল। প্রত্যেক জাতের জ্ঞান আলাদা হুকো ছিল ও নানা রকমের কড়ি বেঁধে মার্কী থাকতো। হুকোতে থাকতো জল তাই জাত নষ্ট হবার আতঙ্ক ছিল, কিন্তু কজিতে থাকতেন ব্রহ্মা অর্থাৎ আগুন। সেটি যে কোন হুকোর মাথায় বসতে পারতো। এতে জাত ঠিক থাকতো। এখন তামাক সাজাবার ভৃত্য রাখা দুষ্কর তাই চলন হয়েছে চা আর সিগারেটের।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সহরে এল দুটো বাইসিক্ল। চললেই গোকুর দল তাড়া করতো। ১৯১৪ সনেও এই অভ্যাস গোকুরুলের ছিল। হিঙল উড নামে একজন সাহেব ডাক্তার এক চাকার সাইকেল চড়ে বেড়াতেন। একটি বড় চাকা, তার মাঝখানে প্যাডেল, উপরে বসবার সিট, পেছনে বাঁকা রডের সাথে ছোট একটা চাকা লাগানো। সব সময়েই প্যাডেল করতে হতো আর ছোট চাকাটি মায়ের পেছনে বাচ্চার মতো চলতো ১৮৬৬ সনে বিলেতে এই রকম সাইকেলের চলন ছিল। এর নাম ছিল ‘ভেলী পেড’ বা ‘বোন-শেকার’। চলিত কথায় বলা হতো ‘পেনী-ফারদিং’। বড় চাকাটি ‘পেনি’ আর ছোটটি ‘ফারদিং’। এমনি গাড়ি এখন দেখা যায় না। দু-চাকায় দেশ ছেয়ে গেছে। গোকুরুলিও বুঝেছে এগুলি সম্পূর্ণ অহিংস।

এল ঘোড়ার গাড়ি। রাজবাড়িতে একটি আর রহিমবক্স পেশ্কার সাহেবের বাড়ি একটি করে ‘ল্যাণ্ডু’। বড় বড় বিয়েতে চেয়ে নেয়া হতো। কেউ আপত্তি করতেন না দিতে। এল দু’চাকার টমটম। তারপর পাকী-গাড়ি। ‘ভাইক’ বা ষ্টুয়ার্ট এর রবার টায়ার শব্দহীন গাড়ি আর কাঠের চাকায় লোহার পাত জড়ানো গাড়ি। হলো একটা ‘ক্যারিইং কোম্পানী’। এরা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া খাটাতো। বিরাট শব্দ করে যখন পথে চলতো, এতে চড়ে কি আনন্দ। শব্দটাই ছিল আনন্দের উৎস। পীচ দেওয়া পথের কথা তখন কেউ ভাবতেই পারতো না। ১৯১৪ সনে এই কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেল। এখন ঘোড়া দেখতে যেতে হবে চিড়িয়াখানায়।

এলো দুটো মোটরগাড়ি। রাজবাড়ীতে ও পেশ্কার সাহেবের বাড়িতে। প্রসন্নদেব রায়কত সাবালক হয়ে রাজা হয়েছেন। পেশ্কার সাহেবের জামাই মুসারফ হোসেন উকিল হয়ে এসেছেন, মোটর তো চাই-ই। এই

গাড়ি চলতে শুরু করলে গোরুর দল পেছনে তাড়া করতো। এর আগে আমাদের বাসায় রংপুরের কাকিনার মহারাজের একখানি মোটর গাড়ি এল। কি ভীড় সেই অভিনব বস্তুটি দেখতে। চালককে অনেক খোসামুদি করে একবার চড়ে বসে দেখলাম কেমন লাগে। কোথাও পেট্রোল পাওয়া গেল না। শিলিগুড়ি থেকে পার্কতীপুর পর্যন্ত কোথাও পেট্রোল নেই। শেষে কলকাতা থেকে সীলকরা টিনে পেট্রোল এলে গাড়িখানি চলে গেল।

এখন মোটর চাপা থেকে প্রাণ বাঁচানই দায়। পেট্রোল পাম্প পথে-ঘাটে। গোরুগুলি 'ডোট কৈয়ার'। ১৯২৪ সনে প্রথম এরোপ্লেন এল, নামলো রেস কোর্সে। দেখার জন্তু হাট বসে গেল। এখন রোজই প্লেন চলে। কেউ তাকিয়েও দেখে না।

শিল্প ও ব্যবসা

শিল্পের দিক থেকে বাঙ্গালীর দল প্রথম চা কোম্পানী খোলেন ১৮৭৯ সনে। সাহেবেরা খোলেন ১৮৭৪ সনে। চা বাগান খোলায় সহরের সবাই কমবেশী সাহায্য করেছিল। চা এই জেলার বড় সম্পদ।

১৯০৬ সনে একটি কাপড়ের কল বসে। কোম্পানীর নাম ছিল 'শিল্প সমিতি'। জায়গাটি ছিল বিরাট অরণ্য যদিও সহরের ভেতবেই। করলা নদীর ধারে কিছু জায়গা সাফ করে ফ্যাক্টরী হল। তখন এদিকে কলের তাঁতি ছিল না। আরও কিছু জঙ্গল সাফ করে মাদ্রাজ থেকে শ্রমিক এনে বসানো হল। কল চললো। কাপড় তৈরী শুরু হল। হঠাৎ কলেরা লেগে বহু শ্রমিক মারা গেল। শেষ ক'জন পালালো। কল বন্ধ। কয়েকমাস বাদে আর একদল শ্রমিক আনা হল। কয়েকমাস বাদে আবার কলেরা লেগে কিছু লোক মারা গেল। বাকি ক'জন পালালো। সবার ধারণা হল এই বনে 'ছাও' বা ভূত আছে। তার এলাকায় অল্প কেউ বাস করতে পারবে না। আর শ্রমিক পাওয়া গেল না। যজ্ঞেশ্বর সান্তালকে কলের কাজ শিখিয়ে আনা হয়েছিল (ভাইপো শুক্রেস্বর সান্তাল উকিলপাড়া)। তিনি হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে মারা গেলেন। কল একেবারে বন্ধ হল। বহু বছর বাদে ১৯১০ সনে মোহিনী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁতগুলি কিনে কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিল স্থাপন করেন। সব গেল, রয়ে গেল নামটি।

কয়েক বছর বাদে বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র কুমুদিনী চক্রবর্তী এখানে দেশলাইয়ের ছোট একটি কল বসান। এটাও চললো না। তারপর মনোরঞ্জন দাসগুপ্ত এখানে তেলের ঘানি বসান। সেটাও চললো না। মনে হয় এই জমিতে শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর 'দ্যাও' এর অশুভ দৃষ্টি আছে।

এখন জঙ্গল একেবারেই নেই। ঘন-বসতি হয়েছে। নাম হয়েছে 'শিল্পসমিতি পাড়া'। আর কোন শিল্পই বিশেষভাবে গড়ে ওঠেনি এই সহরে।

ধরমশালা ও গো-শালা

ধরমশালা হয়েছে তিনটি। ১৯১০ সনে মনসুক রায় সাহা (পুত্র কিশোরীলাল, দিনবাজার) 'সাহা ধরমশালা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫১ সনে আমূল সংস্কার করা হয়। লহমীনারায়ণ চৌধুরী (পুত্র নিরঞ্জন চৌধুরী, দিনবাজার) ১৯৪১ সনে চৌধুরী ধরমশালা স্থাপন করেন।

সার্বজনীন যোগমায়া কালীবাড়ি সংলগ্ন একটি ধরমশালা আছে।

১২০৭ সনে দিনবাজার সওদাগর পট্টিতে হয়েছিল এক ধরমশালা। ১২১২ সনে সেটা গো-শালা হয়ে গেল।

এই প্রথম গো-শালার পত্তন। বুড়ো গোরুদের রক্ষণাবেক্ষণ ছিল মূল উদ্দেশ্য। এমন দিন আসছে যখন বুড়ো মানুষদের জন্ত ‘নর শালা’ খোলার প্রয়োজন হবে।

১২১৫ সনে মাঘকলাই বাড়িতে (রাজ বাড়ির উত্তরে) এক বিরাট গোশালা হয়েছে। এখন গো-শালা গুলিতে দুগ্ধবতী গাভীও রাখা হয় ও কিছু কিছু খাঁটি দুধ সরবরাহ করা হয়।

শ্রীমদ মন্দির

সহরের উত্তরে পৌর এলাকার একটু বাইরে ককরুকা নদীটি যেখানে করলায় মিশেছে সেখানে বটগাছে ঘেরা, দিনেও অন্ধকার, এক জায়গায় সম্ভবতঃ কামরূপ শাসনের আমলে এক কালী মন্দির ছিল। ছোট একটি চালা ঘর। আশে পাশের গ্রামবাসীরা পূজা দিত এখানে। জাগ্রত দেবতা। এই জায়গার নাম ছিল ‘বিষহরি তলা’, পরে নাম হয় ‘মাসকলাই বাড়ি শ্রীশান কালী তলা’। শুনতে পাওয়া যায় বহুকাল আগে এই নিভৃত স্থানে নর-বলি হতো। বৈকুণ্ঠপুরের দুর্গাবাড়ি সম্বন্ধেও এমন গুজোব আছে। ইংরেজ এ দেশে আসবার পরেই ১৮২২ সনে পাতকাটা গ্রামের হাড়িয়া বৈরাগীর পুত্র নয়ান কাপালী নামে একজন ডাকাতে র সর্দার এখানে পূজা দিয়ে পাতকাটার পাতু দাস নামে একটি লোককে হত্যা করে। ফলে প্রকাশ্যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি জেলে সব সহর-বাসীকে আমন্ত্রণ করে। ইংরেজ আমলে এ জেলায় এই প্রথম ফাঁসি। এই ঘটনা নিয়ে তখন একটি পুস্তিকা লেখা হয়। বইখানি বহুকাল কোথাও পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি রাজগঞ্জের শ্রীসংঘ পাঠাগারে এক খণ্ড পাওয়া যায়। বহুকাল অমত্রে থেকে কালী বাড়িটি প্রায় লোপ পেয়েছিল। ১২৬৭ সনে ‘সুকু’ নামে এক বাউণ্ডলে যুবকের অক্লান্ত চেষ্টায় এখানে সুন্দর একটি পাকা মন্দির উঠেছে। এখন নিত্যপূজা হয়।

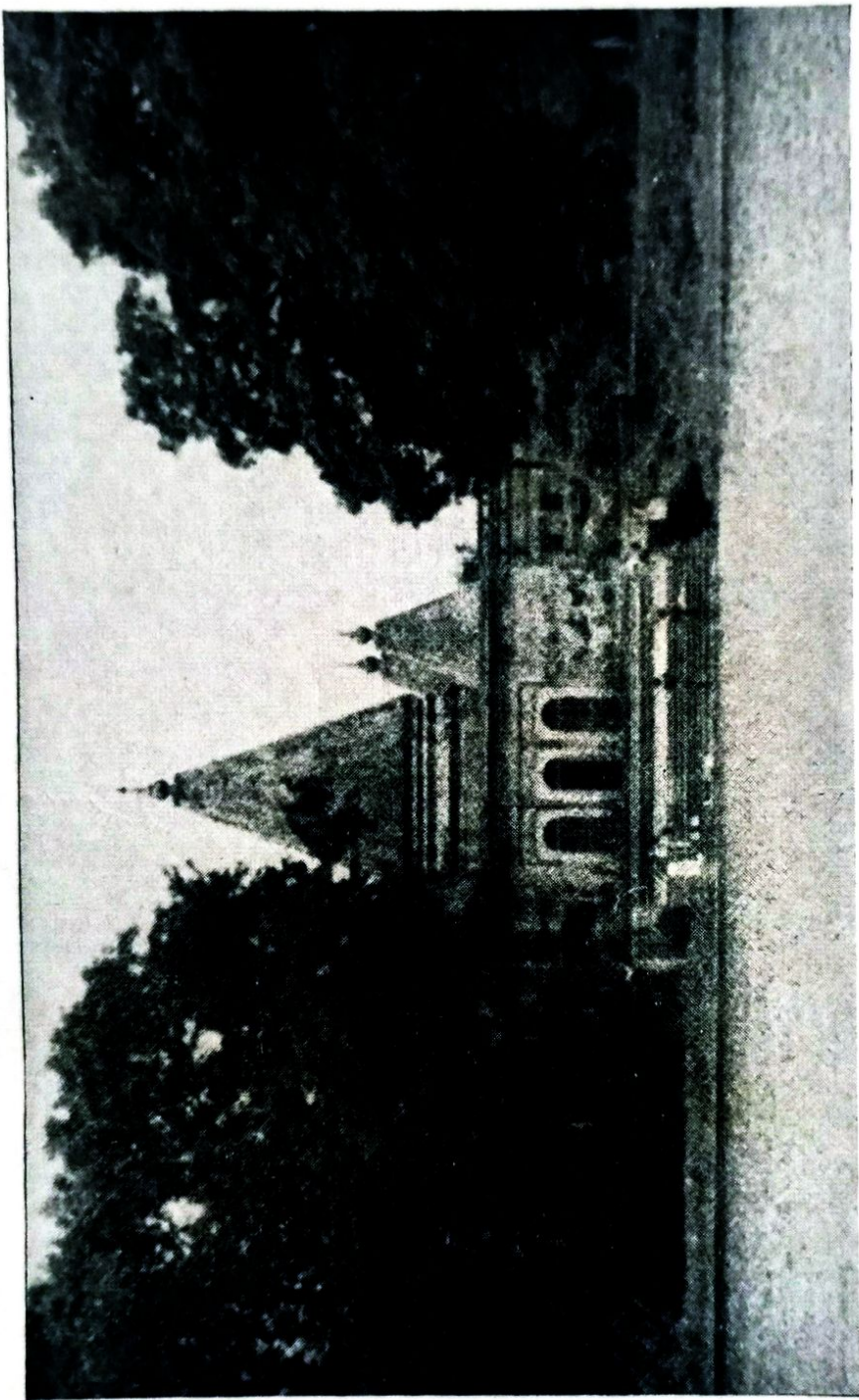
বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির সীমানার ভেতরে বৈকুণ্ঠনাথের মন্দির ও দুর্গাবাড়ির কিছু সংস্কার হয়েছিল রাজা প্রসন্ন দেবের আমলে। এখন দেখে মনে হয় বৈকুণ্ঠপুর তো বৈকুণ্ঠে চলেছেন, মন্দির দুটিও সে দিকে পা-বাড়িয়েছেন। রাজবাড়ির পূর্বে বড় দীঘির ধারে কালী বাড়িটি বড় বড় বট ও রবার গাছে ঘেরা থাকতো। গত বছর বট গাছ গুলি কেটে ফেলে নতুন পাকা মন্দির হয়েছে। রাজা সর্বদেবের তৈরী শিবমন্দিরটি ১৮২৬ সনের ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যায়। ১৮২৮ সনে বর্তমান সুন্দর মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল। এখনও সুন্দর আছে। সহরের লোকেরা দীঘিতে দুটি সুন্দর ঘাট তৈরী করে দিয়েছে।

দিনবাজারের কালী বাড়ি বহুকালের। মন্দিরটি একেবারে ভেঙ্গে যায়। ১২৬১ সনে সহরের মাতুরাম সিং বর্তমান সুন্দর মন্দিরটি তৈরী করে দিয়েছেন।

পঞ্চমুণ্ডির আসনে স্থাপিত বাবুপাড়া যোগমায়া কালীবাড়ি বহু কালের। ১২২২ সনে সুন্দর মন্দির তৈরী হয় এখানে।

তেলীপাড়া সার্বজনীন কালী বাড়িতে পূজার্থীর ভীড় সব চেয়ে বেশী। এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হয় ১২২৮ সনে। বর্তমান অতি সুন্দর মন্দির ও দরদালানটি তৈরী শেষ হয় ১২৫৩ সনে—ইঞ্জিনিয়ার কালিচরণ গুঁই মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায়।

এই মন্দিরের উত্তরে মদনমোহন দেবতার পাকা মন্দির। আরও উত্তরে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। স্থাপিত ১২৫১ সনে—ডাঃ তারকনাথ কর্মকার মহাশয়ের দানে (পুত্র দেবেন্দ্রনাথ কর্মকার, তেলীপাড়া)।



বৈকুণ্ঠপুরোহিত সর্বদেব নির্মিত দেড়শত বৎসরের প্রাচীন শিবমন্দির।

আরও উত্তরে থিয়োসফিকাল লজ মন্দির। স্থাপিত ১৯২৩ সনে—উপেন্দ্রনাথ কর্মকার মহাশয়ের চেষ্টায়। (পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কর্মকার, তেলীপাড়া)।

এত মন্দির, তাই তেলীপাড়া রাস্তার এই অংশটির নাম হয়েছে টেম্পল ষ্ট্রীট।

সহরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় করলার ধারে ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০১ সনে। নতুন মন্দিরটি হয় ১৯১৩ সনে। এখন এটি ভারতীয় চিকিৎসক সভার জলপাইগুড়ি শাখার আপিস। ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির ও জমি এঁদের কাছে বিক্রি করে দেন ১৯৫৭ সনে।

সহরের দক্ষিণ প্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৩ সনে। প্রথম উদ্যোক্তা স্বামী বিমলানন্দ, সত্যপ্রকাশ রায় (ননীদা), ডাঃ শচীন মুখোপাধ্যায় ও মনীন্দ্র নাথ রায়। ছলীচাঁদ মাহেশ্রী ও রামানন্দ ডাগা অনেক জমি দান করেন ও বীরেন্দ্র নাথ মজুমদারের চেষ্টায় ১৯৬২ সনে সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। রাখালদাস নিয়োগী, হেমন্ত বসু, ডাঃ অবনীধর গুহ নিয়োগী, ডাঃ ধীরাজ মোহন সেন, সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়, বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেকের অবদান আছে।

সহরের মাঝখানে মহাত্মা গান্ধী রোডের পাশে (শিলিগুড়ি রোড) খান বাহাদুর রহিম বক্স পেস্কার সাহেব এক সুন্দর ও বৃহৎ মসজিদ তৈরী করান ১৮৭৫ সনে।

এই রাস্তারই ওপরে একটু উত্তরে দিনবাজারে আর একটি সুন্দর মসজিদ তৈরী করান মহম্মদ ইব্রাহিম (পুত্র মহম্মদ সুকুরুল্লা) ১৯০২ সনে।

নয়া বস্তিতে আর একটি ছোট মসজিদ আছে।

কাছারীর কাছে সাহেবদের চার্চ তৈরী হয়েছে ১৮৮২ সনে।

মিউনিসিপাল অপিসের দক্ষিণে হলদিবাড়ী রোডের ওপরে ‘কালী আদমী’দের চার্চ হয়েছে ১৮৯৬ সনে।

ছোট ছোট অনেক মন্দির সহরে আছে।

দেখা যাচ্ছে সবাই তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস মতো কিছু কিছু জনকল্যাণ কাজ করে গেছেন। বিভেদের ভেতরেও সমন্বয় ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানগুলি আজও বেঁচে আছে ভাল ভাবেই।

এই সাথে একটি মন্দিরের কথা না বললে সব কথা বলা হল না মনে হয়। এই মন্দিরটি সহর থেকে একটু দূরে দক্ষিণ দিকে, পাণ্ডা পাড়ায়। কবে বা কে এই মূর্তি ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন সেটা আজও সঠিকভাবে জানা যায় নি। মনে হয় স্বাধীন বৈকুণ্ঠপুরের আমলে। মন্দিরের কালী মূর্তি দুইটি গোথুরা সাপের লেজের ওপর দাঁড়িয়ে। একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রী সাপ। সোজা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে মূর্তির কটি দেশ পর্য্যন্ত। গহণা সব সাপের। খাচ্ছেন সাপ। জিহ্বা নাই। মুখবিবর কাল জামের মতো গাঢ় নীল। চক্ষু কোটরাগত। মহাদেব নাই। লোকে বলে ইনি ‘চণ্ডী’, কেউ বলে ‘ভদ্রকালী’।

আমার মনে হয় ইনি চণ্ডীরূপী মনসা, মহাদেবের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে রণরঙ্গিনী ধ্বংসকারিণী মূর্তি।

ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের মর্ম্মর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬২ সনে, কবিগুরু রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে। যোগেশ মেমোরিয়াল হলের নিকটে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও মন্দির স্থাপিত হয়েছে ১৯৫১ সনে কবিরাজ সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের উদ্যোগে।

পূজা পার্বণ

হুর্গা পূজা, মনসা পূজা ও তিস্তা বুড়ি পূজায় খুব সমারোহ ছিল। রাজবাড়ির হুর্গা প্রতিমা ছিল বিরাট আকারের, ঘোর লাল রং, বাঘের উপর দাঁড়িয়ে, একটি মাত্র মূর্তি। প্রায় ষাট বছর আগে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ বাহন সহ জুটে গেলেন এই বিরাট মূর্তিটির পাশে। হুর্গার রংও একটু ফিকে হয়ে এল। বাঘটি ধীরে ধীরে হয়ে গেল সিংহ। মনে হয় দক্ষিণাগতদের সাথে কৃষ্টি সমন্বয়ে এই পরিবর্তন হয়েছে। শুনতে পাওয়া যায় প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেও, নবমীর গভীর রাতে কি যেন একটা অতি গোপনে বলি দিয়ে তখনই করলার ধারে জঙ্গলে পুঁতে ফেলা হতো। প্রায় তিরিশ বছর আগেও নবমীর রাতে চালের গুঁড়ো দিয়ে মাহুঘের মূর্তি গড়ে বলি দেওয়া হতো। দশমীর রাত শেষে সূর্য দেখা দেবার আগেই প্রতিমা বিসর্জন দেবার নিয়ম আছে বৈকুণ্ঠপুরের রাজাদের। রাজা যেন ঘুম থেকে উঠে প্রতিমা না দেখেন। কেন এ প্রথাটি ছিল জানি না। পূজার তিন দিন পাঁঠা, খাসি, কবুতর অসংখ্য বলি হতো। মোষ বলি দেখার আমাদের খুব উৎসাহ ছিল। পূজার তিন দিন তিন রাত চলতো নাচ ও গান। এই হচ্ছে স্থায়ী সমাজের সাধারণ অভিব্যক্তি। রাজবাড়ির সামনে বসতো বিরাট মেলা। বহু পুরুষ ও মেয়ে সহর ও গ্রাম থেকে আসতো রং বেরং এর কাপড় পরে। বহু দোকান বসতো। খাবারের দোকানে গ্রামের লোক খেতো। অল্প দোকানে কেনাকাটা করতো। এমনিভাবে সহরের আধুনিকতা ধীরে ধীরে গ্রামে অনুপ্রবেশ করতো।

জগদীশদেব রায়কতের বাসাতেও পূজা ও নাচ—গান চলতো। পুরুষেরা মেয়ে সেজে, পায়ে ঝাঁঝরা বেঁধে হাতে রুমাল ঘুরিয়ে নাচতো। বুড়ো রায়কত সাহেব ছিলেন সঙ্গীত বিলাসী। বহু ওস্তাদ জুটতেন তাঁর বাসায়। গানের মজলিস ছিল বিখ্যাত।

সহরে সাগাল বাড়ি, বাগ্‌চি বাড়ি, চক্রবর্তী বাড়িতেও হুর্গাপূজা হতো খুব ধুমধামে। তখন সমবায় সার্বজনীন পূজা ছিল না। পূজার ক’দিন নেমন্তন্ন খেয়েই কাটতো। অর্থবান, অর্থহীন সবাই সম্মানে খেতো পেট ভরে ও আনন্দ ক’রে। এখন আনন্দের চেহারা বদলে গেছে।

সরস্বতী পূজায় সহরে যাত্রাগান ও কথাকথার হিড়িক লাগতো। সবারই বিনে খরচায় আনন্দ করার সুযোগ ছিল কারণ কয়েকজন চাঁদা দিয়ে সবার জন্ত ব্যবস্থা করতেন।

গানের ভেতরে একটু রকমওয়ারী ছিল। মাঝে মাঝে বিতাসুন্দর পালা গান হতো। ছোটদের এ গান শোনা বারণ। তাই গান শুরু হতো রাত ৯টার পরে—বয়স্করা শুনতেন। কথকথার ভেতর দিয়ে দেশপ্রেম জাগাবার চেষ্টা হতো। কথকদের দ্ব্যর্থবোধক গান আই, বি, এর দলকে দিশেহারা করে ফেলতো।

মনসা পূজায় খুব ধুম ছিল রাজবাড়িতে ও রায়কত সাহেবের বাড়িতে। বাঁশের মোথা বাঁশীর বাজনা, নাচ ও গান চলতো। মনসা মঙ্গলের পালা গান হতো এদেশী ভাষায়।

তিস্তাবুড়ি পূজা হতো অনেক বাড়িতে। কোন শক্ত ব্যারাম হলে বা কোন বিশেষ অমঙ্গল হলে শিক্ষিত বাবুরাও তিস্তাবুড়িকে পূজা দিতেন। আমাদের বাড়িতেও এ পূজা হতো প্রতি বছর।

চুরকুট নামে হাড়ি জাতীয় এক কাপালিক ছিল। থাকতো জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রাস্তায় এখনকার তলাপাত্রের জোতে যেতে এক তেঁতুল গাছ তলায়। এখানে জঙ্গলের ভেতরে ছোট্ট একটু কুটরে ছিল তার বাস।

এখন জঙ্গল নেই, সেখানে একটা কালী মন্দির উঠছে। চুরকুটুর রং ছিল ঘোর কালো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কপালে বিরাট সিঁদুরের ফোঁটা। দেখলেই ভয় করতো। সোলা দিয়ে তিস্তাবুড়ির মূর্তি নিজেই গ'ড়ে আনতো। পূজার সময়ে চুরকুটুর ওপর দেবী ভর করতেন। তখন যত প্রশ্নই করা হোক না কেন, প্রায় সঠিক জবাব পাওয়া যেত। প্রায় পনেরো মিনিট এই ভাব থাকতো। ভর চলে গেলে সে যে কি বলেছে তা মনে করতে পারতো না। চুরকুটুর কেউ নাই এখানে। বছর তিনেক আগে এক হাড়িবাড়িতে তিস্তাবুড়ি পূজা প্রাঙ্গণে চুরকুটুর নাতির সাথে দেখা হল। বেচারী তিস্তা বুড়ি, এখনও গরিব সাধারণের আশ্রয়ে আছেন। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে পুরাণো বিশ্বাসের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

চার্চে খুঁট জন্মের উৎসব হতো। ব্রাহ্ম সমাজে ছিল মাঘোৎসব। মুসলমানদের ঈদ ও মহরম। যে যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন সবার উৎসবে সবাই যোগ দিত প্রাণ খুলে। সময়ের পরিবর্তন, রাজনীতির আবর্তন সবাইকে আলাদা করে ফেলেছে। মনটাও দূরে সরে যাচ্ছে দিনে দিনে।

গ্রামের লোক

সহরের কথা আলোচনা করতে গাঁয়ের লোকদের কথাও কিছু বলতে হয়। তাদেরও সহরবাসীদের সাথে কাজ কারবার আছে। সহরের মানুষের সাথে তাদের কেমন সম্পর্ক গ'ড়ে উঠলো সেটাও জানা দরকার। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে গ্রামের লোকের জীবনযাত্রা ছিল খুবই সাধারণ। কিন্তু টাকা পয়সা বেশ ছিল। ভালভাবে বাস করতে এই টাকাটা ব্যয় করার কায়দা জানা ছিল না। তখন ছিল রূপোর টাকা। মাটির কলসীতে ভরে মাটির নীচে পুঁতে রাখতো। এই ছিল তাদের ব্যাঙ্ক, তাদের সিন্দুক। সময় সময় ডাকাতি করে টাকা লুণ্ঠে নিয়ে যেত। হঠাৎ বাড়ির কর্তা সেই জায়গাটি কাউকে বলে ষাবার পূর্বে মারা গেলে টাকাটির আর সন্ধান পাওয়া যেত না। এইভাবে আমার জানা কিছু লোকের প্রায় লাখ টাকা মাটির তলায় নিখোঁজ হয়েছে। হয়তো কোন কালে কোন ভাগ্যবান সেগুলি পেয়ে যেতে পারে।

আদালত সহরে বসলে অনেকে সখের মামলা করতো। 'মাইয়া' অর্থাৎ বউ চুরির মামলাই বেশী। যত ধারার মামলা উকিল, মোক্তারের ফি ততো টাকা ছিল। মামলায় জিত হলে ক্ষতিপূরণের টাকাটি উকিল, মোক্তারবাবুকে পুরস্কার দিত। তা বাদে ভালচাল, ঘি ও একটি খাসি ফাউ হিসেবে।

মেয়েরা সত্তর ভরির রূপোর সূর্যহার, পঞ্চাশ ভরির রূপোর চন্দ্রহার এই রকম ভারী ভারী গহনা পরতো। সবই রূপোর। হিন্দু মেয়েরা বাঁ হাতে বারোটি শাঁখা জোড়া দিয়ে পরতো। এত দামী শাঁখা এখন দেখাই যায় না। মেয়েরা চাল বিক্রি করতে আসতো বাড়ি বাড়ি। বাড়ির অন্দর মহলে যেত, সবার সাথে গল্প করতো, পান-গুয়া (পান-সুপুরী) খেতো তারপর ছুটি। তাদের হাসি খসী স্বন্দর স্বচ্ছ ব্যবহার সহরের অধিকাংশ মহিলাদের আপন করে নিয়েছিল। গত পঞ্চাশ বছরের ভেতরে গ্রামের লোকগুলি নিঃশব্দ হয়ে গেল। মেয়েদের সেই প্রাণখোলা মেলা-মেশা আর আনন্দ কোথায় যেন চলে গেছে।

অনেক আপে রাজবংশীরা ছিল জল অচল। উচ্চবর্ণের কুয়া ছুঁতে পারতো না—জল অশুদ্ধ হয়ে যাবে। উচ্চ বর্ণের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। ১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে এই কু-সংস্কারটি লোপ পেয়ে গেল। রাজবংশীরা এখন প্রমাণ করেছেন তাঁরা ক্ষত্রিয় ও উচ্চবর্ণ হিন্দু।

সাদা ও কালো সমাজ

সহরে 'সাদা আদমী' অর্থাৎ সাহেব ছিল। তারা ছিল শাসকদল। আগের আমলে 'পাটুয়া' (পাট ব্যবসায়ী) সাহেবেরা 'কালো আদমী'দের সাথে কিছু কিছু মিশতো, হয়তো কাজের খাতিরে। কিন্তু শাসক ও চা-সাহেবের দল সহরে একটা 'বিলেত' তৈরী করেছিল। সেটার নাম 'জলপাইগুড়ি ক্লাব' বা প্লানটার্স ক্লাব'। এখন পি, ডবল, ডি আপিস যেখানে-সেখানে একটি খড়ের ঘরে প্রথম শুরু ১৮৮৫ সনে। ১৮৯৪ সনে তেত্রিশ বিঘে জমি নিয়ে বিরাট সৌধে ক্লাবটি স্থানান্তরিত হ'ল। গেটের সামনে ছিল জলপাইগুড়ি অধিকারের একটি জয়ন্তস্ত। এই বিলেতের ধারে কাছেও তাদের অধীন কর্মচারী ও চাপরাশী বাদে আর কোন 'কালো আদমী' যেতে পারতো না—ধূতি পরে তো নয়ই। এদের নাচ, গান, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি সবই এখানেই হতো। ক্লাবের সাথে ছিল তাদেরই একটি দোকান। সব জিনিষ থাকতো, কোন কিছু কিনতে যেন 'কালো আদমী'দের দোকানে যেতে না হয়। তাদের পৃথক কবরখানাও ছিল বর্তমানে বড় পোষ্ট আপিসের পূর্ব দিকে। মারা গেলেও যেন কালো আদমীর ছোঁয়াচ না লাগে। নর্থ বেঙ্গল মাউন্টেড রাইফেল ক্লাব হয়েছিল। বছরে এক মাস ড্রিল, স্টিং, পলো ও হকি খেলা হতো, ঘোড়দৌড়ও হতো। এটা সাহেবেরাই করতো, বোধহয় যুদ্ধ বিজ্ঞাটা রপ্ত করে রাখার জন্ত—যদি দরকার হয় কখনও। তখন সব মাঠটাই ছিল খোলা, ঘরবাড়ি একটিও ছিলনা। এইসব খেলা সবাইকে দেখতে দেওয়া হতো, তবে অনেক দূর থেকে। সাহেব মেমেরা ক্লাবেই থাকতো। ১৯২০ সন থেকে উৎসাহ কমতে শুরু হয়। ১৯৪০ এর পর থেকে প্রায় নিভে গেল। জয়ন্তস্তটি কে বা কাহারো উপড়ে ফেলে দিল, আর তোলবার স্যোগ বা সময় হয়নি। ১৯৪৭ থেকে 'বিলেত'টা এদেশী হতে শুরু করলে।

এখন তিস্তা বাঁধ, নতুন নতুন ঘরবাড়ি মাঠটিকে খুব ছোট করে ফেলেছে। রেস, পলো সবই বন্ধ হয়ে গেছে। রেসকোর্সের আর দরকার কি। কেবল নামটি বেঁচে আছে আজও। এখনও একটা রাইফেল ক্লাব আছে। বর্তমানে সম্পূর্ণ অহিংস ও মৃতপ্রায়। চা-সাহেবেরা এদেশ ছেড়েছে ও ছাড়ছে। তিস্তা নদীর ওপর পুল হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধে হয়েছে 'ডুয়ার্স' থেকে, কাজেই ক্লাবে রাত্রিবাসের দরকার হচ্ছে না।

এখন 'কালো আদমী'দের হাতে এসেছে ক্লাবটি। দুঃখের সাথে স্বীকার করতেই হবে আগের জোলুস আর নেই। অত সুন্দর ও সুশ্রী করে রাখা যাচ্ছে না। এখনও সাদা চা-করেরা এই ক্লাবটি ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখতে বছর বছর বেশ কিছু টাকা চাঁদা দেয়। এই ক্লাব পরিচালনা করার ব্যাপারে দেখা গেল দরকার হলে ও সময়ের পরিবর্তন হলে সাদার দল কালো আদমীদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারে, সবার সাথে চলতে পারে। এ শিক্ষা তাদের আছে। তাই স্বরাজের আগে ইংরেজ বিদ্রোহ যতটা ছিল এখন আর অতখানি নেই। হয়তো অনেক কমে গেছে। কালের পরিবর্তনে পুরোণো চাল বদলে যাচ্ছে। যারা নতুনের সাথে চলতে পারবে তারাই বাঁচবে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

শেষ কথা

এক শতাব্দির ভেতরে দু'টি যুগ চলে গেল। এখন তৃতীয় যুগে এসে পড়েছি। এককালে রাজবাড়ি যেয়ে আনন্দ পেয়েছি, ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাকে সসম্মানে সেলাম করেছি, সেটাকে টেনে নামিয়ে ত্রিরাঙা ভারতের জাতীয় পতাকা তুলেছি। সামন্ত যুগের শেষচিহ্ন জমিদারিও লোপ পেয়েছে। এতকাল মুখ ফুটে যে কথা বলতে সাহস

হয়নি, এখন প্রকাশ্যে রাজপথে দাঁড়িয়ে সেকথা নির্ভয়ে বলতে পারছি। ইংরেজ আমলে যে সব কথা বললে বা যে কাজ করলে পেয়েছি গুলি, লাঠি ও জেল এখন সে সব কথা ও কাজ প্রকাশ্যে নির্ঝিবাদে সম্ভব হচ্ছে।

দেশ বিভাগের পর অনেক নতুন লোকে সহর ভরে গেছে, এনেছে নতুন চাহিদা, নতুন উদ্দীপনা। কোন পথে এই স্রোত বইবে তা আজও জানা নাই। উদ্দাম স্বাধীনতা দেশপ্রেমের উজ্জল প্রেরণা জাগাবে কি ?

মানুষ চলেছে। মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। হুনিয়ার সব খালি জায়গা দখল করে বসেছে মানুষ। বসতি করেছে। পৃথিবীর বাইরে, সাগরের নীচেও বসতির চেষ্টা চলছে। একদল মানুষ চলে গেছে, আর এক দল সেই জায়গায় এসে গেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে লোক বিনিময় ঘটেছে। মানুষের হাতে পৃথিবীর চেহারা ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। কত জলা শুখিয়েছে, কত পাহাড় মাটিতে মিশেছে, কত বন উজাড় হয়েছে। মানুষের দাপটে গাছ ও জন্তু পিছু হটেছে, লোপ পেয়েছে।

জলপাইগুড়ি সহরের পেছনের একশো বছর দেখলে এই চিরন্তন বিবর্তনের ইতিহাসটাই ফুটে ওঠে। একশো বছর আগে জনশূন্য বন, জলা, জানোয়ার ও সাংঘাতিক ব্যাধিপূর্ণ যে স্থানটি ছিল, আজ সেখানে জনারণ্য, বাড়ি, গাড়ি, দোকান, ব্যবসা, শিল্প, স্কুল, কলেজ, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির এক মহা সমারোহ। কলের জল, বিজলী বাতি, ডাকঘর, টেলিপ্রিন্টার, উড়োজাহাজ, বেতার, সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা মানুষের আরাম যোগাতে ব্যস্ত। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া, ব্রাকওয়াটার, কালাজ্বর চিরবিদায় নিয়েছে। তবুও মানুষ স্থখী নয়, আরও চাই।

কিন্তু ১৯৬৮ সনের ৪ঠা অক্টোবর গভীর রাতে তিস্তা নদীর বাঁধভাঙ্গা বহুর প্রবল স্রোতে কয়েক ঘণ্টার ভেতরে গত একশো বছরের গড়ে ওঠা সহরটি ধুয়ে মুছে গেল। বড় বড় বাড়ীর খাঁচাগুলি মাত্র দাঁড়িয়ে থাকলো, ভেতরের প্রাণটি উড়ে গেল। কিন্তু থেকে গেল মানুষের মনে বেঁচে ওঠার অদম্য সাহস, উৎসাহ ও কর্মশক্তি। তাই দ্বিতীয় শতাব্দীতে সহরটি নতুনভাবে গড়ে উঠবে আশা করি। পুরাতন অন্তিমিত—নতুনের অভ্যুদয়।

শহর আলিপুরদুয়ারের অতীত এবং বর্তমান

শ্রীসুরঞ্জন দত্ত রায়

নদীর নাম কালজানী। সকালের রৌদ্রে বাধের উপরে দাঁড়িয়ে থাকি। এখানে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখতে কোন বাধাই নেই। দেশ বিভাগের ধাক্কায় অনেক মানুষ ছেড়েছে তাদের সাবেকী ঘর-বাড়ি, আঙ্গিনা-উঠোন, কলাগাছের ঝোপ-দিয়ে-ঘেরা খড়ের ঘর, তুলসী মঞ্চ, গোয়াল। সব চিরদিনের মতো। কিন্তু ছেড়েছুড়ে দিয়েও মানুষ চিরকাল ভোলানাথ হয়ে দিন কাটাতে পারে না। তাই তাকে আবার ঘর বাঁধতেই হয়। কালজানীর বাধের ধারে দাঁড়িয়ে নদীর জল দেখি। আর দেখি বাস্তব্যাগী আশ্রয়চ্যুত মানুষদের মেলা। বাধের ধারে সারি-সারি ঘর। শীতের রৌদ্রে উঠোনে পুঁইমাচা। সবুজ সমুদ্রে দোল খাচ্ছে বেড়ার ধারে কড়াইন্তির ডগা। ছোট ছোট আনাজের চারাগুলি। কুমড়ো-লতা চাল থেকে নেমেছে মাটির কাছাকাছি। নতুন লাল শালুর লেপখানা রৌদ্রে টক টক করছে। কচি শিশু হামাগুড়ি দিচ্ছে দড়িতে-ঝোলানো দোলনায়। একটি ব্যস্ত বৌ নদীর জলে ধুচুনী ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে। নদীর নাম কালজানী। শহরের নাম আলিপুরদুয়ার।

নদীকে কেন্দ্র করেই শহর। যেমন বন্দর স্রু হ'ত পদ্মা-মেঘনা ও ধলেশ্বরীর বাকে বাকে। কালজানীর জলে ভেসে ভেসে পূর্ববঙ্গ থেকে আসতো বড় বড় নৌকাগুলি। মহাজনদের সওদাগরী নৌকাগুলো পূর্ববঙ্গ থেকে নিয়ে আসত মালমশলা, হাড়ি-কলসী, কাঁসার তৈরী বাসন-কোসন, কাঠের ফার্ণিচার। রংপুরের তিস্তা নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে ধরলা নদী পেরিয়ে তোরসার ধারাবাহিকতায় কালজানীতে উঠত নৌকাগুলো। মস্ত হাল সোজা থাকতো জলের মধ্যে নৌকোর পিছনে। নানারঙা পালগুলি পতপত করে উড়ত বাতাসে। আর নৌকার পাটাতনে বসে মহাজনেরা দেখত জলের ঢেউ, আকাশের রঙ বদলের খেলা।

কে ভেবেছিল সেদিন এই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে আজকের আলিপুরদুয়ার শহরের বিস্তার। অতীতের দিকে তাকাই—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভূটানযুদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর ক্রোড়াংকে পূর্ববঙ্গ থেকে লোক সমাগম স্রু। চা, কাঠ, নতুননির্মিত রেলের চাকরিকে কেন্দ্র করে দলে দলে লোক আসতে লাগলো এদিকে। ছাত্রবৃত্তি পাশ আইনজীবী আমলা ও পিওন। হেডকোয়ার্টার প্রথমে ছিল বক্শায়, পরে ফালাকাটায় উঠে এলো। ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ার।

আমেরিকান উপনিবেশের মত নানা জেলার নানা মতের লোক এখানে। শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে পূর্ব ও মধ্যবঙ্গের লোকই বেশি। মফঃস্বলে বাসকারী খাঁরা তাঁরা সবাই রাজবংশী, রাভা, কোচ, মেচ ইত্যাদি। জেলা কুচবিহার তো পাশেই। সেপানকার কোচ-কালচারের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের আগন্তুকদের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে—একেবারে গোড়ার দিকে—মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে কুচবিহারে বিনাপয়সায় F.A., B.A., M.A., Law প্রভৃতি পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ফলে পূর্ববঙ্গের মেধাবী গরীব ছেলেদের চোখে কুচবিহারের আকর্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল প্রচুর। বিনাপয়সায় বিদ্যাল্যভের মানসে দলে দলে পূর্ববঙ্গ থেকে

আসিত মানুষ। তাই বলা যায় যে পূর্ববঙ্গের মানুষদের কাছে কুচবিহারের আকর্ষণ ছিল আগে, পরে তার নিকটবর্তী আলিপুরদুয়ার। পূর্ববঙ্গের জীবনযাত্রা ছিল কঠোর। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কঠিন কংকরময় পথে পা রাখবার পরিবর্তে এখানে একবার ভাগ্যান্বেষণ ছিল অনেক বেশি সহজসাধ্য। মোটের উপর জীবন-সংগ্রামের কঠিন প্রতিযোগিতার নেশা এখানে তখন লাগেনি। একেবারে আয়াসহীন না হলেও জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশবহুল। এখানে যারা আসতেন তাঁদের কিন্তু দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ঠিকই থাকত।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে Lord William Bentinck-এর চেষ্টায় সর্বপ্রথম ভারতীয় চায়ের আবাদ শুরু হয় আসামে। পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গের চৈরাই অঞ্চল থেকে ক্যামেলিয়া শ্রেণীভুক্ত কিছু পাতা লগুনের লিফিয়ান সোসাইটিতে গবেষণার জন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যথাকালে এল সংবাদ। এক সুবিরট সন্তাবনার উজ্জলতা বহন করে নিয়ে এল সংবাদটি। হাঁ, পাতাগুলি উৎকৃষ্ট চা-শ্রেণীর বলে গণ্য হয়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎপর হ'লেন। আলিপুরদুয়ার মহকুমায় হিমালয়ের সাহুদেশ জুড়ে চা-আবাদের গোড়া-পত্তন ঘটল। বন কেটে বাগান। চা-বাগান। আর সেই চা-বাগানকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক চাকুরিয়া মানুষ। পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। উনিশ শতকে কিছু নতুন মানুষের আগমন ঘটলো। এঁরাও এলেন পূর্ববাংলা থেকে। পূর্ববাংলাই চিরকাল বাংলাকে বলিষ্ঠ প্রাণের মন্ত্র শুনিয়েছে। এর ঘরছাড়া দিক্‌হারা পাগলপারা যুবকগুলির বৃকের ভিতরে ছিল আগুন। এরা পদ্মা সাঁতরেছে, হাসিমুখে অক্লেশে সঞ্চ করেছেন শত যন্ত্রণা। সেই তাদেরই দু-একটি দুঃসাহসী প্রাণের আবির্ভাব ঘটল এদিকে। ভাগ্যাধেয়ী সরল-প্রাণ এই যুবকদের হাতে সর্বপ্রথম দেখা দিল এ-অঞ্চলে বাঙালী চা-বাগানের সন্তাবনা। বাঙালী চা-বাগানগুলি কেন্দ্র করে আসতে শুরু করলো তাদের আত্মীয় স্বজনরা। চাকরির লোভে। দু'পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে—মহকুমার হেড-কোয়ার্টার্স তখন আলিপুরদুয়ার শহর। এখানেই ছিল কোর্ট। বিচারকার্য চালাতেন একজন ইউরোপীয় অফিসার। স্বভাবতঃই আই-সি-এস অফিসার। তাঁর সঙ্গে একজন সেকেন্ড অফিসার। বাঙালী। একজন তহশীলদার—যিনি পদে সাব-ডেপুটি। নাজির পেশ্কার-পদাতিক নিয়ে কাছারীর শুরু। আইন-আদালতের শুরু। শহরের সমাজ জীবনের প্রয়োজন ছিল অল্প। শহরবাসীর মন পড়ে থাকত পূর্ববঙ্গে। সাবেককালের বাড়ি ঘরে। এখানে পড়ে থাকা শুধু অর্থ-উপার্জনের জন্তে। পূর্ববঙ্গের কঠোর জীবনযাত্রার তুলনায় এখানে জীবিকা ছিল অনায়াসলভ্য। ছ' আট আনা মনের ধান। তিন চার আনা সেরের ঘি। আট আনা কোর্ট ফী দিয়ে দরখাস্ত করলে বড় জমির ইজারা পাওয়া যেত। অবশ্য বিশ শতকের গোড়ার দিকে অস্ত্রাত্মক তৈজসপত্র ও কাগজপত্রাদির জন্ত দোড় লাগাতে হ'ত কুচবিহারে। লালমনির হাটের পরের স্টেশন মোগল হাট পর্যন্ত ছিল তখনকার দিনের ট্রেন লাইন। এদিকে ট্রেন লাইন ছিল না। যখনকার কথা বলছি, তখন সময় উনিশ শতকের শেষার্ধ। স্বর্গীয় রসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাবা স্বর্গীয় উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মশাই পায়ে হেঁটে মোগলহাট থেকে আলিপুরদুয়ার আসেন। তারপর একদিন তৈরী হ'ল কুচবিহার স্টেট রেলওয়ে। গীতালদা থেকে দলসিং পাড়া পর্যন্ত। অবশ্য একবারে সবটুকু হয়নি। থেমে থেমে হয়েছে। সেই প্রথমদিককার কথা বলছি। গীতালদা ও মোগল হাটের মধ্যে ধরলা নদীর কথা মনে আছে তো? সেই নদী ঈমারে পারাপার করতে হত। আলিপুরদুয়ারে কালজানীতে পার হ'ত বড় নৌকো। লাইনটা থেমে থেমে হবার কথা আগেই বলেছি। এখনকার শহরের পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া কালজানী নদীর ওপারেই যে খোন্টার কথা শুনি আমরা, সেই খোন্টা তখন ছিল সুখ্যাত বন্দর। এ লাইনে প্রথম যে ট্রেন চলত তা ছিল খোলা গাড়ি। পরে এ-গাড়ীগুলো নিয়ে যাওয়া হয়

কাউনিয়া কুড়িগ্রাম লাইনে। ট্রেন চালু হ'ল। শুরু হ'ল লোকজনের আনাগোনা। প্রকৃতপক্ষে এলাকাটা ছিল ডিঙ্গনিল্যাও। যেন রূপকথার রাজ্য। পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়লো উত্তরখন্ডের এ পত্তনের ইতিহাস। অপূর্ব দেশের কথা — যেখানে আট আনা খরচ করতে পারলেই বিরাট জমির ইজারা মেলে — সামান্য কিছু খরচ করতে পারলেই শাল গাছ কেটে নেওয়া যায়। রাতের বেলা জানালা খোলা রেখেই ঘুমানো যায় — চুরির ভয় নেই। বছরের খোরাক সামান্য পয়সাতেই হয়। পদ্মার ঢেউয়ের সাথে লড়তে হয় না। বন্যায় ভাসিয়ে নেয় না। আর যাদের কিছু টাকা পয়সা ছিল তারা ইউরোপীয়ান। বিদেশী টা প্ল্যান্টার্সদের দেখাদেখি বাঙালীরাও চা-বাগানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ক্রমে বন কেটে বাঙালী চা-বাগান। বর্তমানে ৫৮-টি চা-বাগান। বৈষয়িক অগ্রগতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। রেলের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা ভুলেছি। কুচবিহার স্টেট রেলওয়ের সঙ্গে E. B. R. এর যোগাযোগের ফলে এ লাইনের সাময়িক নামকরণ হয়েছিল Eastern Bengal State Railway. এই State Railway কিনে নেওয়া হয় পরবর্তীকালে। নামকরণ হয় E. B. R.

পুরাতন দিনের ভিড়ে উঁকি দিয়ে দেখছি দু'টি বাড়িকে। সেই শহর গড়ে-ওঠার প্রাথমিককালে দু'টি বাড়ি ছিল শহরের Nerve Centre। একটি গাঙ্গুলীবাড়ি। স্বর্গীয় রসিক গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি। অন্যটি কালীবাড়ি। রাজকুমার মুখার্জির বাড়ি। কালীবাড়িতে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা বাঙালীর সমাজ-জীবনের সূচনা করে চিরকাল। শুধু এখানে নয়, সব জায়গায়। বাঙালী যখনই কোথাও মোটামুটি ছড়িয়ে বসবার মত হয়, তখনই তারা যার অভাববোধ করে — তা হচ্ছে কালীবাড়ির। কাজেই এই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজটি গুরুত্ববাহক। দু'টো বাড়িকে কেন্দ্র করে পূর্ববাঙলা থেকে লোকদের আগমন ঘটতে লাগল। অধিকাচরণ মুখোপাধ্যায় এলেন যশোর থেকে। অভয় সমাদ্দার, বিধুভূষণ সমাদ্দারও যশোর থেকে। বর্তমান M. L. A পীযুষ বাবুর বাবা রমনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল যশোর। গাঙ্গুলীরা আসেন দক্ষিণ বিক্রমপুর থেকে। আইনজীবীরা প্রাধান্য লাভ করলেন। কোর্ট এলো। কোর্টের সাধারণ ঘরে বসতেন বাবা শাসক। সাদা চামড়ার মালুস। আইনজীবীদের দক্ষিণা দেওয়া হ'ত অনেক সময় মোষের শিং-এর ভিতরে খুচরো পয়সায়। এক মোষের শিং, দু' মোষের শিং পারিশ্রমিক হিসেবে দিতে হত। যত শুনি তত অবাক। এইতো সত্যিকার রূপকথার লোকের গল্প।

আলিপুরদুয়ারের সমাজ দানা বাঁধছে ক্রমে ক্রমে। ব্যবসা উপলক্ষে মথুরামোহন পাল, পার্শ্ব পাল এলেন পাবনা থেকে। আলিপুরদুয়ারের আদি বাবুসাহী। এদের দোকান ছাড়া আর কোন দোকান ছিল না তখন। তেল-ভাল-নুন ইত্যাদি। যাবতীয় মশলাপাতি, চিনি-মিছরি-বাতাসা, বেনের দোকান। তখন শা-র মুদির দোকান ছিল একটু এগিয়েই — এখন যেখানে কালজানী ব্রিজটা তার ঠিক মোড়েই, ডান দিকে। বিহারের লোক। কাপড়-চোপড়ের জন্য তারাচাঁদবাবু - মালচাঁদবাবু আগে এলেন। তরকারী, ধান-চাল, ঘী ইত্যাদি আসতো মফঃস্বল থেকে। মনে পড়ল। এদেরই সম-সাময়িককালে একটা বাঙালীর কাপড়ের দোকান ছিল এখানে — হেমচন্দ্র আইচ ও বিপিনবিহারী দত্তের। ওই সময় ষ্টেশনারী দোকান প্রথম খোলা হয় এখানে গাঙ্গুলী ব্রাদার্স নামে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “হাট বসেছে শুক্রবারে বঙ্গীগঞ্জে পদ্মাপাড়ে।” আলিপুরদুয়ারে কালজানী পাড়ের হাট কিন্তু চিরকাল বসে আসছে দু'দিন। সপ্তাহে দু'দিন। রবি ও বৈষ্ণবতিবার। আগেও যা ছিল, এখনো তাই। আরেক কথা। সহরে কিন্তু তখন বাজার ছিল না। ওই হাটই ভরষা।

রাস্তার কথা মনে এলো কথা প্রসঙ্গে। রাস্তা বলতে বর্তমান বড়বাজার ও বাবুপাড়ার রাস্তা। এই রাস্তা অবশ্য কাঁচা ছিল তখন। বড়বাজারের পূর্ব সীমানা থেকে Station Road পর্যন্ত ছিল বিরাট চোতরা বন। রেলওয়ে স্টেশন সেখানেই ছিল যেখানে এখন আছে। একমাত্র ঘান মোষের গাড়ি ও ট্রেন।

১৯১১ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান চৌপটি থেকে বেতার ভবন পর্যন্ত এলাকার নাম ছিল পুরাণ বাজার। কিছু দোকানপাট ছিল। অধিকাংশই ছিল বিহারী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। বর্তমান ভান্ডাপুল থেকে আলিপুর দুয়ার কোর্ট ও আলিপুর দুয়ার জংশন পর্যন্ত দুই পাশের স্থবিস্তৃত স্থান জুড়ে ছিল ধানের ক্ষেত। জনমানবহীন। দু'চার ঘর জোতদারের বাড়িঘর ছিল ওখানে। শেয়াল ও বাঘ ডাকত। একেবারে অজ পাড়ারগাঁ। ১৯১৫তে আলিপুরদুয়ারের লোকসংখ্যা যদি খুব বেশি হয় তবে আড়াই হাজারের খুব বেশি হবে না। ১৯২৭ পর্যন্ত দাঁড়ায় আনুমানিক হাজার বারো। এসব তথ্য সরকারী নথীপত্রেই মিলবে ভালো। পার্টিশনের পরে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন হ'তে ব্যবসাবাগিজ্য যেমন বাড়লো, লোকসংখ্যাও বাড়তে লাগল দ্রুত গতিতে। জংশন বাদ দিয়ে আলিপুরদুয়ার আজ আর কল্পনা করা যায় না। তবু জংশন বাদে আলিপুরদুয়ারের লোকসংখ্যাই আজ ৫০,০০০ আনুমানিক। গত ৭৮ বছরের মধ্যে ব্রীজের ওপারে শহর বিস্তীর্ণ হয়েছে বিপুল গতিতে। এবং শামুকতলারোড ও নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন রোডেও জনসংখ্যার বিপুল বিস্তার লক্ষ্য করার মতো।

পার্টিশনের আগে যাকে বলা হ'ত সওদাগর পট্ট, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের এত রবরবা ছিল না। প্রাচীনেরা চোখ বুঁজলে দেখতে পাবেন ক'টা স্টেশনারী দোকান, কড়াই-বালতি, জুতো ও কাপড়ের দোকান। সন্ধ্যায় সেখানে টিম্‌টিম্ করে জলত আলো। বাইরে মশার গুঞ্জন, অন্ধকার রাত্রির জলসায় জোনাক-পাখার স্পন্দমান আলো। মাঝেমাঝে আকাশ-ডুবানো পৃথিবী ভাসানো সে যে কী সৃষ্টিছাড়া রূপ। আরম্ভ হ'লোতো আর থামবার নাম নেই। এরই সাথে ভয়াবহ ম্যালেরিয়া-ব্র্যাক ওয়াটার ফিভারের যোগাযোগটা কল্পনা করুন একবার। বিছানায় শুয়ে জীবনের মেয়াদ চক্কিশ ঘণ্টা হাতে গুনে বলে দিতে পারেন। ভয়াল বাঘ আর হিংস্র পাইথনের আলিঙ্গনে কী ভীষণ পরিণতি! বাঘা পানিশমেন্ট সেন্টার হিসাবে নাম ছিল আলিপুরদুয়ারের।

কালজানী ব্রীজের উত্তরে কালজানী নদীর পূর্ব পাড়ে ছিল দত্তপট্ট। সে-পাড়ার কথা অনেকেই ভুলেছেন ইতিমধ্যে। এটা ছিল দত্ত-অধ্যুষিত পাড়া। তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন মফঃস্বলের হাটে-বাজারে কাটা ও খুচরো কাপড়ের দোকানদার। সে-পাড়ার অধিকাংশই নদীগর্ভে আজ। আগে ছিল সওদাগর পট্ট, এখন তারই নাম বড়বাজার। দু'পাশে বড়ো বড়ো দোকান। গালামালের, লোহালকড়ের, বেনেতি মালমশলার, কাপড়-চোপড়ের। কীসের নয়? তখনও ব্রীজটা হয়নি। কালজানী নদীর এই ব্রীজ। আধুনিক শিল্পের ও ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার বিস্ময়কর রূপ বহন করছে। বর্ষা হ'লে কালজানীর বন্যা মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এই ব্রীজকে, তবু ওই ব্রীজটা আজকের কর্তৃত্বাঙ্গ একঘেয়ে আলিপুরদুয়ারবাসীর জীবনে একটা আনন্দের মতো। কতটুকুই বা শহর ছিল আগে। সওদাগরপট্ট - বাবুবাজার। পাঁচ-সাত ঘর আমলা, চারঘর আইনজীবীর বাড়ি। হাটখোলাতে ছিল দশরথ সাহার মুদির দোকান। হরেন দাসেরও একটি দোকান ছিল। হাটখোলার দক্ষিণপাশে ছিল হাড়ি-কলসীর দোকান। চৌপটি ও মাড়োয়ারী পট্টিতে কতিপয় মাড়োয়ারীর দোকান। কোর্ট ছিল বর্তমান শহরের ওয়ার হাউসের গুদামের কাছে নদীর পাড়ে। টিনের চাল কাঠের বেড়ার ঘর। পাশেই কালজানী নদী। ১৯২১ এর পর সেটা নদীতে ভেঙে যায়। তখন এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল

লাইব্রেরীতে অনুমান তিন চার বছর কোর্ট চলেছিল। লাইব্রেরী সরিয়ে নেওয়া হ'ল তখন বর্তমান আলিপুর-দুয়ার লোন অফিসের বাড়িতে। ১৯২৭ সালে বর্তমান কোর্ট বাড়ি চালু হয়। বিল্ডিং তৈরী হচ্ছিল আগে থেকেই; পার্টিশনের পর এগিয়ে গেল দ্রুত সব। তৈরী হ'ল কলোনীগুলো। সূর্যনগর, অরবিন্দ নগর, নেতাজী নগর, শান্তিনগর, তেলিপটি, স্বভাষ পল্লী পার্টিশনের দাবী মেটাতে গড়ে উঠলো প্রায় রাতারাতি। নিউ টাউন এবং পুরান শহুরের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে তৈরী হ'য়ে উঠলো রাস্তা। আগে ছিল খোয়া-গুঠা। কুমীরের পিঠের মতো। এখন চকচকে এ্যাশফন্টের রাস্তা। গারোপাড়া, হাসিমারা, বীরপাড়া — ধুপগুড়ি-ময়নাগুড়ি, পলকের জগু দাঁড়াচ্ছে বাস। যাত্রীর গুঠা-নামা। পেট্রোলের গন্ধও বিকট। আজ পোড়া ডিজেলের গন্ধ। যাত্রী-দলের ব্যস্ততা। উন্টোদিক থেকে আসছে স্টেটবাস একটা। গুঠা যাচ্ছে কুচবিহার। লাইন বাস। আসছে ফুটশোলিংএর কাছাকাছি জয়গাঁ থেকে যাত্রী বোঝাই করে। ফুটশোলিংএর নিজস্ব বাসও আছে। চক্চকে বাস থানা দেখলেই উঠতে ইচ্ছে করে। বক্-বকে হ্যাণ্ডেল, সুন্দর স্বচ্ছ কাচের জানালায় রোদ পড়ে পিছলে যাচ্ছে। লেখা রয়েছে “ভূটান্ গভর্নমেন্ট বাস সার্ভিস”। ওই বাসে চেপে বসুন আপনাকে নিয়ে যাবে ভূটানের সুপ্তি পাহাড়ের শীতল ছায়ায়। কমলাবনের ধারে ছোট্ট নদীর তীরে।

শীতের মরশুম এলেই দিনদুপুরে শোনা যাবে, ট্রাক বা বাস-বাহিত অজস্র কলকণ্ঠ : ‘যাচ্ছে কারা?’ ‘দেখালো কারা?’ ইত্যাদি। পিকনিক পার্টি। কুচবিহার-দিনহাটা যেখান থেকেই আশুক পিকনিক পার্টি, যেতে হবে আলিপুরদুয়ারের ভিতর দিয়ে। জয়ন্তী, রাজা ভাত খাওয়া, ভূটানঘাট, ফুটশোলিং, যমদুয়ার। সমস্ত পিকনিক স্পটগুলোই আলিপুরদুয়ারের কাছাকাছি। আলিপুরদুয়ারের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। মাঝেমাঝে দাঁড়ায় গাড়িগুলো। নতুনকালের বেশভূষা যুবকদের। প্যান্ট, চাইনিজ সার্ট, পয়েন্টেড্‌ শ্ব। হাতঘড়ি, কাঁধে ক্যামেরা, ক্লিনলি-শেভন মুখ, ব্যাক্ত্রাশ করা চুল। আলিপুরদুয়ার স্টেশন-গুমটির কাছে ট্রাক দাঁড় করিয়ে কমলালেবু কিনছে।

সমগ্র মহকুমায় একটি মাত্র ছিল হাই স্কুল। বোধকরি ১৯১৬ তে তার প্রতিষ্ঠা। তার আগে ১৯১০ থেকে ১৯১৫ এর মধ্যে একটি মাইনর স্কুল ছিল। বর্তমান জেলা বোর্ডের ডাকবাংলোটির কাছে এই মাইনর স্কুলটি ছিল। স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন রাজকুমার গাঙ্গুলী। বর্তমানকাল পর্যন্ত সে যুগের একজন শিক্ষক আজো বেঁচে আছেন। মুখে মুখে ফেরে নাম। মহেশ পণ্ডিত মশাই। এ-শহরের পুরাকাহিনীর এক আশ্চর্য খনি। সরকার একটি স্মরণ উপেক্ষা করছেন। টেপ রেকর্ড নিয়ে এঁর কাছ থেকে অতীত আলিপুরদুয়ারের অনেক খবর সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। কালের অখণ্ড বৃক্ষ এঁকেই বলে। শতবর্ষ প্রহর যাপন করে আজও তিনি কাল-বিজয়ীর মতো জেগে আছেন। জেলার সবচাইতে প্রাচীন শিক্ষক হিসেবে জলপাইগুড়ি জেলার সুধীবৃন্দের একটি প্রিয় কর্তব্য রয়েছে ওঁর প্রতি। তার সম্মাননায় স্বাধীন দেশের সরকার যদি না এগোন তো তাঁদেরই এগোন দরকার। শিক্ষক দিবসেও এঁর কথা সংগ্রহ করে ছাত্রদের শোনাবার ব্যবস্থা করা যায়।

একটি দুর্গাপূজা হ'ত অতীতে। দুর্গা বাড়িতে। বারোয়ারী পূজা এলো তারই স্রোতধারায়। তখনকার দিনে কোনো চায়ের দোকান বা হোটেল নাম করার মত ছিল না বললেই চলে। বাইরে থেকে যদি কেউ আলিপুর-দুয়ারে আসত দুর্গাবাড়িতে অতিথি সংকার হ'ত। কালীবাড়িতেও অতিথিশালা ছিল। ম্যাক উইলিয়ম সাহেবের নাম মুখে মুখে ফেরে। ঘোর ইংরাজ রাজত্বের কাল। দুর্দান্ত ইংরাজ শাসনের কাল সেটা। ম্যাক উইলিয়ম ছিলেন ইংরাজ, স্বচ্ছ সাহেব। তখনকার দিনের আই সি-এস অফিসার। কাযকাল শেষ করে কোন্

সুদূর অতীতে দেশে ফিরে গেছেন তিনি। হয়তো এতদিনে চির বিশ্রামের ঘুম ঘুমিয়েছেন তাঁর দেশের মাটিতে। কিন্তু আলিপুরদুয়ারকে তিনি যথার্থ ভালোবেসেছিলেন। প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলেন এর শ্রীবৃদ্ধি। আজকের শহর-পরিকল্পনা গোড়ায় অনেকটা তাঁরই ছকের অনুসরণে। দেশে ফিরেও মাঝেমাঝে লোকজনের কাছে আলিপুরদুয়ারের খোঁজ নিয়েছেন উনি। তাঁর আমলের গাছগুলো আজ কত বড় হয়েছে? দেখতে কেমন হয়েছে সেগুলো? এই ম্যাক উইলিয়মেরই স্মৃতি বহন করছে ম্যাক উইলিয়ম স্কুল। ম্যাক উইলিয়ম ইন্সটিটিউট-এর কথা হঠাৎ মনে এল। স্কুলটি প্রথমে যতদূর জেনেছি প্রাইমারী, পরে মাইনর এবং ক্রমে জুনিয়র হাই থেকে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আলিপুরদুয়ার হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা বোধ হয় ১৯১৬-এর পরের দিকে। শহরে এর কমপক্ষে দশ বছর পরে একটি গার্লস লোয়ার প্রাইমারী স্কুল খোলা হয়। শহরের উৎসাহী যুবকদের চেষ্টায় ১৯৪২-এর দিকে একটি মাইনর স্কুল খোলা হয়েছিল। পূর্ববর্ণিত গার্লস লোয়ার প্রাইমারী স্কুলটিকে এই নব-প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় আনুমানিক ১৯৪৩-এর দিকে। এই গার্লস স্কুল আনুমানিক ১৯৪৭ পর্যন্ত জুনিয়র হাই ও পরে হাই এবং হায়ার সেকেন্ডারীতে পরিণত হয়।

শহরে তিন তিনটি সিনেমা হল। সিনেমাই বর্তমান কালের নন্দন কানন। হিন্দী, বাংলা, ইংরেজি নানা ছবির মিছিলে ভিড় করছে তাবৎ মানুষ। টিকিট-লাইনে ভিড়। মারামারি ঘুষোঘুষি, ঠেলাঠেলি। সিনেমা হলের নিচেই যার স্থান তা শহরের চা আর মিষ্টির দোকানগুলো। রেডিওর কল্যাণে সেই আনন্দ হয়েছে আরো বিস্তৃত। মাঝেমাঝে যাত্রাদলের আস্তানা খুব জমে ওঠে শহরের বিরাট প্যাওলে। অতীতের আলিপুরদুয়ারে আমোদ-প্রমোদের এত বিস্তৃত ঢালাও বাবুতা ছিলনা বললেই চলে। বর্তমান হাটখোলার কাছাকাছি ছিল ঔষোগেন্দ্র নাথ মুখার্জির একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান—সেখানে সন্ধ্যার পরে তদানীন্তন যুবকেরা মিলতেন এক সঙ্গে। সেখানে থিয়েটার-যাত্রার রিহাসেল এবং গান-বাজনা হ'ত। সমস্ত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের ওইটিই ছিল প্রধান কেন্দ্র। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এই চেহারা। ওইখান থেকে থিয়েটার ইত্যাদি হ'ত। ডি, এল রায়ের বই প্রাধান্য লাভ করত সে-যুগে। শাহজাহান, মেবার পতন, বঙ্গ বর্গী, চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি বই খুব হ'ত সেকালে। শেষ পর্যায়ের স্মৃতি হিসেবে রবীন মৈত্রের “মানময়ী গার্লস স্কুল”-এর অভিনয় প্রাচীনদের মনে জাগরক হয়ে আছে।

থিয়েটার ছেড়ে যাত্রা। কর্ণাজুন, দাতাকর্ণ ইত্যাদি। জাতীয়তাবোধের প্রভাব সবত্র। শেষদিকে টীপু সুলতান অভিনীত হ'ল সরকারী সহযোগিতায় সাহায্য প্রচেষ্টা হিসেবে। যতদূর জানা যাচ্ছে, সে-যুগে হীরোর ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচুর নাম করেছিলেন নগেন্দ্র নাথ মুখার্জি মহাশয়। চন্দ্রগুপ্তের মূল ভূমিকাটির প্রশংসা করেন আছো কেউ কেউ। চাণক্যের ভূমিকায় নামতেন সুরেন চক্রবর্তী মহাশয়। যোগেন বাবুর ক্লাবের যাত্রা-উজোগের পূর্বে আলিপুরদুয়ারের হাট-বাবুসায়ীরা অঘোর নাথ কাব্যরত্নের যাত্রাগুলো নামাতেন। পরে সিনেমা এল ম্যাক উইলিয়ম ইন্সটিটিউট হলে। ১৯৪১-এর দিকে কিছু শিক্ষিত যুবকের প্রচেষ্টায় একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। প্রধানত এঁদের প্রচেষ্টায় আলিপুরদুয়ারে লাইব্রেরী-আন্দোলনের দ্রুত প্রসার ঘটে। শ্রীশান্তিপদ গাঙ্গুলী, শ্রীতাপস ঘোষ, শ্রীআমেদ হোসেন, শ্রীসুনীল ভৌমিক প্রভৃতি এ-জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। আলিপুরদুয়ার শহরে তিনটি পাঠাগার যথাক্রমে প্রগতি পাঠাগার, স্বভাস পাঠাগার, জাগৃতি পাঠাগার এবং কামাখ্যাগুড়িতে গান্ধী পাঠাগার; অট্টবরে স্বভাস পাঠাগার ও চানরের পারে তরুণ

পাঠাগার স্থাপিত হয়। তরুণ পাঠাগার বর্তমানে তার নিজস্ব জমি বাড়ি করে Rural Library স্বীমে Govt. Grant পাচ্ছে। শহরে এই আন্দোলনের Central Committee স্থাপিত হয়। এইভাবে এঁদের প্রচেষ্টায় শহরে জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শ্রীমনীষ রায় ও শ্রীহরিপদ মিত্রের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জি, সিং কাহলন্ I. C. S. —জাতিতে ছিলেন শিখ—আলিপুর-দুয়ারের ক্রীড়া ব্যাপারে উৎসাহবাক্তক ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইনি পরবর্তীকালে East Punjab এর Chief Secretary হন। খেলার ব্যাপারে এঁর আগ্রহ ছিল প্রবল—বিশেষতঃ ক্রিকেট খেলায়। এঁর Chief Guest হায়ে আসেন কুচবিহারের মহারাজা। একটা মজার খবর এই যে তখনকার দিনের খেলায় খেলোয়াড়েরা সকলে মিলে চেষ্টা করতেন মহারাজাকে দিয়ে গোল দেওয়াতে।

মাঝে মাঝে এই তরুণ দলের উৎসাহে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সূচনা দেখা দেয়। বিভিন্ন সময় এসেছেন মানীশুণীরা। একটি তালিকা দিচ্ছি :—

- (ক) ১৯৪২—শ্রীনরেন্দ্র দেব (স্থান—আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল)।
- (খ) ১৯৪৩—তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবপ্রসাদ ঘোষ (স্থান—মায়া টকীজ)।
- (গ) ১৯৪৫—শ্রীক্ষিতি মোহন সেন (স্থান—মায়া টকীজ)।
- (ঘ) ১৯৪৬—ডাঃ শহীদুল্লাহ (স্থান—আলিপুরদুয়ার হাই স্কুল)।
- (ঙ) ১৯৪৭—ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী (স্থান—মায়া টকীজ)।
- (চ) ১৯৫০—ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় (স্থান—এ)।
- (ছ) ১৯৫২—শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল (স্থান—এ)।
- (জ) ১৯৫৮—শ্রীউদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্কর (স্থান—এ)।
- (ঝ) ১৯৫৯—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ (স্থান—এ)।
- (ঞ) ১৯৬১—রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী—(স্থান—ক্রাবের সম্মুখে মৃতদাফন)।

প্রধান অতিথি—শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী।

সঙ্গীতে—শ্রীসুচিত্রা মিত্র।

নৃত্যনাট্যে—শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত।

এ-ছাড়াও শ্রীপ্রমথ বিশী ও শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র (ক্রাবে)

মায়া টকীজে এসেছেন—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জমজমাট সভা বসেছে তাঁদের আগমনে। শহর ভেঙে পড়েছে তাঁদের বক্তৃতা শুনতে। বাংলার নামী সঙ্গীত-শিল্পীরাও এসেছেন। বহির্বিশ্বের সাথে এমনি করে গড়ে উঠেছে প্রগাঢ় সংযোগসূত্র। এডওয়ার্ড লাইব্রেরী তো আজও এখানকার স্মৃতি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিশারী।

পায়ে চলা পথগুলি ঘুরে ঘুরে রাজপথ থেকে নেমে গেছে ভিতরের দিকে। ওইখানে আছে বীরপাড়ার বিজ্ঞান্য গৃহ। একটু এগোলেই জমজমাট পেট্রল পাম্প। পীচ-কালো রাস্তাটি তাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেছে। রাস্তার দু'ধারে নতুন নতুন বাড়ি। ওই পথ গেছে সোনাপুর চৌপথীর দিকে। একটি গেছে মথুরা বাগানের দিকে, অন্যটি বায়ে ঘুরে কুচবিহারের দিকে। সোজা রাস্তাটি ধরে এককালে এগিয়ে যেত জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ির বাস। কিন্তু তোরষা নদীর বিক্রমে ওই পথ আজ বেগির ভাগ সময়ই পরিত্যক্ত। এখন জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির বাসগুলি যায় হামিল্টন-কালচিনির রাস্তা ঘুরে। কখনো বা মথুরা বাগানের পাশ দিয়ে চিলাপাতা অরণ্যের ভিতরের রাস্তাটি দিয়ে। কালজানী নদীর ও-পার থেকে হাটা পথে কিংবা সাইকেলে চড়ে কত যে ছেলে পড়তে আসে কলেজে। রাতের কলেজেও পড়ে অনেকে। বাড়-বৃষ্টি-জল পথের বাধাকে মানেনা ওরা। কেননা ওরাই যে নতুন কাল। ওরাই নতুন কালের আলিপুরদুয়ার। যেমন ওদিক থেকে তেমনি সলসলাবাড়ি শানুকতলার দিক থেকেও আসে মানুষের শ্রোত। চৌপথী থেকে বাস-ট্যাক্সীগুলো ঘনঘন ছুটছে ওদিকে। অনেকগুলি ইস্কুলে ওদিকে পড়তে যায় ছেলেরা। ওদিকে দমনপুর হাই স্কুল ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে শহর। ডাইনে সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

দমনপুর করেষ্টের সেগুন বাগানে গিয়ে শুক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। হাতীর কানের মত মস্ত বড়ো-বড়ো গোলপাতা ছড়িয়ে বন দাঁড়িয়ে থাকে। পাশদিয়ে বয়ে যাওয়া হুনাই নদী। সবুজ তরল জলশ্রোত। মাঝের ডাবড়ি চা-বাগানের ধারে-ধারে প্রবাহিত হয়ে শহরের একেবারে পূবদিকে কলেজের পিছনে বাশবন ছাড়িয়ে প্রবাহিত হয়েছে হুনাই নদীর শ্রোত। হুনাই-এর পোলের উপর দিয়ে যায় আসাম পথের ট্রেন। এদিকে নতুন ব্রডগেজ লাইন। নতুন আলিপুরদুয়ার স্টেশনের ওভার-ব্রিজের ছাদ ঝকঝক করে রোদে। অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

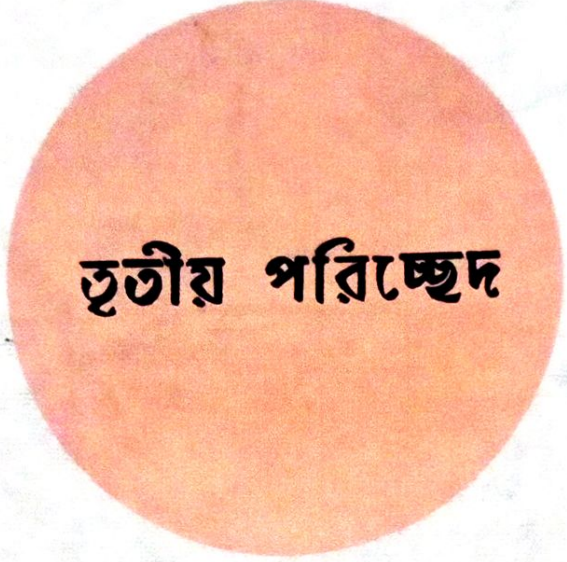
কে বলে আজ আলিপুরদুয়ার ছোট শহর? শহরের প্রবেশ পথে দু'সারি কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে স্তবকে রক্তিম পুষ্পবন্যা ও গুলমোবের ডালে ডালে তরুণ আগুনের উজ্জলতায় বসন্তে যখন মায়া লাগে চোখে, তখন তার শাখায় শাখায় যত কোকিল ডাকে, তার চাইতে লক্ষ-লক্ষ গুণ তরুণের কলকণ্ঠ ভাসে এখানকার ছবির মত কলেজটির করিডরে আর ব্যালকনিতে। বছরের পর বছর। ওই পথ ধরে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে উঠেছে কত তরুণ-তরুণীর দল। মুখে তাদের সকালের আলো। চোখে দিগন্তের উদার প্রতিশ্রুতি। সমস্যা আছে এখানে, সমাধানও আছে তেমনি।

এইতো সেদিন সারা পৃথিবীর তালে-তালে ঘটা করে গোকার্শী শতবার্ষিকী হয়ে গেল এখানে। সেক্সপীয়ার শতবার্ষিকী, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী। সবই এডওয়ার্ড লাইব্রেরীর সমুদ্র প্রচেষ্টায়। এ শহর স্থলপথে পূর্ব-ভারতের সাথে যোগাযোগের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। একদিকে ভূটান, অন্যদিকে কুচবিহার। আবার ওদিকে আগামের সাথে সংযোগরক্ষাকারী রেলওয়ে লাইনও এর উপর দিয়েই গেছে।

অনেকগুলো ভিজিটিং সাইট রয়েছে এর আশে-পাশে। যমদুয়ার। নাম শুনেই চমকে উঠবেন না যেন। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে অবাক করে দেবার মত। নদীর নাম শুনেছেন? সঙ্কোস। জায়গার নাম কালিখোলা না হ'য়ে কালিগোলা হ'লেও কিছু এসে যায় না। কত যে পিকনিক পার্টি এখানে আসে পথের

দুর্গমতা সত্ত্বেও। মাইকে রবীন্দ্র সংগীতের ঝড়ে নদীর জল চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। জলদাপাড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চল কত দূরেই বা। টারিষ্ট লঞ্জে এসে হাতীর উপরে চড়ে বন ঘুরে দেখুন গওার। গওারই বেশী। ভাগ্য ভালো থাকলে বাঘও দেখতে পাবেন। ওদিকে জয়ন্তী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যার অতুলনীয়। নদীর ধারে জ্যোৎস্নালোকিত বর্ষারাত্রে সরকারী বাংলোর কাচের জানালায় ব'সে দেখুন গর্জমান জলশ্রোত। পাথরের প্রকাণ্ড চাই-এর উপর দাঁড়িয়ে জল খেতে এসে দাঁড়িয়ে গেছে বাঘ। ভূটান ঘাট যাবেন পিকনিক করতে? ওই যে রূপালী জলশ্রোতের রেখা। ওধারে ভূটান পাহাড়। কমলা বাগান কাছেই। স্কটল্যান্ডের সাইট কি এর চাইতেও সুন্দর? ভেবে দেখুন মনে মনে। ভয়াল-ভয়ংকর মহাকালের অসাধারণ সৌন্দর্য সবই এই আলিপুরদুয়ারের কাছেই। এইসব নিয়ে সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে ইচ্ছে করলে অনায়াসেই একটি বৃহত্তর আলিপুরদুয়ার গড়ে তোলা যায়। যার আকর্ষণ পশ্চিম বাংলার দীঘা, কালিম্পং এর চাইতে খাটো হবেনা। এ ছাড়াও এই পরিবেশে পাবেন নানা উপজাতিদের বর্ণাঢ্য, বলিষ্ঠ, বিচিত্র জীবন যাত্রা। নৃত্য ও সংগীতের অফুরন্ত আকর্ষণ এই পটভূমিকায়। জাগ্রত আলিপুরদুয়ার!





ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

‘ଜେଲାର ଦେବ ଦେଉଳ’



১৩০৪ সনের ২১শে জৈষ্ঠ
তীর্থন ভূমিকমলের পর।

বর্তমান জন্মেশ মন্দির

দ্যাবক জন্মেশ মন্দির

জন্মেশ মন্দির



নতুন মন্দির

জলেশ-মন্দির

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীজলেশ-ধাম এক পুণ্যতীর্থ। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানায় গড়তলী জলেশ তালুকে জলেশদেবের মন্দির অবস্থিত। বৎসর বৎসর ফাল্গুনী কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে লক্ষাধিক যাত্রী সমাগম হয়; সমস্ত উত্তরবঙ্গ হইতে দলে দলে তীর্থযাত্রীগণ আসিয়া ভক্তিভাবে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা ও সেবাপূজা করিয়া থাকেন।

এতদুপলক্ষে মন্দিরের অনতিদূরে বৃহৎ ‘জলেশ-মেলা’ বসে। শিবরাত্রির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় এক পঞ্চকাল এই মেলা চলিতে থাকে।

সনাতন হিন্দুধর্মের ভিত্তিভূমি এই ভারতবর্ষ। উত্তরে গঙ্গোত্রী, দক্ষিণে কঙ্গাকুমারী, পূর্বে কামাখ্যাধাম, পশ্চিমে হারকা প্রভৃতি শত শত তীর্থ ভারতবর্ষের সনাতন কৃষ্টির ধারক ও বাহক। জলেশও অন্যতম পীঠস্থান।

এই পীঠস্থানে দেবাদিদেব মহাদেব “জলেশ্বর শিব” নামে খ্যাত।

ভারতের কেন্দ্রভূমি কাশীধামে যিনি ‘বিশেশ্বর’ তিনিই দক্ষিণ প্রান্তে ‘রামেশ্বর’ ও উত্তর প্রান্তে ‘জলেশ্বর’। শ্রীরামচন্দ্রের হাথ রাজা জলেশও ঐকান্তিক আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব ভক্তের কীর্তি ভুবনবিশ্রুত রাখার জন্য ভক্ত নামে ‘রামেশ্বর’ ও ‘জলেশ্বর’ আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ

দেবাদিদেব মহাদেবের জলেশ্বর নামের কারণ বিস্তারিত ভাবে শ্রীশ্রীস্কন্দ-পুরাণে বর্ণিত আছে।

স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে ষটষষ্টিতমোহধ্যায়ে বর্ণিত আছে — রাজা জলেশ পাঁচপুত্র — সুবাহু, শক্রমর্দী, জয়, বিজয় ও বিক্রান্ত।

বানপ্রস্থ অবলম্বনের পূর্বে রাজা জল ভাবিলেন — রাজ্য লইয়া পাঁচ ভাই বিবাদ করিতে পারে। তাই তিনি স্বীয় রাজ্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে এক এক খণ্ডের রাজ্য করিয়া গেলেন। খণ্ডিত রাজ্যে কিন্তু কোন পুত্রই সন্তুষ্ট হইলেন না। মন্দিরের পরামর্শে কুমারেরা অথর্ব মন্ত্রে অভিচার বিধিতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক যজ্ঞেই এক একটি কৃত্য (অতি ক্রোধী সৃষ্টি দহনকারী দেবতা বিশেষ) উৎপন্ন হইল। কৃত্য কঠক পুরোহিত, মন্দির, ভূত্যা সহ সকল কুমারই নিধন প্রাপ্ত হইল। একই সাথে বংশনাশ ও ব্রহ্মহত্যা পাপ সংঘটিত হইল।

সন্তাপদগ্ধ রাজা জল এই মহাপাপ হইতে উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিলে বশিষ্ঠ ঋষি বলিলেন —

গচ্ছ জল মমাদেশামহাকালবনোওমম্।

কৃষ্ণা নিক্সত্রিয়াং পৃথ্বীং যত্র রামস্তপশ্রুতি।

তত্র লিঙ্গমনাথং চ কুকুটেশ্বরস্য পশ্চিমে ॥ ৩৬

তদারাম্য রাজেশ্বর জামদগ্ন্যশ্রমে স্থিতঃ। ৩৭

“হে জল, তুমি মহাকাল বনে গমন কর। কুকুটেশ্বরের পশ্চিমে অনাদিলিঙ্গ আছে, যে স্থানে পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তুমিও সেই অনাদিলিঙ্গের আরাধনা কর।”

বশিষ্ঠ বচনে রাজা জল মহাকাল বনে অনাদিলিঙ্গের পূজা বিশেষ সমাধির সহিত বিধিবৎ আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পর লিঙ্গ হইতে বাণী উৎপন্ন হইল —

“হে জল আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।” জল বলিলেন, “হে দেব, আমার এই কীৰ্ত্তি যেন ভুবনবিশ্বত ও অক্ষয় হইয়া থাকে — এই দুর্লভ বর তোমার নিকট প্রার্থনা করি। ‘তুমি আমার ঈশ্বর’ এই কথা যাহাতে দেবতারাও ঘোষণা করেন তজ্জন্ম তুমি আজ হইতে “জলেশ্বর” নামে খ্যাত হও।” মহাদেব বলিলেন — “এবম্ ভবিষ্যতি” — তাহাই হইবে।

শ্রীশ্রীজলেশধামে মহাদেবের ‘জলেশ্বর’ নাম গ্রহণের ইহাই শাস্ত্রীয় তথ্য।

তদ্রূপ শ্রীশ্রীজলেশদেবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীদেবীর বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীকালিকা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণের সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ে ঔৰ্ব্ব ঋষি বলিতেছেন —

ততস্ত্ব কামরূপস্য বায়বাং ত্রিপুরান্তকঃ।

আত্মনো লিঙ্গমতুলং জল্লীশাখ্যং ব্যদর্শয়ৎ ॥১

ঔৰ্ব্ব ঋষি বলিলেন—ত্রিপুরান্তক মহাদেব কামরূপের বায়ু কোণে জল্লীশ নামে স্বীয় অতুলনীয় লিঙ্গ প্রকাশ করিলেন।”

স্ববর্ণমানসস্তত্র নদমুখ্যো মনোহরঃ ॥৭

নন্দিনোহুগ্রহায়তু মানসাখ্যং সরস্ব তৎ।

আগতঞ্চাজ্জয়া শান্তোঃ পূর্বমেব তপস্যাতঃ ॥৮

জটোদ্ভবা তত্র নদী হিমবৎপ্রভবা শুভা।

যস্যাত্ স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি জাহ্নবীসমম্ ॥৯

দ্বাপরস্য তু যা গঙ্গা ত্রিশ্রোতাখ্যা সরিৎসরা।

হিমবৎপ্রভবা শুক্লচন্দ্রবিম্বাঘ্নিনির্গতা।

যস্যাত্ স্নাত্বা মহামাঘাত্যাত্মনো ন জায়তে ॥১০

উক্তরূপে জলেশধাম অঞ্চলের কয়েকটি নদীর নাম কালিকাপুরাণে প্রশংসিত হইয়াছে। যথা—

জলেশ্বর ধামের পূর্বদিকে যে জলঢাকা নদী প্রবাহিতা, কুচবিহার জেলায় তাহারই নাম মানসাই। জলেশ্বর মন্দিরের দুই ফালং পশ্চিমে জটোদ্ভবা নদী জটদা বা জড়দা নদী নামে অদ্যাপি পরিচিতা। শাস্ত্রে বলে যে শিবের বিবাহকালে মাতৃগণ শিরে জল সিঞ্জন করিলে জটা বাহিয়া জল নদী আকার ধারণ করে। তাই নদীর নাম ‘জটদা’। ত্রিশ্রোতা নদী আজও পৌরাণিক নামেই জলেশ্বর মন্দিরের ৫ মাইল পশ্চিমে প্রবাহিতা। এতদ্বারা কালিকাপুরাণে জল্লীশ লিঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থিতি সন্দেহাতীত ভাবে গড়তলী তালুকে নির্ণীত হইতেছে।

জলেশ্বর শ্রী মহাপীঠ

মহাপীঠের প্রধান বৈশিষ্ট্য — সন্নিকটে মহাদেবীর অধিষ্ঠান চাই।

কালিকাপুরাণে এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। যথা :—

তস্মাস্মৈ মহাদেবীং নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্।

সিন্ধেশ্বরীং যোনিরূপাং মহামায়াং জগন্ময়ীম্।

ত্রাঙ্ককো দর্শয়ামাস ভৈরবায় মহাশ্রুনে ॥ ৫

চতুর্ভুজা তু সা দেবী পীনোন্নত পয়োধরা।

সিন্দুর পুষ্পসঙ্কশা ধত্তে কত্রীঞ্চ ঋপরম্ ॥ ২৭

দক্ষিণে বামবাহুভ্যামভীতি বরদায়িণী।

জটামণ্ডিত শীর্ষা চ রক্তপদ্মোপরিস্থিতা।

পঞ্চাঙ্কর জপস্তাদিমস্ত্রেস্তা পরিকীর্তিতঃ ॥

কামাখ্যা তন্ত্রমেবাস্তাঃ পূজনে তন্ত্রমীরিতম্ ॥ ২৮

শ্রীশ্রীজলেশ্বরদেবের ঈশান কোণে এক ফার্মং দূরে কালিকা পুরাণোক্ত গণপতি ও মহাদেবী সিন্ধেশ্বরীর মন্দির। উভয় মূর্তিই ভগ্ন; তথাপি মহাদেবীর পূজা সমাপনান্তে মহাদেবের ভোগ হয় এবং ইহাই চিরন্তন রীতি ॥

এতদ্ব্যতীত যোগিণীতন্ত্রেও জলেশ্বরদেবের উল্লেখ আছে, তবে স্বন্দপুরাণ ও কালিকা-পুরাণেই জলেশ্বরদেবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মহারাজা জল কোনও মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন কি না তাহা প্রকাশ নাই। যে মন্দির আছে তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে কুচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ কর্তৃক নির্মিত।

কিন্তু মহারাজা প্রাণনারায়ণের পূর্বেও যে মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত দেবদেবীর মূর্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৯৫২ সালের ৪ঠা মার্চ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের Superintendent of Eastern circle, টি, এন্ রামচন্দ্রন মন্দিরের কয়েকটি মূর্তি সঞ্চয় মন্তব্য করেন যথা :—

১। মন্দিরের উপর তলায়—শিবের ত্রিনেত্র মূর্তি :—(basalt) কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত, ভগ্ন ২' ১" উঁচু, তৃতীয় নয়ন পরিষ্কৃত, কিরীট মুকুট, মকরকুণ্ডল এবং অবতংশ ভূষিত, সমভঙ্গ বিলাস, অন্তর্ধাসের মধ্যাকোষ পদব্বয়ের মাঝে বিলম্বিত, স্তরবিশিষ্ট প্রভামণ্ডল বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : কাঙ্ককার্য্য পাল যুগের পরিচায়ক।

২। মূল মন্দিরের পূর্বদিকে নন্দীশ্বর মন্দিরে পাল যুগের বাসান্ট প্রস্তর তৈরী সমভঙ্গ বিষ্ণুমূর্তি। উপরের দক্ষিণ হাতে গদা, বাম হাতে শঙ্খ, নীচের ভগ্ন দক্ষিণ হাতে পদ্ম (?) ছিল আর বাম হাতে চক্র। কিরীট মুকুট, মকর কুণ্ডল, যজ্ঞোপবীত ও বনমালা লক্ষ্য করার মত। দক্ষিণ ভাগে লক্ষ্মী, বামভাগে বীণাহস্তে সরস্বতী, শেষ প্রান্তে জয়া, বিজয়া, গরুড় ও দানপতি, পাদপীঠে আরও অনেক কিছু বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রভামধ্যস্থ বিষ্ণুর উপরে কিরীট মুকুট, উভয় পাশে যুগল বিজয়াধর, প্রান্তদেশে হংস ও গজ শাউল। মূর্তিটি বাহুদেবের, উপাসনা বিষ্ণুর। সম্মুখভাগে দু'টি লিঙ্গ—একটি নন্দী অপরটি ভূদেবী। বাহুদেবের মূর্তি ২' ৩" উঁচু।

৩। মূল মন্দিরের দক্ষিণে কুবের মন্দির। মন্দিরের পাশে বটবৃক্ষের নীচে বাসান্ট পাথরের দুইটি পালযুগের ভগ্নমূর্তি। একটিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় অর্দ্ধপ্রভা, অপরটি ভগ্নবিষ্ণুমূর্তির অর্দ্ধাংশ বলিয়া মনে হয়। তাহাতে

গজ-শা ছল, সরস্বতী, বিজয়া ও নতজাহ্নু দানপতির মূর্তি দেখা যায়। বেলে পাথরের মকর বহ্নীও লক্ষ্য হয়। এগুলি সবই পালযুগের।

গড়তলি

মন্দিরের ১০০ গজ পূর্বে বালুকা প্রস্তর নির্মিত গণেশ ও কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত লক্ষ্মী মূর্তিও ভগ্ন। আর একটি পাদপীঠের অংশের উপর জোড়াসন এবং গলদেশহার যুক্ত অল্প এক মূর্তি এখানে ছড়াইয়া আছে। মূর্তি পরিচয় স্পষ্ট নহে।

কিন্তু এই মূর্তিই যে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর তাহাতে সন্দেহ নাই। মূর্তিগুলির কোনটিও অক্ষত নাই। এমন কি কুবেরেশ্বরের মন্দিরের প্রস্তর লিঙ্গটিও খণ্ডিত।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে নন্দীকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করা হয়। পঙ্কোদ্ধারকালে বাহুদেব ত্রিনেত্র ও গোপাল প্রভৃতি এই প্রস্তর মূর্তিগুলি পাওয়া যায়। সুতরাং মহারাজা প্রাণনারায়ণের নব-রত্ন মন্দিরের পূর্বের কোনও মন্দিরে এগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রাণনারায়ণের সময় সে মন্দির ধ্বংসস্তুপে পরিণত ছিল। তাহা মহারাজা জল্ল শিমিত মন্দির হওয়াও সম্ভব।

এই মূর্তিগুলি যদি মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলের হইত তবে এগুলি অবশ্যই তদনির্দিষ্ট মন্দিরেই পাওয়া যাইত। সুতরাং এই মূর্তিগুলি পূর্ববর্তী কোনও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোনও কারণে মূর্তিগুলি কাহারও দ্বারা বিকৃত খণ্ডিত হওয়ার জন্ত নন্দীকুণ্ডে বিসর্জিত হইয়াছিল।

কি কারণে, কোন্ সময়ে বা কাহার দ্বারা এই ধ্বংসাত্মক কার্য সাধিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসের গবেষণার বিষয়।

সাবেক নব-রত্ন মন্দির

কথিত আছে কুচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ যুগয়া করিতে আসিয়া লোকমুখে অবগত হন যে প্রতিদিন দ্বি-প্রহরে এক বক্তাগাভী এই জঙ্গলে ধ্বংসস্তুপের উপরে হুঙ্কারণ করিয়া যায়। মহারাজা প্রস্তর রাশি সরাইয়া শিব-লিঙ্গের দর্শন পান ও তদুপরি মন্দির নির্মাণ করান। দিল্লী হইতে হুদুদ কারিগর আনাইয়া জল্লেশদেবের নব-রত্ন মন্দির নির্মাণ করেন।

১৩০৪ সনের ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার বিকালে (১৮২৭ সালের জুন মাসে) প্রবল ভূমিকম্পে এই হুদুদ্য মন্দিরের দোতলার উপরিস্থ ৫২ ফুট সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া ভূমিসাৎ হয়। কিন্তু তদপূর্বেই জল্লেশ টেম্পল কমিটির প্রথম সেক্রেটারী জগদীশদেব রায়কত যে আলোকচিত্র (Photo) লইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল পণ্ডিত এম্. এস. ভাটস্ ১৯৫২ সালের ৪ঠা মার্চ এই নব-রত্ন মন্দিরের বর্ণনা করেন। তাহার বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল। যথা :—

“মহারাজা প্রাণনারায়ণ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের সম-সময়ে জল্লেশ মন্দিরটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া তৈরী করেন। এই মন্দিরের মধ্যস্থলের অধিকাংশ ধ্বংসের হাত হইতে পরিজ্ঞান পাইয়াছে। মহারাজা প্রাণনারায়ণের মন্দির ৭২' ৮" বিশিষ্ট চতুষ্কোণ বলিয়া দেখা যায়। এর গঠন একতলায় একটির পিছনে আর একটি একরূপ পর পর দুই সারি দালান। কেন্দ্রস্থলে গর্তগৃহ চতুষ্কোণ ২২'। গর্তগৃহ সংলগ্ন দেওয়াল ৬' ২" পুরু। কিন্তু দালান দুই সারির মধ্যবর্তী দেওয়াল মাত্র ৩' ৬"।

দোতলায় ভিতরের সারি দালানের সামনে বাহিরের সারি দালানের সমতল ছাদ বারান্দার দ্বারা। ভিতরের সারি দালানের গঠন চারিদিকে নিম্নরূপ। দুই কোণের দুই ছোট প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে ৩২'×১৬' আয়তন বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ, উপরে স্বদৃঢ় খিলান করা ছাদ এবং উভয় কোণে ১৬' চতুর্কোণ গম্বুজ বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ। কোণগুলি ভরাট করিয়া প্রকোষ্ঠগুলিকে বৃত্তাকারে পরিণত করিয়াছে। মন্দিরের বাহির হইতে দোতালার দিকে দৃষ্টি দিলে চোখে পড়ে পাঁচটি দরজা—যাহার শীর্ষভাগ অর্ধ-চক্রাকৃতি। প্রত্যেক দরজা ৭' ৪" চওড়া, ১০' উঁচু। তিনটি দরজা উভয় কোণের প্রকোষ্ঠ দুইটির মধ্যস্থলে লম্বা প্রকোষ্ঠটির বহির্ভাগে অবস্থিত। আর বাকী দুইটি কোণের প্রকোষ্ঠ দুইটির সংলগ্ন। খিলানগুলির ভিতর বাহির উভয় দিকেই অর্ধ-চক্রাকার, ছোট ছোট বহুভাঁজ বিশিষ্ট এবং ভাঁজগুলির সংযোগস্থল চোখা। একরূপ খিলান সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের বিশেষত্ব। গর্তগৃহের এবং দালানগুলির দেওয়ালের ভিতরে খোদিত অসংখ্য খাঁজগুলিরও গঠন একই প্রকারের।

চতুর্কোণ গর্তগৃহের ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায় গর্তগৃহের চারিদিকের দেওয়াল উর্দ্ধে দোতালার পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার উপরের অংশ সম্পূর্ণ নূতনভাবে পরে নির্মিত। গর্তগৃহের মূল চতুর্কোণ অংশটি প্রথম তলায় সম্পূর্ণ ও দ্বিতীয় তলার অর্ধেক পর্যন্ত খাড়া উঁচু। তার উপরের অংশের কোণগুলি ভিতরের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চতুর্কোণ গৃহটিকে অষ্টকোণে পরিণত করিয়াছে। এরই উপরে মনে হয় বৃত্তাকার ড্রাম (drum) এবং এই ড্রামের উপরে গম্বুজ, গম্বুজের উপরে পদ্মের মাথা এবং তাহার উপরে ধাতু নির্মিত নিশান ছিল।

প্রাচীন মন্দিরের ছবিতে দেখা যায় যে গর্তগৃহের দোতালার উর্দ্ধদেশে খাড়া অষ্টকোণ আকৃতি-বিশিষ্ট গঠন ছিল। এই দ্বিতল অষ্টকোণের উপরের দিকে মন্দির ভিতরের দিকে চাপা ও চারিদিকে একটি অল্প পরিসর সমতল রাস্তা। এই স্থানে দোতালার কোণের অল্পরূপভাবেই ইহারও কোণগুলি ভিতরের দিকে চাপিয়া আসিয়াছে। এই অষ্টকোণাকৃতির উর্দ্ধে দীর্ঘ টোলের বা পিপার দ্বারা গঠন। পিপার শেষে উভয় দিক হইতে অর্ধবৃত্তাকারে ঢাকা; ও এই ডোমের চারিদিকে পদ্মের মালার দ্বারা প্রতীকমান হয়। মূল চূড়াটি এই পদ্মের মালার কেন্দ্রস্থলে ছিল বলিয়া মনে হয়।

পণ্ডিত ভাটসের এই বর্ণনা হইতে মহারাজা প্রাণনারায়ণ নির্মিত নব-রত্ন মন্দিরের চিত্র ও নির্মাণশৈলী পাওয়া যায়।

পুনর্গঠিত বর্তমান জলেশ মন্দির

১৩০৪ সালে বা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দির বিধ্বস্ত হওয়ার পর ভারত সরকার (Secretary of State for India in Council) এক ট্রাস্ট কমিটি গঠন করিয়া মন্দির পরিচালনের ভার উক্ত কমিটির উপর দেন। কমিটি বহু পরিশ্রমে সর্বসাধারণের নিকট হইতে দান ও ভিক্ষালব্ধ অর্থ লক্ষাধিক টাকা বায়ে ৫২ ফুট ভগ্নস্থানে ফেরোকংক্রীটে ৩২ ফুট উচ্চ ড্রাম ও তদুপরি ২০ ফুট উচ্চ ডোম (গম্বুজ) নির্মাণ করেন। তদানন্তর প্রতিবৎসর মন্দিরের সংস্কার, যাত্রীনিবাস নির্মাণ প্রভৃতি উন্নতিমূলক কার্য হইয়া আসিতেছে।

সংক্ষেপে বর্তমান মন্দিরের পরিচয় নিয়ে দেওয়া গেল। যথা :—

গর্ত-গৃহের মেঝে	২৭'	সমচতুর্ভুজ	উচ্চতা	১০'
একতলার ভিত্তি বারান্দা সহ	১২৩' ৬"	"	"	১০'
দোতলার ভিত্তি	৮০'	"	"	২০'
তেতলার ড্রামের ভিত্তি	৪০'	"	"	৩২'
ড্রামের চারিপার্শ্বের পরিধি	১২৬' ৬"			

অর্জবৃত্তাকার ডোমের পরিধি	৩৪' ২"	উচ্চতা	২০
ড্রাম ও ডোমের স্থূলতা (বৃত্ত ও গম্বুজের)	৬"		
চূড়া (ধুতুরা ফুল, কলস ও ত্রিশূল)		"	২০
মেঝে হইতে ত্রিশূলের অগ্রভাগ পর্যন্ত মন্দির		"	১১২

ভিত্তিভূমির গভীরতা নির্ণয়ের কোনও প্রচেষ্টা হয় নাই।

মন্দির পরিচালন

মন্দির নির্মাণ করাইয়া মহারাজা প্রাণনারায়ণ জলেশ্বরের সেবা-পূজার জন্য ৪৬ খানা জোত দেবোত্তর করিয়া যান। পরবর্তীকালে পশ্চিমদুয়ার অঞ্চল Western Duars ভূটানরাজ দখল করেন কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তির হানি করেন নাই। অতঃপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমদুয়ার ব্রিটিশের অধিকারে আসিলে ১৮২১ খৃঃ ১৭ই এপ্রিলের রাজস্ব বিভাগীয় ৪২৪ L.R আদেশক্রমে দেবোত্তরগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। এই বাজেয়াপ্ত জমির পরিমাণ ছিল ১৬১৮'৭৬ একর। জোত বাজেয়াপ্ত করিয়া ৩জন পূজারীর মাহিনা ৭২০/- ও মন্দির সংস্কার বাবদ ১০০০/- মোট বার্ষিক ১৭২০/- টাকা আয়ের ৩২টি প্রজাবিলি জোতের খাজানা আদায়ী স্বত্ব “জলেশ টেম্পল কমিটি” নামে এক কমিটি করিয়া মন্দির পরিচালনের দায়িত্ব তাহার উপরে দেন। আদেশটি এইরূপ :—

রাজস্ব বিভাগ

ভূমি রাজস্ব—নং ৪২৪ এল, আর।

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল, ১৮২১।

ডবলিউ মড সাহেব

অবর সেক্রেটারী, বাংলা সরকারের নিকট হইতে।

বাংলার ভূমি পরিসংখ্যান ও কৃষি বিভাগীয় ডিরেক্টরের প্রতি—

মহাশয়,

পশ্চিম দুয়ারের ময়নাগুড়ি পরগণা সম্বন্ধীয় ৩০শে মার্চ ১৮২১ তারিখে লিখিত আপনার ৩৭৮নং টি এ পত্র ও তৎসহ প্রেরিত দলিল পত্রাদি পাইয়াছি। দাবী করা হইয়াছে যে এই জোতগুলি অত্যাধি ব্রিটিশ সরকারে কখনও কোনও রাজস্ব প্রদান করেন নাই; নির্দিষ্ট দেবসেবার উদ্দেশ্যে জলেশ মন্দিরের পূজারী ও পরিচালকবৃন্দের ভরণ-পোষণ জন্য এই জোতগুলি দেবোত্তর দেওয়া হইয়াছে ও কতকগুলি দলিলের ভিত্তিতে এই দাবী করা হইয়াছে। আপনার পত্রের সাথে দলিলগুলির ইংরেজি তর্জমাও দেওয়া আছে। সেগুলি এ, বি, সি, ডি বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে।

২। তদন্তের বক্তব্য এই যে এ ও বি চিহ্নিত সনদ দুইটিতে যে ৪০টি জোতের তালিকা দেওয়া আছে প্রচলিত বাংলা সম্বন্ধের সাথে সেগুলির সম্বন্ধের মিল নাই; অধিকন্তু এগুলির কোনও বৈধতা নাই, ছোটলাট বাহাদুর এ যুক্তি স্বীকার করেন না যে যেহেতু সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সাথে সাথে এগুলি বাজেয়াপ্ত করেন নাই হতরাং এখন আর সেগুলি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন না। যাহা হউক, ছোটলাট বাহাদুরের মতে ডুয়ার্সের মধ্যে অবস্থিত এটি একটি সুন্দর মন্দির এবং এতদঞ্চলের লোকেরা মন্দিরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তিসম্পন্ন।

সুতরাং মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের কিছু কর্তব্য আছে। এমতে স্যার চার্লস ইলিয়ট স্থির করিয়াছেন যে জোতগুলি বাজেয়াপ্ত হইবে বটে কিন্তু জোতগুলির আয় হইতে মন্দিরের সেবাপূজায় নিযুক্ত তিনজন পূজারীর মাহিনা বাবদ মাসে ৬০৮ টাকা ও মন্দিরের সংস্কার বাবদ বৎসরে ১০০০৮ এক হাজার টাকা সরকার হইতে দেওয়া হইবে। মন্দির সংস্কার বাবদ ১০০০ এক হাজার টাকা জলপাইগুড়িতে একটি কমিটি করিয়া তাহার হাতে দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে কমিটি এই এক হাজার টাকা খরচ করা ছাড়াও সর্বসাধারণের নিকট হইতে আরও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩। অবশিষ্ট ৬টি জোত সম্বন্ধে ছোটলাট বাহাদুরের মত যে, এগুলি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। এগুলির সমর্থনে কোন দলিলপত্রাদি নাই এবং যে কল্পিত উদ্দেশ্যে এই জোতগুলি দান করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হয় জোতের মালিকগণ তাহার কিছুই করে না।

অনুগত ভূতা

স্বাক্ষর—ডবলিউ মড্

অবর সেক্রেটারী, বাংলা সরকার।

উক্ত আদেশ অনুযায়ী ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে কমিটি গঠিত হইল বটে এবং মন্দির সংস্কার বাবদ বার্ষিক ১০০০৮ টাকা বরাদ্দ হইল কিন্তু দীর্ঘকাল মন্দিরের কোনও সংস্কার সাধিত হয় নাই। ভূমিকম্পের পূর্বে যে আলোকচিত্র তোলা হইয়াছিল তাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান যে মন্দিরের গায়ে কাশিয়া মৃগা প্রভৃতি জঙ্গল ঘাস গজাইয়াছে। মন্দিরের তখন আর দৃঢ়তা নাই এবং অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যে একটি নক্সা ও আনুমানিক সংস্কারের ব্যয় নির্দ্ধারিত হইল তাহাতে আবশ্যক হয় ৩৫,০০০ এমনকি অপরিহার্য সংস্কার সাধনেও প্রয়োজন ১৫,০০০ টাকা। কমিটি সরকারকে বহুপ্রকার আবেদন-নিবেদন করিয়াও কোনও ফলোদয় হইল না দেখিয়া চিন্তিত আছেন এমন সময় প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরের ৫২ ফুট ভাঙ্গিয়া পড়িল। কঠিন সমস্যা কঠিনতর হইল।

এমতাবস্থায় ভারত সরকার ১৮২২ সালের ৩০শে জানুয়ারী “জন্মেশ টেম্পল কমিটির” নামে এক ট্রাস্ট দলিল সম্পাদন করেন। ট্রাস্ট কমিটি ভগ্ন মন্দির সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ কাজে ত্রতী হ'ন।

প্রথম ট্রাস্ট কমিটির সদস্য নিযুক্ত হ'ন—

- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| ১। কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কত | — | সেক্রেটারী |
| ২। শ্রীগোবিন্দশঙ্কর—সর্বাধ্যক্ষ। | | |
| ৩। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস। | | |
| ৪। শ্রীশান্তরাম দাস। | | |
| ৫। কুমার রূপেন্দ্র নারায়ণ। | | |

পরে ৮/৩/১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রায়কত সাহেবের স্থলে শ্রীগোবিন্দশঙ্কর সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় কমিটির সেক্রেটারী মনোনীত হ'ন। ট্রাস্টীগণের মধ্যে কেহ মৃত হইলে তদস্থলে জীবিত ট্রাস্টীগণ নতুন ট্রাস্টী নির্বাচন করেন এবং জেলা জজ তাহা অনুমোদন করেন।

বর্তমানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ট্রাস্টী আছেন।

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| ১। শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ | — | সেক্রেটারী |
|---------------------------|---|------------|

২। শ্রীকিশোরী মোহন ঠাকুর — সহঃ সেক্রেটারী

৩। শ্রীসর্বানন্দ দাস।

৪। শ্রীমোহিনী কান্ত দাস।

৫। শ্রীভূপেন্দ্র দেব রায়কত।

১৯৫৪ সালের ১নং আইনের (জমিদারী গ্রহণ আইন) দ্বারা অস্থায়ী জোতগুলি গভর্নমেন্ট খাস করিয়া লন এবং তৎপরিবর্তে বার্ষিক ৩,০৭৫.৩৯ পঃ কমিটিতে দিতে থাকেন।

ট্রাস্টীগণ প্রতি বছর জমা খরচের হিসাব চার্টার্ড একাউন্টেন্টের দ্বারা অডিট করান, আগামী বছরের বাজেট প্রস্তুত করেন এবং অডিট রিপোর্ট ও বাজেট জেলা জজের দ্বারা মঞ্জুরী করাইয়া লন।

ভগ্ন মন্দির সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ

১৮৯৯ সালে ট্রাস্ট কমিটি কার্যভার গ্রহণ করিল। মন্দির ভূমিকম্পের পূর্বেই সর্বত্র কাশিয়া মূন্ডা প্রভৃতি বহু ঘাসে আবৃত হইয়াছিল। রায়কত সাহেব তৎকালীন মন্দিরের যে আলোক চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা উপলব্ধি হয়। ভূমিকম্পের পর তাহা জংগলে পরিপূর্ণ হইল এবং বহু শূকর, শূগাল, ব্যাঘ্রাদির আবাসে পরিণত হইল। কমিটি চিন্তাশ্রিত হইলেন।

মন্দির সংস্কার সম্পর্কে রায়কত সাহেব ১৯২৭ সালের ২রা আগষ্ট ট্রাস্ট কমিটির নিকট যে রিপোর্ট দেন তাহাতে তিনি লিখেন—

“বাক্সালা ১৩০৪ সালে প্রবল ভূমিকম্পে মন্দির ভূমিসাৎ হয়। শিবরাত্রির পূর্বেই ভগ্নস্তূপ ও আশঙ্কাজনক মন্দিরের স্থান সমূহ ভাঙ্গিয়া সরাইতে অল্পমান ৪০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল মনে হয়। মন্দিরের উত্তর বারান্দা, পূর্ব বারান্দা, উত্তর-পশ্চিম ডোম, উত্তর-পূর্ব ডোম, সম্পূর্ণ তৈয়ারী, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের ডোমদ্বয় মেরামতী পলস্তুরা ইত্যাদি কার্যে প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা ৬হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় ঠিকাদার মহাশয়কে দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান ওভারসিয়ার বাবুর স্বর্গীয় পিতা জগন্নাথ সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম ও দক্ষিণ বারান্দার ছাদ মেরামতি কার্যেও দুই হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। তৎপর হইতে অর্থ সংগ্রহ করতঃ দীর্ঘকাল কোনও কার্য না করাইয়া টাকা সঞ্চয় চলিতেছিল। তৎকালে বাক্সালা ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কার্য আরম্ভ হইয়া এ যাবৎ প্রায় ৪৪০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইতে চলিল। ইহার মধ্যে ইট প্রস্তুতি প্রভৃতি ব্যয় ও ধরা হইল। আগামী মাস হইতে ছয় মাস মধ্যে আরও ৮০০০ হাজার টাকার আনুমানিক হিসাব উপরে প্রদত্ত হইল। কেবলমাত্র মন্দিরটী মেরামতিতে শেষ পর্যন্ত ৭৫,০০০ (পচাত্তর হাজার) টাকা আবশ্যক হইবে। সময় ২০ বৎসর লাগিল” ... “আরও ২০,০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া কেবলমাত্র মন্দিরের পূর্ব সৌষ্টব আনয়ন করিতে আরও ১০।১২ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।”

এই রিপোর্টেই জানা যায় যে ভগ্নস্তূপ সরাগোর পর মন্দির পুনর্নির্মাণ কাজে হাত দিতে আরও ৭।৮ বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়।

বস্তুতঃ অর্থ সংস্থানটিই প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ট্রাস্ট দলিলের বার্ষিকী ১০০০ টাকা প্রতিবৎসর নিতান্ত আবশ্যকীয় সংস্থারেই ব্যয়িত হয়। বিধ্বস্ত মন্দিরের চারিদিকের এবং প্রাঙ্গণের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া শিবরাত্রি উপলক্ষে আগত হাজার হাজার যাত্রীর দাঁড়াইবার উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করা ইত্যাদিতেই প্রায় টাকা খরচ হইত।

ট্রাষ্ট কমিটি তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার বীল সাহেবকে মন্দিরটি নতুনভাবে তৈয়ারী করা সম্পর্কে একটি নক্সা তৈয়ার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে মিঃ বীল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তৎকালীন এন্টিমেটার ও ড্রাফটসম্যান ৩ চিন্তাহরণ বন্দোপাধ্যায়কে হিন্দুধর্মসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই শিবমন্দিরের নক্সা তৈয়ারী করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি ১৯০০ খ্রীঃাব্দে একটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী নক্সা তৈয়ার করিয়া দেন। কিন্তু নানা কারণে মন্দির পুনর্গঠনের কার্য আরম্ভ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল।

এই অবস্থায় ৩গোবিন্দশঙ্কর সর্বাধক্ষ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট এক আবেদন পত্র পাঠান। ডিরেক্টর জেনারেলের প্রেরিত বিভাগীয় পরিদর্শক মন্দির দর্শনের পর মন্দির পুনঃ সংস্কারের একটি এন্টিমেট বা খরচের আনুমানিক বিবরণ প্রস্তুত করেন। উক্ত এন্টিমেট অনুযায়ী দোতালার উপরে ৫০ ফুট উচ্চ দেওয়াল ও তদুপরি ২৫ ফুট উচ্চ গম্বুজ প্রস্তুত করিতে প্রায় একলক্ষ টাকার প্রয়োজন। তিনি গভর্নমেন্ট কর্তৃক এই টাকা মঞ্জুর করাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট উহা নামঞ্জুর করেন।

রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ স্যামনের নিকট জলেশ মেলায় দশ বৎসরের উপস্থ পান্টাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করা হয়। দরখাস্ত সমর্থন করিয়া স্যামন সাহেব মঞ্জুরীর জ্ঞাত গভর্নমেন্টের নিকট পান্টাইয়া দেন। গভর্নমেন্ট তাহাও নামঞ্জুর করেন।

ভগ্ন মন্দির কি করিয়া গড়িয়া উঠিবে ?

তখন ব্যক্তিগত দানের উপরে নির্ভর করা ছাড়া উপায়স্তর নাই দেখিয়া ৩গোবিন্দশঙ্কর সর্বাধক্ষ অর্থশালী ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হ'ন, কিন্তু এই লক্ষাধিক টাকা বায়ের কাজে হাত দেওয়া দুঃসাহসিক কার্য এরূপ মন্তব্য করিয়া কেহই সাহায্য করিতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে বিশেষ চেষ্টা করিলেও দশ হাজারের অধিক টাকা সংগ্রহ হইবে না। এই প্রকারে মন্দির পুনর্নির্মাণ কার্য ৫৬ বৎসর পিছাইয়া গেল।

অক্লান্ত কর্মী রায়কত সাহেব ও ৩গোবিন্দ বাবু ইহাতে নিরন্তর হইলেন না। রায়কত সাহেব বহু পরিশ্রমে ও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের জঙ্গলাদি পরিষ্কার করান এবং বৃদ্ধ বয়সে ডুমুরের বিভিন্ন অস্থান্যকর স্থানে এবং পার্শ্ববর্তী কুচবিহার রাজ্যের মেখলীগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গা সাব-ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ ও কোন কোন দিন তাঁবুতে রাত্রি বাস করিয়া ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহের কার্যে ব্রতী হ'ন। অপরদিকে ৩গোবিন্দশঙ্কর সর্বাধক্ষ ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে মন্দির সংস্কার কার্যের জ্ঞাত লোহালকড় প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিষপত্র নিজ ব্যক্তিগত দায়িত্বে লইয়া মন্দির পুনর্নির্মাণের কার্যে ব্রতী হন। মন্দিরের অদূরে জড়দা নদীতে অফুরন্ত পাথর। ভূমিকম্পে ভগ্ন তেতাল ও গম্বুজ ফেরো কংক্রিটে পুনর্নির্মাণ করা পূর্বেই সাব্যস্ত ছিল। গ্রামের গাড়োয়ান ও মঞ্জুর নামমাত্র পারিশ্রমিক লইয়া নদী হইতে পাথর আনিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে স্তূপাকার করিতে লাগিল। মন্দির প্রাঙ্গণস্থ বিশাল বটবৃক্ষের ডাল কাটিয়া তাহা হইতে আবশ্যকীয় তক্তা চেরাই করা হইল। ভগ্ন মন্দির ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

রায়কত সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত ১৯২৭ সালের রিপোর্টের পরেই পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দা আরম্ভ হয় এবং যে জোতদারশ্রেণী মন্দিরের মেরুদণ্ড ছিল তাঁহারা চরম আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হন। কৃষিজাত দ্রব্য যথা ধানের মণ এক টাকা পাঁচ সিকায় নামিয়া যায়, তামাকের মণ পাঁচ টাকা হইতে পনের টাকার মধ্যে এবং পাট আবাদের মঞ্জুরী পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা উত্তল হয় না। ডুমুর অঞ্চলের শত শত জোত রেভিনিউ নিলামে ডাক

দেওয়ারও লোক পাওয়া যায় না। এমনই শোচনীয় অবস্থায় অর্থসংগ্রহ কঠিন হইয়া পড়ে। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মন্দায় ডুয়াসবাসী জোতদারদের একটি বৃহৎ অংশ নিঃস্ব হইয়া যায়।

১৯৩২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই কৃষিজাত শস্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং মন্দিরের সংস্কারকাৰ্য পুনরায় আরম্ভ করা হয়।

মূল মন্দিরটির সংস্কারকাৰ্য শেষ হওয়ার পর মন্দিরের সংলগ্ন চারিদিকের ফেরোকংক্রীটের একতলা নির্মাণ ও মন্দির প্রাঙ্গণে অগ্ন্যাক্ত সৌষ্ঠবমূলক প্রাটফরম্ আদি নির্মাণ করা হয়।

এইভাবে যে মন্দির পুনর্নির্মাণ হইয়াছে তাহার পরিচয় ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

জলেশদেবের সেবা ও পূজা

মহারাজা প্রাণনারায়ণ জলেশদেবের পূজা ও ভোগরাগের নিমিত্ত তিনখানি জোত দেবোত্তর করিয়াছিলেন কিন্তু মন্দির-সংস্কার বা মেরামত বাবদ আলাদা কোনও বন্দোবস্ত করেন নাই। তাহাতে সেবাপূজা চলিত বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত কেহ কোন অর্থব্যয় না করায় মন্দির ক্রমশঃ জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গৃহীত মন্দিরের ফটো হইতেই তাহা প্রমাণ হয়।

ব্রিটিশ সরকার মন্দির সংস্কারের জন্ত বার্ষিক এক হাজার টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু সেবা-পূজার ব্যয় বাবদ কোনও বরাদ্দ করিলেন না।

জায়গীর বাজেয়াপ্তী পত্রে মড্ সাহেব জানাইলেন :—

“The Committee would be able to get further subsidies from the public for the purpose.”

“এতদ্ জল্প কমিটি সর্বসাধারণের নিকট হইতে আরও অর্থ সংস্থান করিতে পারিবেন।”

ফলে ১৮৯১ সালের পরে দেবতার সেবাপূজা একপ্রকার বন্ধ লইয়া গেল। পূজারীরা—পূজা না করিলে নয়— এইভাবে কোনও প্রকারে সেবা-পূজার কাৰ্য চালাইতে লাগিলেন। কমিটির সেক্রেটারী সরকারের কাছে সেবাপূজা বাবদ আরও ১১৬০০ টাকা মঞ্জুর জন্ত আবেদন জানাইলেন। ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল বয়লো হুপারিশ করিলেন কিন্তু কমিশনার সাহেব নানা আপত্তির মধ্যে “এই টাকা মঞ্জুর করিলে গবর্ণমেন্টের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির যে প্রধান কারণ সরকারের আয়বৃদ্ধি তাহা পর্যাপ্ত বিনষ্ট হয়” বলিয়া রিপোর্ট করায় বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট তাঁহার মতেই মত দিয়া আবেদন নামঞ্জুর করেন। গতাস্থর নাই দেখিয়া কমিটি সর্বসাধারণের নিকট টাকা ও ভিক্ষা লইয়া সেবা পূজার ব্যবস্থা করিতে ত্রতী হইলেন।

ঐ সময়ে এতদ্ অঞ্চলে একমণ সরু আতপ চাউলের মূল্য ছিল বার আনা। বৈশাখী মেলায় যাত্রীগণ ভোগ দিতে আসিয়া অতিরিক্ত কিছু কিছু আতপ চাউল মন্দিরে সারা বৎসর ভোগ দিবার জন্ত প্রদান করিত। এক সের বিগুন্ধ গাওয়া ঘির মূল্য ছিল মাত্র ছয় আনা। সুতরাং সেবা-পূজা যথারীতি চলিতে লাগিল।

এর পর হইতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৩৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর — কমিটি দৈনিক ভোগরাগের

যে বাজেট পেশ করেন তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। যথা —

১। আতপ চাউল দৈনিক ৫ পাঁচ সের মাসিক ৩ মণ ৩০ সের হিসাবে	১৬।।০
২। ডাল দৈনিক ১ সের মাসিক ৩০ ত্রিশ সের	৪.
৩। সৈন্ধব লবণ মাসিক ১।। সের	৮.০
৪। মশলা—ধনিয়া, জিরা, গোলমরিচ, পাঁচফোড়ন আধা সের	১৮.০
৫। হলুদ মাসিক	৮.০
৬। ঘি দৈনিক এক ছটাক, মাসিক ২ সের	২।।০
৭। তরকারী দৈনিক এক আনা	১৬৮.০
৮। কাচা লংকা মাসিক	৮.০
৯। নৈবেদ্যের জন্তু— চিনি, কলা, পান-রুপারী, ধূপ মাসিক বরাদ্দ	৩৮.৬
১০। সরিষার তৈল মাসিক ৩ সের	১৮.০

সর্বমোট মাসিক খরচ ৩০।৬

ইহার পর হইতে দ্রব্যমূল্য চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কমিটিকে বিভিন্ন খাতে আয়ের সংস্থান করিয়া লইতে হইতেছে।

জল্লেশ মেলা

মন্দিরের একটি আয়ের পথ ছিল জল্লেশমেলা। মেলায় ভূটিয়া ব্যবসায়ী গরম কহল, ঘোড়া, কুকুর, নানা প্রকারের মালা এবং তিব্বতীরা নানা প্রকার ধাতু নিমিত্ত দ্রব্যাদি, খেলনা, চামর প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনিত। তদকালে দূরস্থানে যাতায়াতের বাহন ছিল ঘোড়া এবং প্রতিবৎসর জল্লেশমেলায় দুই-তিন শত ঘোড়া কেনা-বেচা হইত।

সুদূর পাটনা, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ হইতেও উৎকৃষ্ট সতরঞ্চ, কাঁসা, পিতলের বাসন, ট্রাক প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের বড় বড় দোকান মেলায় বিক্রয়ার্থ আসিত। সে যুগে মফঃস্বলে ঐ সকল দ্রব্য মিলিত না, তাহার জন্ত গ্রামবাসীগণ জল্লেশমেলার অপেক্ষায় থাকিত; শিবচতুর্দশীতে জল্লেশমেলায় গরুর গাড়ীতে ও রেলপথে পরিবার পরিজন সহ আনিত ও শিব দর্শনান্তে মেলায় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে চতুর্দশী উপলক্ষে তিনদিন স্পেশাল ট্রেন দিয়াও কুলাইতে পারিত না।

মনে পড়ে, আমরা মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের কয়েকজন ছাত্র আমাদের গাইড্ অফিসের শিক্ষক মহাশয় সহ পাটগ্রাম ষ্টেশনে একে একে দুইখানা স্পেশাল ট্রেনে উঠিতে পারিলাম না। শেষরাত্রে তৃতীয় স্পেশালে খোলা কয়লার ওয়াগনে উঠিয়া ভোটপাটি ষ্টেশনে নামি ও তথা হইতে তিন মাইল পদব্রজে মন্দিরে পৌছি।

তিস্তা নদীর পশ্চিম হইতে তিস্তাঘাটে একসাথে এতো যাত্রী ভীড় হইত যে সারা জলপাইগুড়ি সহরে সোর-গোল উঠিত, তিস্তার ঘাটে স্বেচ্ছাসেবকেরা নৌকায় ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রিত করিত।

১৮৯১ সালে মন্দিরের দেবোত্তর বাজেয়াপ্ত করার সাথে সাথে মেলাটিও ব্রিটিশ সরকার খাসদখলে লইল। এতে মন্দিরের যে আয় হইত তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় টেম্পল কমিটি বহুবার মেলাটি ফেরৎ পাওয়ার জন্ত সরকারের নিকট আবেদন করিয়াও সফলকাম হন নাই। অবশেষে ১৯৪৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্বপারিশক্রমে বোর্ড অব রেভিনিউ ১৯৫৫ সাল হইতে মেলাটি মন্দির কমিটিকে প্রত্যাৰ্পণ করেন। কিন্তু পূৰ্ব পাৰিক্ৰিয়ান সৃষ্টি হওয়ায় ও চীন তিৰ্কত রাজ্যটি গ্রাস করার মেলার আর আগের অবস্থা নাই। অধুনা রাস্তাঘাট উন্নত হওয়ায় ও বাস চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘোড়ার ক্রেতা নাই বলিলেই চলে। গ্রামে গ্রামে নানাবিধ দ্রব্যের দোকান হওয়ায় জলেশমেলার কেনা-বেচাও কমিয়া গিয়াছে। অথচ মেলা পরিচালনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মেলা পরিচালনের জন্য একটি কমিটি আছে। ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে তার চেয়ারম্যান ও টেম্পল কমিটির সেক্রেটারী মেলাও সেক্রেটারী। কমিটির অন্যান্য সদস্য—(১) প্রধান মেডিকেল অফিসার (স্বাস্থ্য), (২) পুলিশ সাহেব, (৩) থানামহল অফিসার, (৪) সদর সাবডিভিশনাল অফিসার, (৫) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (৬) জেলা হেলথ অফিসার ও (৭) টেম্পল কমিটির আর একজন সদস্য।

মেলার সময় একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসে ও তিনদিন একজন ম্যাজিষ্ট্রেট মেলাস্থানেই ছোটখাট অপরাধের বিচার করেন।

মন্দির প্রাঙ্গণে বৃক্ষাদি

টেম্পল কমিটি মন্দির চত্বরের উপরে ও চতুষ্পাৰ্শ্বে নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে নাসপাতি, কাবাবচিনি, আমলকি, হরিতকী, কদ্রাক, মেহগনি, লবঙ্গ, জায়ফল, সফেদা, পীচফল, আমড়া, মহুয়া, চন্দন, কর্পূর, অর্জুন, দেবদারু, গাব, ক্ষীরকদম্ব ও প্রায় ৪০টি নারিকেল গাছ প্রধান।

মন্দির প্রাঙ্গণে দ্রষ্টব্য বস্তু ও দাতার নাম

- ১। মন্দিরের পশ্চিমে চতুর্দশী তোরণ — মন্দির কমিটি
- ২। মন্দিরের পূর্বে হাতিগেট — স্বর্গীয় ভোলানাথ ঘোষ — রামসাই
- ৩। „ সম্মুখস্থ নাটমন্দির — স্বর্গীয় মতিলাল রায় ও তৎপুত্র হরনারায়ণ রায় পদমতি
- ৪। মার্বেল পাথরের গৌরীপাট — স্বর্গীয় দীননাথ দাস — জোরপাখিরী
- ৫। নন্দীকূণ্ডে পূর্ব তীরের দক্ষিণ ঘাট — স্বর্গীয় দীননাথ দাস — জোরপাখিরী
- ৬। „ „ মধ্যঘাট — স্বর্গীয় শান্তারাম রায় — দ্বারিকামারী
- ৭। „ „ উত্তর ঘাট — স্বর্গীয় ভাহুরাম রায় — খাগড়াবাড়ী
- ৮। „ উত্তর তীরের ঘাট — শ্রীবদন চন্দ্র রায় ও শ্রীভবানীচরণ রায় — অলতাডাকী।

চতুর্দশী তোরণ

জলেশ মেলার দিক হইতে মন্দির দর্শনার্থীর প্রথম দৃষ্টিপথে পড়ে চতুর্দশী গেট বা তোরণ। তোরণের তাৎপৰ্য : এক ব্যাধ জন্মলে হরিণ শিকার করিয়া রাত্রি-প্রবাস জন্ত বেলগাছের ডালে মৃত হরিণ টাঙ্গাইয়া রাখে। বৃক্ষতলে শিব-পার্বতী শান্তালাপে নিমগ্ন। এমন সময় রক্তমাখা বিষপত্র মহাদেবের পায়ে পড়িলে আন্ততোষ চাহিয়া দেখিলেন এক ভক্ত করজোড়ে স্তব করিতেছে। সেদিন ফান্সনী কৃষ্ণা চতুর্দশীতিথি। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাধকে বর প্রদান করিলেন এবং এই কীর্তিকে চিরস্মরণীয় করিলেন।

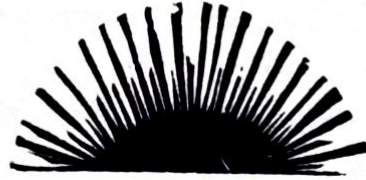
তাই শ্রীভগবান গীতার নবম অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে বলিলেন :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোমং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,
তদহং ভক্তুঃপছতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥

আমার পূজায় নাই আদ্যাস বিস্তর,
ভক্তি মাত্রে তুষ্ট আমি, ওহে ভক্তবর !
আমাতে অপিয়া চিত্ত মম ভক্তগণ
যাহা কিছু ভক্তিভরে করে সমর্পণ,
পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যা ইচ্ছা যাহার,
লই আমি সে সকলি, ভক্তি উপহার ॥

মন্দিরের ধ্বনি

জয় জগন্নাথ । জয় শিব ॥



ইতিহাসের দৃষ্টিতে জলেশ মহাপীঠের প্রাচীনত্ব

ত্রিনিদাদ চৌধুরী

জলপাইগুড়ি সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে জলেশ গ্রাম। এই গ্রামেই অবস্থিত উত্তরবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান “জলেশ মহাপীঠ”; অধিষ্ঠিত দেবতা শিব। মন্দিরে যে শিব প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার কোন মূর্তি নাই। তিনি অনাদিলিঙ্গ মূর্তি। এই শিবের নাম হইতে গ্রামের নামকরণ হইয়াছে না গ্রামের নাম হইতে শিবের নামকরণ হইয়াছে, তাহা আর এখন সঠিকভাবে বলা সম্ভবপর নহে। শিবচতুর্দশীর দিন হইতে প্রায় এক মাসকাল এখানে উৎসবের সমারোহ লাগিয়া থাকে এবং দূর দূরান্তর হইতে ভূটিয়া, অসমিয়া, বঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভক্ত তীর্থযাত্রীগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন। বৎসরের অষ্টাশ্রম সময়েও এখানে যাত্রী সমাগম কম হয় না, বিশেষতঃ পর্বদিনে।

জলেশ উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কিন্তু জলেশ মহাপীঠ কত প্রাচীন তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীএম, এস, ভ্যাটস্ (M. S. Vats) বিগত ১৯৫২ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে লিখিয়াছেন, প্রবাদ এই যে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বা সমসাময়িককালে মহারাজা প্রাণনারায়ণ কর্তৃক পুনর্নির্মিত জলেশ মন্দির খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈনিক ভূটান দেশীয় নরপতি কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১)। শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ লিখিয়াছেন “জলেশ মন্দির কমিটির প্রথম সম্পাদক কুমার জগদ্বিন্দেব রায়কর্তার গবেষণা মতে ৮ম শতাব্দীতে বর্মণ বংশের শেষ রাজা জলেশ্বর বর্মণ জলেশ মন্দির নির্মাণ করেন” (২)। ডাঃ চারুচন্দ্র সাহাচার মতে আনুমানিক ১০০ খৃষ্টাব্দে জলেশ্বর নামক একজন রাজা সর্বপ্রথম এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই একজন অধস্তন পুরুষ পুত্ররাজা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মন্দিরটির সংস্কার করেন (৩)। বলা বাহুল্য, এই সকল মতই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কারণ, কামরূপের বর্মণ রাজবংশের বংশ তালিকায় জল বা জলেশ্বর নামক কোন রাজার নাম আজও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং পুথুরাজার গড় নামে পরিচিত, অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত, ভিতরগড় হয়ত পৌরাণিক পুথুর স্বতি বহন করিতেছে। বাংলার ইতিহাসে এরূপ ঘটনার অভাব নাই; উদাহরণ স্বরূপ জলপাইগুড়ি জেলারই নলরাজার গড়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আদিতে গুপ্ত সম্রাটগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেও চিলাপাতা বনাঞ্চলে অবস্থিত সেই সুপ্রাচীন দুর্গ আজ “নলরাজার গড়” নামে পরিচিত হইয়া পৌরাণিকযুগের স্বতি বহন করিতেছে (৪)। ভিতরগড় কিংবদন্তীর ভবচ্ছন্ন রাজার রাজধানী বলিয়াও পরিচিত (৫)।

ইতিহাসের শূন্যস্থানগুলি মানুষের মন অতি সহজে কিংবদন্তীর দ্বারা পূরণ করিয়া লইয়া থাকে। রাজা জল বা জলেশ্বর হয়ত এইরূপ কোন কিংবদন্তীর নায়ক। কিন্তু উত্তরবঙ্গের জনসমাজে রাজা জলেশ যেমন সুপরিচিত, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি যে শুধুই কল্পনামাত্র, তাঁহার যে কোন ঐতিহাসিক পটভূমি

নাই, তাহা অসম্ভব করিতে বিধা হয়। কোচবিহারের ইতিহাসে রাজা জল্লেশ জিতারির সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (৬)। “আসাম বুরুজী” মতে দক্ষিণ পশ্চিমাগত ছত্রী জিতারি রাজের পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র অরিমন্ত ১১৬০ শকে (১২৩৮ খৃষ্টাব্দে) কামরূপ জেলার বেটনার নিকটবর্তী বৈগরগড় নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন (৭)। এই হিসাবে জিতারি দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। জিতারি “জনশ্রুতিতে অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষাগুরু। ... জিতারির নিজের রচিত একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি গগন ঘোষ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। জিতারির গুরু ছিলেন ধর্মকীর্তি নামে এক পণ্ডিত। জিতারি যে কথখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার “সুগত-মত-বিভিন্ন কারিকার” তিনি স্পষ্ট বাঙ্গলার লোক বলিয়া উল্লিখিত। “তাঁহার উত্তরবঙ্গের অধিবাসী হওয়া বিচিত্র নয়।” ইতিহাস খ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত জিতারি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম পাদে বিদ্যমান ছিলেন (৮)।

রাজা জল্লেশের সমসাময়িক বলিয়া কথিত জিতারি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। “স্কন্দ পুরাণে”র আবৃত্ত্য খণ্ডে ষটষষ্টিতমোহধ্যায়ে লিখিত আছে—

“জল্লো নাম মহাদেবি রাজাভূত্বিশ্রুতঃ।

সদা জল্লরতং নিত্যং জল্লবাদ প্রবর্তকঃ ॥” ২

“স্কন্দপুরাণে” জল্লেশ মহাপীঠের ইতিহাস ও তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে জল্ল নামক রাজার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কোথাকার রাজা, কোন বংশে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহার কোন আভাসই পাওয়া যায় না। তিনি সর্বদা জল্লের রত থাকিতেন এবং জল্লবাদ প্রবর্তক করিয়াছিলেন এরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। “গৌতমসূত্রে”র মতে “বিজিগীষু ব্যক্তি বিবাদি স্থলে যে বাক্যের দ্বারা পরমত খণ্ডন করিয়া নিজের মত সংস্থাপন করেন” তাহাই জল্ল (বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড ৭২৮ পৃঃ)। এইরূপে পরমত খণ্ডন করিয়া যিনি নিজের মত সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন নরপতি কি কর্মগুণে জল্লেশ নাম ধারণ করিয়াছিলেন? তাঁহার পরিচয় কি? জানা নাই। নিজের রাজ্য পঞ্চপুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া তপশ্চায় গমন করা, রাজ্য লোভে পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ, অভিচার ক্রিয়ায় সকল পুত্রেরই মৃত্যু—এসকলই সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত এই ঘটনা কোন সময়ে এবং কোন দেশে ঘটয়াছিল তাহার কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠের নির্দেশে রাজা জল্লেশের মহাকালবনে শিবের আরাধনার মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘটনারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ পৌরাণিক বশিষ্ঠ নিশ্চিতই খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে জিতারির সময়ে জীবিত থাকিতে পারেন না। এই বশিষ্ঠই বাক্যে? “রুদ্রথামলে”র মত বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে যে ব্রহ্মার নির্দেশে বশিষ্ঠ মহাচীনে তারা সাধনার জ্ঞান গিয়াছিলেন; পরে জানা গিয়াছে ‘আর্ধনাগার্জুনপাদৈর্ভোটেষ্ণু উদ্ধৃতম্’—আর্ধ্য নাগার্জুন ভোটদেশ হইতে তারা সাধনার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ আচার্য্য নাগার্জুনের কাল সপ্তম শতাব্দী;—হিন্দু তন্ত্রের তারা সাধনার যুগে বৌদ্ধ নাগার্জুনের ভোটদেশ হইতে তারা সাধনা পুনরুদ্ধারের কাহিনী বর্জন করিয়া বশিষ্ঠের নাম যোগ করা হইয়াছে—নাগার্জুনই বশিষ্ঠ হইয়াছেন। দশম-একাদশ শতাব্দীতেও এইরূপ আর একজন সিদ্ধাচার্য্যের বশিষ্ঠ নামে পরিচিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। “বশিষ্ঠ” উপাধিদারী ব্যক্তি বর্তমানকালেও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের আদর্শ আধুনিক ইতিবৃত্তের অস্বরূপ মানিলেও পুরাণকার সেই আদর্শমত বলিয়াছেন কিনা বিচার্য্য। তিনি কার্যতঃ সত্যবিবরণ লিখিয়াছেন না অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলি-সমষ্টি

উপস্থাপন রচনা করিয়াছিলেন? হিন্দুর চরম লক্ষ্য মোক্ষ; এই লক্ষ্য মনে রাখিয়া হিন্দু সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করে। হিন্দুর ব্যাকরণ, হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্র মোক্ষমুখ। পুরাণে যে মোক্ষ-প্রতিপাদক কাহিনীর বাহুল্য থাকিবে তাহা বিচিত্র নহে।* স্বন্দপুরাণে উল্লিখিত বশিষ্ঠের উপখ্যান এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের একাঙ্গীকরণের অসাধারণ শক্তিরও ইহা অস্বতম নিদর্শন।

জিতারির আবির্ভাব কাল দশক-একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ তাত্ত্বিকদের দ্বারা রচিত হয় বাংলা ভাষার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ “চর্যাগান।” “গানগুলিতে কেবল বৌদ্ধ তাত্ত্বিকদেরই নয়, অবৌদ্ধ যোগীদেরও সাধনার নির্দেশ আছে। ... তারা (বৌদ্ধ) ছাড়া শৈবতাত্ত্বিক, হ্যুত বিষ্ণুর সাধকও ছিল ... কাহ্নের গানে শৈবতাত্ত্বিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।” (৯) “এই সিদ্ধাচার্যাগণ সমাজের নানাশ্রেণীর মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ... অবশ্য নাম জানিয়া জাতি স্থির করা যায় না; কারণ প্রায়শঃই অনেক নাম ছদ্মনাম মাত্র; সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহারা সম্ভবতঃ গাহাঁহু আশ্রমের সহিত পিতৃদত্ত নামও ত্যাগ করিয়াছিলেন। সিদ্ধাচার্যাগণের জাতির তালিকা হইতে মনে হইতেছে সে ইহাদের সহজিয়া ধর্মমত শুধু সমাজের অন্ত্যস্ত শ্রেণীতেই নহে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সমাজেও নিশ্চয় প্রবেশলাভ করিয়াছিল। আচার্যাগণের মধ্যে কেহ কেহ রাজবংশ সম্বৃতও ছিলেন।” (১০) রাজা জল্লেশ কি এইরূপ একজন ছদ্মনামধারী সিদ্ধাচার্য? পুরাণ ব্যাখ্যাকারগণও এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; লিখিয়াছেন “পুরাণে আর এক প্রকার ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণের রাজগণের পরম্পরা ও নামে অমিল আছে। তখনকার দিনে অনেক রাজাই উপনামে পরিচিত ছিলেন। ... উপনাম থাকায় বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন নাম প্রচলিত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই একটি নাম একেবারেই নাই”।† রাজা জল্লেশের নামের ব্যাপারেও যে এরূপ হয় নাই তাহাই বা কে বলিবে! যাহা বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণের বেলায় সত্যস্বন্দ পুরাণের বেলায় তাহা সত্য হইতে বাধা নাই; বিশেষতঃ যখন স্বন্দপুরাণ পূর্ববর্তী পুরাণের সংক্ষিপ্তসার লইয়াই রচিত—পরবর্তীকালীন প্রক্ষিপ্ত অংশও অবশ্য উহাতে আছে।

“জল্ল” আর “ঈশ্বর” দুইয়ে মিলাইয়া ‘জল্লেশ্বর’। সাধারণতঃ ‘নাথ’ বা ‘ঈশ্বর’ যোগ করিয়াই শিবের নামকরণ হয় এদেশে। “জল্ল, বিজিগীষু ব্যক্তির পরমত নিরাকরণ পূর্বক স্বমতের অবস্থাপক বাক্য বিশেষ।” (বিশ্বকোষ)। “স্বন্দপুরাণে”ও দেখা যায় রাজা জল্ল “সদা জল্লরত” থাকিতেন এবং “জল্লবাদ” প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে অস্বাভাবিক হয়, বাংলার অস্বতম গণদেবতা (তথাকথিত অস্বতম সমাজের) ধর্মঠাকুরকে ক্রমে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠদেবতা শিবঠাকুর আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। কাহিনীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সত্য রূপকের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা হইল আর্থ্য ও অনার্থ্যের সংগ্রাম ও অনার্থ্য দেবতার আর্থ্যকরণ। ধর্মঠাকুর কোন কালেই আর্থ্য দেবতা ছিলেন না। শিবের রূপান্তরিত হইয়া যখন তিনি হিন্দু দেবতামণ্ডলীর মধ্যে সসম্মানে গৃহীত হইলেন, তখনই পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। যাহার প্রচেষ্টায় এই ধর্মবিপ্লব হইয়াছিল, তিনি জল্লের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া আছেন।

কিন্তু অস্বাভাবিক ইতিহাস নয়; কিংবদন্তীও সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। এ সকলের যে কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই তাহা নহে; বিচার বিশ্লেষণ ও অস্বতম্য প্রমাণে যাচাই না করিয়া তাহা গ্রহণ করা যায় না। কাজেই “জল্লেশ” কাহ্নরও ছদ্মনাম হইতে পারে এই ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইল।

তবে কি জল্লেশ মহাপীঠের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই? মনে হয় আছে। কারণ শুধু গান গল্প

কিংবদন্তীর উপরে নির্ভর করিয়া এত বড় একটা তীর্থস্থান এতদীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে পারে না। হয়ত ঐতিহাসিক সত্য বিশ্বাসের তলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে ইতিহাস কোনদিন আবিষ্কৃত হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে। তবে মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু অহুমান করা চলে এই মাত্র। (১২)।

কালিকা পুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে যে জামদগ্ন্য ও পরশুরামের কথা লিখিত আছে তাঁহাদের ক্ষত্রিয় নিধনকারী পৌরাণিক পরশুরামকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু পৌরাণিক যুগের পরশুরামের সহিত জলেশ মন্দিরের কোন সম্বন্ধ ছিল তাহা অহুমান করাও কষ্টসাধ্য। এইজন্য সকল পাঠ একত্রে বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্মণ লিখিয়াছেন “পরশুরামের যুগের আখ্যায়িকায় পৌণ্ড্রদেশবাসী ক্ষত্রিয় ও জল্লীশদেবের নামোল্লেখ সম্ভব হয় না।” এইজন্য তিনি বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণে উল্লিখিত “দ্বিতীয় ভার্গবতুল্য” মহাপদ্মনন্দকেই পরশুরাম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন (১৩)। ইহার একমাত্র কারণ, পুরাণ কাহিনীর একটি মোহিনী শক্তি আছে। রচয়িতার লেখনী হইতে নির্গত কাহিনীতে অসঙ্গতি বা অতিশয়োক্তি থাকিলেও পৌরাণিক সাহিত্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের জন্য লোকে সংস্কারবশতঃই তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই কারণে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত অনেক কাহিনীর সহিত পুরাণাদিতে বর্ণিত সকল আখ্যান সর্বত্র না মিলিলেও পুর্ক-সংস্কারের বা ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া লোকে অসঙ্গতিসমূহ উপেক্ষা করিয়া সকল আখ্যানকেই সমদৃষ্টিতে পাঠ করিয়া থাকেন। এই কারণেই সকল প্রমাণ বিচার করিয়া, সকল অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াও বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণে উল্লিখিত “দ্বিতীয় ভার্গবতুল্য” বা “পরশুরাম ইব” ব্যক্তির সহিতই জলেশমন্দিরের সংশ্রব করা হইয়াছে। কিন্তু “দ্বিতীয় ভার্গবতুল্য” বা “পরশুরাম ইব” কথাতে প্রকৃতব্যক্তিকে বোঝান যাইতেছে না। কারণ “কালিকাপুরাণ” এবং “যোগিনীতন্ত্রে” স্পষ্টভাবে “জামদগ্ন্য” ও “পরশুরাম” নামই উল্লেখ করা হইয়াছে; কোনরূপ তুলনামূলক উদাহরণ, সন্দেহ বা কষ্টকল্পনার অবসর এখানে নাই।

অন্যদিকে প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা করিলে দেখা যাইবে “জামদগ্ন্য” এবং “পরশুরাম” এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। “পরশুরাম সগরের সমকালীন, তিনি সগরকে আগ্নেয়াস্ত্র শিখাইয়াছিলেন (বায়ু—৮৮।১৩৪) : আবার পরশুরাম কার্ত্ত-বৌধাজ্জুনকে মারিলেন ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া রামের দ্বারা নির্জিত হইলেন (বিষ্ণু—৪।৪।৪৩)। পুনশ্চ পরশুরাম মূলককে নির্ধাত্তিত করিয়াছিলেন (বিষ্ণু—৪।৪।৩৮)। অগত্যা পরশুরাম সগর, মূলক ও রাম তিনজনেরই সমসাময়িক হইতেছেন। রামের ১০ পুরুষ পূর্বে মূলক ও মূলকের ১৭ পুরুষ পূর্বে সগর।” (১৪) যতই দীর্ঘজীবী হোক না কেন, একই ব্যক্তি ২৭ পুরুষ ব্যবধানে জীবিত থাকিতে পারে না। কাজেই ইহা নিশ্চিত যে, “তিন রামের কীর্ত্তি পরস্পরে আরোপিত হইয়াছে।” এই ভাগে তিন রামের কীর্ত্তি পরস্পরে আরোপিত হইয়া পরশুরাম প্রবাদে পরিণত হইয়াছেন। পরশুরামের স্মৃতিবিজড়িত বহু স্থান ও কাহিনী বাংলায় ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে “কালিকাপুরাণ” ও “যোগিনীতন্ত্রে” উল্লিখিত এই পরশুরাম কে? তাঁহার পরিচয়ই বা কি? এদেশে “রামনামা অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি থাকায় একে অন্তের অবতার বলিয়া কল্পিত হইলেন। বিভিন্ন রামের কীর্ত্তি পরস্পরে আরোপিত হইল। যে রাম পরশুরাম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তিনি ক্ষত্রিয় সংহার করিয়াছিলেন; পরে যিনিই ক্ষত্রিয় সংহার করিলেন, তিনিই পরশুরাম নাম পাইলেন। কীর্ত্তি সাদৃশ্যে নাম-মহাত্ম্য কল্পিত হইল।” (১৫)

এইরূপ নাম সাদৃশ্যেই জলেশ মন্দিরের সহিত সম্পর্কিত রাম নামধারী একব্যক্তি পরশুরামরূপে কীর্ত্তিত

হইয়াছেন এবং এই ব্যক্তিকে খুঁজিতে পুরাণ বা মহাভারতের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন হয় না; বাংলার মাটিতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে রামনামধারী যে নরপতির নাম ভাস্বর হইয়া আছে, তিনি পালবংশীয় রাজা রামপালদেব। তিনি ক্ষৌরীনাথক ভীমকে যুদ্ধে পরাজিত ও বধ করিয়া পিতৃরাজ্য (জনকভূ) বরেন্দ্রী উদ্ধারসাধনের পর প্রবল আক্রোশে শত্রুপক্ষীয়গণকে সমূলে বিনাশ করেন। (১৬) “তাঁহার ভয়ে কৈবর্তরাজের আত্মীয়স্বজন ও সমস্ত রাজবংশীয়গণ কামরূপ ও কুচবিহারের জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আজও তথায় রাজবংশীয়গণের মনে রামভীতি প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কিংবদন্তীর কুজাটিকায় রামপালের প্রসঙ্গ পরশুরামের নামে এখনও চলিয়া যাইতেছে। বগুড়া, রংপুর ও কুচবিহারে এখনও পরশুরামের কথা ঘরে ঘরে উপকথায় পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই উপকথা বা প্রবাদের নায়ক পরশুরামই গোড়াধিপ রামপাল” (১৭)। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে “কালিকাপুরাণ” প্রমুখ উপ-পুরাণ সমূহ রচিত হইয়াছিল। গোড়াধিপ রামপালের সময় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। কাজেই “কালিকাপুরাণ” বা “যোগিনীতন্ত্রে”র রচনা সময়ে লোকচিত্তে রামপালের স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সেই রামপাল কর্তৃক পরাভূত কৈবর্ত-রাজবংশীয়গণের “জল্লীশ” মন্দিরে বা মন্দির সন্নিহিত স্থানে আশ্রয় লওয়ায় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জল্পেশ মহাপীঠের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সঙ্ঘ্যাকর নন্দী বিরচিত “রামচরিতে”র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে কৈবর্ত নরপতি ভীম শিবেরও উপাসক বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

“সভবানী সমুপাতা ভূজঙ্গমণিভূষিতঃ স্বয়ংদেবঃ

দ্বিজরাজকেতুরাসীমুক্তা পুণ্যল্য যস্যাস্তঃ।” ২।২৬

পালযুগের শেষপর্যায়ের “কৈবর্ত বিদ্রোহ” বলিয়া কথিত সামন্ত-বিদ্রোহের নায়ক দিক্কোক, রুদ্রোক ও ভীমের কোন ইতিহাস নাই, “রামচরিতে” এমন কোন উল্লেখ নাই যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, দিক্কোক বা ভীম “অনন্ত-সামন্ত-চক্রের” বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। দিক্কোক, রুদ্রোক বা ভীম কোন বংশে জন্মিয়াছিল? তাঁহারা কি উপায়ে পালরাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন? রামপালদেবের অমুগ্রহজীবী সঙ্ঘ্যাকর নন্দী তাঁহাদের ‘রামচরিত’ কাব্যে ভীমের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা পালরাজাদের অপেক্ষা কম ছিল না। সঙ্ঘ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন —

“যশ্মিন রত্নানাশ্রয়ে সরস্বত্যাপি স্বয়ং লক্ষ্মীঃ।

তে-পারিজাতবাজি প্রবর করীন্দ্রাদয়োল্লাসন ॥” (২।২৬)

অর্থাৎ সর্বপ্রকার রত্নের আশ্রয় যে ভীমের মধ্যে স্বয়ং সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং যাহার অধিকারে শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও হস্তীসমূহ সহ সেই সেই জনগণও শত্রুচিন্তামুক্ত হইয়া বাস করিত। শত্রুপক্ষীয় কবির এই অযাচিত প্রশংসা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মদনপালদেবের “মনহলি তাম্রলিপি” হইতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালেই দিব্য বা দিক্কোক উত্তরবঙ্গের একাংশে রাজত্ব করিতেছিলেন। (১৮) বঙ্গপতি জাতিবর্মার সহিত যে দিক্কোকের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার সংবাদ “নালন্দা লিপি” হইতে জানা যায়। “দিব্যর সৈন্য আক্রমণকালে (জাতবর্মাকে) নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গে অভিযান করিতে হইয়াছিল।” (১৯) ভোজ বর্মার “বেনাব লিপি” হইতেও দিব্যর সহিত জাতবর্মার যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায় (২০)। এই সকল বিবরণ হইতে অনুভূত হয় যে তথাকথিত “কৈবর্তরাজগণ” সাধারণ সামন্ত ছিলেন না। তাঁহাদের জাতিগত ইতিহাস কি? জানা নাই।

সম্রাটের নন্দী দিব্যাককে হেয় করিবার জন্ত “দহ্মা”, “উপাদিত্তী” প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তিনি যে দিব্যাক এবং তাঁহার বংশীয়গণকে কৈবর্ত আখ্যায় ভূষিত করিয়া হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই তাহাই বা কে বলিবে? আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সম্রাটের নন্দীর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে স্পষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। (২১) যাহাই হউক, নবাবীকৃত রাজ্যপাল ও যশোদাসের “ভাতুরিয়া” লিপি হইতে তথাকথিত “কৈবর্তরাজগণের” ব্যক্তিগত ইতিহাসের কিছুটা পরিচয় যেন পাওয়া যায়।

যশোদাস পালবংশীয় নরপতি রাজ্যপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের কৃষক সেনার সাহায্যে যশোদাসের পরিচালনায় রাজ্যপাল নূতন নূতন দেশ জয় করিয়াছিলেন; যশোদাসও কৃষকবংশীয় ও কৃষকদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই তথ্য প্রদান করিয়া “ভাতুরিয়া লিপি” সম্পাদনাকালে অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী লিখিয়াছেন—“দিব্যাক হঠাৎ একদিনে বড় হন নাই। সম্ভবতঃ তিনি যশোদাসের বংশধর এবং যশোদাসের মতই তিনি প্রধানমন্ত্রীর মত কোন উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। ২০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যপাল এবং ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই ১৬২ বৎসর ধরিয়া যশোদাস এবং তাঁহার বংশধরগণ (প্রধান) মন্ত্রীর সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। মনে হয় ইহার ফলেই দিব্যাকের সিংহাসন গ্রহণে কোন আপত্তি উপস্থিত হয় নাই।” ভাতুরিয়া লিপির উপসংহারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যশোদাস আটটি মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বিরাট মন্দিরে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং এই শিবলিঙ্গের পূজাদির ব্যয়নিবাহের জন্ত রাজ্যপাল মধুশ্রব নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহাও এই বংশের শৈব ধর্ম্মাহুরক্তির প্রমাণ।

যশোদাসের প্রপিতামহ মজুমদার “এই বংশের প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র সুরদাস ও শঙ্করদাস ঐশ্বর্য্যে ও বীরত্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।…… শঙ্করদাসের পুত্র যশোদাসের যশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যশোদাসের পিতা ও পিতামহের সম্মান ও প্রতিপত্তি এবং তাঁহার নিজের গুণাবলী তাঁহাকে পালবংশের রাজা রাজ্যপালের (প্রধান) মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবার সহায়ক হইয়াছিল।” (২২) তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থে পাল-নরপতি ধর্ম্মপালের সভাসদ টঙ্কদাস ও বৌদ্ধ-পণ্ডিত চাকদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় (২৩)। যাহা হউক; উপরোক্ত বিবরণ হইতে ভূমিজ কৈবর্তবংশীয় দিব্যাক, রুদ্রাক ও ভীম যে এক বিশিষ্ট বংশধারার অধস্তন পুরুষ এই তথ্য জানা যাইতেছে। সম্রাটের নন্দী কোথাও দিব্যার বা “তাঁহার শ্রেণীয় বৃত্তি বা সামাজিক স্থান সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করেন নাই। মনে হয়, সমাজে তাঁহাদের বৃত্তি বা স্থান কোনটাই নিন্দনীয় ছিল না। একাদশ-দ্বাদশ শতকেও তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন, কাব্যও রচনা করিতেন এবং ব্রাহ্মণাধর্ম্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির অতুরাগী ছিলেন। ‘সদুক্তি কথাযুত’ নামক কাব্য-সংকলন গ্রন্থে (১২০১) কেবট পপীপ বা কৈবর্ত পপীপ রচিত গদ্যাস্তবের একটি পদ আছে, পদটি বিনয় মধুর, সুন্দর।” (২৪)

জল্লেশ মহাপীঠের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এ সকল কথা লিখিবার কারণ এই যে জল্লেশ মহাপীঠের সহিত “রাজবংশী” সম্প্রদায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। “মন্দিরের দ্বাররক্ষক বা দেউড়ীগণ সকলেই রাজবংশীয়। যে বিষ্ণু মহাদেবের অতিশয় প্রিয়, তাহা মন্দিরে প্রবেশকারী ভক্তকে এই দেউড়ীদের নিকট হইতে নিতে হয়।…… মন্দিরের পূজার বা ভোগের রান্নার যোগাড় দেওয়ার ভার এদেরই এবং এই মন্দিরের চাবিও দেউড়ীদের নিকট থাকাই নিয়ম। তোষয়িত্তা তথা সর্ব্বান্ জল্লীশং পূজয়েন্নরঃ— ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া জল্লেশের পূজা করিবে। (২৫) সুতরাং ইহাদের কথা কিছু বলিতে হইবে বৈকি!

এই প্রসঙ্গে “ভ্রামরীতত্ত্বে” উল্লিখিত পঞ্চরাজপুত্রের “বর্দ্ধন” হইতে পলায়ন করিয়া রত্নপীঠে বা জল্পেশে আশ্রয় গ্রহণ করিবার কথা উল্লেখযোগ্য। “বর্দ্ধন” যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রামপালদেব যখন কৈবর্ত্ত নরপতি ভীমকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারপূর্বক “বর্দ্ধন” বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করেন, তখন আত্মীয়স্বজন সহকারে পঞ্চরাজপুত্রের “বর্দ্ধন” হইতে আসিয়া রত্নপীঠে বা বনাকীর্ণ শিবভূমি জল্পেশে আশ্রয় গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই পঞ্চরাজপুত্রের ভিতরেও ভীম নামক একব্যক্তির আভাষ পাওয়া যাইতেছে (‘নন্দীহৃত ভয়াঙ্কীমে’ ইত্যাদি)। এই শ্লোকের অর্থ পরিষ্কৃত করিয়া আসামের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের শিষ্য পণ্ডিত রূপনারায়ণ শ্রুতিধর ‘কামতেশ্বর কুনকারিকা’ গ্রন্থে লিখিলেন :—

বর্ধনসূত পাঁচ জন, রত্নপীঠে নিল থান,
আর কেহ লুকাইল যোনি-গর্ভ পীঠে,
তারমধ্যে ভীমেশ্বর, আরাদিল মহেশ্বর
সিদ্ধ হইল সিতু রত্নপীঠের নিকটে।” (২৬)

“ভ্রামরীভক্ত” ও “কামতেশ্বর কুনকারিকা”য় প্রচারিত তথ্যে ভীমবংশীয়গণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শঙ্করদেব খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতেও জলেশ্বর মন্দিরের সহিত ভীমের বংশধরদের (ভীমের সন্তান = রাজবংশী ভাষায় “ভীমের ছোয়া” = পাঁচশত বৎসর পরে লোকের মুখে মুখে পরিবর্তিত হইয়া “ভীমেশ্বর” হইয়াছে) সংস্বরের জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। ইহাতে ইতিহাসের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শুধু রামপাল রূপান্তরিত হইয়া পরশুরামে এবং ভীমের জটনক বংশধর ভীমেশ্বরে পরিণত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক কাহিনী রূপান্তরিত হইয়া এইভাবেই ইতিহাসে কিংবদন্তীর উৎপত্তি হয়। এই কিংবদন্তী অহুসরণ করিয়াই অষ্টাদশ শতাব্দীতেও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পল্লীকবি রতiram দাস লিখিয়াছেন—

“হাযরে রাজার বংশে লভিয়া জনম ।
পরশুরামের ভয়ে এ বড় শরম ॥
রণে ভক্ত দিয়া মোর, এদেশে আইসাছি ।
ভক্তকবি রাজবংশী এই নামে আছি ॥ (২৭)

যাহা হউক, উপরোক্ত তথ্যে রামপাল ও ভীমের সময় একাদশ শতকের শেষ এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমপাদেও জলেশ মন্দিরের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

দিনাজপুর জেলার রামগঞ্জে প্রাপ্ত দশম-একাদশ শতকে উৎকীর্ণ এক তাম্রশাসনে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ শঙ্করকে উদ্দেশ্যপূর্বক ভূমিদান করিয়া “জটোদা” নদীতীরে এক শৈবতীর্থের অবস্থিতির পরিচয় দিয়াছেন। এই শৈবতীর্থ কোনখানে অবস্থিত ছিল? তাম্রশাসনের ৩১ এবং ৩২ পংক্তিতে দেখা যায় ঈশ্বর ঘোষ জটোদা নদীতে স্নান করিয়া তিন দূর্বা এবং কুশ ধারণ করিয়া (“জটোদায়াং স্নাত্বা তিনদর্ভ পবিত্রপূর্বকং ভগবত শঙ্কর ভট্টারক-মুন্দিয়া”) (২৮) “ঢেকরী” নামক স্থান হইতে ভূমিদান করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নাম সাদৃশ্যে বর্দ্ধমান জেলার “ঢেকুরের” সহিত “ঢেকরীর” অভিন্নত্ব অনুমান করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে অধিকাংশ

ঐতিহাসিক তাঁহারই পদাঙ্কসরণ করিয়াছেন। কিন্তু “ঢেকুরী বা ঢেকুর বলে কোন গ্রাম নেই গোপভূমে (বর্তমান জেলায়)। জয়দেব কৈহলির পূর্বদিকে, অজয় নদের দক্ষিণ তীরে সেন পাহাড়ীর অন্তর্গত গৌরাঙ্গপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ... গৌরাঙ্গপুরে ‘ইছাই ঘোষের’ বিখ্যাত দেউল আছে—বাংলাদেশের রেল দেউলের মধ্যে একটি অত্যন্ত নিদর্শন। বিশেষ প্রাচীন নয়। গড়ন ও অত্যাগত বিশেষত্ব দেখে বিশেষজ্ঞরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর দেউল বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে গোপ রাজবংশের কেউ হয়ত ইছাই ঘোষের স্মৃতি রক্ষার্থে এই দেউল নির্মাণ করেছিলেন। এমনও হতে পারে।” (২২) ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর নির্মিত দেউল দ্বারা দশম-একাদশ শতাব্দীর ঈশ্বর ঘোষের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা সম্ভব নহে এবং একমাত্র নাম সাদৃশ্যে ‘ইছাই ঘোষের’ সহিত ঈশ্বর ঘোষের অভিন্নত্ব অনুমান করা সঙ্গতও নহে। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার সময় স্বর্গত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন “জটোদা...ঢেকুরী নামকস্থানের নিকটবর্তী নদী ছিল বলিয়া...তাঁহার সাহায্যে ঢেকুরীর প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণীত হইতে পারিবে।” (৩৪) ইহাই প্রকৃত পথ।

“কালিকা পুরাণে” লিখিত আছে—

“জটোদবা তত্রনদী হিমবৎ প্রভবা শুভা।

যস্যাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি জাহ্নবী সমম্ ॥

গৌরী বিবাহ সময়ে সর্বৈমাতৃগণৈঃ কৃতঃ।

জনাভিষেকো ভর্গস্য জটা জুটেম্ যঃ পুয়া ॥

শ্বৈস্তোত্রৈরভবদ্ যস্মাজ্জটোদাখ্যা নদীততঃ।

* * * * *

তত্র স্নাত্বা মহানগা জল্লীশং প্রতিপূজ্য চ।

তস্যাং নিশি হবিষ্যাসী সংযতস্তাং নিশানয়েৎ ॥” (৩১)

অর্থাৎ হিমালয় হইতে যে নদী উৎপন্ন এবং যে নদীতে স্নান করিয়া জল্লেশে পূজা দিতে হয় তাহাই “জটোদা”। কালিকা পুরাণে প্রশংসার সহিত উল্লিখিত করতোয়া, ত্রিশ্রোতা, মানস প্রভৃতি নদী জল্লেশ মহাপীঠের সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই “জটোদা” নদীর অবস্থান যে উত্তরবঙ্গের হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চলে একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। স্বর্গীয় হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী “জটা দিক্কর” বা জটোদার নাম জলঢাকা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (৩২) “জটাদিক্কর” নাম কি জটোদা তীরবর্তী “ঢেকুরী” নগরের ও স্মৃতি বহন করিতেছে? অসম্ভব নয়। মুন্সী জয়নাথ ঘোষ লিখিত “রাজোপাখ্যানে” (প্রত্যক্ষণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়) জটোদার বর্তমান নাম “মানসাই”। জলঢাকা নদীর নিম্নভাগ “মানসাই” নামেই পরিচিত। নন্দলাল দে তাঁহার ভৌগোলিক অভিধানে জটোদা নদী বর্তমান জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (৩৩) আবার অগ্রমতে বর্তমান জল্লেশ মন্দিরের নিকটবর্তী “ঝাড়দা” নদীই জটোদা। (৩৪) স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় পূর্বে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্তমান গোয়ালপাড়া সহরের সন্নিকটে প্রবাহিত “জয়া”...নদীই প্রাচীন জটোদা। (৩৫) কিন্তু পরবর্তীকালে মত পরিবর্তন করিয়া কুচবিহার জেলার গোসামারীর প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত “জারি ধরলাকেই” জটোদা বলিয়া গ্রহণ করেন। (৩৬) জারি ধরলাও জলঢাকা নদীর নিম্নাংশ বলিয়া পরিচিত। ইংরেজ ভৌগোলিক মেজর রেলেনের মানচিত্রে

(১৭৬৪-৭৬) জলেশ মন্দিরের পূর্বদিক দিয়া Jerdeerker নামক একটি নদী প্রবাহিত দেখা যায়। ইহা হয়ত “জটোদা ঢেকরীর” অপভ্রংশমাত্র। এই সকল নদীই জলেশ মন্দিরের নিকটবর্তী এরূপ দেখা যাউতেছে। কাজেই জটোদা নদীর তীরবর্তী শৈবতীর্থ জলেশ যে খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল তাহা “রামগজলিপি” হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গ যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল তাহা অবিসংবাদী সত্য। বহুদিন পূর্বে দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে কুমারগুপ্ত ও বৃহগুপ্তের রাজত্বকালের কয়েকখানি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছিল। “৪নং দামোদরপুর লিপিতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, নগরশ্রেষ্ঠী রিভূপাল হিমালয়ের পাদদেশে ডোঙ্গাগ্রামে কোকামূলস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী এবং নামলিঙ্গের পূজা ও সেবার জন্য ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। ... ৫নং দামোদর পটোলীতে (৫৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দ) দেখিতেছি, শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দির সংস্থারের জন্য ভূমিক্রয় করিতেছেন অযোধ্যাবাসী কুলপুত্রক অমৃতদেব। এই সবকটি লিপি পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ভূমি-সম্বন্ধীয়।” (৫৭) এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কমলেন্দু চক্রবর্তী লিখিয়াছেন — “ডোঙ্গাগ্রাম দামোদরপুরের (দিনাজপুর) অদূরবর্তী মনে হয় এবং অযোধ্যা নামে বাংলাদেশেই অনেক স্থান আছে। কাজেই উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা থেকে অমৃতদেবের আগমন অনুমান করবার কারণ নেই।” (৩৮) এই তাম্রলিপিগুলি প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়া ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখিয়াছেন “৪নং দামোদরপুর লিপিতে দেখিতেছি পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গের এক দুর্গমপ্রান্তে লিঙ্গরূপী শিবের পূজা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।” (৩৯) এই লিঙ্গরূপী শিব কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন?

উপরোক্ত তাম্রশাসনগুলিতে শৈবতীর্থরূপে হিমালয়ের পাদদেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অভ্যন্তরে ঢেকরী ও ডোঙ্গাগ্রামের নাম পাওয়া যায়। দুইটি একই স্থানের বিভিন্ন সময়ের নাম কিনা তাহা অসংশয়ে বলা যায় না। তবে ইওয়া অসম্ভব নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এরূপ স্থানের নাম পরিবর্তন সদা সর্বদাই ঘটিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও কুচবিহারের নাম পরিবর্তিত হইয়া “আলমগীর নগর” হইয়াছিল; তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রায় তাহার প্রমাণ আছে। (৪০) স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু “ঢেকরী” উত্তরবঙ্গেই অবস্থিত এবং কুচবিহার জেলার গোসামীমারীর পূর্বনাম এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (৪১) শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ বর্দ্ধমান জেলার ঢেকারা নামক লৌহ-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে “ঢেকরীর” নাম কল্পনা করিয়াছেন। (৪২) কিন্তু উত্তর আসামের অধিবাসিগণ রংপুর, কোচবিহার, গোয়ালপাড়া অঞ্চলের কথ্য-ভাষাকে সেদিন পর্য্যন্তও ব্যঙ্গ করিয়া “ঢেকুরী” বা “ঢেকেরী” ভাষা বলিতেন এ সাক্ষ্য স্যর জর্জ গ্রিয়ারসনের মত ভাষাতত্ত্ববিদ দিয়াছেন। (৪৩) “ঢেকরী” হইতে “ঢেকুরী” ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল এই অনুমান অসঙ্গত নয়। কিন্তু গোসামীমারীই “ঢেকরী” ইহার প্রমাণ কোথায়? গোসামীমারী শৈবস্থান নহে, শক্তিপীঠ। (৪৪) শক্তিপীঠে শিবের বা বিষ্ণুর অবস্থান থাকিতে বাধা নাই। কিন্তু গোসামীমারীর তীর্থ মাহাত্ম্য কৈ? শৈবতীর্থরূপে তাহার প্রসিদ্ধি কৈ? কাজেই গোসামীমারী শিবভূমি ঢেকরী হইতে পারে না। দামোদরপুর লিপিগুলির সাহায্যে জলেশ সন্নিহিত গ্রামগুলির ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শৈবতীর্থের প্রকৃত অবস্থান নির্দ্ধারিত হইবে।

দামোদরপুর লিপিতে যে সকল দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা হইলেন কোকামূলস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী এবং নামলিঙ্গ। “কোক” শব্দের অর্থ বগ্নকুকুর বা নেকড়ে। অর্থাৎ যে দেবতার পূজা করিলে বগ্ন কুকুর বা নেকড়ে বশীভূত হয়, তিনিই কোকামূলস্বামী। “কোক” শব্দের আর এক অর্থ “বিষ্ণু”। দেবী

- দুর্গা কোকমুখা নামে মহাভারতে পূজিত হইয়াছেন। বরাহ তো বিষ্ণুর এক অবতার রূপেই স্বীকৃত। নেপালে বরাহক্ষেত্র (বা বরাহছত্র) নামক প্রাচীন কোকামুখ বা বরাহ অবতার মূর্তি আছে—কাঠমাণ্ডু হইতে ১২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। (৪৫) আবার স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহের নিকটে সিংহভূমের পার্শ্বে বরাহভূমের অস্তিত্বও দেখিতে পাওয়া যায়। (৪৬) কাজেই দেখা যায় বরাহভূম নামে নানাস্থান পরিচিত ছিল। অধিকাংশ সংস্কৃতি বিজ্ঞানী আজকাল কোন এক সাংস্কৃতিক উপাদানের এককেন্দ্রিক বিকাশে (Simple origin) বিশ্বাস করেন না। বহুকেন্দ্রিক বিকাশে (Multiple origin) বিশ্বাস করেন। তাই মনে হয়, ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত একাধিক কেন্দ্রে আর্ধ্য-অনার্যের যে সংঘাত হইয়াছিল আর্ধ্য-অনার্য দেবদেবী নিয়ে, সেই সংঘাত কেন্দ্রের মধ্যে জল্পে অগ্রতম। কাহিনীর মূল কাঠামো হয়ত অনেক আগে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। পরে স্বন্দ-পুরাণে গৃহীত হয়।

জল্লেশ মন্দির হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত মাধবডাঙ্গার ভগ্নস্থাপত্য যে প্রায় একশত বৎসর পূর্বেও বিষ্ণু বা নারায়ণের মন্দির নামে পরিচিত ছিল তাহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্মাগার্স সাহেব তাঁহার সেটেলমেন্ট রিপোর্টে লিখিয়া গিয়াছেন। (৪৭) ময়নাগুড়ি তহশীলের ২৫নং তালুকের নাম ‘গড়তলি’। ‘গড়=দুর্গ, তলি=সংশ্লিষ্ট অঞ্চল; অর্থাৎ দুর্গের সন্নিহিত অঞ্চল। জল্লেশ মন্দির এই তালুকেই অবস্থিত। মনে হয়, অতীতে এখানে একটি দুর্গ ছিল এবং দুর্গের নামেই তালুকের নাম হয়।’ ২০নং তালুকের নাম চূড়াবন্দর। ‘চূড়া=রাজমুকুট, বন্দর=স্থান। প্রবাদ এই যে জল্লেশ মন্দিরের চূড়া ঝড়ে এখানে পতিত হয়। তাহা হইতে এই স্থানের নাম চূড়াবন্দর হইয়াছে।’ এখানে প্রকৃত ইতিহাস কিংবদন্তীর আড়ালে লুক্কায়িত আছে। গড়তলি ও রাজমুকুট একত্রে বিবেচনা করিলে দুর্গ ও রাজ্যের কথাই সর্ব প্রথম মনে হয়। ইহা অকারণ নয় এবং অনৈতিহাসিকও নয়। এখানে একদা এক রাজনগরী ছিল এই অনুমান, উপরোক্ত প্রমাণে, আশাকরি, অসঙ্গত মনে হইবে না। পূর্বপ্রান্তে আসাম হইতে পশ্চিম প্রান্তে গড়তলি পর্যন্ত ‘খাওয়ারমারি’ নামক প্রাচীন জনপথও এখানকার প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

তবে এখন যেখানে জল্লেশ মন্দির অবস্থিত, পূর্বেও সেইস্থানে মন্দির ছিল কিনা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত স্মাগার্স (D. H. E. Sunders) সাহেবের সেটেলমেন্ট রিপোর্টে পশ্চিমদুয়ার বা জলপাইগুড়ি অঞ্চলের নাম বা তালুকগুলির বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিবরণে গ্রামগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক তথ্য প্রভৃতি জানা যায়। ময়নাগুড়ি তহশীলের “২২নং তালুকের নাম পূর্ব ডহর। পূর্ব=প্রথমে=প্রথম; ডহর=উপাসনা=পূজা করা। এখানে পূর্ব ডহর (মহাদেব) নামে দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একটি ক্ষুদ্র রক্তিম বর্ণ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। প্রবাদ এই যে যিনি জল্লেশ মন্দির তৈরী করিয়াছিলেন সেই রাজাই এই মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন।” (৪৮) “বিশ্বকোষ” মতে “ড” শব্দের অর্থ “ডয়তে উড্ডীয়তে ভক্তানাং হৃদয়াকাশে যঃ” অর্থাৎ শিব। কাজেই পূর্ব ডহর অর্থে প্রথম শিব। সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে জল্লেশলিঙ্গ আদিতে পূর্ব ডহর মন্দিরেই স্থাপিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে “ডহর” শব্দের আর এক অর্থ “নৌকার তলদেশ।” নৌকার তলদেশের মত আকৃতি-বিশিষ্ট অর্থাৎ ডোঙ্গার মত দেখিতে যে গ্রাম তাহাই কি ডোঙ্গাগ্রাম? এই অর্থে পূর্ব ডহর ও ৪নং দামোদরপুর লিপিতে উল্লিখিত ডোঙ্গাগ্রাম এক এবং অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ধনাইকুড়ি, চুকচুকা, জরধোকা প্রভৃতি নদীর শুষ্কখাত পরিবেষ্টিত পূর্ব ডহর তালুক দেখিতে এখনও নৌকার খোলের বা ডোঙ্গার মতই মনে হয়। ইহাও আদিতে জল্লেশ লিঙ্গ পূর্ব ডহর মন্দিরে স্থাপিত থাকিবার আর এক প্রমাণ। পূর্বতম মন্দির ধ্বংস হইয়া কোচবিহার নরপতি প্রাণনারায়ণ লিঙ্গ বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিয়া বর্তমান স্থানে নূতন মন্দির নির্মাণ ন। এইজন্য পূর্বডহর

মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিগ্রহ স্থানান্তরিত হওয়ার জ্ঞান পূর্ব ভহর মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থাপন রহিয়াছে। নতুন মন্দির নির্মাণ করিবার সময় তীর্থমাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জ্ঞান মহারাজা প্রাণনারায়ণ মন্দির প্রান্ত বাহিনী ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনী “ঝড়দা” নদীকে ‘জটোদা’ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ “ঝড়দার” উৎপত্তি হিমালয় পর্বতে হয় নাই; ইহার উৎপত্তি স্থল মন্দিরের অধিক দূরে নহে। স্বন্দপুরাণে জটোদাকে ‘মহানদী’ বলা হইয়াছে। জলঢাকা হিমালয় হইতে উৎপন্ন এবং প্রকৃতই “মহানদী।” ইহার ভূটানের পার্বত্য অঞ্চলের নাম “দি-ছু”। ‘বোদো’ ভাষায় দি=জল, ছু=জল অর্থাৎ অনেক জল বা মহানদী। জলঢাকা পূর্ব ভহর মন্দিরের অদূরে প্রবাহিত হিমালয়োৎপন্ন নদী—ইহাই ঈশ্বরঘোষের তাত্ত্বশাসনে উল্লিখিত জটোদা।

জলেশ লিঙ্গ অনাদি লিঙ্গ বলিয়া পরিচিত; ৪নং দামোদরপুর লিপির “নাম লিঙ্গ”ও শিব লিঙ্গ। উভয়ের প্রাচীনত্ব সন্দেহের অবকাশ রাখে না। দুইটিই উত্তর বঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। এইজ্ঞান উভয়কে, পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত হইলেও, এক এবং অভিন্ন লিঙ্গ বিগ্রহ বলিয়া মনে করিতে স্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহ হয়। এই অনুমান সত্য হইলে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধ্বেও জলেশ লিঙ্গ বিগ্রহের প্রসিদ্ধি ছিল। অত্যাধিক “অধোধ্যাবাসী কুলপুত্রক অমৃতদেব” মন্দির সংস্কার করিবার জ্ঞান হিমালয়ের পাদদেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অভ্যন্তরে ভূমিদান করিতে আসিবেন কেন? পরবর্তীকালে, দশম-একাদশ শতাব্দীতে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ জটোদা নদী তীরবর্তী ‘ঢেকুরী’ নামক স্থানে ভগবান শঙ্করের উদ্দেশ্যে ভূমিদান করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে পর্য্যন্তও “জটাদিকর” বা Jerdeeker যে প্রাচীন “জটোদা-ঢেকুরীর” স্মৃতি বহন করিত একথা রেণেলের মানচিত্রে এবং হরেপ্রনারায়ণ চৌধুরীর ইতিবৃত্তে প্রমাণিত হয়। অধুনা বিস্তৃত উত্তরবঙ্গের নরপতিগণের সমর্থনপুষ্ট ছিল বলিয়াই জলেশ মন্দির এত প্রসিদ্ধি ও তীর্থমর্যাদা লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে কোচবিহার নরপতিগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় জলেশ মন্দির নতুন মর্যাদা লাভ করিয়াছিল মাত্র।

এই প্রসঙ্গে জলেশ শিব লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তীটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। বনে গমন করিয়া গরুর দুধ দেওয়া এবং স্বপ্নাদেশের সঙ্গে শিবের উৎপত্তির যে গভীর সম্পর্ক দেখা যায়, তাহাতে নৃতনত্বের কিছুই নাই। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধেই এই ধরনের কিংবদন্তী প্রচলিত। তাহা হইলেও এই সকল কিংবদন্তী ঐতিহাসিকের কাছে একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। কোন কাহিনী, প্রবাদ বা কল্পনা যখন লোকচিত্তে শিকড় বিস্তার করিয়া থাকে, তখন মাটিতেও তাহার মূল থাকা সম্ভবপর। সুতরাং মনে হয়, এই মূল বস্তুতঃ প্রাগৈতিহাসিক স্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বন্য শিকারীগণ যে এতদঞ্চলে বাস করিত, পশু শিকার করিয়া এবং অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিত তাহা কল্পনা করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। হিংস্র পশুর কবল হইতে পরিজ্ঞান লাভের জ্ঞান আদিম মানবগণ যে সকল দেবতার কল্পনা করিত তাহার সহিত বৃক্ষ, বন্যজন্তু, পর্বত ও অরণ্য জড়িত ছিল। দামোদরপুর লিপিতে উল্লিখিত দেবতা সকলের নামেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় গোবিন্দহন্দর সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার “জলীশ মহাপীঠের ইতিহাসে” লিখিয়াছেন “জলেশ... শিবলিঙ্গের চারিদিকে নীচে ৮ ফুট পর্য্যন্ত মাটি সরান হয়। সেই সময় দেখিতে পাই যে শিবলিঙ্গের অনুমান ২১০ হাত বা ৪ ফুট নীচে লিঙ্গের উপরের আকারের প্রায় দ্বিগুণ এবং ৮ ফুট নীচে উহার প্রায় তিনগুণ বড় হইবে। নীচের দিকে সম্পূর্ণ গোলাকার ভাবে ক্রমে বড় হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের একটি স্মৃচ্ছড়া মাটির নীচ হইতে উঠিলে

- যে রূপ হয় সেইরূপ।” (৪২) ইহাতে স্বতঃই মনে হয় আদিম মানব কর্তৃক আশানে ও গোরস্থানে স্থাপিত উন্নত-শির শিলাস্তম্ভের কথা এবং সেই শিলাস্তম্ভ পূজার কথা। আদিম মানবগণ এই সকল শিলাস্তম্ভকে নিয়মিত পূজা করিতেন। সে প্রথা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সমাদিক্ষেত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অহুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন। অচ্ছেদিত (undressed) রুক্ষ স্বাভাবিক সরল রেখার শিলাস্তম্ভ (Menhir) ক্রমে ছেদিত, খোদিত ও মার্জিত হইয়া শিবলিঙ্গের রূপ ধারণ করিয়াছে এবং শৈব সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া আদিম সমাজেও “শিব” বলিয়া পূজিত হইতেছে। (৫০) বাংলার শিবের উৎপত্তির আভাষ যেন ইহা হইতেই পাওয়া যায়। শিবের সঙ্গে আশানের সম্পর্ক কেন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, সে কথা বুঝিতেও কোন অসুবিধা হয় না। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথম পশুপালন করিয়া মানুষ যখন স্থায়ী ও উন্নত সভ্যতার স্তরে উপনীত হইল, তখন পশুপালক আদিম মানব জাতি যে দেবতার শরণাপন্ন হইল তিনিই পশুপতি-শিব। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত বলিয়াই শিবলিঙ্গ অনাদিলিঙ্গ; জলেশ সম্বন্ধেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। শিকড় এত গভীর বলিয়াই জলেশলিঙ্গ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর নিকট হইতে পূজা পাইতেছেন।

জলেশ্বরের আদি কথা নিয়ে নতুন চিন্তাধারা। আরও গবেষণার ক্ষেত্র দেখা দিয়েছে। সম্পাদক

পাদটীকা

- ১। Jalpaiguri District Handbook—A. Mitra, pp. 148-49
- ২। জলেশ মহাপীঠ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মণ, পৃ: ৩৮
- ৩। Rajbansis of North Bengal—Dr. Charu Chandra Sanyal, p. 149
- ৪। An Ancient Defence of North-East—P.C. Das Gupta, Amrita Bazar Patrika Magazine —12th January, 1969
- ৫। বাংলার সামাজিক ইতিহাস—৮দুর্গাচন্দ্র সাংঘাল, ১৪৭ পৃ:
- ৬। The Cooch Behar State and its land reform—H. N. Choudhuri, p. 218
- ৭। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—৮নগেন্দ্র নাথ বসু, রাজকৃষ্ণাণ্ড, ২৪৩ পৃ:
- ৮। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, ১৬৫-৬৬ পৃ:
- * পুরাণ প্রবেশ—গিরীন্দ্র শেখর বসু, ৪ পৃ:
- ৯। বাংলার সাহিত্য ইতিহাস—ডা: হুমুয়ার সেন, ২৩ পৃ:
- ১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডা: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড ১৭০ পৃ:
- † পুরাণ প্রবেশ—গিরীন্দ্র শেখর বসু, ১২ পৃ:
- ১১। জলেশ মহাপীঠ—শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ, ২২ পৃ:
- ১২। The Cooch Behar State and its land reform—H. N. Choudhuri,
- ১৩। রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মণ, ৬৮-৬৯ পৃ:
- ১৪। পুরাণ প্রবেশ—শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু, ১৮ পৃ:
- ১৫। পুরাণ প্রবেশ—শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু, ১২ পৃ:

- ১৬। Ram Charitam—Varendra Research Society Edn. Introduction p. XXIX ; Chapter II Verse, 30-34
- ১৭। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ঊনগেন্দ্র নাথ বসু, রাজকৃষ্ণকাণ্ড, ২০৩ পৃঃ
- ১৮। Ram Charitam—V. R. S. Edn. Introduction p. XVIII ; গোড় লেখ মালা—ঊক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ১৫৭ পৃঃ
- ১৯। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়, আদিপর্ব, ২২১ পৃঃ
- ২০। Inscriptions of Bengal—N. G. Majumdar—vol. III. Introduction—p. XXI.
- ২১। “Although the author occasionally showed an unusual degree of generosity by bestowing praises upon both (Mahipal II and Bhima), it is hardly to be expected that he could always take an impartial view of men and things, and that his judgement was not warped by a deep-rooted faith and belief in the innate honesty and injured innocence of Rampala and the villainy of those who were opposed to him and responsible for all troubles and sufferings.”—Ramcharitam—V. R. S. Edn.—Introduction—p. XIII.
- ২২। ভারতবর্ষ—১৩৬৩, ফাল্গুন—৩৭১-৭৫ পৃঃ ।
- ২৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩শ ভাগ (১৩১৩)—২৫৪ পৃঃ ।
- ২৪। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়—আদিপর্ব—২৮২ পৃঃ ।
- ২৫। জল্লেশ মহাপাঠ—শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ—৩৪ পৃঃ ।
- ২৬। জল্লেশ মহাপাঠ—শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ—৩০-৩১ পৃঃ ।
- ২৭। রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১৩১৫, ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা—উপেন্দ্র নাথ বর্মণ কর্তৃক উদ্ধৃত ; বাংলার লোক সাহিত্য—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩য় খণ্ড—২৫৭ পৃঃ ।
- ২৮। Inscriptions of Bengal—N. G. Majumdar—vol. III—p. 154.
- ২৯। পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ—২১৭ পৃঃ ।
- ৩০। সাহিত্য—১৩২০—বৈশাখ—৩২ পৃঃ, পাদটীকা ।
- ৩১। কালিকা পুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (বঙ্গবাণী)—৪২৭ পৃঃ ।
- ৩২। The Cooch Behar State and its land reform—H. N. Choudhuri—pp. 209-10.
- ৩৩। Indian Antiquary—1922, Supplement—p. 81.
- ৩৪। Jalpaiguri District Gazetteer—p. 152 ; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—৪র্থ সংস্করণ—৬১৪-১৫ পৃঃ ।
- ৩৫। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ঊনগেন্দ্র নাথ বসু—রাজকৃষ্ণকাণ্ড—২০০ পৃঃ ।
- ৩৬। Social History of Kamrup—N. N. Basu—vol. I, pp. 214-15.
- ৩৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়—আদিপর্ব—২৭০-৭১ পৃঃ ।
- ৩৮। মঙ্গলকাব্য—২য় বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা ।
- ৩৯। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়—আদিপর্ব—৬০২ পৃঃ ।
- ৪০। ইতিহাস—৭ম খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা—১৪২-৫০ পৃঃ ।
- ৪১। Social History of Kamrup—N. N. Basu—vol. I.

- ৪২। পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ—২১২ পৃঃ।
- ৪৩। "The Assamese spoken in the district of Kamrup and Goalpara, which are the most western on the north-side of the Brahmaputra Valley, is not exactly the same as the standard language of Upper and Central Assam, being influenced by the Rajbangshi Bengali spoken immediately in West Goalpara and the Bengal district of Rangpur (জলপাইগুড়ি তখন রংপুর জেলার অন্তর্গত ছিল) ... The pronunciation of the vowels appears to approach more nearly to that of Bengali than does standard Assamese"—Linguistic Survey of India—vol. V, part—I, p. 414, vol. I, part I, p. 446.
- ৪৪। কোচবিহারের ইতিহাস—খান চৌধুরী আমানতউল্লাহ—৫২ পৃঃ।
- ৪৫। মধুপুৰী—২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা—৪৮ পৃঃ।
- ৪৬। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজকৃষ্ণাণ্ড—নগেন্দ্র নাথ বসু—৬৮ পৃঃ।
- ৪৭। "Madh=The Hindu God Krishna, dangi=high land. This is a shrine of this god on a piece of high land in the taluk, which is named after him."—District Handbook—Jalpaiguri—A. Mitra—Appendix—p. CXCIII.
- ৪৮। District Handbook—Jalpaiguri—A. Mitra—Appendix, V—p. CXCII.
- ৪৯। জনবানী—৭ম বর্ষ, ৫১শ সংখ্যা, ৭ পৃঃ—শ্রীনিরেন সেনগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত।
- ৫০। Annual Report of Archaeological Survey of India—1915-16.
-

জলপাইগুড়ির দেব দেবী

শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

দেবতাস্থা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত জলপাইগুড়ি এখন শুধু মানুষকে টেনে আনে দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির ভূমি হিসেবে। কিন্তু জলপাইগুড়ি শুধু চায়ের দেশই নয়। সবকিছুর ওপর রয়েছে এ-জেলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাস। ষথার্থ ও ব্যাপক গবেষণার সার্থক উপাদান আজও লুকিয়ে রয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, ছড়িয়ে আছে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে।

খোলা মনে পশ্চিম থেকে পূবে এগিয়ে চললে একের পর এক দেখতে পাব প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক স্বাক্ষর যা কালকে অতিক্রম করে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাংলা দেশ দেব-দেউলের দেশ। তাই প্রতিটি জেলায় দেখি প্রাচীন মন্দির। দেবতাকে কেন্দ্র করেই গ্রামে গ্রামে দেউলের প্রতিষ্ঠা। গড়ে উঠেছে নানা পীঠস্থান। এ পীঠস্থান আবার সেখানকার মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সন্ন্যাসীর হাট বা সন্ন্যাসীরকাটা জেলার শিকারপুর চা-বাগিচা অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। কোন এক সন্ন্যাসীর নামানুসারেই নাকি এই নাম। এ সন্ন্যাসী ভবানী পাঠক নামেই বিখ্যাত — যিনি ঐ অঞ্চলে সন্ন্যাসী নামেই সমধিক খ্যাত ছিলেন।

এই হাটের সামনে বেশ একটু স্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দির। মন্দিরটি দেখতে অনেকটা বৌদ্ধ 'প্যাগোডা'র মতন। এ মন্দির কবে কে নির্মাণ করেছেন তার কোন প্রমাণ নেই —, তবে মধ্য-মধ্যে এ মন্দির সংস্কার করা হয়ে থাকে। প্রচলিত প্রবাদ, ষ্টুট নামে জনৈক সাহেব নাকি এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তবে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মন্দির খুব প্রাচীন নয়। উল্লেখযোগ্য, মন্দিরের ভিত্তি পাকা হলেও আর সব কিছু কাঠনির্মিত। এমন কি দেউলের পূজিত কাঠ নির্মিত মূর্তি আজও অপূর্ব শিল্পের স্বাক্ষর বহন করছে।

মন্দিরের প্রবেশপথের ঠিক সামনেই এক প্রস্তরস্তম্ভের ওপর খেত পাথরের একটি বৃষ মূর্তিকে মন্দিরের দিকে মুখ করে স্থাপিত অবস্থায় দেখা যায়। এ ব্যতীত মন্দিরের সিঁড়ির তিন সারিতে দু'পাশে তিনটি করে সিংহ মূর্তি দৃষ্টিগোচর হবে। সবই প্রস্তর-নির্মিত। সিংহ মূর্তি হাঁ করে একদিকের একটি পা গোল পাথরের ওপর স্থাপন করে পেছনের দু'পায়ে ওপর বসে আছে। সিংহের কেশর বুলে পড়েছে। লেজ উঁচু। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে পিতলের দু'টি ঘণ্টা বুলতে দেখা যাবে। ছোট ঘণ্টাটিতে লালবাহার খাপা সুখার (তারিখ ২৫-৬-১৯২৭) দাতার নাম হিলেবে খোদিত আছে।

দরজা খুলে মন্দিরে প্রবেশ করলে বেশ বোঝা যায় যে, দেবতা কখনো উপবাসে থাকেন না। প্রতিটি মূর্তির কপালে সিন্দূর লেপা। বেদীতে ফুল, ধূপ-ধূনা নিয়মিত দেওয়া হয়।

মন্দিরে সর্বসম্মত মোট দশটি মূর্তি স্থাপিত আছে। সবই কাঠের। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে,

মূর্তিগুলি টুকরো টুকরো করে তৈরী করা হয়েছে। সব মূর্তিই পূর্ণাঙ্গ। চক্রাকারে মূর্তিগুলি তিনটি সারিতে সাজান। হু'পাশে চারটি—আর মাঝে দু'টি। মূর্তিগুলির সম্ভাব্য বর্ণনা নিম্নরূপ :

প্রথম বেদীতে : (ক) পুরুষ মূর্তি—পদ্মাসনে উপবিষ্ট। উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন ফুট। মাথায় জটা। পরিধানে বাঘের ছাল। বাম হাত ডান পায়ের পাতার ওপর স্থাপিত—, আর ডান হাত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে রয়েছে। মাথার জটা ঘাড়ের দু-পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। চোখ বেশ বড় বড়।

(খ) স্ত্রী মূর্তি—উপরোক্ত পুরুষ মূর্তির দক্ষিণদিকে মেয়েদের সাধারণ ভঙ্গীতে উপবিষ্ট। উচ্চতা প্রায় তিন ফুট। বাম হাত বাম হাঁটুর ওপর—দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদের ভঙ্গিমা। পরিধানে সাধারণ মেয়েদের মতন একখানা শাড়ী, লাল রং। বাহুতে অলংকার। গলায় হাঁহুলী। কপালে সিন্দুর। প্রাঙ্গ, উপরোক্ত পুরুষ ও স্ত্রী মূর্তিটি কার ?

দ্বিতীয় বেদীতে : দু'টি স্ত্রী মূর্তি আছে। উচ্চতা যথাক্রমে আড়াই ফুট ও দু' ফুট। মূর্তি দু'টির ভঙ্গীও অন্তরূপ। নীচের বেদীতে একটি শৃগাল মূর্তি—উচ্চতা প্রায় দেড় ফুট। মাথায় লাল পাগড়ী, পরণে 'ব্রাউন' রং-এর কুর্তা চার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বরকন্দাজের মূর্তিও লক্ষ্য করার মত। এছাড়া আছে একটি রুগ্ন মূর্তি—যার মাথার চুল ছোট, পরিধানে কোন বস্ত্র নেই। বুকের হাড় বের হয়ে আছে—হাঁটু গেড়ে বসার ভঙ্গী। আরও একটি মূর্তি ঠিক এর ডান দিকে অবস্থিত।

উপরে যে বর্ণনা দেয়া হল তা ভবানী পাঠকের মূর্তি বলেই অনুমান করা হচ্ছে। করতোয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে আজও সন্ন্যাসী পূজার প্রচলন আছে।

ভবানী পাঠকের কথা বলতে গেলে আরও একজনের কথা উল্লেখ করতে হয়—ইনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্লরূপী 'দেবী চৌধুরাণী'। বস্তুতঃ দেবী চৌধুরাণীর কর্মক্ষেত্র সমগ্র উত্তরবঙ্গ। বিশেষ করে রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা। পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলা রংপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেবী চৌধুরাণীর কর্মক্ষেত্রের কিয়দংশ বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর বনভূমি অঞ্চলে এখনো অনেক কীর্তির চিহ্ন রয়ে গেছে।

ভবানী পাঠকের বংশধর বলে পরিচিত কয়েকটি পরিবার আজও ভাণ্ডিগুড়ি গ্রামে বসবাস করছে। ভবানী পাঠকের প্রধান একটি ঘাঁটি ঝাকুরাপাড়া গ্রামে ৬৫ ফুট পরিধি বিশিষ্ট একটি বট বৃক্ষ এখনও রয়েছে। এই বৃক্ষটির সামনে একটি দীঘি আছে। ১২ ফুট ব্যাস সম্বলিত একটি বিরাট ঢোলক সিপাইপাড়া গ্রামে দেখা যায়। শিমুলগুড়ি গ্রামের কাছে করতোয়া নদীতে একটি ভাঙ্গা বজ্রা পাওয়া গেছে। মন্ডনী গ্রামে ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি দেবীর মূর্তি আজও মন্ডনী দেবী নামে পূজিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, মূর্তিটি কাষ্ঠ নির্মিত। অনেকের মতে মন্ডনীদেবীই দেবী চৌধুরাণী নামে পূজা পাচ্ছে। বোদাগঞ্জ গ্রামেই ভবানী পাঠকের সাধনার স্থান ছিল। এখানে ২৫টি বেল গাছ আছে। নিকটেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বোদাগঞ্জের যোগিনীভাঙ্গা, বাতাস-ভিটা, জ্যোৎস্নাভিটা, বাশফাপুরী, দীঘলফাপুরী, যোগমাফাপুরী প্রভৃতি স্থান 'খাপুরী' নামে পরিচিত। চারদিকে জঙ্গল এবং মধ্যে পরিষ্কার—, এগুলি স্থানীয় ভাষায় খাপুরী বা খাপী। ভবানী পাঠকের অনুগামীরা এসকল স্থানেই মিলিত হত বলে অনুমিত হয়। এছাড়া জয়পুর গ্রামে একটি মনসা মূর্তি ও গৌরীকোণ গ্রামে একটি ভাঙ্গা 'গড়' আছে। বোদাগঞ্জের ধর্মনাথ রাঘবের বাড়ীতে আজও ৫০ বছর পূর্বে পাওয়া শিলপাটা [৩'×১৮"×৪"]

দেখতে পাওয়া যায়। করতোয়া নদীর উৎপত্তি স্থানে যেখানে ভাঙ্গা বজরা পাওয়া গিয়াছে সেখানে প্রায় ১০ ফুট লম্বা ও ৬ ফুট পরিধি বিশিষ্ট একটি তুলসীগাছ আজও দেখতে পাওয়া যায়। প্রকাশ এই স্থান থেকেই দেবী-চৌধুরাণী করলা নদীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। করতোয়া নদীতে আজও দুধিয়ারঘাট, হাওয়ারঘাট, খটখটিয়ারঘাট নামে কয়েকটি ঘাট দেখতে পাওয়া যাবে।

এবার শিলিগুড়ি হলদিবাড়ী রাজ্য সড়ক দিয়ে জলপাইগুড়ির দিকে এগিয়ে এলে মোহিতনগরের কাছে জোড়দীঘিতে দাঁড়াতে হবে। এখানে খনন কার্য চালিয়ে হাজার বছর আগের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, প্রাচীনকালের নিদর্শন পুরাতন ইষ্টক পাওয়া গেছে। অনেকে জোড়দীঘির ঐ টিপিকে পৃথুরাজার টিপি বলে অভিহিত করেন। অহুস্কানে জানা গেছে, ঐ নিদর্শনগুলি খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর পাল-পৃথু-গুপ্ত সাম্রাজ্যের নিদর্শন।

শহরের কারিগরী বিদ্যালয়ের ময়দানেও মাটি কাটবার সময় শ্রমিকরা পুরাকালের প্রচুর তৈজসপত্র পেয়েছিল। কারিগরী বিদ্যালয়ের কাছে একটি কালীমন্দির চোখে পড়বে। আগে এখানে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। নয়ান কাপালী নামে এক ডাকাতের কাহিনীর সঙ্গে এ কালীবাড়ীর কাহিনী জড়িয়ে গেছে। আগে এখানে নরবলি হত। আরও একটু এগিয়ে গেলে দেখা যাবে রাজবাড়ী। রাজবাড়ীর সামনে রয়েছে শিব ও কালী মন্দির। বিরাট একটি দীঘি। জানা গেছে, রাজা সর্বেদেবের আমলে দীঘিটা খনন করা হয়েছিল। এ দীঘিকে কেজু করেও রয়েছে অনেক কাহিনী।

এবার শহর থেকে এক মাইল দক্ষিণে যেতে হবে। যেতে হবে পাণ্ডাপাড়ায়। শহরের পৌর এলাকার শেষ সীমা। মৃৎ-নির্মিত কালীমূর্তি। দেবী এখানে ভদ্রকালীরূপে পূজিতা, প্রতিবছর কার্তিক মাসে নূতন মূর্তি নির্মাণ করা হয়। এ মূর্তির পদতলে চিরাচরিত মহাদেব নেই। দু'টি সর্পের ওপর দেবী দণ্ডায়মানা। দেবী এখানে জিহ্বা বের করেননি। দেবীর দুহাত। শোনা যায়, বৈকুণ্ঠপুরের রাজা দর্পদেব এই দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৭৫৮-৯৩। অনেকের মতে তারও আগে কোচবিহারের রাজা রূপনারায়ণ ১৬৯৩ থেকেই নাকি দেবীর পূজা করে আসছিলেন।

আরও চার মাইল দক্ষিণে এগিয়ে গেলে ভাল হয়। জলপাইগুড়ি—হলদিবাড়ী সড়কে ধাপগঞ্জ হাটের কাছে পানানদীর ধারে বামনপাড়া নামে একটি স্থান আছে। এখানে ধাপচণ্ডী নামে একটি মন্দির নিঃসন্দেহে প্রত্নতাত্ত্বিকের কিছু খোরাক জোগাবে। কথিত আছে, মুসলমান শাসনকালে হুসেনশাহ যখন বৈকুণ্ঠপুর আক্রমণ করেন তখন ঐ স্থানের প্রাচীন মন্দির বিধ্বস্ত হয়। তারপর এই স্থান কালের আবর্তে জংগলাকীর্ণ হয়ে ওঠে। তারপর এক মুসলমান সপরিবার বামনপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। শোনা যায়, ঐ মুসলমান পরিবারের এক প্রাচীন ব্যক্তি রাতে স্বপ্ন দেখেন। দেবী কালীর স্বপ্ন। নির্দেশাছুযায়ী খনন কার্য চলে। জংগল পরিষ্কার হয়। তারপর প্রতি সন্ধ্যায় দেবী-নির্দেশিত স্থানে সন্ধ্যাদীপ দিতে থাকেন। ঐ মুসলমান পরিবার প্রায় তিনপুরুষ এই প্রথা চালিয়ে যান। দেশ ভাগ হল। ঐ পরিবারও পাকিস্তানে চলে যান।

বহুদিন ঐ দেবী চিহ্নিত স্থান অবহেলিত থাকে। ১৯৫৫ সালে হলদিবাড়ী-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়ক নির্মাণকালে জনৈক ঠিকাদার স্বপ্ন দেখেন, যেন ঐ নির্দিষ্ট স্থানে কোন বিষ সৃষ্টি করা না হয়। তখন থেকে আজও প্রতি সন্ধ্যায় ঐ উঁচু টিপিতে আলো দেয়া হয়। তিনিই একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন। ঐ উঁচু টিপিকে এড়িয়ে আজকের হলদিবাড়ী সড়ক চলে গেছে। খননকার্য চালান হলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা হয়তো আরো অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন।

পাণ্ডাপাড়ার এক মাইলের মধ্যে প্রায়—শুধু একটি দীঘি আছে। এ দীঘিটি প্রায় আদরপাড়ার দীঘিরই অল্পরূপ। দীঘিতে ইষ্টক নিমিত সিঁড়ি আছে। দীঘির চার প্রান্তই ইষ্টক নিমিত বলে অল্পমিত হয়। মন্দিরের আকারে দু'টি ভগ্নস্তূপও রয়েছে। এর কিছু আগে গদাধর নদীর তলদেশ। বিশ্বাসপাড়াতেও শুকিয়ে যাওয়া একটি দীঘি রয়েছে।

এবার শহরে ফিরে এসে পশ্চিমদিকে মাইল দশেক এগিয়ে যেতে হবে। অতি সম্প্রতি, এ বছরের মার্চ মাসে জহরী গ্রাম বা হাটের পিছনে কীর্তনীয়াপাড়া গ্রামে পূর্ববঙ্গগত জনৈক কৃষিজীবী শ্রীবিপিনচন্দ্র বিশ্বাস উঁচু টিপির মতন একটি স্থানে খননকালে চারদিকে দেওয়াল বিশিষ্ট ভগ্নস্তূপ দেখতে পান। ঐ সময়েই দু'টি কষ্টিপাথরের মূর্তি মাটির তলা থেকে আবিস্কৃত হয়। বড় মূর্তিটি ২৭ ইঞ্চি লম্বা। দণ্ডায়মান মূর্তিটির দু'দিকে দু'টি মূর্তি আছে। স্থতীক্ষ্ম নাসাগ্রভাগ। প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর হাত জোড় অবস্থায়—অনেকটা বৃদ্ধের মতন দেখতে। ছোট মূর্তিটি ৭ ইঞ্চি লম্বা। সপ্তাঙ্খ রয়েছে। মূর্তির হাতে প্রস্ফুটিত পুষ্প। একটি সূর্য মূর্তি। জহরীর আশে পাশে খনন কাজ চালান হলে আরও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলবে। অল্পমান করা হচ্ছে প্রাপ্ত এ মূর্তিগুলি পাল আমলের।

জেলায় প্রাচীনতম মন্দিরগুলির কথা আলোচনা করতে গেলে সবচেয়ে আগে জলেশ মন্দিরের কথা মানসপটে ভেসে ওঠে। শহর জলপাইগুড়ির ১০ মাইল পূর্বে তিস্তা নদী অতিক্রম করে ময়নাগুড়ি। ময়নাগুড়ির চার মাইল দক্ষিণে জটোদ্রা মতাস্তরে জটোদা বা ঝড়দা কিংবা আজকের নাম জড়দা নদীর তীরে জলেশ নামক স্থানে এই শিব মন্দিরটি অবস্থিত। ভারতের ৫১ পীঠের মধ্যে জলেশ একটি মহাপীঠ। এখানে দেবী ভ্রামরী এবং ভৈরব শ্রীশ্রীজলেশ। জলেশ মন্দিরের গম্বুজের শ্রায় ফেরো কংক্রীটের বৃহৎ গম্বুজ ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। এই মন্দির ১০২৪ ফুট লম্বা, ১২০ ফুট চওড়া ও ১২৭ ফুট উঁচু। নির্মাণের দিক থেকে কিম্বা স্থাপত্য রীতির দৃষ্টিতে জলেশ মন্দিরের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে—মন্দিরের গর্ভগৃহগুলি মৃত্তিকা নিয়ে অবস্থিত। মন্দিরের দুয়ারের সম্মুখেই নামবার সিঁড়ি। গর্ভগৃহে রয়েছে শিবলিঙ্গ। এখানে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরও আছে। এ থেকে বোঝা যায় শাক্ত-শৈব সভ্যতা এখানে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। মহাপীঠের প্রাচীনত্ব নিয়েও গবেষণার শেষ হয়নি। জলেশ মন্দিরে একটি ঘটনা আছে। তাতে তিব্বতী ভাষায় কিছু উৎকীর্ণ রয়েছে।

বস্তুতঃ ময়নাগুড়ি অঞ্চল যেন মন্দিরের অরণ্য। জলেশ ও ময়নাগুড়ির মধ্যে পথেই পড়বে মাধবডাঙ্গা। বটেখরের মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। মন্দিরের প্রস্তরস্তম্ভ এখনও দৃশ্যমান। মন্দিরের গঠনপ্রণালী পূর্বদহর মন্দিরের অল্পরূপ। মনোরম অলংকরণ। কোনটিতে রয়েছে বুদ্ধগয়া মন্দিরের নমুনা, কেখোও ওংকার চিহ্ন, কোথাও বা এমনিতির আরও অনেক কারুকার্য। ময়নাগুড়ির মাইল পাঁচেক দূরে অবস্থিত সোদর খই-এর শিবমন্দির। শিব-মন্দিরের অনতিদূরে একটি প্রস্তর নির্মিত চৌবাচ্চা দেখতে পাওয়া যাবে। অনেকে অল্পমান করেন যে, দূরাগত পথিকদের জল এখানে স্নান ও পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। ময়নাগুড়ির অল্প দূরে, চার মাইল পশ্চিমে দোমহনী। এখানে ছিল কালো কষ্টি পাথরের একটি মূর্তি। মহাকাল নামে এ মূর্তি পূজা পেত। মূর্তির শিরস্ত্রাণ সর্প নির্মিত। মূর্তির ত্রিনয়ন। গলায় রয়েছে পবিত্র উপবীত। মহাশ্যামস্তকে নির্মিত কণ্ঠ অলংকার। পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান মূর্তির দু'পাশে রয়েছে ডাকিনী-যোগিনী। মূর্তিটি তৎকালীন জেলা সমাহর্তা শ্রী কে, কে, সেনের প্রচেষ্টায় কলকাতার মিউজিয়ামে পাঠান হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় ও হিন্দুদের কাছে মহাদেবই মহাকাল নামে পরিচিত।

এবার দেখি ময়নাগুড়ির কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে কিনা। অল্পসম্মানে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয়

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি ভবানী দাসের ময়নামতীর পুঁথিতে কিছু কিছু বিচিত্র তথ্য রয়েছে। স্বামী মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ময়নামতী নিজপুত্র গোবিন্দচন্দ্র অথবা মতান্তরে গোপীচাঁদের প্রতিভূরূপ রাজ্যশাসন করতে থাকেন। ইতিহাসে জানা যায়, মাণিকচন্দ্র কামরূপ রাজ ধর্মপালের সংগে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে রাণী ময়নামতী পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে পিতৃ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ত্রিশ্রোতার তীরে ধর্মপালের সংগে যুদ্ধ করেন। আরও জানা যায়, রাণী ময়নামতীর 'উনশত রাজধানী' ছিল। উপরোক্ত যুদ্ধে রাণী ময়নামতী জয়লাভ করেন। 'ময়নাবুড়ি'র উপাখ্যানে জানা যায়, তেজস্বিতা ও ধর্মপ্রাণতার জন্য ময়নামতী শক্তির অবতার রূপ দেবীরূপে পূজা পেতেন। ময়নাগুড়ির অবস্থান ও তার চতুর্পার্শ্বস্থ প্রাচীন মন্দির সমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় এখানেই ময়নামতীর রাজধানী অবস্থিত ছিল। আজকের ময়নাগুড়ি হ্রদে তাঁর স্মৃতি বহন করছে। ময়নাগুড়ির ময়না মার পেছনে হ্রদে রয়েছে আরও কোন অজানা তথ্য।

ময়নাগুড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে শিব ও শক্তির বিশ্বব্যাপক সমন্বয়ের নানা নিদর্শন। ময়নাগুড়ির মরাখাওয়া নদীর তীরসহ বেংকান্দি গ্রামে প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ চামুণ্ডাদেবীর মূর্তি (স্থানীয় নাম পেটকাটি), অধুনালুপ্ত প্রাচীন কামরূপের শক্তিশাধনা ও তান্ত্রিকপথের প্রভাবের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে।

অনেকের মতে এ দেবী আগে ভদ্রেস্বরীদেবীরূপে পূজা পেতেন। পরে ভদ্রেস্বরীই চামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। মূর্তির দশটি হাত। দু'টি দক্ষিণ ও একটি বাম হস্ত ভগ্ন অবস্থায় দেখা যাবে। দেবীর নাসাগ্রভাগ ভগ্ন। প্রস্ফুটিত পদ্মে দেবী উপবিষ্টা। বর্ণনা নিম্নরূপ : বামদিকের পাঁচটি হাতে রয়েছে — হস্তি, ঘণ্টা, ছিন্ন নর-মুণ্ড, একটি নরমূর্তি — অপর হাত ভগ্ন। দক্ষিণ দিকের হাতগুলিতে রয়েছে হস্তি, মৃতবাত্তির কংকাল, ছোট বাগুযন্ত্র বিশেষ — অথ দু'টি হাত আংশিক ভগ্ন। দেবী চামুণ্ডা ত্রিনয়না — সর্পনির্মিত কর্ণভরণ, মুকুট ও সর্পশোভিত, গলায় নরমুণ্ডমালা, সর্বাঙ্গে সর্প-মালায় সজ্জিতা। পদতলে জাহ্নু পেতে বসার ভঙ্গীতে একটি নারীমূর্তি। শূণ্য উদরে একটি বৃশ্চিক। মূর্তির একদিকে শূগাল, অত্রদিকে ময়ূর। দেবী প্রত্যহ পূজা পাচ্ছেন।

এবার কিন্তু ময়নাগুড়ি থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বেশীদূর নয়। ময়নাগুড়ি-ধুপগুড়ি ৩১নং জাতীয় সড়ক থেকে কাঁচা পথে এক মাইল পূর্বে পড়বে হচলুডাঙ্গা। মল্লিকের হাট নামেও পরিচিতি আছে। পূর্বকথিত জলেশ মন্দিরের তিন মাইল পূর্বে পূর্বদহ বা পূর্বডহর। পূর্বডহর জটিলেশ্বর মন্দির প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আকর। এলাকা সরকারী আইনানুযায়ী সংরক্ষিত।

অলংকরণের দিক থেকে পূর্বডহর মন্দিরটি বাস্তবিকই আকর্ষণীয়। এ মন্দিরের সীমানায় প্রবেশ করবার ইষ্টক-নির্মিত তোরণদ্বার ও তার দু-দিকের মনোরম অলংকরণ ও কারুকার্যখচিত প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর প্রকৃতই দ্রষ্টব্য বস্তু। ঐ দ্বারের সম্মুখে রয়েছে দ্বারপালের মূর্তি। এই মূর্তিটি পাহাড়পুরের দ্বারপালের মূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ছাড়া মূল মন্দিরের বাইরের প্রাচীর গাত্রে খোদিত অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি শিল্পীর বাস্তব কল্পনার সার্থক রূপায়ণ বলেই মনে হয়। ঐ সব খোদিত মূর্তিগুলির মধ্যে বুদ্ধ, নটরাজ, গণেশ, যক্ষিণী (একটি যক্ষ মূর্তি রাজ্য মিউজিয়মে রয়েছে) প্রভৃতির মূর্তিগুলিই সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের তোরণ-দ্বার ও তার পার্শ্বস্থ যোনিপীঠ যে ইষ্টক দ্বারা নির্মিত তা বিশেষ পুরাতন বলেই প্রতীয়মান হয়। ইষ্টকগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক ফুট। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডগুলি সাজিয়ে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে এবং প্রস্তরখণ্ডগুলি লৌহশলাকার দ্বারা বিদ্ধ করে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। প্রস্তরখণ্ডগুলির

দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। প্রস্থ ২ ফুট ৫ ইঞ্চি। মন্দিরের আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩ প্রস্থে ২২২ ফুট। এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে একটি কিশ্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, শিবের অমুচর নন্দী এখানে তপস্বী করে সিদ্ধিলাভ করে এই বর পায় যে, পূর্বভূমির মন্দিরে পূজা না দিয়ে জলেশ মন্দিরে পূজা দিলে কোন ফল লাভ করা যাবে না। বলা বাহুল্য, দেবতা এখানে শিবলিঙ্গ। জলেশ-মন্দির নির্মাতা রাজাই এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত। কিন্তু সে রাজা কে তা আজও গবেষণার বিষয়। তবে মন্দিরটি প্রাচীন জলেশ মন্দিরের সংস্করণ বলে মনে হয়। এই মন্দিরের চত্বরের ভিতর আরও একটি ছোট মন্দির দৃষ্টিগোচর হবে। মন্দিরে কোন মূর্তি বা বিগ্রহ নেই। মন্দিরটি জটিলেশ্বর রূপে পরিচিতি লাভ করলেও সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পূজা এখানে প্রচলিত। কালীপূজার রীতিতে পূজা হলেও কোন পশুবলির বিধান এখানে নেই। পূজাপদ্ধতি শাক্ত-পূজারই অনুরূপ। অতীত শাক্ত-সাধনার পীঠ বলে এর প্রসিদ্ধি রয়েছে। সম্প্রতি এখানে পুকুর থেকে আরও একটি মূর্তি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

আরও কিছু এগিয়ে যাবার আগে প্রসঙ্গতঃ একথা বলা আবশ্যিক যে, তিস্তার পশ্চিমপার থেকে রায়ডাক নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ভাঙানী পূজার প্রচলন আছে। দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জনের পরদিন অর্থাৎ একাদশী তিথি থেকে দু'দিন পর্যন্ত ভাঙানী পূজার রীতি প্রচলিত। একটি একক নারী মূর্তি। ব্যাঘ্রের ওপর সমাসীন। দেবীর দু'হাত। এক হাতে পাত্র, অপর হাতে আশীর্বাদে ভংগিমা। বার্ষিকঘাট ও ময়নাগুড়ি রোডের মধ্যবর্তী স্থানে ভাঙানী গ্রাম ভাঙানীদেবীর নাম মাহাআই প্রচার করছে। ভাঙানী মূর্তির সংগে মহাদেব বা শিব কিংবা অপর কোন মূর্তির অবস্থান নেই। পূজায় কোন পশুবলি হয় না। এ অঞ্চলে ভাঙানী দেবীর একটি স্থানিক নাম আছে—“ভাং ধোরী মাও পূজা”। সম্প্রতি, ভাঙানী দেবীর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এখন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাতিক ও গণেশ যুক্ত হয়েছে। ব্যাঘ্র রূপান্তরিত হয়েছে সিংহে। বহুবিধ লৌকিক কাহিনীর একটি নিয়রূপ; যে দেবী দম্পত্যের সংগে অস্ত্রে (ভাং) যুদ্ধ করেছিলেন তিনিই যুদ্ধশেষে কন্যা (মা বা মাও) রূপে পরিগণিত হন। যুদ্ধশেষে ঘরে অর্থাৎ কৈলাসে যাবার পথে (যেহেতু ডুমার্স কৈলাস যাবার পথ) তিনি ব্যাঘ্রে বসে সাধারণ মানুষকে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। অনেকের মতে, এটা মাটি মায়ের পূজা যাতে অধিক ফল পাওয়া যায়।

এবার এগিয়ে যেতে হবে সোজা পূর্ব দিকে। ডুমার্সের তোরসা নদীর পারে জলদাপাড়া সরকারী বন সংরক্ষণ সংলগ্ন স্থানে চিলাপাতা বন। এখানে কণিক রাজার দুর্গ বলে কথিত প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। অনেকে আবার এই দুর্গকে ‘নল রাজার গড়’ বলে অভিহিত করেন; ‘নল রাজার গড়’ স্থানীয় লোকের মুখে ‘নর রাজার গড়’ বলে পরিচিত। একথা শোনা যায়, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ-সিংহ ঐ গড় নির্মাণ করেন। যেহেতু এদেশের লোকের পক্ষে পরপর দু’টি ‘র’ উচ্চারণে অস্বাভাবিক হয় সেহেতু ‘নর রাজার গড়’—‘নল রাজার গড়ে’ রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে হয়। আবার অনেকে বলেন, এ গড় ভুটিয়ারা নির্মাণ করেছিল। কোন কোন ইংরেজী বইতে এই গড়কে ‘চিচা কোটা গড়’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবার যেতে হবে ডুমার্সের অরণ্যে। আলিপুরদুয়ার মহকুমার অধীনে জয়ন্তীর মহাকাল শিব সমগ্র উত্তর খণ্ডের এক প্রসিদ্ধ শিবলিংগ। রাজাভাতখাওয়া থেকে ট্রেনে জয়ন্তী আসবার পথে দুই পার্শ্বে গভীর অরণ্য দেখতে পাওয়া যাবে। এ বনাঞ্চলের দৃশ্য বাস্তবিকই মহান ও গভীর। জয়ন্তী স্টেশনের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ ‘মহাকাল শিব লিংগ’। মহাকাল শিব অরণ্যের মধ্যে পর্বতোপরি অবস্থিত। শিবের কোন মন্দির দৃষ্টিগোচর

হবে না। শিবস্থানের কাছে একটি অতি বিরাট আম গাছ ও একটি পুষ্করিণী অবস্থিত। প্রতি শিবরাত্রির সময়ে এখানে সমতল ও পাহাড় অঞ্চলের বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি মূর্তির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেগুলি আজও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অপেক্ষায় রয়েছে।

পাহাড়পুর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ব্রোঞ্জ নিমিত্ত পাল যুগের মনসা মূর্তি। ভারত-পাক সীমান্তে ভিতর গড়ের কাছে পাওয়া গেছে বোধ হয় সেন যুগের কষ্টি পাথরের চণ্ডী মূর্তি। ধূপগুড়ির কুর্শামারীতে মিলেছে আদি পাল যুগের কৃষ্ণ পাথরের স্বর্ঘ মূর্তি। আবার দক্ষিণ বেরুবাড়ী-হলদিবাড়ী সীমান্তে পাওয়া গেছে উমা-মহেশ্বর মূর্তি। অপূর্ব কারুকার্য খচিত ১২৬২ সালে আবিষ্কৃত এ-মূর্তিটি পাল যুগের। যে চারটি আবিষ্কৃত মূর্তির কথা এখানে বলা হল সেগুলো সংগ্রহ করেছেন জলপাইগুড়ির শ্রীনির্গল চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। এগুলো উত্তরবঙ্গ-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ‘অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়ামে’ রক্ষিত আছে।

স্থানীয় ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীগোপালচন্দ্র বসু মহাশয় সংগ্রহ করেছিলেন পালযুগের মহিষমর্দিনীর মূর্তি। কষ্টিপাথরের এ-মূর্তি এখন আছে কলকাতার রাজা মিউজিয়ামে। জানা গেছে, বৈকুণ্ঠপুর জংগলের কোন স্থান থেকে রাজা প্রসন্নদেব রায়কত সংগ্রহ করেছিলেন বিষ্ণুমূর্তি। বহুদিন তাঁর গুদামে অবহেলায় দীর্ঘকাল মূর্তিটি পড়েছিল। এ মূর্তি পাল যুগের। চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তিটি এখন রয়েছে উক্ত শ্রীবসুর বাটীতে।

জহরী-তালমায় আবার পাওয়া গিয়েছিল সেনযুগের চতুর্ভুজ খোদিত প্রস্তর। উক্ত প্রস্তরের এক পিঠে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রকোষ্ঠ অঙ্কিত। প্রধান প্রকোষ্ঠে রয়েছে যোগাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্তি—ওপরের দুই হাতে গদা-পদ্ম, নীচের দু-হাত জামুতে স্থাপিত। মনে হয় কোন বুদ্ধমূর্তিকে পরে নারায়ণের মূর্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এ-মূর্তি আজও ঐ গ্রামে পূজা পাচ্ছে। এরকম আর একটি মূর্তি কিন্তু ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রয়েছে।

বেলাকোবার অন্তর্গত খালপাড়া গ্রামে বছর দশেক পূর্বে মাঠে চাষ করবার সময় শ্রীভন্দা রায় নামে জনৈক চাষীর লাঙ্গলের ফলায় অল্পম ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন সমন্বিত একটি চতুর্ভুজ গণেশের মূর্তি আত্মপ্রকাশ করে। মূর্তিটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এক ফুটের কিছু বেশি হবে। এই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর মূর্তিটিতে গণেশ পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে হেলে দণ্ডায়মান। মূর্তিটির কোমলতা, কারুকার্য, পদদ্বয়ের গঠন, শরীরের স্বাভাবিকতা ও পরিহিত বস্ত্রের সূক্ষ্ম তরঙ্গায়িত ভাঁজগুলি বাংলার পালযুগের শেষাংশের অপরূপ ভাস্কর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

জয়পুর চা-বাগানের পুষ্করিণী খননকালে আবিষ্কৃত হয়েছে মনসা মূর্তি। ১৯১৩ সালে বাগানেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজা পাচ্ছে। সেনযুগের এই মূর্তিটি বামহস্তে এক সর্পসহ অষ্টনাগ দ্বারা শোভিত।

বেরুবাড়ী সীমান্তে ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র সংগ্রহ করেছেন চামুণ্ডা মূর্তি। স্থানীয় লোকেরা মূর্তিটিকে ‘পেটকাটি মূর্তি’ বলে। মূর্তিটি পালযুগের, ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। উপরে বর্ণিত ময়নাগুড়ির বেকান্দি গ্রামে পূজিত চামুণ্ডা মূর্তিরই অনুরূপ। অস্থিচর্মসার, দেহে মাংস নেই, চামুণ্ডার তিন নয়ন কোটরময়। বজ্রজানী বোদ্ধদের দেবদেবীর মধ্যেও চামুণ্ডা গৃহীত হয়েছিল। দেবীর উদর কৃশ সেজ্ঞা হয়তো এর স্থানীয় নাম পেট কাটি।

দেব-দেউলের দেশ জলপাইগুড়ির প্রাচীন মন্দির ও প্রাপ্তমূর্তিগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার উপাদান। ভগ্ন অর্ধ-ভগ্ন মন্দির ও বিগ্রহ লোকচক্ষুর অন্তরালে আজও অতীতের সাক্ষিরূপে বিরাজমান। এগুলির অবস্থিতি কেবলমাত্র প্রাক-ইতিহাসের সাক্ষ্যই নয় পরন্তু ভারতের সুমহান ভাস্কর্য ও শিল্পকলার অপূর্ব নীরব নিদর্শন। এসব মূল্যবান সম্পত্তি যত্নের অভাবে নষ্ট হচ্ছে— প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সার্থক অন্বেষণ করলে নূতন আলোক সম্পাত করতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস রাখি।

[* আলোচ্য নিবন্ধ রচনার সাহায্য করেছেন শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীজীবনবন্ধু লাহিড়ী। তথ্য সংগ্রহ করেছি ডাঃ চারুচন্দ্র সান্দ্যাল লিখিত The Rajbanshis of North Bengal ও Jalpaiguri District Handbook, 1951 থেকে। বী. প্র. ব]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জলপাইগুড়ি জেলার একশ বছরে শ্রীশিক্ষার ক্রমবিকাশ

শ্রীস্বনীতি বাল্য চন্দ

জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন আজ থেকে এক শতাব্দী আগে ১৮৬৯ সালে। হিমালয়ের পাদদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিকেতন নদীবহুল এই জেলায় নানা প্রদেশ থেকে আগমন হ'লো কত লোকের। এই সময় শহরে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বলে অত্যাশ্রিত হয় না। শ্রী-শিক্ষা তখন গৃহ-শিক্ষার মধ্যমী সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে লাগল। এ সময় থেকে কেউ কেউ তাঁদের মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন—কিন্তু শিক্ষিকার অভাব—তবুও সে সময় কয়েকটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। বর্তমান সদর বালিকা বিদ্যালয়টি যে স্থানে অবস্থিত সেই করলা নদীর তীরবর্তী স্থানটি উদ্যোক্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁদের উদ্যোগে এই স্থানে কাঠের মেঝে, বাঁশের চাটাই ঘেরা টিনের চাল দিয়ে নির্মিত হ'লো একটি ছোট গৃহ—সম্ভবতঃ ১৮৭২ সালে। তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার বেকের সাহেবের আগ্রহে প্রথমে বিদ্যালয়ে কাজ শুরু হয়। তখন বিদ্যালয়টি ছিল মডেল স্কুল। এই সঙ্গে তখন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল বলে শুনেছি। পরে মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হতো। পরবর্তীকালে শরৎবাবু নামে এক বুদ্ধ পণ্ডিত বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে তখন শিক্ষা দেওয়া হতো এই নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়টিতে। ক্রমে শ্রী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্যোগ বৃদ্ধি পেল—স্বর্গীয় জালান মিশ্র নামধারী এক ব্রাহ্ম মুসলমানের আগমন এই কার্যে সহায়তা করল। এই ব্যক্তির বিদ্যুৎ শ্রী শ্রীযুক্ত জালান অগ্রণী হয়ে এই বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার স্থাপন করলেন এবং নিজে অবৈতনিক শিক্ষিকা হিসাবে শিক্ষাদান করতে লাগলেন—সম্ভবতঃ ১৯০২ সন থেকে। তিনি অল্পবিস্তর ইংরেজী শিক্ষাও দিতে লাগলেন। ক্রমে ছাত্রী হিসাবে বিদ্যালয়ে কিছু মেয়ে যোগ দিল। শহরবাসী মুক্তহস্তে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। স্বর্গীয় শরৎবাবু এই সময় অতি বৃদ্ধ হ'য়ে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। সে স্থানে ৬কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় নিযুক্ত হলেন।

১৯০৭ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চ প্রাইমারী পর্যায়ের উন্নীত হ'লো। ক্রমে ১৯১১-১২ সালে টিনের ঘরটির স্থলে নির্মিত হ'লো একটি পাকা বাড়ী। কুচবিহারের মহারাজী স্বর্গীয়া স্বনীতিদেবী এই কাজে প্রচুর সাহায্য করেছেন বলে শোনা যায়। এই সময় স্কুলটি M. V. থেকে M. E. তে উন্নীত হ'লো। তখন বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় গোবিন্দ সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়। তাঁর অবদানও স্মরণীয়।

১৯২৫ সনের ৩রা আগষ্ট লেখিকার প্রথম জলপাইগুড়ি আগমন — সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে। তখন বিদ্যালয়ের সম্বল ছিল একটি টিনের চালা ও একটি পাকা দালান। অবশ্য শিক্ষিকাদের একটি আবাসও ছিল। ঐ ঘরগুলিতে ক্লাশ বসত। বিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রেই প্রথমে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করত তা হ'লো

বিদ্যালয়ের আম গাছটি। এর নীচে ছাত্রীরা আনন্দেই খেলা করে বেড়াত। এখনও এর ছায়ায় মেয়েরা প্রতিদিন দিনের কাজ শুরু হওয়ার আগে মিলিত হয়। বিদ্যালয়ে হলের অভাব থাকায় প্রায় সব রকম অনুষ্টান উপলক্ষেই এর নীচে মেয়েরা সমবেত হয়। ব্যায়ামাগারের অভাবও পূর্ণ করে চলেছে গাছটি দীর্ঘদিন ধরে। গাছটি যেন বিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক — এর তলায় বসে কত বিখ্যাত মনীষীরা তাঁদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। গাছটি তাই বিদ্যালয়ের পরম সম্পদ। বাৎসরিক বণ্টা যদিও এর সৌন্দর্যকে আজ অনেকাংশে বিনষ্ট করেছে তবু মনে হয় এর পত্রবহুল শাখা ও রক্তবর্ণ ফল আজও সবাইকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। তাই আমার আবেদন পরিচালকমণ্ডলী যেন গাছটির সংরক্ষণে যত্নবান হন।

সেই প্রাচীন বিদ্যালয়টি আজ শহরের বৃহত্তম বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগান ও সরকারী সাহায্যে বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র বৃদ্ধি পেয়েছে — একই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে ছাত্রী ও শিক্ষিকার সংখ্যা। প্রারম্ভে ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ (প্রাইমারী বাদে), বর্তমানে ছাত্রীসংখ্যা ৭৫০ (প্রাইমারী বাদে), তার মধ্যে তপশীলী ছাত্রী ২৬ জন। বর্তমানে প্রাতঃকালীন প্রাইমারী বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা ১৭৪।

তখন প্রাথমিক বিদ্যালয় (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী) একই সঙ্গে চলত। বি.এ. পাশ শিক্ষিকা ছিলেন না, এমন কি একজন ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষিকাও তুলভ ছিলেন। বেশ মনে আছে এইজন্ম আমার স্বামী শ্রীদেবেন্দ্রকুমার চন্দ্র মৈমনসিং-এ যান শিক্ষিকা অনুসন্ধানে। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় একজন ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষিকা ভ্রমহলতা দাস এবং কিছুদিন পরে একজন বি.এ. পাশ শিক্ষিকা শ্রীপ্রভা মজুমদার আসেন বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে। এই প্রসঙ্গে না বলে পারছি না লেখিকার স্বামী বিদ্যালয় পরিচালনার সব রকম কাজে যেভাবে লেখিকাকে সাহায্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন এই বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতাও করেছেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি ও সাফল্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়টির উন্নতির মূলে প্রথম যার কথা আজ মনে হচ্ছে—তিনি স্বর্গীয় রেবতীরমণ দত্ত। আমি প্রথম এসে তাঁকেই সেক্রেটারী রূপে দেখেছি। বিদ্যালয়ের সকল প্রকার কর্মে তিনি আমাকে সাহায্য করেন। তিনি ছিলেন P.A. to the Commissioner। তখন পর পর এই স্থলাভিষিক্ত কয়েকজন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। বিদ্যালয় সম্প্রসারণে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন — স্বর্গীয় তারিণীপ্রসাদ রায়, স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র ঘোষ, স্বর্গীয়া স্ত্রীভাষিণী ঘোষ, স্বর্গীয়া রাণী অশ্রমতী দেবী, শ্রীবিপুলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশান্তি রায় ও শ্রীকিরণ রায়। স্বর্গীয় তারিণীপ্রসাদ রায় ও স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র ঘোষের অর্থানুকূল্যে বিদ্যালয় সম্প্রসারিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়ের চেষ্টায় ও উদ্যোগে বিদ্যালয়ের গ্রান্ট ও অনুমোদন পাওয়া সহজসাধ্য হয়। প্রথমদিকে বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের জন্ম গৃহে গৃহে ঘুরে লেখিকাকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে—এ বিষয়ে সাহায্য করেছেন স্বর্গীয়া স্ত্রীভাষিণী ঘোষ—শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের মাতা। এই সময়ই জলপাইগুড়ির মহিলা সমিতির কাজ শুরু হয়েছিল এবং এ বিষয়ে তিনিই অগ্রণী ছিলেন।

বিদ্যালয়ের প্রায় গোড়া থেকে যে সব শিক্ষিকাদের বিশেষ অবদান আছে তাঁরা হলেন—শ্রীঅরুণা দাশগুপ্তা, শ্রীতাপস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিকণা সেনগুপ্ত (অশ্র), শ্রীঅমিয়া সেনগুপ্ত, শ্রীঅমিয়া দে, শ্রীসাধনা বসু ও শ্রীবীণা চক্রবর্তী। বহু সমস্তায় জর্জরিত বিদ্যালয়কে সাহায্য করে এঁরা বিদ্যালয়ের মান বিভিন্ন দিকে উন্নত করেছেন। সেই সময় এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্ম চেষ্টা ছাড়াও একই সঙ্গে স্থানীয় মহিলাদের

নানা সমস্যা সমাধানের কাজে এগিয়ে এসেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় সেই যুগে মহিলা সমিতি গঠন করা সহজ হয়েছিল।

এই বিদ্যালয়টি ১৯৫৭ সনে বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, কদমতলা বালিকা বিদ্যালয়, ফয়জুল্লাহ (জুনিয়র হাই) বালিকা বিদ্যালয়, সেন্ট্রাল ও সোনালী বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। পরবর্ত্তীকালে প্রসন্নদেব বালিকা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গৌরবের বিষয় এই যে, এই শহরের একমাত্র কলেজের প্রথম ক্লাশ শুরু হয় সদর বালিকা বিদ্যালয়েরই ঘরে — সকাল বেলায়।

- স্ত্রী-শিক্ষায় এই বিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। আজ যাঁরা শহরে ও জেলার সর্বত্র শিক্ষার ত্রুটি গ্রহণ করে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের সহায়তা করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশী। তাই বিদ্যালয়টি জেলার “মহাশূরুপা” শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবী রাখে।

১৯৫০ সনের বিশ্বংসী বহুবার পর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল স্বর্গীয় কৈলাস নাথ কার্টজ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ও সমবেত ছাত্রীদের শৃংখলাবোধের প্রশংসা করে বলেন — “This is definitely one of the best Girls' High Schools that I have had the pleasure of visiting in the state of West Bengal.”

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার চর্চাও বরাবর চলে এসেছে। শহরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রীরা কৃতিত্বের দাবী রাখে। ১৯৬১ সালের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে লেখক তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—“এমন মধুর রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরিবেশন সচরাচর পাওয়া যায় না। তার ওপর সুন্দর শৃংখলা — পরিচ্ছন্ন পরিবেশ—ছাত্রীদের উজ্জল দৃষ্টি হাসিমুখ সব মিলিয়ে এ স্মৃতি মনের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।” আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগজেন্দ্র নাথ মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরাও বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

কৃত্তী শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের কথা বলে এই বিদ্যালয় প্রসঙ্গ শেষ করছি। এখানকার প্রাক্তন শিক্ষিকা শ্রীঅমিয়া সেনগুপ্ত (শিলিগুড়ি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা) ও শ্রীবিভা দেবী (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা) রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এখানকার প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী শান্তি রায়, শ্রীমতী অমিয়া গুপ্ত, শ্রীমতী দিপালী রায়, শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী, শ্রীমতি যুথিকা মুখার্জী ও আরও অনেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হ'য়ে বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

আমাদের সদর বালিকা বিদ্যালয়ের সমসাময়িক আরও কতগুলি বিদ্যালয়ে মেয়েরা বিদ্যালাভের সুযোগ পেয়েছে। অবশ্য সে সব জায়গা আজ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকাল আগে শহর থেকে দূরেও যে লেখাপড়া করার প্রেরণা মেয়েরা পেয়েছিল তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তখন বোদা, পাটগ্রামে M. E. স্কুল ছিল। ১৯৪২।৪৩ সালে পাটগ্রামে প্রথম ম্যাট্রিক স্কুল স্থাপিত হয়—মেয়েদের আলাদা বিদ্যালয়ও ছিল। ১৯১৫।১৬ সালে জটেশ্বরেও লোয়ার প্রাইমারী স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া করত। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রেকর্ডে শহরের আর একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সেটি ১৮৮৮ সালে অনুদান পেয়েছিল। এর সেক্রেটারী ছিলেন স্বর্গীয় পি, এন, মুখার্জী।

১৮২২ সালে বোদাতে গুয়াগ্রাম প্রাইমারী বিদ্যালয় এবং তারপর চন্দনবাটিতে M. E. স্কুল স্থাপিত হয়। এ ছাড়া ১৮৮৮ তে দেবীগঞ্জে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও ছিল। ১৮২৬ সনে জোরপাকড়িতে M. V. বিদ্যালয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ত বলে শোনা যায়।

১৯২৬ সনে উমাগতি প্রাইমারী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা ৬০। তারও অনেক আগে ১৮৮৫ সালে পাহাড়ীশাড়া প্রাইমারী বিদ্যালয়টি গড়ে ওঠে। এটিও একটি অতি প্রাচীন প্রাইমারী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাও এখানে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে এর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১০০। এর মধ্যে হরিজন—১২, মুসলমান—১৭, বিহারী—১০ ও রাজবংশী—৪৫। বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন স্বর্গীয় মহম্মদ সাহেব জান হক চৌধুরী। ৩২জন ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রথম বিদ্যালয়টি শুরু হয়েছিল। এটি মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পরিচালিত। রাজবাড়ীর জগদীশ্বরী পাঠশালা একই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। পরে অবশ্য প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যালয়টি উড়ে যায়—আর গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি।

আদরপাড়া প্রাইমারী বিদ্যালয়টি প্রায় শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় আজিজুল রহমান। ১৯২৬ সালে মিউনিসিপ্যালিটি বিদ্যালয়ের সাহায্য-দান বন্ধ করে। তখন বিদ্যালয়টিকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেন শ্রীহরেন্দ্র মোহন শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর এখানকার স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়। ১৯৫০ সালের পর থেকে বিদ্যালয়টির অবনতি ঘটে। তখন সব ছাত্র-ছাত্রী স্কুল পরিত্যাগ করে। কাজেই নতুনভাবে বিদ্যালয়টিকে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়—তখনকার নতুন প্রধান শিক্ষিকার আগ্রহে প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি পুনর্গঠিত হয়। এখানকার চূড়ান্ত প্রাথমিক পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ। বিদ্যালয়টির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র সমাজের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ে ও সবরকম অসুবিধার মধ্যেও তারা যথেষ্ট ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়ে সচেষ্ট আছে।

সোদামিনী বালিকা বিদ্যালয়টি শহরের বিশিষ্ট দানশীল রাজত পরিবারের একান্ত আগ্রহে ও সাহায্যে ১৯৩১ সালে স্থাপিত হয়। তখন এই শহরে বালিকা বিদ্যালয় কম থাকায় ছাত্রী সংখ্যা ভালই ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যালয়টির অবস্থা শোচনীয়—ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে।

১৯২৮ সালে স্বর্গীয় মধুসূদন রায়ের বাইরের ঘরে একটি ছোট পাঠশালা স্থাপিত হয়। তাঁর কন্যা শ্রীযুক্তা বিমলা রায় এবং শ্রীপ্রীতিনিধান রায়ের বড় বোন স্বর্গীয়া অল্পপমা দেবী এখানে তখন শিক্ষকতার কাজ করতেন। পাড়ার ছোটবড় ১০।১২টি মেয়ে নিয়ে পাঠশালার কাজ শুরু হয়। কিছুদিন পরে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হ'লো স্বর্গীয় হেমলাল ঘোষের বাড়ীতে, পরে স্বর্গীয় রমাপ্রসন্ন সরকারের ভাড়া বাড়ীতে। তখন এটি উচ্চ প্রাইমারীতে উন্নীত হয়েছে। এটিই বর্তমানে কদমতলা বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। ক্রমে বিদ্যালয়টি M. V., ১৯৩৯ সনে M. E., ১৯৫৭ সালে স্কুল ফাইন্সাল এবং ১৯৬৫ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হ'য়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টির নিজস্ব পাকাবাড়ী হয়েছে। ছাত্রীসংখ্যা বর্তমানে ৫৫০। এর মধ্যে তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রী সংখ্যা ১৪। বিদ্যালয়টির প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীপুষ্প ঘোষের অবদান উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির মূলে যাদের অবদান স্মরণীয় তাঁরা হ'লেন ৬বনমালী ঘোষ, ৬হেমলাল ঘোষ, শ্রীপ্রীতিনিধান রায়,

শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়—আরও অনেকে। এই প্রসঙ্গে ৬হেমলাল ঘোষের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিদ্যালয়টির সঙ্গে সকালে প্রাইমারী বিভাগ সংশ্লিষ্ট আছে।

কদমতলার পরেই যে বিদ্যালয়টি শহরে স্থাপিত হয়েছে তা হ'লো সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৪৮ সালে “নূরমঞ্জিলে” বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৯৫৮ সালে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়েছে নিজস্ব ভবনে। এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন স্বর্গীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। সব রকম সরকারী সাহায্য নিয়ে বিদ্যালয়টি কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। এর ছাত্রীসংখ্যা বর্তমানে ৩৩২। ১৯৫০ সালে শ্রীমতী ভারতী সেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বল করে। শৃঙ্খলা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠানেও বিদ্যালয়টি কৃতিত্বের দাবী রাখে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ফাইন আর্টস শাখা খোলা হয়েছে।

এর পর ১৯৫৪ সনে ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হ'লো ‘সেন্ট্রাল বালিকা বিদ্যালয়’। এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধনাঙ্ক ছিলেন স্বর্গীয় তরুণী মোহন চক্রবর্তী (সোনাউল্লা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক), স্বর্গীয় ডাঃ ধীরাজ মোহন সেন, শ্রীকৃষ্ণী কান্ত ভৌমিক, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল প্রমুখ আরও অনেকে। তখন নিজস্ব গৃহ না থাকাতে সোনাউল্লা স্কুলের কয়েকটি ঘরে সকাল ৬টা থেকে ১০টা পান্ডা মাত্র ৪ জন শিক্ষিকার সাহায্যে ৮০।৮২টি মেয়ে নিয়ে শুরু হ'লো এর কাজ—শ্রেণী সংখ্যা ছিল পঞ্চম থেকে অষ্টম। সোনাউল্লা স্কুলের প্রাক্তন ও প্রবীণ শিক্ষক শ্রীহরিপদ চৌধুরী নবীন উত্তম নিয়ে সাহায্য করলেন শিক্ষিকাদের। পরের বৎসর স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষিকা সংখ্যা বাড়তে লাগল। তাই স্কুলের আয় থেকেই জমি কেনা সম্ভব হ'লো এবং শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায় মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের অর্থ সাহায্যে ঐ জমিতে উঠলো নতুন বিদ্যালয়ভবন—দ্বারোদ্ঘাটন করলেন ১৯৫৮ সালের জাহ্নবারীতে প্রাক্তন শিক্ষার্থিকর্তা শ্রীধীরেন্দ্র মোহন সেন। ১৯৫৯ সালে বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাই থেকে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৬০ সালে ছাত্রীরা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয়। ঐ সময় থেকেই deficit basis এ grant-in-aid পাওয়া গেল। ১৯৬৫ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে স্বীকৃত হ'য়েছে। ১৯৬১ সাল থেকে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের কাজও চলেছে সকালে। প্রথম বছরে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। খেলাধুলা সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠান, শৃঙ্খলাবোধ সব ব্যাপারেই ছাত্রীদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা ছুটি বিভাগ মিলিয়ে মোট ৮৫০—এর মধ্যে তপশীলী ৯ জন।

ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও এ ক'টি স্কুলই যথেষ্ট নয়। শহরের জনসংখ্যাও বাড়ছে—বাড়ছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার তাগিদ। সেই প্রয়োজনে ১৯৫৪ সালের মে মাসে গড়ে ওঠে আর একটি বিদ্যালয়—“সোনালী বালিকা বিদ্যালয়।” ৬শুক্রেখর সান্যাল মহাশয় ডাঃ মহেন্দ্র মোহন বাগচীর সহায়তায় তাঁরই বাড়ীর বাইরে তিনজন শিক্ষিকা ও ৯০জন ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই বিদ্যালয়। তখন বিদ্যালয়টি ছিল অবৈতনিক। ৬শুক্রেখর সান্যাল মহাশয়ের স্বর্গীয় ভগ্নী “সোনালী”র নামে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে। দু'বছরের মধ্যে এটি জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্থানাভাবের জন্য সান্যাল মহাশয় ১৭ কাঠা জমি দান করলেন। কয়েকটি চা-বাগানের সহায়তায় ৬সান্যাল এবং তাঁর স্ত্রী পচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করলেন। ১৮৫৯ সনে আরও ৪ বিঘা জমি কিনে তৎকালীন পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী এম, সি, থান্না কর্তৃক বর্তমান ভবনের ভিত্তি স্থাপন করা হলো। এ সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫০। তার মধ্যে শতকরা

৭৫ ভাগ ছিল উদ্বাস্ত। বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ৪৭২। এর মধ্যে তপশীলী ছাত্রী সংখ্যা ৬। ১২৬১ সনে বিদ্যালয়টি হাইস্কুলে এবং ১২৬৭ সনে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি ও সাফল্যের পেছনে ছিল প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা স্বর্গীয়া অনিমা দেবী অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও উদ্যম। এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে একই কর্তৃপক্ষীনে সংযুক্ত আছে একটি বুনিয়াদী বিভাগ। এই বুনিয়াদী বিদ্যালয়টির ছাত্রীসংখ্যা বর্তমানে ২৪৭।

১২৫০ সালে ফয়জুল্লাহ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং পরের বছর অহুমোদন লাভ করে। এর ছাত্রী সংখ্যা ১৩২।

কেবলমাত্র এই শহরের বৃক্কেই নতুন নতুন বিদ্যালয় গড়ে উঠছে তা নয়। শহরের ধারে কাছেও গড়ে উঠতে লাগল আরও অনেক বিদ্যালয়। পূর্ববঙ্গ থেকে কত উদ্বাস্ত এসে ঘর বাধলেন শহর থেকে দূরে—গড়ে উঠলো কত উদ্বাস্ত কলোনী। তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার তাগিদে গড়ে উঠলো কয়েকটি বিদ্যালয়—মোহিতনগর, দেবনগর, তোড়লপাড়া আরও কত আর. আর. বিদ্যালয়। এ প্রসঙ্গে মোহিতনগর বিদ্যালয়ের জন্মের ইতিহাসটুকু উল্লেখ না করে পারছি না।

১২৫০ সনে তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রী কে, এন কাটজু এসেছিলেন জলপাইগুড়ি পরিদর্শনে। পথের মাঝে মোহিতনগর কলোনীবাসীরা রাজ্যপালের গাড়ী থামিয়ে ঘিরে দাঁড়ালেন তাঁকে—জানালেন কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী। ৭টি বিদ্যালয়ের দাবী মঞ্জুর হ'লো—তার মধ্যে মোহিতনগর বিদ্যালয় একটি। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বাস মহাশয় ১৬ বিঘা জমি দান করলেন এবং তাঁর স্বর্গীয় পিতার নাম অহুসারে ১২৫৩ সালে নামকরণ করলেন “মোহিতনগর কলোনী তারা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়।” ১২৫৬ সাল থেকে ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদেরও এখানে লেখাপড়া করার সুযোগ হ'লো। প্রথমে বেতন প্রথা চালু থাকলেও পরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং এখনও তাই চলেছে। ১২৬৭ সালে এটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ১৩০।

দেশবন্ধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১২৫৬ সালে স্থাপিত হয়। এখানে সহশিক্ষা প্রচলিত। এখানকার ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ২০২। ১২৫৪ সালের ১লা মে থেকে পৃথকভাবে সকালে জুনিয়র হাই বালিকা বিদ্যালয়টির কাজ শুরু হয়। বর্তমানে এর ছাত্রী সংখ্যা ৪২২। এই বিদ্যালয়ে ৬স্বরেজ নাথ চক্রবর্তী ও শ্রীহরেজ মোহন শাস্ত্রীর অবদান কম নয়।

১২৬১ সালে দেবনগর কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয়টির কাজ আরম্ভ হয় দেবনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির ভবনে। পূর্বে সতীশ লাহিড়ী বিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষা প্রচলিত ছিল—এখনও আছে। ১২৫২।৬০ সালে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে বোর্ড ও বিদ্যালয় পরিদর্শিকার নির্দেশ অহুসারে পৃথকভাবে একটি জুনিয়র হাই গার্লস স্কুল স্থাপিত হ'লো। এটি বর্তমানে কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয়। এর ছাত্রী সংখ্যা এখন ২৩৫।

সতীশ লাহিড়ী মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১২৪৮ সনে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এর ছাত্রী সংখ্যা ৮৩। ১২৫৩ সনে স্থাপিত সতীশ লাহিড়ী বুনিয়াদী বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ৮৩। উপরোক্ত সতীশ লাহিড়ী বিদ্যালয়টি, কুমুদিনী বালিকা—মিউনিসিপ্যাল স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা দরদী, দানবীর, ত্যাগবীর ৬সতীশ লাহিড়ীর অর্থদানে স্থাপিত হয়েছে।

১৯৬০ সালে আরও একটি বিদ্যালয় কলোনীবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করে দেয়—এটির নাম অরবিন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা—৭৪।

এইভাবে শহরের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার দাবীতে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন আরও অনেক বিদ্যালয়—সাবেরিয়া, যোগমায়া, জুনিয়র বেসিক স্কুল, সদাগরপাট স্কুল ইত্যাদি। জলপাইগুড়িতে হিন্দী ভাষাভাষীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয় মাড়োয়ারী বিদ্যালয়। অবশ্য শহরের অন্যান্য বিদ্যালয়েও অনেক মাড়োয়ারী মেয়েরা পড়ে।

দুঃস্থ ও নিঃস্ব, পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে “শিক্ষা কল্যাণ সংস্থা।” ১৯৫৭ সালে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। এখানে আশ্রয় লাভ করে কিছু কিছু দুঃস্থ অনাথ শিশু শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এখানে ৩২ থেকে ৪০ জন ছাত্রী বাস করে। বর্তমানে এই অর্থনৈতিক দুর্দিনে দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা যে কত প্রয়োজন তা সকলেই স্বীকার করবেন। এ বিষয়ে সচেতন হলে দেশের অনাথ, দুঃস্থরা শুধু যে বঞ্চিত হবে তাই নয়—এদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বলে দিতে না পারলে সামাজিক পরিবেশ হয়ে উঠবে অস্বাস্থ্যকর, অসহনীয়। তাই এই শিশু কল্যাণ সংস্থার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে হলো। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য—আরও গড়ে তোলা দরকার।

আজকাল মেয়ে পুরুষ উভয়কেই জীবিকার সন্ধানে বের হতে হচ্ছে। যে সব মেয়েরা বিদ্যালয়শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদেরও আজ সংসারের চাহিদা মেটাবার জন্য এগিয়ে আসতে হচ্ছে। শহরের পলিটেকনিক বিদ্যালয় মেয়েদের লেডি ব্রোওর্গ ডিপ্লোমা ও নানা রকম হাতের কাজ শেখবার সুযোগ করে দিয়ে তাদের কর্মের পথ কিছুটা প্রশস্ত করে দিয়েছে। উষার সেলাই স্কুলও এ বিষয়ে সাহায্য করেছে। মেয়েরা আজ বিভিন্ন হস্ত-শিল্পের কাজে যোগ দিয়েছে—এ বিষয়ে তাঁতশিল্প, ছাপার কাজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ সাল থেকে জলপাইগুড়ি “সমাজ কল্যাণ পর্ষৎ” গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বালোয়ারী সমাজ কল্যাণ মাতৃমন্ডল—শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজ করছে। গ্রামাঞ্চলে বহু কষ্ট স্বীকার করে গ্রাম সেবিকারা নানাভাবে ছোট ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত লেখিকাও এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তখন ৫টি সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র গঠন করা হয়েছিল—খালপাড়া, বেলাকোবা, পানিকোড়ি, মগরাডাঙ্গা ও মালিভিটা। ১৯৬০ সালে কেন্দ্রের সংখ্যা ৫ থেকে ১০-এ পরিণত হয়। এই সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রগুলি এখন রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত। ১৯৬০ সাল থেকে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্থার সভাপতি হিসেবে ও স্থানীয় আর্টজন মহিলা কর্মী সভা হিসেবে কাজ করছেন। এইসব কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার জন্য যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সেই শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায়ের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। এই সংস্থার বালোয়ারী বিভাগে গ্রাম সেবিকারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ করবার আগে ৫৬ বছরের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ছেলেমেয়েদের কেন্দ্রে আসবার প্রেরণা বাড়ানোর জন্য সামান্য খাবারের ব্যবস্থা থাকে। গ্রামের দুঃস্থ শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করবার এ এক সহজ উপায়। পড়ার আকর্ষণে না এলেও খাবারের আকর্ষণে ছোটদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়—সেই সুযোগে তাদের কিছু শেখান হয়। এই সংস্থার মাতৃমন্ডল বিভাগ গ্রামের অঙ্গ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলাদের মধ্যে গিয়ে নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের পরিচিত করান—প্রয়োজনে তাদের সেবাও করেন। এইভাবে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে তাঁরা আনতে চেষ্টা করছেন নব চেতনা। “সমাজ-শিক্ষা বিভাগে” গ্রাম সেবিকারা নানা উপায়ে—কখনও ম্যাজিক ল্যান্টার্ন, কখনও

চার্ট, নাচ-গান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সমাজ-শিক্ষা দেন। আক্ষরিক জ্ঞান না দিয়েও যে মানুষের জ্ঞানকে সর্বক্ষেত্রে বিস্তার করা যায় এটিই সমাজ-শিক্ষার গোড়ার কথা। অবশ্য এই সঙ্গে তাদের আক্ষরিক জ্ঞান, নাম সই ইত্যাদি শেখাবার চেষ্টাও করা হয়। এই সমাজ কল্যাণ সংস্থাগুলির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। সরকার যদি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আরও গড়ে তুলতে পারেন তবে গ্রামাঞ্চলেও নতুন প্রাণের জোয়ার দেখা দেবে সন্দেহ নেই।

স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে অনেকদিন আগে ধাত্রীবিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। তখন মেয়েরা এ বিষয়ে খুবই অনভিজ্ঞ ছিল—কাজেই এঁদের চেষ্টাও প্রশংসনীয়। স্থানীয় হাসপাতালে মেয়েরা নার্সিংএ ট্রেনিং নিচ্ছে এবং সেবা কার্যে যোগ দিচ্ছে। পূর্বে এই কাজে মেয়েদের পাওয়া হুজুর ছিল। এখন ক্রমেই এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে—এটা কম আনন্দের কথা নয়। হাসপাতালের সঙ্গেই যে ফার্মেসী ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে—সেখানেও স্বল্প সংখ্যক হ'লেও মেয়েরা ট্রেনিং নিয়ে থাকে।

এই শহরে শিশুদের জন্য দুটি হৃদয় বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৪১ সনের ৬ই জানুয়ারী স্থাপিত হয় শিশুনিকেতন—শ্রীঅরুণা দাশগুপ্তার ঐকান্তিক চেষ্টায়। তিনি তাঁর বাড়ীর একটি ঘরে প্রথমে এ কাজ শুরু করেন, তিন চার বছরের মধ্যে এর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৩। তখন তাঁর বিদ্যালয়ের সামনে উঠলো খড়ের ঘর। শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তার সহকর্মীগণও তাঁকে এ কাজে সাহায্য করলেন—ঘরের দরজা, জানালা ও বেড়া রং করে—তখন কর্মীরা নিজেদের হাতে খেলনা-পুতুল তৈরী করে শিশুদের পুরস্কার দিতেন। ১৯৫০ সালে চা-বাগান ও সরকারের সাহায্যে সাড়ে তিন বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠলো বর্তমান নিকেতনটি। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ থেকে বিদ্যালয়টি সরকারী সাহায্য লাভ করেছে। বর্তমানে নিকেতনে চারটি বিভাগ আছে। দুটি নার্সারী, একটি কিণ্ডার গার্টেন ও একটি জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়। শিশুদের জন্য একটি পার্ক ও একটি ক্লিনিক আছে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৪০০ এবং শিক্ষিকার সংখ্যা ২০। শিশুর হৃদয় বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে গল্প, ছবি ও ছড়ার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে তৈরী পুষ্টিকর টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিয়মিত শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকেন। তিন বছর বয়স থেকে শিশুদের ভর্তি করা হয়।

১৯৪৪ সালের ৩রা জানুয়ারী সহরবাসী কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির আগ্রহে ও উদ্যোগে স্থাপিত হ'লো শিশুমহল। একজন শিক্ষক ও একজন মাতৃকার তত্ত্বাবধানে মাত্র ৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রথমে এর কাজ শুরু হয় জলপাইগুড়ি Cultural Instituteএ। পরে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী ও শ্রীসুধীর তলাপাত্র মহাশয়ের সহায়তায় ২৭শে জানুয়ারী Jalpaiguri Instituteএর সংলগ্ন আম-বাগানে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হ'লো। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চার মাস পরে শ্রীনরেশ চক্রবর্তী ও শ্রীঅশোক নিয়োগীর সহায়তায় একটি অস্থায়ী কমিটি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই কমিটির সর্বপ্রথম সভাপতি স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ মহলানবীশ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি নানা বাধার সন্মুখীন হয়। যুগান্তরের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য ক্ষিতি মোহন সেন, আচার্য্য নন্দলাল বসু ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বিদ্যালয়টিকে নানাভাবে সাহায্য করেন। বিদ্যালয়ের 'মনোগ্রামটি' এঁকে দেন স্বয়ং নন্দলাল বসু। এই বিদ্যালয়টিতে স্বর্গীয় তারিণী প্রসাদ রায়, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, শ্রীমতেন্দ্র প্রসাদ রায়, শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, স্বর্গীয় রামদীন দাগার অবদান উল্লেখযোগ্য। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভবন, তারিণী ভবন, যোগেশ ভবন ও একটি কর্মী নিবাস নির্মিত হয়েছে। তিস্তা ও করলা নদীর

বন্ধা প্রতি বছরই বিদ্যালয়টির প্রভূত ক্ষতি করছে। তবু এর মধ্যে শ্রীকানাই চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীরা বিদ্যালয়টির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্ত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন তা প্রশংসনীয়। এই বিদ্যালয়টিতেও আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি আনন্দমার্গের একটি কিংডারগার্টেন স্কুল এখানে স্থাপিত হ'য়েছে। ইংরেজী ও হিন্দী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

উচ্চশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে “প্রসন্নদেব বালিকা মহাবিদ্যালয়” স্বর্গীয়া রাণী অশ্রমতীর দানে স্থাপিত হয়। এই মহাবিদ্যালয়টি আজ উত্তরবঙ্গের একটি বিশিষ্ট মহাবিদ্যালয়ের দাবী রাখে। পর পর চার বছর এই কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে ৪ জন এবং বাংলায় একজন সাম্মানিক পরীক্ষায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করে। কলেজটি সুপরিচালিত। এর বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা ৫৫০।

১৯৪২ সালে ‘আনন্দ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়’টি স্থাপিত হয়। এখানেও মেয়েরা পড়বার সুযোগ পাচ্ছে। ১৯৫১ সালে এখানকার এক কুতূহী ছাত্রী শ্রীমতী প্রতিমা বিশ্বাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাম্মানিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৫৮ সালে এখানে বাণিজ্য-বিভাগ খোলা হয় রাত্রিতে, বহুদূর থেকে মেয়েরা এখানে এসে বি. কম. পড়ছে। এর একটা বড় সুবিধে হ'লো যারা সাংসারিক প্রয়োজনে অর্থোপার্জনে বাধ্য হ'য়েছে তারাও শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়তে পারছে। ১৯৬১ সালের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২, বর্তমানে ৭৪। এই কলেজের দিবাভাগে ছাত্রীসংখ্যা বর্তমানে ২০৬—১৯৪২ সালে ছিল ১৮।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হ'লো শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা গিয়ে শিক্ষকদের পক্ষে ট্রেনিং নেওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। তাই ১৯৫৮ সালে এখানে “আনন্দ চন্দ্র শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হ'লো। এটি শুধু আজ শহরের নয়, ডুয়ার্সের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও যথেষ্ট সংখ্যায় ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ ক'রে দিয়েছে। এই শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও উপরোক্ত আনন্দ চন্দ্র মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে রাহত পরিবারের অবদান অনেকখানি।

শহরের আর একটি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র—বেসিক ট্রেনিং স্কুলটি ১৯১৪ সালে এই শহরে প্রথম গুরু ট্রেনিং স্কুলরূপে স্থাপিত হয়েছিল। শোনা যায় ১৬ জনের উপযোগী এই বিদ্যালয়টি প্রথম স্থাপিত হয় আলিপুরদুয়ারের ৬ মাইল দূরে অবস্থিত ভাটিবাড়ী গ্রামে। পরে ১৯১০ সনে এটি আলিপুরদুয়ারে স্থানান্তরিত হয়। ঠিক এই ধরনের আরও একটি গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয় ছিল পঁচাগড়ে। এটি এখন পাকিস্থানের অধীনে। পরে ১৯১৪ সনের ১লা জানুয়ারী এই দুটি গুরু ট্রেনিং স্কুল একত্র হ'য়ে এক নতুন ধরনের শিক্ষক শিক্ষণ-কেন্দ্রে পরিণত হয়। তখন ৪০ জনের ট্রেনিং দেবার উপযোগী এই বিদ্যালয়টি জলপাইগুড়ি শহরে উঠে আসে। শোনা যায় যে জমিটির ওপর স্কুলটি অবস্থিত সেটি দান করেছেন শিক্ষাবিভাগকে স্বর্গীয় মহম্মদ সোনাউল্লা। ১৯৪২ সনে প্রথম এখানে ২টি মেয়েকে পড়বার অনুমতি দেওয়া হয়। এটিই পরে ১৯৫০।৫১ সনে বেসিক ট্রেনিং কলেজ এবং ১৯৫৬ সনে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৯৫০।৫১ সনে কলেজের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৫—বর্তমানে ১৬। ১৯৫০—৬০ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষণ কেন্দ্রটি উত্তর বঙ্গের একমাত্র বেসিক ট্রেনিং কেন্দ্র ছিল। পরে আরও কয়েকটি বেসিক ট্রেনিং কেন্দ্র গ'ড়ে ওঠে। তার মধ্যে বেলাকোবা বেসিক ট্রেনিং স্কুলটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ সালে এটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এখানে ৭৮ জন মেয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে। এখানে একজন মহিলা শিক্ষয়িত্রী আছেন।

এই জেলার কয়েকটি টোলে এখনও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মেয়েরা এখানে পড়ছে। টোলগুলির নাম যথাক্রমে—ময়নাগুড়ি আনন্দনগর টোল (বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা—৩); জলেশ দেবেন্দ্রনাথ টোল (বর্তমানে এটি উঠে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে), দোমহনৌ টোল (বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা—১) জলপাইগুড়ি সারস্বত চতুষ্পাঠী (বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা—৪), সোনাপুর হৃদয়নাথ চতুষ্পাঠী (ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ৩) ও দ্বারিকানাথ চতুষ্পাঠী (বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা—১২)।

শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করেছি; এখন শহরের বাইরে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও ডুয়াস; অঞ্চলের বিদ্যালয় সম্পর্কে যে সব সংক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি সে সম্পর্কে আলোচনা করলে শিক্ষার দিক থেকে মেয়েরা কতটা এগিয়ে যেতে চাইছে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবে।

বেলাকোবা উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সনে। ১৯৪৪ সনে এটি অনুমোদন লাভ করে। ১৯৫৭ থেকে এখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়—তখন ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৫—বর্তমানে ৯৩। বিদ্যালয়টি ১৯৬০ সনে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হ'য়েছে। যাদের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে বিদ্যালয়টি গ'ড়ে ওঠে তাঁরা হ'লেন—শ্রীওমর আলি আমেদ, স্বর্গীয় প্রসন্নদেব রায়কত, স্বর্গীয় খান বাহাদুর অলিয়র রহমান, শ্রীসামসুদ্দীন আহমেদ ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

১৮৬১ সালে শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায় এবং শ্রী এম, এন, রায়ের প্রচেষ্টায় বেলাকোবাত্রে একটি সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অবশ্য ১৯৫৩ সন থেকে এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ শুরু হয় বেলাকোবা উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে। প্রারম্ভে এর ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬৬, বর্তমানে ১৫১।

রাজগঞ্জ “মহেন্দ্র নাথ উচ্চ বিদ্যালয়টি” স্থাপিত হয় ১৯৫১ সনের ১২ই ডিসেম্বর। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীমণিভূষণ রায়। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন আরও অনেকে। জমি দিয়ে উপকৃত করেছেন শ্রীমণীষ চন্দ্র শর্মা। এখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। প্রথমে এখানে ১৫০ জনের মধ্যে ছাত্রী ছিল ৩২ জন—তার মধ্যে তপশীলী ছাত্রী ৫ জন। ১৯৫৭ সনে এখানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ১৪৭। বিদ্যালয়টি ঘাটতির ভিত্তিতে (deficit grant) সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। এখানে খেলাধুলার ব্যবস্থাও ভালো।

সন্ন্যাসীকাটা জুনিয়র হাই স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৯৫৮ সনে—অনুমোদন লাভ করে ১৯৬০ সনে। ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ১৩।

নিউ জলপাইগুড়ি জুনিয়র হাই স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৯৬৫তে এবং অনুমোদন পায় ১৯৬৭তে। ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ২২।

রাণীনগরেও জুনিয়র হাই ও যশোধারা জুনিয়র হাই স্কুলে সহশিক্ষা ব্যবস্থা আছে বলে শুনেছি।

এখানকার রায়পুর চা-বাগানে একটি জুনিয়র স্কুল আছে। স্কুল সংলগ্ন শিক্ষা নিবাসও আছে। এছাড়া খরিজা, বেকবাড়ী, ঘুঘুডাঙ্গা ও মণ্ডলঘাট প্রভৃতি জায়গায়ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে। সেখানে মেয়েরা পড়ছে। গড়ালবাড়িতেও একটি জুনিয়র হাই বিদ্যালয় আছে।

জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স অঞ্চলেও আজ বহু বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এই ডুয়ার্স অঞ্চল এক সময় ছিল বন জঙ্গলে পূর্ণ দুর্গম অঞ্চল। রাস্তা ঘাটের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না—যাতায়াত করতে হ'তো পায়ে হেঁটে অথবা গরুর গাড়ীতে। তিস্তার পুল নির্মাণের আগে লোকেরা যাতায়াত করত নদীপথে। বর্ষাকালে তাই বলতে গেলে ঐ সব অঞ্চল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ত। এর ওপরে ছিল বহু হিংস্র জন্তুর উপদ্রব—এই বিপদ-সঙ্কুল অঞ্চলে বীর যোদ্ধার ন্যায় চা-শিল্পীরা আসেন এবং নানা কষ্ট স্বীকার ক'রে, পরিশ্রম ক'রে গড়ে তোলেন চা-বাগান। ইউরোপীয়ান সাহেবরাও আসেন চা-ব্যবসার জন্ত—সুদূর ডুয়ার্সে। তাঁদের চেষ্টাও কম ছিলনা এসব চা-বাগান গড়ে তোলার কাজে। এইসব অঞ্চল শুধু যে চা-ব্যবসার কেন্দ্র তাই নয়, এখানে তামাক, কাঠও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

- কাজেই এসব অঞ্চলে দ্রুত লোক সমাগম হ'তে লাগল—ফলে গড়ে উঠলো বসতি—তাদের চেষ্টায় রাস্তাঘাটের উন্নতি হ'লো—ডুয়ার্স অঞ্চল আর আগের মত দুর্গম রইল না। পাকা রাস্তার দুপাশে সবুজ বৃক্ষশ্রেণী ডুয়ার্সের পথকে আজ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রাস্তার পাশে পাশেই চা-বাগিচা, পাহাড় এর সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ম্যালেরিয়া জর্জরিত এই অঞ্চল এখন ম্যালেরিয়া মুক্ত হ'য়েছে। যে ডুয়ার্স অঞ্চলকে এক সময় “যমের দুয়ারী” বলা হতো তা এখন স্বাস্থ্য সম্পদে সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। আগে এ অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলনা বললেই চলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ছিল সেখানে শিক্ষক পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য।

ধীরে ধীরে প্রত্যেক চা-বাগানে গ'ড়ে উঠতে লাগল শ্রমিকদের ও অগ্রাণু কর্মীদের ছেলেমেয়েদের জন্ত বিদ্যালয়। এইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চা-বাগানের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আক্ষরিক জ্ঞান লাভ করেছে। শিক্ষার গুণে তাদের আয়ুর্ভেদনা বৃদ্ধি পেয়েছে—সজীববদ্ধতা এসেছে।

এ সব অঞ্চলে শুধু আজ প্রাইমারী বিদ্যালয়ই নয়, উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও অনেক গড়ে উঠেছে। সেখানে তপশীলী, উপজাতি ছেলেমেয়েরাও শিক্ষার জন্ত যথেষ্ট বেশী সংখ্যায় এগিয়ে আসছে। এটা নিঃসন্দেহে শুভলক্ষণ। যারা মূঢ় মান ছিল তারা আজ ভাবার কল্যাণে জেগে উঠেছে। এদের সংখ্যা অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় কম তবে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে এসেছে প্রাণের জোয়ার—নিজেদের গ'ড়ে তোলবার ঐকান্তিক প্রয়াস। তাই একথা নিশ্চয়ই বলতে পারি—তমসাস্কন্ন নিরক্ষর মূঢ় ডুয়ার্স অঞ্চলের জাগরণ জাতীয় উন্নতির একটি সোপান। এই অঞ্চলের বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের দেখে মনে হয় এরা জ্ঞানের আনন্দ পেয়ে মানুষ হতে আগ্রহী—নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও ছাত্রী সংখ্যা এ কথাই প্রমাণ করে।

১৯১০ সালে ময়নাগুড়িতে একটি ছোট প্রাইমারী বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। ময়নাগুড়ির জোতদারদের আর্থিক সাহায্যে ও তৎকালীন ডেপুটি কালেক্টর স্বর্গীয় রাধিকা মোহন নন্দী এবং ময়নাগুড়ি থানামহলের তহশীলদার কৈলাস মণ্ডল মহাশয়ের উদ্যোগে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় মাত্র কয়েকটি মেয়ে নিয়ে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হ'য়েছিল। ১৯৩৭ সালে জেলা বিদ্যালয় পরিষদ বিদ্যালয়টির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। ১৯৪৮এ একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ সময় প্রাতে ছেলেদের বিদ্যালয় ভবনে স্কুলের কাজ চালান হতো। তৎকালীন জেলা সমাহর্তা শ্রীহিরণ্য বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রাক্তন দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহটি বিনামূল্যে এবং উক্ত চিকিৎসালয়ের সংলগ্ন ১:৫২ একর জমি পাওয়া যায়। স্বর্গীয় চিমনীরাম মাহেশ্রী ও শ্রীবংশীদর মাহেশ্রী অর্থ সংগ্রহে সাহায্য করেন। বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠী, স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী,

শ্রীরাখাল বন্দোপাধ্যায় এবং শ্রীসরোজকুমার লাহিড়ীর অবদান স্মরণীয়। ১২৪২ সনে পুনর্বাসন দপ্তর থেকে ষোল হাজার টাকা সাহায্য পেয়ে ১২৫০ সনে বর্তমান নিজস্ব ভবনটির ভিত্তি স্থাপন করেই পরের বছর ১৫ই আগষ্ট গৃহপ্রবেশ হয়। ১২৫৫ সনে বিদ্যালয়টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অহুমোদন লাভ করে। তখন ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫০। ১২৫৭ সনে কলাবিভাগ নিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হ'লো। ১২৬৭ সনে বিজ্ঞান শাখা খোলা হলো ৩০। ৪০ জন ছাত্রী নিয়ে। প্রাথমিক বিভাগসহ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ৮০০। ১২৫২ সন থেকেই বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি অস্থায়ী ছাত্রীনিবাস ছিল। তারপর ১২৫৬ সনে শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায় মহাশয়ের ব্যক্তিগত সাহায্য ও চেষ্টায় ৫০ জনের উপযোগী স্থায়ী ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হ'লো।

ময়নাগুড়িতে এছাড়া আরও কয়েকটি জুনিয়র হাই ও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে—যেমন ময়নাগুড়ি হাসপাতাল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, দোমহনী রেলওয়ে বালিকা বিদ্যালয় ও উদাস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই সব বিদ্যালয়ে শতকরা ৫০।৫৫ জন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। ময়নাগুড়ি হাসপাতাল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিও সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে। চারটি হাই স্কুল ও ১৪টি জুনিয়র হাইস্কুলে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। খুবই আশা ও আনন্দের বিষয় এই যে ময়নাগুড়িতে তিনটি নৈশ বিদ্যালয় আছে ও সেখানেও মেহেরা পড়ে। ১২৫৫ সনে সুভাষ নগরে একটি “স্পেশাল প্রাইমারী বিদ্যালয়” ছিল এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৭। এটিই পরে জুনিয়র হাই স্কুলে পরিণত হয়। এর বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ২৫। ১২৬২ সনে এখানে একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল স্থাপিত হয়। তখন ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১০—বর্তমানে ১৩৬।

দোমহনী “পলহোয়েল” বিদ্যালয়টি অহুমোদন লাভ করে ১২২৮ সালে। ১২৩০ সাল থেকে এখানে সহশিক্ষা প্রচলিত। কিন্তু ১২৩২ সালে এটি অহুমোদন হারায় এবং ১২৩৩এ আবার স্বীকৃতি পায়—তখন থেকেই এটি রেলওয়ে স্কুল হিসাবে পরিচালিত হ'য়ে চলেছে। ১২৪৭এ এর ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৬।

জল্লেশ উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় প্রাইমারী বিদ্যালয় রূপে। ১২৫১ সালে জুনিয়র হাই, ১২৫৭ সালে হাই এবং ১২৬৭ সালে হায়ার সেকেন্ডারী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। সেখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। ১২৫১ সনে ছাত্রী সংখ্যা ৫, ১২৫৭তে ১৫ এবং ১২৬৭তে ৪০ জন ছিল। এখানে তপশীলী ছাত্রী শতকরা ৮০।

জল্লেশ মেহেরচাঁদ জুনিয়র হাইস্কুলটি স্থাপিত হয় ১২৫২ সনে। বর্তমানে এর ১০০ জনের মধ্যে ২০ জন ছাত্রী।

জোর পাকড়িতে ‘আব্দুল গণি হাই স্কুল’টি ১২৪৬ সনের পূর্বে M. E. স্কুল ছিল। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার মূলে যাদের অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় গুরুচরণ দেব, আব্দুল গণি আহমেদ ও মহম্মদনাথ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানেও ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। ছাত্রী সংখ্যা মোট ১১০, তার মধ্যে তপশীলী ৪২। প্রাথমিক বিভাগে বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ৫৭—এর মধ্যে তপশীলী ১২।

“হেলাপাকড়ি পদমতী ইউনিয়ন রহিমুদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়” স্থাপিত হয় ১২৪৮ সনে। প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সহশিক্ষা প্রচলিত—ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ১৮। হেলাপাকড়িতে ১২৬৬তে আর একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর নাম “ভোটপট্টী হুমান বক্স লোহিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।” শ্রীমোক্ষনাথ সেন প্রধান উদ্যোক্তাগণের মধ্যে একজন। এখানেও নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীরা পড়ে। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ১০।

১৯৬০ সালে ওদলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়টি অনুমোদন লাভ করে—১৯৬১তে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি পায়। এখানেও সহশিক্ষা—বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ১৫৩।

লাটাগুড়িতে ১৯৪৭ সালে “লাটাগুড়ি বিদ্যালয়”টি স্থাপিত হয়—১৯৫২ সালে অনুমোদন লাভ করে ও ১৯৬৫তে উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত হয়। বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ১৫১ এবং প্রাইমারী বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা ১০৫। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ।

মালবাজারে মাল হুভাষিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯৫৯ সালের ১লা এপ্রিল উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। সেই বছরই এর সঙ্গে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট হয়—ছাত্রী সংখ্যা ১৬৩। বিদ্যালয়টিতে একটি ভাল ছাত্রী নিবাস আছে। কয়েকজন শিক্ষিকাও সেখানে আছেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ডাঃ নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্র ঘোষ মহাশয় অন্যতম। বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ৫১১।

ডামডিমে ১৯৪৮ সালে “গজেন্দ্র বিদ্যামন্দির” স্থাপিত হয়। এর বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ৫৩৩। সংশ্লিষ্ট প্রাইমারী বিভাগের ছাত্রীসংখ্যা ৭৫। এ ছাড়া বাগরাকোটে একটি উচ্চ (দশম শ্রেণী) বিদ্যালয় আছে।

মেটেলী-প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৩৫। এখানেও সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। ১৯৬৪ সনে মেটেলী সিনিয়র বেসিক বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ৮০ জন ছাত্রী (উপজাতি-৪) ও ৫ জন শিক্ষিকা নিয়ে বিদ্যালয়টি চলছে।

মেটেলীতে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯২০ সালে প্রাইমারী স্কুল হিসেবে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে জুনিয়র হাই, ১৯৫৭তে উচ্চ এবং ১৯৬১ সনে উচ্চতর মাধ্যমিকে রূপান্তরিত হয়। এখানে সহশিক্ষা প্রচলিত। বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ৪৫ (উপজাতি-৩০) শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ২২। যাঁরা স্কুলকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের নাম ইন্সট্রাড গোয়েস্কা, ৬মুরলীধর আগরওয়ালা, শ্রীঅমূল্য গোপাল সেনগুপ্ত, ৬বীরেন্দ্র খাসনবীশ, শ্রীবিমল তালুকদার, ৬প্রিয়লাল দাস।

চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ ১৯৬১ সনে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ৯৫। এখানে একটি জুনিয়র হাই স্কুলও আছে। স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার চেষ্টা চলছে।

নাগরাকাটা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিছু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায়—১৯৫৮ সালে। ১৯৬৪ সালে দশম শ্রেণীতে এবং ১৯৬৬তে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। প্রথম বছরে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৯ তার মধ্যে ছাত্রী ছিল ৯ জন, আর বর্তমানে কেবল ছাত্রী সংখ্যাই ৭৫। এর মধ্যে উপজাতি ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ২০। দূরবর্তী স্থানের মেয়েদের যাতায়াতের জগা স্কুল বাসের বন্দোবস্ত আছে।

চ্যাংমারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সনে। এখানে ভাষা মাধ্যম হিন্দী। প্রারম্ভে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৮, বর্তমানে ১০৮। এখানে ছাত্রী নিবাসও আছে।

১৯৬৬ সনে স্থাপিত লুকসান বাজার লাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্মারক জুনিয়র হাই বিদ্যালয়টিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। এখানে বাংলা এবং হিন্দী উভয় ভাষার মাধ্যমেই পড়াবার ব্যবস্থা আছে। ১৯৬৭তে বিদ্যালয়টি অনুমোদন লাভ করে। বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ২৪।

কলাবাড়ী চা-বাগানে একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে। এর বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা-২৭। ১৯৬০ সালে এটি স্থাপিত হয় এবং অনুমোদন লাভ করে।

১৯৪৫ সালে ধূপগুড়ি বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। নবম শ্রেণী থেকে এখানে সহশিক্ষা প্রচলিত। প্রথমে বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬০—বর্তমানে ১৮০।

ধূপগুড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়। এখানে প্রথম বছর ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৫০—বর্তমানে ২৫০। এই বিদ্যালয়টি চলে এককালীন ভিত্তিতে সরকারী অনুদানে।

বৈরাতিগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ১৯৬৫ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে।

মল্লিকপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—১৯৫৬ সালে অনুমোদন লাভ করেছে। এখানে বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা-১৩।

ডাউকীমারী বিদ্যালয়টি ১৯৪৯ সনে দুটি শ্রেণী নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করে। বর্তমানে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদিত। এখানেও সহশিক্ষা-এর ছাত্রী সংখ্যা ৪৫।

১৯৫০ সালে স্থাপিত শালবাড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েরা একত্রে পড়ে। বর্তমানে এর ছাত্রী সংখ্যা-১২ এবং শ্রেণী সংখ্যা ৪—পঞ্চম থেকে অষ্টম।

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত নাথুয়া জুনিয়র স্কুলেও সহশিক্ষা প্রচলিত। এখানে মোট ৬৮ জন ছাত্রী পড়ে। পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত ৪টি শ্রেণী আছে। এখানে “রাজা মোহন জুনিয়র হাই স্কুলে”ও সহশিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। উপরোক্ত তিনটি বিদ্যালয়ই শিক্ষকগণের বেতনের পার্থক্য অনুসারে সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে।

গয়েরকাটা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৬৫ সনে জুনিয়র হাই থেকে হাই স্কুলে উন্নীত হয়। এখানেও সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত।

বানারহাট উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৪৯ সালে স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বানারহাট চা-বাগানের তৎকালীন ম্যানেজার ম্যাকিনটায়ার সাহেব। বানারহাট বিদ্যালয়টির উন্নতির মূলে বিশেষ অবদান রয়েছে ৩ইন্সপেক্টর গুহ ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ৮সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের। ১৯৫২ সালে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১ এবং গৌরবের বিষয় এই যে প্রথম ছাত্রী শ্রীমতী নিভা দত্ত বিদ্যালয়ের প্রথম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে সাফল্য লাভ করেছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা-১৮৪। এটি এখন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ১৯৬০ সালে শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায় একটি বেসিক বিদ্যালয়েরও ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এর বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা-১৭৪। এই বিদ্যালয়টিতে শ্রীযুক্ত রায়ের অবদান উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালে বীরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় এবং ১৯৫৭ সালে উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত হয়। এখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায় ও ডাঃ সত্যভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছে। প্রারম্ভে এর ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৫—বর্তমানে ১৭৫। এর মধ্যে তপশীলী ও উপজাতি ১৫ জন ছাত্রী আছে। দু'জন শিক্ষিকাও আছেন। গত বছর বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২—এ বছরও দুই। “১৯৬৪ সনে বিজ্ঞানে শ্রীমতী অসীমা কুণ্ডু ও ১৯৬৬তে সাহিত্যে শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। অধিকাংশ বালিকারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। ভাল ছাত্রী

পাওয়া এসব অঞ্চলে দুর্ভহ ব্যাপার। এখানে লাইব্রেরী ও ল্যাবোরেটরীর ভাল বন্দোবস্ত আছে। ১৯৬৪ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এতে প্রথম বছর ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩০—বর্তমানে ২২০। শিক্ষিকা আছেন মোট ৬ জন।

মাদারীহাট জুনিয়র বিদ্যালয়টি ১৯৬০ সালে ৪টি শ্রেণী নিয়ে কাজ শুরু করে। স্থানীয় ডাঃ চিন্ময় লাহিড়ী, শ্রীতিলক চন্দ্র শর্মা ও শ্রীদেবী প্রসাদ বাগচী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। এখানেও সহশিক্ষা ব্যবস্থা। প্রথম বছর ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫০—বর্তমানে ৭২। এর মধ্যে তপশীলী ছাত্রী আছে ২৬ জন এবং উপজাতি ৬ জন। ১৯৬৬ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত হ'য়েছে। এখানে ছাত্রীদের খেলাধুলা করার সুবন্দোবস্ত নেই।

মাদারীহাট থানার অন্তর্গত টোটোপাড়ায় Tribal welfare এর উদ্যোগে টোটোপাড়া প্রাইমারী বিদ্যালয়টি সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। এখানকার ছাত্র ছাত্রী সবাই উপজাতি।

গোপালপুর চা-বাগানে অনেক দিন থেকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। পরে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পাওয়াতে আরও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় চা-বাগানের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে। এই দুটি বিদ্যালয় পরে একত্রিত হ'য়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সনের ১৩ই জানুয়ারী উক্ত বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ৮হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। এখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা—বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা-৭৭। এই বিদ্যালয়টিতে শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের অবদান উল্লেখযোগ্য। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে কাতাই-এর কাজ, শিল্প শিক্ষা, অভিনয়, সংগীত ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া এখানে গার্লস গাইড আছে এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করা হয়।

ফালাকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েরা পড়ছে ১৯৫৭ সন থেকে। এ বিদ্যালয়টি প্রাইমারী বিদ্যালয়রূপে স্থাপিত হয় ১৮৮০ সনে এবং ১৮৯৩তে M. E. স্কুলে উন্নীত হয়। তখনকার তহশীলদার এবং স্থানীয় তহশীল অফিসের উদ্যোগে এটি স্থাপিত হয়। তখন এটি পরিচালিত হতো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও জোতদারদের সাহায্যে। এটি ১৯৪৯ সনে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং ১৯৫১ সনে অন্তিমোদন লাভ করে। ১৯২৮১২ সন থেকে স্থানীয় মেয়েরাও এই M. E. বিদ্যালয়ে পড়ত। যাদের আগ্রহে ও উৎসাহে এখানে শিক্ষা প্রসার লাভ করেছে তাঁরা হলেন—৮মণীন্দ্র চন্দ্র বসু, ডাঃ রমণী রঞ্জন রায়, শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু, ৮সতীশ চন্দ্র দেব, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীনবুলচন্দ্র দাস।

ফালাকাটা M. E. বালিকা বিদ্যালয়টি ফালাকাটা B. F. P. স্কুলে ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়। প্রথমে ছাত্রী ছিল মাত্র ৫ জন। ১৯৫৫ সালে এটি জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং ১৯৬৪ পর্যন্ত এই ভাবেই পরিচালিত হয়। ১৯৬৫ সালে এটি হাই স্কুলের অন্তিমোদন লাভ করে এবং ১৯৬৬ সাল থেকে ফালাকাটা গার্লস হাই স্কুল নামে পরিচিত হয়। ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ৪৫০—এর মধ্যে তপশীলী ছাত্রী ১০ ও উপজাতি-২। ফালাকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্বোক্ত উদ্যোক্তাগণই এবিদ্যালয়েরও উদ্যোক্তা।

ফালাকাটা-ডালিমপুরে একটি বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে গ্রামের মেয়েদের নানারকম হাতের কাজ—চরকা, তাঁতবোনা ইত্যাদি শেখাবার ব্যবস্থা আছে। গান্ধীজীর আদর্শ ও পরিকল্পনা এখানে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখানে দুজন মহিলা কর্মী আছেন।

কাদম্বিনী চা-বাগানে কোম্পানীর চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে একটি জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—চার বিঘা জমির ওপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বিদ্যালয়টি আজও ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের অধীনে আসার স্বীকৃতি পায়নি। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিবাস আছে — দুজন শিক্ষিকা সেখানে থাকেন। বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২০০।

১৯৫৩ সালে কালচিনি “ইউনিয়ন এ্যাকাডেমী” জুনিয়র হাই বিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫তে এটি উচ্চ এবং ১৯৫৮তে উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত হয়। ৩এস কে মজুমদার এবং শ্রীএইচ কে সাগুাল মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ১৮২ জন বালিকা এখানে লেখাপড়া করে। এর মধ্যে উপজাতি ছাত্রী-৫ এবং তপশীলী-১২। অধিকাংশ ছাত্রীই অষ্টম/নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। ১৯৬৮ সালে ১৫ জন ছাত্রী-বিজ্ঞানে এবং ৩৩ জন সাহিত্যে পরীক্ষা দেয়। ১৯৬৬ সনে শ্রীমতী মধুচ্ছন্দা রায় এবং শ্রীমতী রচিতা রায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল সংযুক্ত আছে। এখানে ৩টি শ্রেণী—ষষ্ঠ থেকে অষ্টম, এবং ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ১৮৫।

মধু চা বাগানেও একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে। ১৯৬২তে এটি স্থাপিত হয় এবং সেই বছরই অন্তিমোদন লাভ করে। বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা-১৭।

১৯৫০ সালে হাসিমারা উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রাইমারী বিদ্যালয়রূপে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৫৪ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৯৬৭ সালে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যালয়ে শতকরা ৪৭ ভাগ ছাত্রী পড়ে।

নিমতিঝোরা চা-বাগানে একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে। চা বাগানের মেয়েরা এখানে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে।

১৯১৮ সালে আলিপুরদুয়ারে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল—এই তথ্যটি জানা যায় শ্রীযতীন্দ্রলাল গাঙ্গুলি মহাশয়ের (৮৫ বৎসর বয়স্ক) কাছ থেকে।

১৯২০—২৫ সালের মধ্যে আলিপুরদুয়ার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। প্রথমে এটি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৫৪/৫৫ সালে এটি দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়রূপে অন্তিমোদন লাভ করে এবং ১৯৫৭ সালে ৪টি বিভাগ নিয়ে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে এখানে ফাইন আর্টস বিভাগে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। স্বদূর মফঃস্বলে এই বিভাগ খুলে মেয়েদের স্বপ্ন প্রতিভাকে ফুটিয়ে তোলার জগ্ন এই স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা—৩৫০। এর মধ্যে উপজাতি-৩ জন ছাত্রী ও তপশীলী-১২ জন ছাত্রী পড়ে। এখানে শিক্ষিকা সংখ্যা ১৮, তারমধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষিকা ২জন। বিদ্যালয়টি সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে ঘাটতির ভিত্তিতে। বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি ছাত্রী নিবাস ও একটি শিক্ষিকা নিবাস আছে। তবে ছাত্রী নিবাসে ছাত্রী সংখ্যা খুবই নগণ্য।

১৯৫০ সালে আলিপুরদুয়ার নিউটাউনে “নিউটাউন উচ্চ বিদ্যালয়টি” স্থাপিত হয়—১৯৫৬ সালে এটি স্বীকৃতি লাভ করে। দেশ বিভাগের পর বহু উদ্বাস্তু আসাতে আলিপুরদুয়ার শহরটি সম্প্রসারিত হয় এবং নিকটবর্তী কলোনীবাসীগণ মেয়েদের শিক্ষার জগ্ন চিন্তিত হ’য়ে পড়েন। সেই সময় শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। প্রথমে এখানে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৫০ এবং বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ২৫০। এর মধ্যে উপজাতি ছাত্রী ৩০ জন। উত্তর বঙ্গের আর কোন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এত জন উপজাতি

ছাত্রী নেই। আরও উল্লেখযোগ্য এই মেম্বেরা (উপজাতি) অধিকাংশ ছাত্রী নিবাসে থাকে। এই বিদ্যালয়টি পরে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। এখানে ২৬ জন শিক্ষিকা আছেন। বর্তমানে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞানের ছাত্রী সংখ্যা ১২। ১৯৬৮ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাতে এখান থেকে ৯৮ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। এই বিদ্যালয়টিও ঘাটতির ভিত্তিতে সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে। তবে সব সময় সাহায্য নিয়মিত না আসায় বিদ্যালয়টিকে আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে। এখানে কয়েকটি শিক্ষিকা নিবাসও আছে। বেশ কয়েকজন শিক্ষিকা এখানে থাকেন। বিদ্যালয় সংলগ্ন ২টি ছাত্রী নিবাসে ছাত্রী সংখ্যা ৪৮। এখানে উল্লেখযোগ্য - ছাত্রী নিবাসের জন্ম শ্রীযুক্তা হিরণবালা আইচ এক কালীন দশ হাজার টাকা দান করেন। আরও উল্লেখযোগ্য - এখানে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সকালে পৃথক ভাবে চলে। প্রতিটি বিভাগে ছাত্রী সংখ্যা ৪০০। বিদ্যালয়টির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে মোট ১৭৫০। ছাত্রী সংখ্যার দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে এটি বৃহত্তম বালিকা বিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। এত ছাত্রী সংখ্যা—তবু এই বিদ্যালয় প্রতি বছর বহু ছাত্রীকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে স্থানাভাবের জন্ম। উপরোক্ত বিদ্যালয়ে পৃথক ভাবে পৃথক ভবনে একটি আর, আর, বিদ্যালয় ১৯৬৪ সাল থেকে চলছে। এটির নাম “বালিকা শিক্ষা মন্দির।” বস্তু থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আছে—ছাত্রী সংখ্যা মোট ৫০০। শিক্ষিকা আছেন ১২ জন।

আলিপুরছার জংশনে একটি রেলওয়ে বিদ্যালয় অনেক দিন থেকেই ছিল। ১৯৫৭ সালে রেলওয়ে কলোনী সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ১৯৫৮ সালে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫০০—বর্তমানে ৫২৫। শিক্ষক শিক্ষিকা সংখ্যা মোট ১৫। শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্ম পৃথক নিবাস আছে।

শ্রীমাতা প্রসাদ গার্লস হাই স্কুল নামে আর একটি বিদ্যালয় এখানে আছে। ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাইস্কুলরূপে স্থাপিত হয়। ১৯৬৬তে এটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এর ছাত্রী সংখ্যা ৩৮৩। বিদ্যালয়ের কাজ চলে সকালে।

বীরপাড়া জয়ন্তী সমবায় বিদ্যালয় (আলিপুরছার) ১৯৬২ সালে জুনিয়র বিদ্যালয়রূপে স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমূল্যচন্দ্র রায়। এখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা। প্রথম বছর ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩২—বর্তমানে ১০৫। এর মধ্যে তপশীলী ছাত্রী আছে ৩১ জন। বিদ্যালয়টির নিজস্ব কোন ভবন নেই। সরকারী সাহায্যে বিদ্যালয়টি পায় না। এটি ১৯৬৭তে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে।

১৯৬৩ সালে মথুরা চা বাগানে ১টি সিনিয়র বেসিক স্কুল স্থাপিত হয়েছে এবং এই বছরই অনুমোদন লাভ করেছে। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ১৯।

কামাখ্যাগুড়ি জুনিয়র হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৮তে। পরের বছর এটি অনুমোদন লাভ করে। এই স্কুলের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অক্সেড সখীর ঘোষ, শ্রীদেবেন দাস, শ্রীগীতা মণ্ডল ও আরও অনেকে। প্রাইমারী বিদ্যালয়ে অতীতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮০—বর্তমানে ১২৫। জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রী সংখ্যা প্রথমে ছিল ১২। এখন ১৮৫। প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় দুপুরে নিজস্ব ভবনে এবং জুনিয়র বিদ্যালয়টি স্থানীয় ছাত্রদের বিদ্যালয়ে সকালে বসে।

কুমার গ্রামের বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৪৪ সালে। ১৯৫৩ সালে এটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ১২৮।

আলিপুরহাটের কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৫৭ সালে। এখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। রাষ্ট্রে বাণিজ্য বিভাগে মেয়েরা পড়বার সুযোগ পাচ্ছে। বাণিজ্য বিভাগের প্রথম ছাত্রী শ্রীমতী গোপা ঘোষ এ বছর ডিষ্ট্রিশন পেয়ে কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এখানকার ছাত্রীসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪০০। উল্লেখযোগ্য যে এই কলেজটির সঙ্গে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্ভবতঃ ১২৬৩ থেকে সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে—নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়ানো হয়। তবে মেয়েরা এখানে কেবল মাত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়বারই সুযোগ পায়। ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৩০।

জলপাইগুড়ি জেলায় খ্রীষ্টান মিশনারীদেরও নিঃসন্দেহে কিছু অবদান আছে।

নাগরাকাটায় 'সেন্ট ক্যাপিটেনিও' বিদ্যালয়টি প্রথম রোমান ক্যাথলিক মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ও দানে ১২৪৮ সনে স্থাপিত হয়। ১২৫৮ সনে ৪টি শ্রেণীসহ (পঞ্চম—অষ্টম) জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ১২৬৩তে বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ৩০২। বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রী নিবাসে ছাত্রী সংখ্যা ১৫০। এখানে ইংরাজী ও হিন্দী উভয়ই শিক্ষার ভাষা—মাধ্যম। তবে বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে—সেজন্য শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন। এখানে উপজাতি ছাত্রীই বেশী।

মিশনারীদের চেষ্টায় বীরপাড়াতে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছে। বিদ্যালয়টির নাম Nangdala মিশনারী হাইস্কুল। এখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শৃঙ্খলা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ফালাকাটায় আমেরিকান মিশনারীদের সাহায্যে রেমণ্ড মিশনারী ট্রেনিং স্কুলটি স্থাপিত হয়েছে ১২৪২ সালে। এ বিদ্যালয়টিতে যেভাবে ছেলেমেয়েদের হাতে কলমে কাজ শেখান হয় তা প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়টি আবাসিক। এখানে হায়ার সেকেন্ডারী বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা ৮৬।

আলিপুরহাটের থানার অন্তর্গত দমনপুরে ক্যাথলিক ডায়োসিস সোসাইটির প্রচেষ্টায় আর একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এটির নাম “নির্মলা কনভেন্ট।” ১২৫৮ সালে এটি স্থাপিত হয়—১২৬০ সালে এটি জুনিয়র হাই এবং ১২৬৫তে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। হিন্দী ভাষার মাধ্যমে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা ২২০। বিদ্যালয়ের ফলাফল সন্তোষজনক।

মহাকালগুড়ি মিশন স্কুলটি স্থাপিত হয়েছে ১২৪৬ সালে এবং ১২৪৮ সালে অনুমোদন লাভ করেছে। বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা ১৬৭।

সান্তালপুর মিশন স্কুলটি স্থাপিত হ'য়েছে ১২৬৪ সালে জুনিয়র হাইস্কুলে এবং পরের বছরই অনুমোদন লাভ করেছে।

অনুরূপ কয়েকটি মিশনারী বিদ্যালয় দেখতে পাওয়া যায় ডেঙ্গুয়া ঝাড় চা বাগানে, মালবাজারে (বার্টলজ) ও নাগরাকাটায় (সেন্টমেরীজ বোর্ডিং)। এই মিশনারী বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে মিশনারীরা যে শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করে চলেছেন তা খুবই কষ্টসাধ্য। তবুও তাঁরা এদের গড়ে তোলার জন্য যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন তা প্রশংসনীয়। তাঁরা যে কতখানি সাফলালাভ করেছেন—এই সব বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের দেখলেই তা উপলব্ধি করা যায়। ছাত্রীদের শান্ত, নম্র, সংযত ব্যবহারই প্রমাণ করে এরা শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষা কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতে মেয়েদের উৎসাহ বাড়ছে। অভিভাবকরাও মেয়েদের এই সব দিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছেন। এই শহরে স্বর রসিকদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র—‘সরোজেন্দ্র দেব সংগীতালয়,’ ‘গীতচ্ছন্দা,’ সঙ্গীতালয়, কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ শিক্ষা নিকেতন। সরোজেন্দ্র দেব সঙ্গীতালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৬০, গীতচ্ছন্দায় ৩৫ এবং সঙ্গীতালয়ে—২০। প্রতি বছরই ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গীতের চর্চাও বাড়ছে। সারাদিনের কাজের পর সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত শেখার আগ্রহও ক্রমশ বাড়ছে। এতে অবসর যাপনও হচ্ছে আবার প্রয়োজনে অর্থোপার্জনের পথও হচ্ছে প্রশস্ত—সঙ্গে সঙ্গে এদেশের •সংস্কৃতি ও কৃষ্টি হচ্ছে পুনরুজ্জীবিত।

১৯৪৭ সালে জেলায় প্রাইমারী (মেয়েদের) স্কুলের সংখ্যা ছিল একটি, হাই স্কুল (সদর বালিকা বিদ্যালয়) ১টি, মিডল স্কুল (কদমতলা, আলিপুরহাট) ২টি, জুনিয়র মাদ্রাসা একটি। ১৯৪৭ সালে প্রাথমিক ছাত্রী সংখ্যা ছিল—৪২, মিডল—৫৪৪, মাদ্রাসা—৪৮ ও হাইস্কুলে—৫৩০। ১৯৬৬ সনে ছাত্রী ও বিদ্যালয় সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে—প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮টি (ছাত্রী সংখ্যা—২৪০) জুনিয়র বেসিক ২টি (ছাত্রী সংখ্যা ২০২৩) জুনিয়র হাই ৫টি (ছাত্রী সংখ্যা ১০৮২); সিনিয়র বেসিক ৫টি (ছাত্রী সংখ্যা ৬৭৭); হাই স্কুল ৭টি (ছাত্রী সংখ্যা ২৪৩০); উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮টি (ছাত্রীসংখ্যা—৪১৮০)। বর্তমানে ১৯৬৮ সালে বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে আরও অনেক, অনেক বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত হ’য়েছে, নিঃসন্দেহে ছাত্রীসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই জেলার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন যে সব কৃত্তী মহিলারা নানা দিকে পারদর্শিতা লাভ ক’রে তাঁদের নাম উল্লেখ না ক’রে পারছি না। এই জেলার প্রথম বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ’য়েছেন শ্রীশান্তি রায়, শ্রীবীণা দাশগুপ্তা ও শ্রীবিমলা রায় চৌধুরী (১৯২৮ সনে)। এই কারণে এঁদের নাম স্মরণযোগ্য। এই জেলার আনন্দ চন্দ্র কলেজ থেকে প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন শ্রীসান্না সেনগুপ্ত, শ্রীঅঞ্জনা সরকার, শ্রীঅনিমা নিয়োগী ও শ্রীহেমলতা দত্ত। এঁরা কলেজের প্রথম উত্তীর্ণ ছাত্রী হিসেবে গৌরবের—সন্দেহ নেই। এই শহরের শ্রীঅরুণা দত্ত (শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র দত্তের কন্যা) মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পরীক্ষায় স্বর্ণপদক লাভ ক’রে জেলার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। শ্রীআশা গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ও শ্রীমঞ্জুলা রায় (৮দেবেশ ঘোষের কন্যা) বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ ক’রে জেলার মুখোজ্জ্বল করেছেন। উদীয়মান কবি ও লেখিকা হিসাবে ৮মঞ্জুলিকা দাশের নাম স্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে আর একজনের নাম কৃত্তী মহিলা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। শুনেছি হিমালয়ের দুর্গম গিরিপথে পাড়ি দিতে দেখা যায় নেপালী বা অগ্র মহিলাদের। কিন্তু সমতলের মহিলাদের মধ্যে প্রথম এই দুর্গম পথে অভিযান করেছেন এই জেলারই ভক্তি বিশ্বাস (শ্রীদীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের ভগ্নী)। এটাও কম গর্বের বিষয় নয়। জলপাইগুড়ি থেকে প্রথম আইনজীবী হয়েছেন যে মহিলা, তিনি হ’লেন শ্রীদীপ্তিকণা বসু (৮নগেন্দ্র নাথ মহলানবীশের কন্যা)। আলিপুরহাট মহকুমার শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় (৮ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের কন্যা) মহিলাদের মধ্যে এই মহকুমা থেকে প্রথম এম. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এঁর মা উক্ত ৮ইন্দু মুখোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী) ১৯২৯ সালে গৃহবধূদের মধ্যে প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ’য়ে গৃহবধূদেরও লেখাপড়া করার প্রেরণা যুগিয়েছেন।

জেলার শতবর্ষ পূর্তি বছরে দ্বী শিক্ষা প্রসারের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেল—দ্বী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও চেষ্টা শতগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সেই তাগিদে গড়ে উঠছে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।



জলপাইগুড়ি জেলায় শিক্ষাবিস্তারের

রূপরেখা

শ্রীঅমিয় কুমার পাকড়াশী

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রস্তাবনা

জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয় ১৮৬২ সালের ১লা জানুয়ারী। তৎপূর্বে তিস্তানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বৈকুণ্ঠপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত কিছু অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশ ছিল ভুটানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অধিকাংশ অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা এই পুনর্গঠনের পূর্বে কিরূপ ছিল তাহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

এ সমস্ত অসুবিধাহেতু কোনভাবেই এ জেলার সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ইতিহাস পূর্ণাঙ্গভাবে কেন, আংশিকভাবে স্বেচ্ছায় উপায়ে বিবৃত করা অসম্ভব। বিভিন্ন বিদ্যালয়, জেলা বোর্ড, সরকারী সেন্সাস রেকর্ড হইতে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহা সাধ্যমত স্বেচ্ছাভাবে উপস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসব ক্ষেত্রেও রেকর্ডের স্বল্পতা বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলা রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়—এ জেলার প্রাচীনতম উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৬ সন। কিন্তু ঐসময়ের বা তার পরবর্তী খ্রিষ্ট বৎসরকালের কোন রেকর্ড পাওয়া যায় নাই, কারণ ঐ বিদ্যালয় গৃহসহ সমস্ত রেকর্ড পত্রাদি ভস্মীভূত হয় ১৫ই জানুয়ারী ১৯০৭ সনে।

এই বিবরণ সংগ্রহ ব্যাপারে যাহারা বিভিন্ন তথ্যদ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হইতেছেন জলপাইগুড়ির প্রবীণতম ব্যবহারজীবী এবং বর্ষীয়ান সমাজসেবী, জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীবিপুলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল (ইনিও জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র), আলিপুরদুয়ার পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত পৌরপতি এবং আলিপুরদুয়ার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ২য় বর্ষের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী শ্রীধীরেন্দ্র কুমার ভৌমিক, আলিপুরদুয়ার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১ম দলের ছাত্র শ্রীহরিপদ মিত্র। ইহা ব্যতীত যাহারা বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন আলিপুরদুয়ার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের হুপতি শ্রীযতীন্দ্র লাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আর একজন শতাব্দী-বর্ষীয়ান-খেতাবী, যিনি এই বঙ্গাব্দ ১৩৭৫ সনেই তাঁহার শতবর্ষ পূর্ণ করিয়াছেন, (জলপাইগুড়ি জেলারও ১৩৭৫ বঙ্গাব্দেই শতবর্ষ পূর্ণ হইল) যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন তথ্যদ্বারা, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তথ্যশালা হইতে। ইনি হইতেছেন শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র সরকার (ত্রৈবার্ষিক নর্মাল পাশ)। ইনি নর্মাল পাশ করার পর প্রথমে জীবনে ভাটিবাড়ীতে গুরু ট্রেনিং স্কুলের স্থাপনাকাল (১৯০৪) হইতে, উহার আলিপুর-

দ্বারা স্থানান্তর (১৯০৮) এবং আলিপুরদুয়ার এম. ই. স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইতে হাই স্কুলে রূপান্তর পর্যন্ত সমস্ত সময়েই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন। জলপাইগুড়ি জেলার শততম জয়ন্তীতে তাঁহারও শততম জয়ন্তী পূরণ নিশ্চয়েই আমাদের কাছে স্নান্য বিষয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিক শিক্ষার অরূপ

জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিষ্ঠা সময়ে এই জেলায় কত বিদ্যালয় ছিল, এবং কত ছাত্র অধ্যয়নরত ছিল তাহা তথ্যভাবে বর্তমান সময়ে নির্ধারণ করা দুঃস্থ। তবে ১৯৫১ সনের এই জেলার সেন্সাস রিপোর্ট উদ্ধৃত্য ক্যাপ্টেন ইয়াটের (মাননীয় পি, এম, ডেকাসের কাছে লিখিত) পত্রে দেখা যায় (পত্রের তারিখ ১৭৭৩ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী) যে, ঐ সময়ে বৈকুণ্ঠপুরে কৃষিব্যবস্থা খুবই উন্নত ধরনের ছিল। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত জায়গা তিনি দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর সমৃদ্ধতম স্থানগুলির মধ্যে একটি। “The Bycampore country is in a very high state of cultivation and appears to be one of the richest I have beheld.” অনুরূপ অবস্থায় ইহা অসম্ভব করা অসম্ভব হইবে না যে, কৃষিকার্য্য সমৃদ্ধতম এলাকা নিশ্চয়ই শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিল না, যদিও এ সম্পর্কে তথ্যগত ভিত্তি দেওয়া বর্তমানে প্রায় অসম্ভব।

১৮৭২ সনে প্রথম এই জেলায় সেন্সাস লওয়া হয়। এই জেলায় তখন মাত্র ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮৩ জন বালক ছিল এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২২। তুলনায় দার্জিলিং জেলায় ছিল ২৪টি বিদ্যালয় এবং ঐ বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬১৭ (বালক ৫৪২, বালিকা—৭৫)। অবশ্য সেন্সাস কর্তৃপক্ষস্বীকার করিয়াছেন যে, জলপাইগুড়ি জেলা সম্পর্কীয় এই তথ্য সঠিক না হওয়াই স্বাভাবিক।

১৮৭২ সনের হিসাবে যে ১৯টি বিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে, তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বিদ্যালয় যে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ উপরে যে পেশাদার ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ২২ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়া ১৯জন পণ্ডিত মহাশয়ও ছিলেন; তাঁহাদের সকলেরই সম্ভবতঃ টোল ছিল।

খুব সম্ভবতঃ ১৮৭৫ সনে রাজসাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের অফিস স্থাপিত হয়। ইহারই পরবর্তী স্তরে তদানীন্তন সরকারী কার্য্যসূচী অনুযায়ী “জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল”—এই জেলার প্রথম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৭৬ সনে। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নীলমণি পাল। এই সময় এই জেলার শিক্ষার ব্যবস্থার ভার ছিল বর্তমান ও রাজসাহী বিভাগের জ্ঞাত সমন্বিত একটি বিভাগীয় পরিদর্শকের অফিসের উপর। ঐ পরিদর্শক মহোদয়ের কর্মকেন্দ্র ছিল চুঁচুড়া। শোনা যায়, এই সময়েরই কোন এক সময়ে অজ্ঞেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিভাগীয় পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহার লিখিত হস্তাক্ষরের নিদর্শন রাজসাহী বিভাগের বিভাগীয় পরিদর্শকের অফিসে ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ছিল। কিন্তু হুঁত্যাগাবশতঃ দেশবিভাগের সময় এই রেকর্ড পত্রাদি কোথায় লুপ্ত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

বিভাগীয় কমিশনারের অফিস, ১৮৭৮ সনে পুড়িয়া যাওয়ার দরুণ, তাঁহার দপ্তরসহ জলপাইগুড়ি শহর হইতে রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়াতে উঠিয়া যায় কিন্তু পুনরায় ১৮৮৮ সনে জলপাইগুড়ি ফিরিয়া আসে। ঐ

সময়েও শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় পরিদর্শকের অফিস চুঁচুড়াতেই অবস্থিত ছিল। অবশেষে খুব সম্ভবতঃ ১৮২৩/১৮২৪ সনে শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় পরিদর্শকের অফিস জলপাইগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং C. A. Martin প্রথম পরিদর্শক নিযুক্ত হন। উক্ত মার্টিন সাহেবের এক পরিদর্শন মন্তব্যও লিপিবদ্ধ আছে ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের পরিদর্শন বহিতে, উহার তারিখ ১৬ই নভেম্বর ১৮২৪। তৎপূর্বে শুধুমাত্র রাজসাহী বিভাগের কোন পরিদর্শকের কোন মন্তব্য কোথাও পাওয়া যায় নাই।

ঐ সময়ে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল ছাড়া কিছু মধ্য বাংলা স্কুল ও কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় খোলার প্রচেষ্টা শুরু হয় সম্ভবতঃ ১৮৮০ সনের পরবর্তী দশকে। হাইস্কুল ছাড়া অন্তর্বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলসের উপর—পরবর্তীকালে এই ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলসই রূপান্তরিত হন ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস হিসাবে।

খুব সম্ভবতঃ, জেলার জন্মলগ্নে একমাত্র দেবীগঞ্জই (অধুনা পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত) একটি মধ্য বাংলা বিদ্যালয় ছিল। এছাড়া জলপাইগুড়ি শহরে একটি নর্মাল স্কুল ছিল [স্থাপিত ১৮৭১ (?)]। এই নর্মাল স্কুল পরবর্তীকালে, ১৮৭৮ সনে, রংপুরে উঠিয়া যায় এবং তৎপরিবর্তে সদর মধ্য বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বোদার চন্দনবাটি, দেবীগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, জোড়পাকড়ী, সাপটীবাড়ী, শিবারপুর (অধুনা বেলাকোবা) অঞ্চলে মধ্য বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

বর্তমানে জলপাইগুড়ির যে অঞ্চল ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত, তন্মধ্যে প্রথম মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় খুব সম্ভবতঃ স্থাপিত হয় ময়নাগুড়ি ও ফালাকাটাতে। ১৮২৩ সনে ফালাকাটায় প্রথম মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—ইতিপূর্বে ঐ স্থানে ১৮৮০ সনে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফালাকাটায় কোন মধ্য বাংলা বিদ্যালয় ইতিপূর্বে ছিল না। ময়নাগুড়ির মধ্য বাংলা বিদ্যালয় ১৮২৫ সনে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় বলিয়া জেলা বোর্ডের মন্তব্য বহিতে উল্লিখিত আছে।

জেলার প্রতিষ্ঠা কালে যে সমস্ত স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বলিয়া শুনা গিয়াছে, তন্মধ্যে জলপাইগুড়ি থানায় বেরুবাড়ী মাঝগ্রাম, গোমস্তাপাড়া, রাজগঞ্জ থানায় শিকাপুর, ময়নাগুড়ি থানায় জোড়পাকড়ীর নিকট ভুরঙ্গের বাড়ী, বার্নেশের নিকট পুলতলী, স্থপির হাটের নিকট সাপটীবাড়ী (অধুনা বটতলী) এবং জল্লেশ মন্দিরের সন্নিহিত ভুকাডাঙ্গা নামক স্থানে বিদ্যালয় ছিল। মনে হয়, বেশীর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ই, বর্তমানে যে পাঁচটি থানা পাকিস্থানভুক্ত হইয়াছে, তাহাতে অবস্থিত ছিল ; কারণ ঐ কয়টি থানা বহুদিন হইতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার অধীন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই রংপুর জেলার অধীন ছিল।

১৮৮৪ সনে জেলায় শেষ কমিটি গঠিত হয়। ঐ সময় কিছু কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। কতকগুলি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮৪-৮৫ সন দেখা যায়। ১৮৮৭ সনে জেলা বোর্ডের স্থাপনা হয়। ১৮২৪ সন হইতে জেলা বোর্ড কার্যকরী ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভার সুস্থভাবে সম্পাদনের জন্ত অগ্রসর হন। ১৮২৪ সনের জেলা বোর্ডের এক মন্তব্যে দেখা যায় যে, জেলার বৃত্তিভোগী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৪ হইতে কমাইয়া ৩৬এ লইয়া আসা হয়। জেলা বোর্ডের প্রস্তাব বহি অনুযায়ী দেখা যায় যে, বালিকাদের জন্ত ১৮৮৮ সনে যে দুটি বিদ্যালয়কে তাঁহারা অনুদান প্রদান করিতেন, তন্মধ্যে একটি জলপাইগুড়ি শহরে। অপরটি দেবীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়।

৩য় পরিচ্ছেদ

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের বিবরণ

ঠিক স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে (১৯৪৭) জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ১৫টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল বালকদের জন্য এবং ১টি ছিল বালিকাদের জন্য। বালিকাদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়টি ছিল জলপাইগুড়ি শহরে। আর বালকদের জন্য ১৫টির মধ্যে ১৩টিই ছিল জলপাইগুরি সদর মহকুমায় (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত ৫টি থানা সহ)। ৪টি ছিল পাকিস্তানভুক্ত এলাকায়, যথাক্রমে—দেবীগঞ্জ, বোদা, পচাগড় ও পাটগ্রাম থানার সদরে। জলপাইগুড়ি জেলার মোট এই ১৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে যেগুলি ১৯৩০ সনের পূর্বেই বা তৎকালীন সময়ে মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়, তাহাদের ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যতটুকু আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

*

*

*

১। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল (রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়)

বিদ্যালয় গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ের স্থাপনাকাল ১৮৭৬। এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নীলমণি পাল। পরবর্তীকালে জগৎ সরকার, গোলক চক্রবর্তী, অধরবাবু ও গোপাল সরকার প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯০৭ সনের ১৫ই জানুয়ারী ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জেলাস্কুলের সমস্ত রেকর্ড পত্রাদি এবং গৃহটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে জেলা স্কুলের অবস্থান ছিল বর্তমান কমিশনার সাহেবের বাসস্থানের জায়গায়। অতঃপর বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয় ভাড়াবাড়ীতে। ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ছিলেন ডি, এন, নিয়োগী। ভাড়াবাড়ীতে দুই জায়গায় জেলা স্কুলের কার্য পরিচালিত হইত। বর্তমানে যেখানে ৩নং গুমটির কাছে নূপেন সিকদার মহাশয়ের বাড়ী আছে সেখানে এবং ‘নরেন ভিলা’ বলিয়া পরিচিত যে স্থান, সেই স্থানে। “নরেন ভিলা” তখন ‘পল সাহেবের হাটা’ বলিয়া পরিচিত ছিল। ১৯১৪ সনের শেষের দিকে অথবা ১৯১৫ সনে বিদ্যালয়টি নিজস্ব গৃহে বর্তমান স্থানে উঠিয়া আসে। এই স্থানের নাম ছিল তখন “কর্ণেল কুঠি” অর্থাৎ কর্ণেল হেদায়েত আলির বাসস্থান। এই আলি সাহেবের নামানুসারেই আলিপুরছার মহকুমার সৃষ্টি।

১৯০৭ সনে যে সব ছাত্র ভর্তি হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ভবকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তদীয় ভ্রাতা দিগন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র ঘটক, চারুচন্দ্র সাত্তাল, যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র (প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট), জিতেন্দ্রনাথ মৈত্র (প্রাক্তন দায়রা জজ)।

এই জেলা স্কুলে ১৯০৭ সনের পূর্বে যাঁহারা ছাত্র ছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন—ওয়ালিয়র রহমান (খুব সম্ভবতঃ ইনিই প্রথম দফায় এই বিদ্যালয় হইতে Entrance পাশ করেন), স্যার এফ রহমান (ইনি পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হন), যোগেশ ঘোষ ও শ্রীনাথ হোড়। শ্রীনাথ হোড় মহাশয়ের ছাত্রহিসাবে অদ্ভুত কৃতিত্বের কথা শোনা যায়, তিনি একই বৎসরে পর পর তিন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন এবং সম্মানে উত্তীর্ণ হন। প্রথমে তিনি VIth class হইতে Vth class-এ ওঠেন। কিছুদিন পরেই তাঁহাকে IVth class এ promotion দেওয়া হয়। কয়েকমাস পরে তাঁহাকে আরও উপরের শ্রেণীতে উঠাইয়া দিবার জন্য শ্রেণী শিক্ষক মহাশয়গণ প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ জানান। কিন্তু প্রধানশিক্ষক মহাশয় অস্বীকৃত হন। কিন্তু কয়েক-

দিনের মধ্যেই হোড় মহাশয়ের অধিগতবিদ্যা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে IIIrd class-এ promotion দেন। এ ছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আছেন বি, এন, দাশগুপ্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার। অগ্রাগ্র বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আছেন শান্তিনিধান রায়, জ্যোতিষচন্দ্র সান্মাল (জনমত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা), গণেশচন্দ্র সান্মাল, শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বর্দ্ধন D. Sc. (যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন), প্রীতিনিধান রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, ললিতচন্দ্র দত্ত (যিনি অবসর গ্রহণের কিছু পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন), মাখনলাল কুণ্ডু, গঙ্গানাথ বাগচী, ক্ষীরোদেন্দ্র দেব রায়কত ও রাজাবাহাদুর প্রসন্নদেব রায়কত, খানবাহাদুর মথলেছর রহমান (অবিভক্ত বঙ্গের ভূতপূর্ব এম, এল, সি, ও জেলা স্কুল বোর্ডের প্রথম বেসরকারী প্রেসিডেন্ট), অশোক চন্দ্র মিত্র I. C. S. (প্রাক্তন Registrar-General of India), কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী (আই, এস, সি, পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার), চারুচন্দ্র সান্মাল, গোপালচন্দ্র বসু (ফগীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক), সত্যেন্দ্রনাথ রায় (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব); স্বরেশচন্দ্র পাল (ত্রিশ্রোতা পত্রিকার প্রথম সম্পাদক)। ইহা ছাড়াও আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাত্র ছিলেন, যাঁহাদের নাম আমাদের নিজেদের অজ্ঞতার দরুণ লিখিত হইলনা।

বিদ্যালয়ের পুরাণো রেকর্ড পত্রাদির মধ্যে Resolution Book অল্পখানি দেখা যায় যে, তখনকার গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ছিলেন ডেপুটি কমিশনার ও সদস্য ছিলেন শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় পরিদর্শক।

বেতন আদায় সম্পর্কীয় নিয়মাবলীও তখন ভিন্ন ধরনের ছিল। বৎসরের বেতন তিনবার আদায়ের ব্যবস্থা ছিল—গ্রীষ্মের বঙ্গের আগে, পূজার বঙ্গের আগে ও বড়দিনের বঙ্গের আগে।

এই বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য হেডমাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে আজও তামসরঞ্জন রায় ও নারায়ণ চন্দ্র জীবিত আছেন। শ্রীযুক্ত চন্দের আমলেই এই বিদ্যালয় হইতে একটি ছাত্র স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বাংলাদেশে প্রথমস্থান অধিকার করে।

২। দেবীগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল

দেবীগঞ্জ (অধুনা পূর্বপাকিস্তান ভুক্ত) বহুকাল হইতেই একটি সমৃদ্ধিশালী গঞ্জ ছিল। জেলার জন্মলগ্নে এখানেই মধ্য বাংলা বিদ্যালয় চালু ছিল। এ অঞ্চল কুচবিহার চাকলাজোতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, এখানকার যে কোন কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় কুচবিহার রাজ পরিবারের অবদান থাকিত। খুব সম্ভবতঃ কুচবিহার-রাজ আত্মকূল্যেই দেবীগঞ্জে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার লাভ ঘটে। পরবর্ত্তীকালে ১৮৮০-৮১ সনে উহা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জেলা বোর্ড হইতেও এই বিদ্যালয়ে যথারীতি সাহায্য প্রদান করা হইত। এছাড়া এই দেবীগঞ্জেই প্রথম বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

অতঃপর ১৯১০ সালে কুচবিহার রাজাভূকূল্যেই ঐ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং বিদ্যালয়ের নাম কুচবিহারের স্বনামধন্য শিক্ষাভরাগী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের নামানুসারে চিহ্নিত হয়। এই গৃহনির্মাণ বাবদ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন কুচবিহার রাজ তহবিল, এবং এই বিদ্যালয়ের সমস্ত পৌনঃপুনিক ব্যয়ও ঐ ধরবার হইতে বহন করা হইত। ঐ বিদ্যালয় গৃহের গঠন প্রণালীও ছিল কুচবিহার জেফিস স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজের আদি গৃহগুলির অনুরূপ।

এই বিদ্যালয়ই জলপাইগুড়ি জেলার দ্বিতীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার চার বৎসরের মধ্যেই একটি ছাত্র ১৯১৪ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এই জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে।

৩। আলিপুরদুয়ার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার তৃতীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, কিন্তু বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাচীনত্ব হিসাবে দ্বিতীয়। এই বিদ্যালয় গড়িয়া গুটার ইতিহাসের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। জেলার সৃষ্টিতে প্রথম যখন ডুয়ার্স মহকুমা গঠিত হয়, তখন সদর ছিল ফালাকাটায়; পরবর্তীকালে বক্সা ঘুরিয়া আলিপুরদুয়ারে মহকুমা শহর স্থাপিত হয়। ফালাকাটায় মহকুমা দপ্তর থাকাকালীন একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়। জেলা বোর্ডের রেকর্ডে দেখা যায় ১৮৮৮ সনেই আলিপুরদুয়ার এম. ই. স্কুলের জন্ম অর্থ বরাদ্দ করা হয়, অথচ আলিপুরদুয়ারে ঐ সময়ে কোথাও কোন মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় যে ছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। আলিপুরদুয়ারের অশীতিপর বৃদ্ধরাও এ বিষয়ে কিছু বলিতে সক্ষম নহেন। রেকর্ড দৃষ্টে মনে হয়, হয়ত ফালাকাটার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের নাম আলিপুরদুয়ার মহকুমার নামানুসারে, আলিপুরদুয়ার মহকুমার একমাত্র বিদ্যালয় হেতু, “আলিপুরদুয়ার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়” হিসাবে নামকরণ করা হইয়াছিল, অথবা আলিপুরদুয়ারে বিদ্যালয়টি চালু হইবার কিছুকাল পরেই বন্ধ হইয়া যায়।

১৯০৪ সনে শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র সরকার ভাটিবাড়ী গুরু ট্রেনিং স্কুল (old type) এর হেড্‌ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মাসিক ২০৮ টাকা বেতনে কার্যে যোগদান করেন। ১৯০৮ সনে ঐ গুরু ট্রেনিং স্কুলটি আলিপুরদুয়ারে আসে এবং বর্তমানে যেখানে জেলা পরিষদের ডাকবাংলো আছে সেখানে স্থাপিত হয়। ঐ শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সহিত একটি Practising Primary School, যাহাকে Model School বলা হইত, তাহাও যুক্ত ছিল। ঐ সময়ে আলিপুরদুয়ার পুরাণো বাজারে (এখন যেখানে হিমালয় মোটর ট্রান্সপোর্ট অফিস ও United Bank of India অফিস আছে, তাহার কাছাকাছি) একটি Secularised মন্তব্যও ছিল (ইহার উল্লেখ আলিপুরদুয়ার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১৯১২ ও ১৯১৩ সনের পরিদর্শন মন্তব্যেও দেখা যায়)। এই Secularised মন্তব্য বলিতে কি বুঝাইত, তাহা স্পষ্ট নয়।

১৯১০ সন হইতেই আলিপুরদুয়ারে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় চালু করিবার প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং উহা সঠিক রূপ নেয় ১৯১২ সনে। এই প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন তদানীন্তন আলিপুরদুয়ার মহকুমার সেক্রেটারি অফিসার সর্দারজন শ্রদ্ধেয় জে. কে. বিশ্বাস। ইনিই বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে শেষজীবনে ইনি যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখনও তাহার এ বিদ্যালয়ের কথা স্মরণ ছিল। এই বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বীক্ষণাগারের জন্ম তিনি ১৯৩৭ সনে তৎকালীন প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ দান করেন।

তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি কমিশনার মিলিগ্যান সাহেব ঐ বিদ্যালয় ১৪ই জুন ১৯১২ সনে পরিদর্শন করেন। তাহার মন্তব্যেই ঐ সময়ে আলিপুরদুয়ার মহকুমায় একমাত্র ফালাকাটাতাই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবস্থিতির বিষয় উল্লেখ আছে। ঐ সময়ে Practising Primaryর মডেল স্কুল লইয়াই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় চালু হয় এবং ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত খোলা হয়। এই সময় হইতেই Guru Training School (Reformed type) চালু করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেন এবং ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলিপুরদুয়ারের গুরু ট্রেনিং স্কুল

জলপাইগুড়িতে উঠাইয়া আনার সূচী নির্ধারণ হয় এবং জলপাইগুড়ি সদরে ঐ গুরুটোনিং বিদ্যালয় গৃহের নির্মাণ কার্য শুরু হয়।

ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩২, ৪র্থ শ্রেণীতে ২। সরকার বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের জন্ত আত্মমানিক ব্যয় বরাদ্দ ৪০০০ টাকার মধ্যে ৫০০ টাকা মঞ্জুর করেন, এবং মাসিক ২৫ টাকা হারে জেলা বোর্ড কর্তৃক অহুদান মঞ্জুর হয়। আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয় যে, আলিপুরদুয়ারের প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট শ্রীসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসাবে বেত্র হস্তে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষার ভার লইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাকে এই “গাধা মানুষ করা” পেশায় বেশীদিন নিযুক্ত থাকিতে হয় নাই। এবং খুব অল্পদিনই তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তিনি একজন্ম কোন পারিশ্রমিকও গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের পর অপর এক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় (শ্রীযুক্ত রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি F. A. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৩০ টাকা মাত্র। ১৯১৩ সনে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১জন সহ। ছাত্র বেতনের হার ছিল ১ম শ্রেণী ৮০ আনা। ৬ষ্ঠ শ্রেণী ১ টাকা।

এ সময়কার একটি ব্যাপার উল্লেখ্য, যাহা এখনকার নিয়মানুসারে নিয়মবহির্ভূত তাহা এই যে যদিও বিদ্যালয়টি ১৯১২ সনেই সরকারী সাহায্যালাভে সক্ষম হয়, তথাপি ১৯১২ সন পর্যন্ত বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হিসাবে মঞ্জুরী লাভে সক্ষম হয় নাই।

শিক্ষা বিভাগের রাজশাহী বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শক ডঃ পি. চ্যাটার্জী মহাশয় ১১ই জানুয়ারী ১৯১৫ সনে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন এবং বিদ্যালয়টি অনুমোদিত হয়। এই মঞ্জুরীর সময় এই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দেবেন্দ্র চক্রবর্তী এবং প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের এ্যাডভোকেট শ্রীহরিপদ মিত্র, জলপাইগুড়ির এ্যাডভোকেট শ্রীমণীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ারের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং এ্যাডভোকেট শ্রীহরেশ দয়াল পাল।

১৯১৫ সনেই বিদ্যালয়টি বর্তমান স্থানে নতুন বিদ্যালয় গৃহে স্থানান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয় গৃহের নক্সা, পরিকল্পনা ও কাজকর্ম দেখাশুনা করেন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়— তিনি তখন সরকারী খাসমহল বিভাগের ‘আমিন-পেস্কার’ ছিলেন। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় এখনও জীবিত—বয়স ৮৩। ঐ বিদ্যালয়ের তৎকালীন গৃহগুলির আজ আর কোন অস্তিত্ব নাই, তৎপরিবর্তে নতুন ইষ্টকমণ্ডিত গৃহ রাজকীয় মহিমায় বিরাজমান।

১৯১৬ সন হইতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্ম যথাসাধ্য প্রস্তুতি চলিতে থাকে এবং ১৯১৯ সনে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিসাবে মঞ্জুরী লাভ ঘটে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রারম্ভে জ্যোতিষ চন্দ্র সেন, বি. এ. মহাশয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন, মঞ্জুরীর সময় ছিলেন বিমলা প্রসন্ন সেন। তিনি দীর্ঘ ১০ বৎসর (১৯১৮-১৯২৭) এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ শাস্ত ছিল। ১৯২৬-২৭ সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী কিছু ছাত্র টেবিল পরীক্ষায় ফেল করার পর তাঁহার বাড়ীতে (স্কুল কোয়ার্টার্স) আগুন ধরাইয়া দেয়। তিনি নাকি তখন সখেদে (বোধহয় ছাত্রদের পরিচয় তিনি জানিতেন) বলিয়াছিলেন—‘আমার বাড়ী পোড়াইয়াছ, আমার দাড়িও পোড়াইয়া দাও’। বোধহয় ইহার পরই তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে এই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র দল হিসেবে ষাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশ সেন, মাখন সেন

সীতানাথ রায় ও এনায়েতউল্লা। দ্বিতীয় দলের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক (আলিপুরদুয়ার পৌরসভার প্রথম বেসরকারী পৌরপতি), ৬ক্ষিতীশ মহলানবীশ (এই বিদ্যালয়েই পরবর্তীকালে শিক্ষকতা করিতেন এবং ১৯৩৪ সনে অকালে ক্ষয়রোগে দেহত্যাগ করেন)। এই বিদ্যালয়ে দীর্ঘতমদিনের জ্ঞান প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীযুক্ত হরিসেবক বিষ্ণু মজুমদার ১৯৩১ সন হইতে ১৯৬৪ সন পর্য্যন্ত।

এই বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্রবর্গের মধ্যে আছেন রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য এবং এন. এফ. রেলওয়ের ভূতপূর্ব জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্য নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার পর অন্ত্র চলিয়া যান), সেনাবিভাগের মেজর শ্রীবিষ্ণুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষ্ঠ বিভাগের বাস্তকার শ্রীযুক্ত শক্তিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (উক্ত দুই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরস্পরের ভ্রাতা এবং তাঁহাদের পিতা ছিলেন শিক্ষাবিভাগের একজন বিশিষ্ট পরিদর্শক) শোলমারী আশ্রমের সেক্রেটারী ডাঃ রমণী রঞ্জন দাস, লেং কর্ণেল ডাঃ সুনীল কুমার ভৌমিক, ও বর্তমানে নাইজিরিয়ার অধিবাসী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়।

৪। ফণীন্দ্রদেব (বিদ্যালয়) ইনষ্টিটিউশন

এই জেলার পরবর্তী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। সম্ভবতঃ ১৮৭১ সনে এই জেলার প্রতিষ্ঠা সময়ে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের সহিত একটি মডেল স্কুলও সংযোজিত ছিল। যতদূর জানা যায়, তাহাতে মনে হয় এই নর্মাল স্কুলের অবস্থান ছিল বর্তমান সদর বালিকা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দীতে। ১৮৭৮ সনে এই বিদ্যালয়ের মধ্য বাংলা বিদ্যালয় হিসাবে রূপান্তর ঘটে এবং ১৯১০ সনে ইহা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে পরিবর্তিত হয়। মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ের নাম ছিল জলপাইগুড়ি সদর মধ্য বাংলা বিদ্যালয়। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে নাম ছিল জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যাল মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়।

১৮৯৪ সনে তখনকার বিদ্যালয় সমূহের রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় পরিদর্শক সি. এ. মার্টিন মধ্য বাংলা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। খুব সম্ভবতঃ বিভাগীয় পরিদর্শক দ্বারা এই প্রথম বিদ্যালয়টি পরিদর্শিত হয়। এই সময় বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯০ এবং বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার যাঁহার উপর হস্ত ছিল, তাঁহাকে হেড্ পণ্ডিত বলা হইত। পরিদর্শন মন্তব্যানুসারে দেখা যায় যে, ১৮৯৯ সনে বিদ্যালয়ের মাসিক গড় আয় ছিল ৫০৮/৪ (পঞ্চাশ টাকা সাত আনা চার পাই) এবং মাসিক গড় ব্যয় ছিল ৪৯৮/০ (উনপঞ্চাশ টাকা দশ আনা)।

১৯০১ সনে প্রথম একজন ভারতীয় বিভাগীয় পরিদর্শক হিসাবে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। ইনি পি, চ্যাটার্জী মহোদয়, পরে ডক্টরেট হন। তাঁহার পরিদর্শনের তারিখ ১লা আগষ্ট ১৯০১। ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন ইউ, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৬ সনে বিদ্যালয়ের মাসিক গড় ব্যয় ছিল ৬৬৮/০। ঐ সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা অধিকর্তা এইচ. সার্প মহোদয়ও এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

১৯১০ সনে এই বিদ্যালয়ের মধ্য বাংলা বিদ্যালয় হইতে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরকালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২৮,—মাসিক গড় ব্যয় ছিল ১০৮৮/০ (একশত আট টাকা আট আনা) এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন সর্বজন

শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্র নাথ সিংহ (আণ্ডার গ্রাজুয়েট) মহাশয়। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৩০০। সিংহ মহাশয় এই বিদ্যালয় পরবর্ত্তীকালে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিসাবে রূপান্তরিত হইলে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁহার প্রাক-বিদ্যালয়কালীন সময় পর্য্যন্ত কাজ করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ৪র্থ শ্রেণী হইতেই ইংরাজীর মাধ্যমে ঐ সময়ে সমস্ত বিষয়ে পড়াশুনা চলিত। ঐ সময়ে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর বেতনের হার ছিল—৬ষ্ঠ ও ৫ম শ্রেণীতে—১১০, ৪র্থ ও ৩শ্রেণীতে—১৮, ২য় শ্রেণীতে—৮০, ১ম শ্রেণীতে—১০০।

অরিতগতিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং ১৯১৫ সনে ছাত্রসংখ্যা হয় ৩২৫। ঐ সময়ে দুই ছুইবার তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা ডি, ডি, হর্নেল বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং বিদ্যালয় গৃহের অবস্থা খুবই শোচনীয় দৃষ্টে (ছাত্রসংখ্যায় স্থানানুভাব ছিল) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেন এবং লেখেন যে, এরূপ বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী থাকাই উচিত নয়।

১৯১৭ সনে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী ও ১৯১৮ সনে নবম শ্রেণী খোলা হয়। G. F. Oaten (প্রেসিডেন্সী কলেজ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহিত যাহার নাম সংশ্লিষ্ট) তখনকার সহকারী শিক্ষা অধিকর্তা হিসাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ১৯১৯ সন হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত পাঁচবার বিদ্যালয়টি পরিদর্শিত হয়; অবশেষে ১৯২১ সনে বিদ্যালয়টি ১৯২০ সন হইতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

রাজা প্রসন্নদেব রায়কত এই বিদ্যালয়ের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে উন্নয়নের ব্যাপারে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দিতে স্বীকৃত হন এবং তন্মধ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা দান করেন নগদ অর্থে, এবং কিছু কাঠ, টিন ইত্যাদিও দান করেন।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার গুণে বিদ্যালয়ের উন্নতি দ্রুততর হইতে থাকে এবং ১৯৩০ সনে বিদ্যালয়ের মাসিক সরকারী সাহায্য দাড়ায় ২৪০০ (দুইশত চল্লিশ) টাকা।

কিন্তু এই সময়েই অসহযোগের বস্তার সহিত এই বিদ্যালয়ের উপরও নামিয়া আসে দুর্যোগ। ১৯৩০ সনে যখন সর্বত্র গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল, তখন তাহার ডেউ এই বিদ্যালয়েও আসিয়া লাগে। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথম যেদিন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে, তাহার কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় সমস্ত ছাত্রই বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসে, মাত্র সাতজন ছাড়া। শিক্ষা বিভাগের রাজশাহী বিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় পরিদর্শক আলফাজ-উদ্দীন আহমেদ মহোদয়ের সমস্ত চাপ উপেক্ষা করেন এবং তদানীন্তন বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীঅন্নদাচরণ সেন এবং ঐ সাতজন ছাত্রের নাম কিছুতেই সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইতে স্বীকৃত হন নাই; ফলে বিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়। বিদ্যালয় ভীষণভাবে অর্থক্লেশতা ভোগ করিতে শুরু করে; শিক্ষক মহাশয়দের বেতন ২০০ (কুড়ি) হইতে ৫০০ (পঞ্চাশ) টাকা পর্য্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের এই ঘটনার সময় রাজাবাহাদুর প্রসন্নদেব রায়কত এই বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন এবং তৎকালীন বিধান সভার সরকারী পক্ষের সদস্য ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের একটি দিকই আমাদের নিকট পরিজ্ঞাত, সেটি হইতেছে যে, তিনি সব সময়েই ইংরেজ সরকার ঘোঁষা ছিলেন; কিন্তু অপর দিকটিতে দেখা যায় যে, তিনি এই সঙ্কট সময়ে সর্বক্ষেত্রেই সম্পাদক মহাশয়ের পার্শ্বে ছিলেন এবং তাঁহাকে সমর্থন জানান। এই দিকটি আমাদের

কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁহার একটি উক্তি এই ব্যাপারে সর্বকালের সাক্ষী হইয়া আছে তাঁহার চরিত্র প্রকাশনে “ছাত্রদের ধরাইয়া দিয়া আমরা পুলিশদের গোয়েন্দার কাজ করিতে পারি না।”

অসহযোগ আন্দোলন হেতু এই বিদ্যালয় যে দুর্ঘ্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল এই জেলার আর কোন বিদ্যালয় স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয় নাই।

অবশ্য স্বাধীনতার পর স্বদেশী সরকার অনুদান বাবদ যে অর্থ ব্রিটিশ সরকারের আমলে এই বিদ্যালয়ের প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা মঞ্জুর করেন, ফলে ঐ অর্থে এই বিদ্যালয়ের নূতন ভবন নিৰ্ম্মিত হয়।

এই বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে আছেন উত্তর-বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ এ, সি, রায়, ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ও প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার) এবং বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ডের এম, এ, (বর্তমানে M/s. Thacker Spink এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী)।

৫। জলপাইগুড়ি সদর উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়

জেলার প্রথম উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা জেলার বালিকাদের শিক্ষার ব্যাপারে নবযুগের সূচনা করে।

এই বিদ্যালয়ের জন্মলগ্নের ইতিহাস সংগ্রহ করা শ্রুষ্টি। তবে রায়বাহাদুর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, এই বিদ্যালয়ের বর্তমান অঙ্গনে গোড়ার দিকে একটি নৰ্মাল স্কুল (সম্ভবতঃ ১৮৭১ সন হইতে) চালু ছিল এবং সেই সঙ্গে একটি মডেল স্কুলও (Practising Primary School) ছিল। মনে হয়, এই নৰ্মাল স্কুলই বোধ হয় পরবর্তীকালে সদর মধ্য বাংলা বিদ্যালয়, যাহা বর্তমানে ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের পূর্বসূরী।

যাহাউক, ১৯০২ সাল হইতে যে এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় জালান মিঞার স্ত্রীর পরিচালনাধীনে পরিচালিত হইত তাহা ডাঃ সাম্মাল ও রায়বাহাদুর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উভয়েই বলেন। জালান মিঞার স্ত্রী শুধু শিক্ষিকাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় একটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকা। নিশ্চয়ই আজ ভাবিতে অবাক লাগে যে নারী শিক্ষার সেই শৈশবযুগে, যখন মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতা ছিল আকাশচুম্বী, তখন কিরূপে ঐ সমাজে এরূপ একজন নিষ্ঠাবান অসাম্প্রদায়িক মহিলা ছিলেন। শ্রদ্ধেয় শরণপণ্ডিত মহাশয় তাঁহার সহকর্মী ছিলেন।

১৯২১ সনে এই বিদ্যালয়ের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হিসাবে রূপান্তর ঘটানোর চেষ্টা হয়। সেই সময় ঠিক কে প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন, সে সংবাদ সঠিক সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। খুব সম্ভবতঃ কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের আমলেই ইহার রূপান্তর ঘটে।

১৯২৫ সনে চন্দ্র দম্পতি বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে স্বামী স্ত্রী উভয়েই এম, এ, পাশ। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে এই অনগ্রসর অঞ্চলে ইহা কল্পনাও করা যাইত না। তাঁহাদের যোগদানের পর হইতেই এই বিদ্যালয়ের উন্নতির গতি দ্রুততর হয়। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় অল্পমোদন লাভ করে। ১৯২৭ সন হইতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ ঘটে এবং ১৯২৮ সনে প্রথম দল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়—সকলেই উত্তীর্ণ হয়। শ্রীমতী শান্তি রায় একট ২০ (কুড়ি) টাকার প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান।

১৯৪৭ সন পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ই জলপাইগুড়ি জেলায় বালিকাদের একমাত্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫৩০।

এই বিদ্যালয়ের গৌরব, এই বিদ্যালয়ের উপরিকথিত প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী সুনীতি বাল্য চন্দ। এই জেলার শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত শিক্ষকদের “জাতীয় পুরস্কার” লাভে সক্ষম হইয়াছেন।

এই বিদ্যালয়ের ইতিহাসে, তথা জলপাইগুড়ি জেলার নারী-শিক্ষার ইতিহাসে চন্দদম্পতির দান উল্লেখযোগ্য।

৬। দোমহনী পলহোয়েল উচ্চ বিদ্যালয়

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম রেলওয়ে কর্তৃদ্বারী প্রথম বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তদানীন্তন বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, আরও বিশিষ্ট ভাবে বলা যায় ঐ সময়ের ঐ রেল কর্তৃপক্ষের জেনারেল ম্যানেজার পলহোয়েল মহোদয়। তাঁহার সময়ে তাঁহার গড়া B. D. R. ফুটবল দল বাংলাদেশের কলিকাতা ভিন্ন সর্বত্র তাহাদের বিজয়াভিযান চালাইয়াছে। তাঁহার উদ্যোগেই নতুন খেলোয়াড় গড়িবার পরিকল্পনায় এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

বেঙ্গল ডুয়ার্স রেল লাইন স্থাপনের পর প্রথম রেল শহর বার্ষিক। তিস্তার ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত হওয়ায় দোমহনীতে নতুন শহর সুন্দরভাবে গড়িয়া ওঠে। কর্মচারীদের প্রয়োজনে, রেল সদর দপ্তরের দোমহনীতে অবস্থান হেতু বহিরাগতদের আগমনে যথেষ্ট লোকসমাগম ঘটে। এবং নিজের প্রেরণায় পলহোয়েল সাহেব ১৯১২ সনে দোমহনীতে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহা যথারীতি মঞ্জুরী লাভ করে। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়ের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় পলহোয়েল উচ্চ বিদ্যালয় ১৯২৭ সনে এবং ঐ বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মঞ্জুরী লাভ করে। পরবর্তীকালে, এই বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী আবার ১৯৩১ সন হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়। ১৯৩৩ সনে পুনরায় মঞ্জুরী লইয়া এই বিদ্যালয় আবার তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই জেলায় প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এই বিদ্যালয়ই একমাত্র সহ-শিক্ষামূলক বিদ্যালয় ছিল।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে জলপাইগুড়ি ও কলিকাতার ক্রীড়া-জগতে সুপরিচিত মোজাম্মেল হক ছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৫০ সন হইতে এখানকার রেলের জেলা দপ্তর উঠিয়া যাওয়ায় এই স্থানের গুরুত্ব ভীষণভাবে কমিয়া যায়। ছাত্রসংখ্যা দ্রুত কমিতে থাকে এবং বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ভয়াবহরূপে কম এবং বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৭। বোদা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয় আজ পূর্বপাকিস্তান এলাকাকৃত। জেলা বোর্ডের রেকর্ডে দেখা যায় যে, ১৮৯২ সনে বোদার চন্দনবাড়ী স্থল মধ্য বাংলা হইতে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল জেলা বোর্ডের দাক্ষিণে, সরকারী অহুদানে ও কুচবিহার চাকলাজোত কর্তৃপক্ষের আত্মকূলো পরিচালিত হয়। ১৯২৭ সাল হইতে বিদ্যালয়ের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রচেষ্টা শুরু হয়। বিদ্যালয় ১৯২৯ সনে

মঞ্জুরী লাভ করে এবং ১২৩০ সনে বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়। ঐ প্রথম দলে জেলা স্কুল বোর্ডের বর্তমান সহকারী পরিদর্শক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র কর মহাশয়ও ছিলেন।

৮। সোনাউল্লা (উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়) ইনষ্টিটিউশন

বোদা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাথে সাথেই এই বিদ্যালয়েরও মঞ্জুরী লাভ ঘটে। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের অদৃষ্টে ঠিক বোদার মত সহজ পথ উন্মুক্ত ছিল না, পরন্তু ছিল অতিক্রম করিবার জ্ঞাত ঝড়। বিক্ষুব্ধ সমুদ্র।

বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ,— শহরের অপর দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, যথা জেলা স্কুল ও ফণীন্দ্র দেব, ভিত্তির ব্যাপারে কতকগুলি ছাত্রকে অমনোনীত করিয়া প্রত্যাখ্যান করায়—এবং এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলার বিশিষ্ট জনসেবক জগদীন্দ্রদেব রায়কতের তাহাদের প্রতি অহুকম্পায়।

রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের মাতা রাণী অমৃতেশ্বরী দেবীর নামে “অমৃতেশ্বরী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়” শুরু হয় ১২২০ সনে রাজবাড়ীর ক্যানোপি (Canopy) হাউসে। ক্ষীরোদেন্দ্র দেব রায়কত প্রথম প্রধান শিক্ষক। পাঁচ মাস পর তিনি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন পরিচালন ব্যাপারে। ছাত্রসংখ্যা তখন প্রায় ৪০। ১২২১ সনে ছাত্র হয় ৬০। ঐ সময়ে মাসিক গড় আয় দাঁড়ায় ১৩৫ (একশত পয়ত্রিশ) টাকা ও গড় ব্যয় ১২৭ (একশত সাতাশ) টাকা।

১২২১ সনের ১লা জুলাই জগদীন্দ্রদেব রায়কত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন, এই জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রদ্ধেয় তরণীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়। যোগদান করিয়াই রাজবাহাদুরের নিকটে গুনিলেন যে, বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ বা মাসিক সাহায্য বাবদ আর কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না। চক্রবর্তী মহাশয় ইতিপূর্বে রংপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে ডিমলা-রাজ ষ্টেটের ডিমলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নিশ্চিত বেতন, নিশ্চিত চাকুরী। এই কথা শোনার পর চক্রবর্তী মহাশয়ের মাথায় প্রায় বজ্রাঘাত—কিন্তু যিনি চিরকালই বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছেন, তিনি পশ্চাদপসরণ না করিয়া আগাইয়া যাইতে চাহিলেন। অগ্রত চাকুরীর সন্ধানে আর না গিয়া স্বল্পে তুলিয়া লইলেন এই বিদ্যালয়েরই জোয়াল।

চক্রবর্তী মহাশয় রাজবাহাদুরের ঐ কথা শোনার পরই ছুটিয়া গেলেন সোনাউল্লা সাহেবের নিকট—যিনি তখন জলপাইগুড়ির “হাতেম তাই।” চক্রবর্তী মহাশয় প্রতিশ্রুতিও পাইলেন পাঁচ হাজার টাকা ও বিদ্যালয়ের জ্ঞাত জমি—বিদ্যালয়ের নামকরণ হইল নূতনরূপে “সোনাউল্লা ইনষ্টিটিউশন”। বিদ্যালয়ের কাজকর্মও শুরু হইল সোনাউল্লা সাহেবের মুশাফিরখানায়।

কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের বিধি বাম। তখন প্রবল অসহযোগ আন্দোলন। ১২২২ সনে দেশবন্ধু দাশ আসিয়া সোনাউল্লা সাহেবকে “আমির-উল-মলুক” উপাধি দিয়া গেলেন এবং কানে দিয়া গেলেন “স্বদেশী”র বীজমন্ত্র। খুব সম্ভবতঃ সংস্কৃতমন্ত্র “আমির-উল-মলুক” সাহেবের ঠিক রপ্ত না হওয়ায় ব্যাখ্যায় ভুল হইয়া গেল। “আমির-উল-মলুক” সাহেব স্বদেশী স্কুলের তাড়ায় ইংরাজী বিদ্যালয় সোনাউল্লা ইনষ্টিটিউশনকে গৃহহারা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় সরকারের দরবারে “দরবারী” হওয়ায়, তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার বাহাদুরের হস্তক্ষেপে, “আমির-উল-মলুক” সাহেব তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে বার্থ হইলেন। কিন্তু ‘আমির-উল-মলুক’ সাহেবের দরজাও সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট বন্ধ হইয়া গেল।

বিদ্যালয় ইতিমধ্যে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হিসাবে অনুমোদন পাইয়াছে এবং শনৈঃ শনৈঃ উচ্চ বিদ্যালয়ের দিকে খোঁড়া ঠ্যাং লইয়া চলিতে শুরু করেছে। অবশেষে খোঁড়া ঠ্যাং বিভিন্ন প্রচেষ্টায় সোজা হইয়া গেল—বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে মঞ্জুরী পাইল ১৯২৯ সনে। ১৯৩০ সনে প্রথমদল পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিল—মোট ১২ জন, দশম শ্রেণীর সকলেই। সেকেণ্ড ডিভিসনেই পাশ করিল ১০ জন, দুজন অকৃতকার্য।

সোনাউল্লা সাহেবের মন ঘুরিল। বিদ্যালয়ের জন্ত তিনি দান করিতে স্বীকৃত হইলেন—সাত বিঘা জমি, পাচ হাজার টাকা ও পূর্বকার নক্সা অনুযায়ী দালান ঘর। কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট দুর্ভাগ্য পুনরায় তাহার বাহু মেলিয়া ধরিল। কিছু কাঙ্ক্ষকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই সোনাউল্লা সাহেব ১৯৩০ সনের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় রোগশয্যা হইতে বেহেস্তের পথে যাত্রা করিলেন।

চক্রবর্তী মহাশয় অবশ্য সমস্ত বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া তাঁহার সাধ্যমত বিদ্যালয়কে আগাইয়া লইয়া চলিলেন। এক কথায় বলা যায়, সোনাউল্লা বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবার ইতিহাস চক্রবর্তী মহাশয়ের একক সংগ্রামের ইতিহাস, অবশ্য সঙ্গে কিছু পদাতিক ও অস্বারোহী ছিল,—ছিলনা মহারক্ষী ও রথী।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য এই জলপাইগুড়ি জেলার যে, এই চক্রবর্তী মহাশয় অবসর গ্রহণের পর জীবনের শেষ কয়টি বৎসর অসহনীয় অর্থক্লেশ্তায় কাটাইয়া রোগে দুঃখে তাঁহার জীবনের ছন্দ টানিয়াছেন।

* * * *

১৯৩০ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্যন্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসারের ইতিহাস একটি অতুর্ভব ইতিহাস। ১৯৩০ সনে পৃথিবীব্যাপী শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে মন্দা দেখা দিয়াছিল তাহার প্রতিচ্ছবি জেলার প্রধান শিল্প চা-শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছিল, ফলে কাহারও অকুপণ হস্ত আর এই অতি প্রয়োজনীয় সমাজ সেবায় উন্মুখ হয় নাই। ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়, ফলে ব্যবসাবাণিজ্য আবার তেজীভাব দেখা দিতে শুরু করে। ১৯৪২ সনে কৃষি দ্রব্যাদির দাম প্রচুর বাড়িয়া যায়, ফলে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় খোলার আগ্রহ দেখা দেয়। পচাগড়, পাটগ্রাম, বেলাকোবা, বাকালী, জোড়পাকড়ী, মণ্ডলঘাট, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার কোর্ট (ম্যাক্ উইলিয়ম স্কুল) ও কুমার গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় খোলার তোড়জোড় শুরু হয়। এই স্কুলগুলির মধ্যে, পচাগড়, পাটগ্রাম, বেলাকোবা, বাকালী, মণ্ডলঘাট, ধূপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ম্যাক্ উইলিয়ম স্কুল স্বাধীনতার পূর্বেই মঞ্জুরী লাভ করে; অগ্রগুলির মধ্যে একমাত্র ময়নাগুড়ি ছাড়া আর সবগুলিরই ২১ বৎসরের মধ্যে অবলুপ্তি ঘটে।

ময়নাগুড়ি বিদ্যালয় ১৯৪৮ সনে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিসাবে মঞ্জুরী পায়, অতীতক ১৯৪৮ সনে মণ্ডলঘাট বিদ্যালয়ের এবং ১৯৫১ সনে বাকালী বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি ঘটে। মণ্ডলঘাট বিদ্যালয় অবশ্য আবার ১৯৬৩ সনে পূর্ণমঞ্জুরী লাভ করে।

এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সনের পূর্বে যে বিদ্যালয়গুলি গড়িয়া ওঠে, তাহাদের মধ্যে বেলাকোবা, ধূপগুড়ি, বাকালী, জোড়পাকড়ী, পাটগ্রাম ও মণ্ডলঘাট স্কুলগুলির প্রত্যেকটিতে কোন না কোন সময়ে, বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবার মুখে, বর্তমানে অবসর গ্রহণকারী যোগেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

স্বাধীনতার পূর্বে বর্তমান (বিভক্ত) জলপাইগুড়ি জেলার যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলি উচ্চ বিদ্যালয়রূপে মঞ্জুরী লাভ করে, তাহাদের নাম ও মঞ্জুরীর তারিখ নীচে দেওয়া হইল।

বিদ্যালয়ের নাম	প্রথম মঞ্জুরীর তারিখ	বালক/বালিকা/সহশিক্ষামূলক বিদ্যালয়	মন্তব্য
১। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল	*১৮৭৬	বালক	*মঞ্জুরীর সঠিক তারিখ নির্ধারণ সম্ভবপর হয় নাই।
২। আলিপুরহাটার এইচ, ই, স্কুল	১৯১৯	„	
৩। ফণীন্দ্রদেব ইন্সটিটিউশন, জলপাইগুড়ি	১৯২০	„	
৪। জলপাইগুড়ি সদর বালিকা বিদ্যালয়	১৯২৭	বালিকা	
৫। দোমহনী পলহোয়েল এইচ, ই, স্কুল	১৯২৭	সহশিক্ষামূলক	
৬। সোনাউল্লাহ ইন্সটিটিউশন, জলপাইগুড়ি	১৯২৯	বালক	
৭। বেলাকোবা (*ওয়ালিয়র রহমান) এইচ, ই, স্কুল ১৯৪৩		„	*পরবর্তীকালে এই নাম লোপ করা হয়।
৮। (বাকালী) ধর্মপুর আব্দুল করিম এইচ, ই, স্কুল *১৯৪৫		„	*১৯৫১ সনে বিদ্যালয়টি লুপ্ত হয়।
৯। ধূপগুড়ি এইচ, ই, স্কুল	১৯৪৬	„	
১০। জোড়পাকডী আব্দুল গণি এইচ, ই, স্কুল	১৯৪৭	„	
১১। ম্যাক উইলিয়ম এইচ, ই, স্কুল	১৯৪৭	„	
১২। মণ্ডলঘাট এইচ, ই, স্কুল	*১৯৪৭	„	*১৯৪৮ সনে এই বিদ্যালয় লুপ্ত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা লাভের সময় এই জেলার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের বিবরণ

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট এই জেলায় অনুমোদিত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল বালকদের জন্ম ২১টি ও বালিকাদের জন্মে ২টি। (Quinquennial Review of Progress of Education in West Bengal from 1942-43 to 1946-47 দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা-২৮) এছাড়াও বালকদের জন্ম ৫টি জুনিয়র মাদ্রাসা ও বালিকাদের জন্ম ১টি জুনিয়র মাদ্রাসা ছিল।

১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ফাটলের সময় উপরোক্ত ৬টি মাদ্রাসাই লুপ্ত হয়। তন্মধ্যে মেহেরুল্লহা জুনিয়র মাদ্রাসা ও সোনাপুর মাদ্রাসা (দুটিই বালকদের বিদ্যালয় ছিল) পরিবর্তিত হইয়া প্রথমে মধ্য ইংরাজী

বিদ্যালয় ও পরবর্তীকালে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত জলপাইগুড়ি শহরে অবস্থিত, বেগম ফয়েজুন্নেসা বিদ্যালয়টি বর্তমানে বালিকাদের জন্য জুনিয়র হাই স্কুল হিসাবে চালু আছে। জিৎপুর জুনিয়র মাদ্রাসা বর্তমানে মাঝেরডাবরী জুনিয়র হাই স্কুল রূপে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। অপর দুইটি জুনিয়র মাদ্রাসার একটি জলপাইগুড়ি শহরে উদাস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে, এবং অপরটি গ্রামাঞ্চলে পুঁটিমারীতে বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে চালু আছে।

উপরোক্ত ২১টি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, যেগুলি বালকদের জন্য চালু ছিল, তাহাদের মধ্যে দুর্ভাগ্যবশত: আজও ৩টি বিদ্যালয়ের পক্ষে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ঐ ৩টির মধ্যে একটি শালকুমারহাট মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় (১৯২৯ সনে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৩৪ সনে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত) আলিপুরদুয়ার মহকুমায় অবস্থিত। অপর ২টির একটি চূড়াভাণ্ডার ডেলডেলা জুনিয়র হাই স্কুল (প্রতিষ্ঠিত ১৯৪৬, মঞ্জুরীপ্রাপ্ত-১৯৪৭) —সদর মহকুমার ময়নাগুড়ি থানায় অবস্থিত, দ্বিতীয়টি মাণিকগঞ্জ জুনিয়র হাই স্কুল সদর থানার বহু বিতর্কিত বেকবাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত। এই মাণিকগঞ্জ বিদ্যালয়টি পূর্বে ব্রাহ্মণপাড়ায় একটি মধ্য বাংলা বিদ্যালয়রূপে পরিচালিত হইত, পরে ১৯৪০ সনে উহা মাণিকগঞ্জ হাটে স্থানান্তরিত হইয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

রাজগঞ্জ থানার সন্ন্যাসীকাটা ইউনিয়নের গ্যাড্‌রা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ১৯৫২ সনে, এবং মাল থানার চেংমারী ইউনিয়নের চেংমারী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ১৯৫১ সনে অবলুপ্ত হয়। গ্যাড্‌রা বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ছিল বর্তমানে সন্ন্যাসীকাটা গ্রামের যে অংশ পাকিস্থানভুক্ত তেঁতুলিয়া থানার অন্তর্গত হইয়াছে সে অংশের। ফলে দেশ বিভাগের কারণে ও পাসপোর্টের দরুণ এই ছাত্র আশা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া যায় এবং বিদ্যালয়টিও নিশ্চয় হইয়া পড়ে। চেংমারী বিদ্যালয়টি ছিল খুবই বর্ধিষ্ণু গ্রামে, তিস্তার পূর্বপাড়ে। কিন্তু, ১৯৫০ সনে তিস্তার ভয়াবহ বন্যায় এতদঞ্চলের বহু গ্রামের এবং জনবসতির অবলুপ্তি ঘটে; ফলে এই বিদ্যালয়ের জীবনস্পন্দনও স্তব্ধ হইয়া যায়।

যে দুটি বালিকা বিদ্যালয় ঐ সময়ে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে পরিচালিত হইত, তাহাদের একটি কদমতলা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় (১৯৩৯ সনে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত) জলপাইগুড়ি শহরে অবস্থিত ছিল। এই বিদ্যালয়টিকে ভিত্তি করিয়াই জলপাইগুড়ির রাষ্ট্রীয় বালিকা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টি তাহার নিজস্ব স্থানেই অবস্থান করিতে থাকে এবং চালু থাকে। পরবর্তীকালে স্থান পরিবর্তন করি শহরের মধ্যস্থলেই পূর্বতন স্থান হইতে সামান্য একটু দূরে উহা কদমতলা উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়রূপে রূপান্তরিত হয়।

বালিকাদের জন্য অপর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টি ছিল আলিপুরদুয়ার শহরে। ১৯১৮ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে উন্নয়নের জন্য ১৯৩৭-৩৮ সনে স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টা চলে; কিছু সাফলালভ ঘটিলেও পরে আবার বিপর্যয় দেখা দেয়। পুনরায় ১৯৪৩ সনে সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রারম্ভে শ্রীমতী অশোকা দাশগুপ্তা ইহার প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৪৬ সন হইতে বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হিসাবে স্বত্বভাবে চালু হয় এবং শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্তা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই বিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পরবর্তী দশকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে অমুমোদিত হয়।

স্বাধীনতা অর্জন ও পশ্চিম বঙ্গের জন্য লগ্নে এই জেলার যে সমস্ত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় মঞ্জুরী লাভ করিয়াছিল, তাহাদের নাম নিয়ে দেওয়া হইল।

বিদ্যালয়ের নাম	প্রথম প্রতিষ্ঠার তারিখ	বালক/বালিকা সহ শিক্ষামূলক বিদ্যালয়	মন্তব্য
১। ফালাকাটা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৮৮৮	বালক	
২। ময়নাগুড়ি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৮৯৫	বালক	১৮৮৯ সন হইতে এখানে মধ্য বাংলা স্কুল চালু ছিল।
৩। জোড়পাকড়ী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯১৯	বালক	১৮৯২ সন হইতে এখানে মধ্য স্কুল চালু ছিল।
৪। মণ্ডলঘাট মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯১৯	বালক	
৫। শিকারপুর (বেলাকোবা) মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯২০	বালক	১৮৮৯ সন হইতে এখানে মধ্য স্কুল চালু ছিল।
৬। বাকালী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯২০	বালক	১৮৯৯ সন হইতে মধ্য বাংলা স্কুল চালু ছিল।
৭। ধূপগুড়ি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯২১	বালক	
৮। আনন্দ মডেল মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯২২	বালক	
৯। মজিদখানা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯২২	বালক	
১০। শালকুমার হাট মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯২২	বালক	
১১। চেংমারী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৩১	বালক	বিদ্যালয়টি ১৯৫১ সনে অবলুপ্ত হয়।
১২। মহাকালগুড়ি মিশন ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৩১	সহশিক্ষামূলক	
১৩। কুমারগ্রামদুয়ার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৩৪	বালক	
১৪। আলিপুরদুয়ার বালিকা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৩৮	বালিকা	
১৫। কদমতলা বালিকা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় (জলপাইগুড়ি)	১৯৩৯	বালিকা	
১৬। মাণিকগঞ্জ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৪০	বালক	পূর্বে মধ্য বাংলা স্কুল হিসাবে আক্ষণ পাড়ায় চালু ছিল।
১৭। গ্যাড্‌রা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৪০	বালক	পূর্বে ইহা জমাদারপাড়া মধ্য বাংলা বিদ্যালয়রূপে পরিচালিত হইত, পরবর্তীকালে গ্যাড্‌রায় স্থানান্তরিত হয়।

বিদ্যালয়ের নাম	প্রথম প্রতিষ্ঠার তারিখ	বালক/বালিকা সহ শিক্ষামূলক বিদ্যালয়	মন্তব্য
১৮। আলিপুরদুয়ার ম্যাকউইলিয়ম মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৪১	সহশিক্ষামূলক	
১৯। ভাটিবাড়ী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৪২	বালক	
২০। রাজাডাঙ্গা পি, এম, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৪৩	বালক	
২১। জলেশ লক্ষীকান্ত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৪৪	বালক	
২২। বোনাপাড়া জয়ধরডাঙ্গা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৯৪৫	বালক	

[বিদ্যালয়টি স্থাপনকালে উহা অধুনা পূর্বপাকিস্তানভুক্ত জয়ধরডাঙ্গায় ছিল। কিন্তু তৎকালীন বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিত্যানন্দ রায় মহাশয় জেলা বোর্ডের তদানীন্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, রাতারাতি বিদ্যালয় গৃহ ভাঙ্গিয়া বোনাপাড়ায় লইয়া আসেন]

২৩। চুড়া ভাণ্ডার ভেলভেলা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ১৯৪৭ বালক

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জেলার জন্মলগ্নে সরকারী সেক্সাসের হিসাব অনুযায়ী এ জেলার মাত্র ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮৩ জন বালক অধ্যয়ন করিত। মোট ২২জন শিক্ষক এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান করিতেন। এই হিসাব সম্পর্কে ২য় পরিচ্ছেদে আমাদের সন্দেহ আগেই প্রকাশ করিয়াছি।

১৮৮২ সনে জেলা-সেস-কমিটি গঠিত হয়। এই সংস্থার শিক্ষাসম্পর্কীয় কার্যাবলীর বিশেষ রেকর্ড পাওয়া যায় না। তবে কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮৪ সন হিসাবে উল্লিখিত আছে দেখা যায়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, ১৭৮৪ সনে প্রথম স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত আইন প্রণয়নকালে, জেলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয় এবং নূতন বিদ্যালয়ের সৃষ্টি শুরু হয়।

১৮৮৭ সনে জেলা বোর্ড গঠিত হয়, এবং ঐ বৎসরই আর্থিক সরকারী সাহায্যের জন্য বোর্ড প্রার্থনা জানান। ঐ সময় হইতেই জেলা বোর্ড বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (মধ্য বাংলা ও মধ্য ইংরাজী) বিদ্যালয়ে সাহায্য দিতে শুরু করেন। তবে খুব সম্ভবতঃ প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ তখন পর্য্যন্ত সদর মহকুমাতেই পর্য্যবসিত ছিল।

১৮৯৪ সনে জেলা বোর্ড এই প্রস্তাব করেন যে, জেলার মোট ৮৪টি অনুদানভোগী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইয়া ৩৬ করা হউক,—তন্মধ্যে ২০টি সদর অঞ্চলে ও ১৬টি বোদা অঞ্চলে। মনে হয়, এই সময়ে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতাধিক ছিল, কারণ বহু বিদ্যালয় ছিল যাহারা কোন অনুদান পাইত না বা গ্রহণ করিত না। এই সময়ে আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে—ভাটিবাড়ী, মজিদখানা, শনশনাবাড়ী, শালকুমার, সাতালীতে,

এবং ফালাকাটা অঞ্চলে—ফালাকাটা, রায়চঙ্গা, জটেশ্বর এবং ধূপগুড়ির শালবাড়ীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বলিয়া জানা যায়। ঐ ১৮২৪ সনেই অনেকগুলি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় দেখা যায়। ১৮২১ সনের সেন্সাস অনুযায়ী বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বালকের সংখ্যা ছিল ৬,৫২২ ও বালিকার সংখ্যা ছিল ২১৩, অর্থাৎ মোট ৬৭৪২ জন।

বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গ প্রদেশে পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন স্কীম চালু হয় এবং তদনুযায়ী কিছু স্কুল গড়িয়া ওঠে, যেগুলির কর্তৃত্বভার জেলাবোর্ডের হস্তে গ্ৰস্ত হয়। এই স্কীম বঙ্গভঙ্গ রদের পরও চালু থাকে। প্রতি পঞ্চায়েতী ইউনিয়নে একটি স্কুল স্থাপিত হয় এবং ইহাদের নামকরণ হয় “মডেল প্রাইমারী স্কুল”। এই স্কুলগুলি স্থাপনের জন্য সরকার হইতে গৃহনির্মাণ ও অগ্রাগ্র ব্যয় বাবদ ১০০০ (এক হাজার) টাকা দেওয়া হইত এবং মাসিক ব্যয় বাবদ বালকদের স্কুলের ক্ষেত্রে মাসিক ১০ (দশ) টাকা অথবা ১১ (এগার) টাকা এবং বালিকাদের ক্ষেত্রে ১৬ (ষোল) টাকা দেওয়া হইত। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই জেলায় জেলা বোর্ড বহু বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন, এই বিদ্যালয়গুলিই “বোর্ড স্কুল” নামে পরিচিত ছিল।

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার জগৎ তদানীন্তন সরকার ১৯১৬ সনের ২২শে মার্চের ৭৩৩নং আদেশবলে চা-বাগান এলাকার শ্রমিকদের জগৎ স্কুল চালু করার নির্দেশ দেন। (Quinquennial Report of the Progress of Education in Rajshahi Division, 1927-32, Page-5 দ্রষ্টব্য)। এই বিদ্যালয়গুলি প্রথমাবস্থায় সরকারী বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হয়, কিন্তু ১৯৩০ সন নাগাদ ইহাদের দায়িত্ব গ্ৰস্ত হয় চা-বাগান কর্তৃপক্ষগুলির উপর। তবে, সরকার হইতে এই সময়ে বিদ্যালয়গুলিকে অনুদান দেওয়া হইত জেলা বোর্ডের মাধ্যমে। ১৯৩৪ সনে এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০৬ এবং ছাত্র সংখ্যা ১৮৭৫। (১৯৩৩-৩৪ সনের Public Institution Report দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা—৩৪।)

১৯২১ সনের সেন্সাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, জেলায় মোট শিক্ষকের সংখ্যা ছিল—পুরুষ—৪৬১, মহিলা-৭, মোট—৪৬৮ জন। তন্মধ্যে জেলা স্কুলে ১০জন, ফণীন্দ্রদেব, দেবীগঞ্জ ও আলিপুরদুয়ার মিলিয়া ২৮জন শিক্ষক ছিলেন এবং জেলার মোট ৮টি মধ্য ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যালয়ে ৩০জন শিক্ষক ছিলেন। অনুমিত হয় যে প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক ঐ সময়ে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতেন। ১৯২১ সনের যে সর্বভারতীয় সেন্সাস রিপোর্ট জলপাইগুড়ির কমিশনার অফিসে রক্ষিত আছে, ঐ রিপোর্টে শিক্ষকের সংখ্যার উল্লেখ থাকিলেও বিদ্যালয়ের সংখ্যার কোন উল্লেখ নাই। তবে মনে হয় যে, ৪০০জন প্রাথমিক শিক্ষক মহাশয় অন্যান্য পক্ষে ৩৫০টি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। ঐ সময়ে সাধারণতঃ খুব কম বিদ্যালয়েই একজনের বেশী শিক্ষক থাকিতেন।

১৯২৭-৩২ সনের Quinquennial Report on the Progress of Education in Rajshahi Division এ দেখা যায় যে, ১৯৩২ সনে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় ১০৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তন্মধ্যে ১টি সরকারী স্কুল, (গুরু ট্রেনিং স্কুল সংলগ্ন Practising Primary School), ২৩১টি জেলা বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়, ২টি Biss' Scheme School (মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত) এবং ১২৩টি সাহায্যহীন বিদ্যালয়সহ ৮৪১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯২৭ সনে এই সংখ্যা ছিল ২৫৪। (ঐ রিপোর্টের ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৯৩০ সনে বঙ্গীয় (গ্রাম্য) প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক আইন চালু হয়। কিন্তু এই জেলায় ঐ আইন অনুযায়ী স্কুল বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৬ সনে। কিন্তু জেলা স্কুল বোর্ড চালু হইবার পূর্বেই, জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ড ১৯৩৩-৩৪

সনে তাহাদের পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয়ে বিনা-বেতনে শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, জেলা বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়েও ইতিপূর্বে বেতন আদায় করা হইত।

জেলা স্কুল বোর্ড চালু হওয়ার সময় খুব সম্ভবতঃ জেলা বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫০এর উর্দে ছিল না। কারণ দেখা যায় যে, ১৯৩২ সনে ঐ সংখ্যা ২৩১ ছিল, যদিও ঐ সময় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০৭৫। কাজেই একথা বলা চলে যে, জেলা স্কুল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন স্তর সম্প্রসারণের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই।

জেলা স্কুল বোর্ডের প্রতিষ্ঠার পর ৮ বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৪ সন পর্যন্ত ঐ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার মহোদয়গণ। এই সময় ঐ বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন রায়বাহাদুর জয়গোবিন্দ গুহ। ঐ পদে থাকাকালীন সময়েই তাঁহার মৃত্যু হয়। রায়বাহাদুর বিপুলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর ঐ পদে সমাসীন হন। অবশ্য প্রথম হইতেই তিনি এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন। জেলা স্কুল বোর্ডের প্রথম বেসরকারী প্রেসিডেন্ট হন খানবাহাদুর মখলেছুর রহমান। স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই সময় বর্তমান (বিভক্ত) জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয় তাহা ছিল ৬০৪। কিন্তু স্বাধীনতার সময়ে এই অংশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৫৮—সমস্ত বিদ্যালয়ই ছিল সহশিক্ষামূলক। (Quinquennial Review on the Progress of Education in West Bengal 1942-43 to 1946-47, দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা-১৫)। এছাড়া রেলওয়ে পরিচালিত একটি বালিকাদের জন্ম প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল দোমহনীতে। মোট ছাত্র সংখ্যা ২৩,৫৭২র মধ্যে বালক ছিল—১২,৬৭০ জন ও বালিকা—১০,৯০২ জন। জেলার মিউনিসিপ্যাল এলাকা সহ মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৮০, তন্মধ্যে ১৮টি ছিল সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, ২টি ছিল মিউনিসিপ্যালিটি (জলপাইগুড়ি) পরিচালিত বিদ্যালয় (Biss' Scheme), এবং ১টি ছিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (Practising Primary School)। মোট ছাত্র সংখ্যা ২৪,৩৩৫এর মধ্যে বালক ছিল ২০,৬২১ ও বালিকা ৪,৭১৪। (পূর্বোক্ত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের জেলার কলেজীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা

১৯৪০ সন পর্যন্ত এ জেলায় কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র কলনায় ছিল। ইতিপূর্বে এ জেলার আলিপুর-দুয়ার মহকুমার ছাত্রগণ সাধারণতঃ কুচবিহার বা রংপুর কলেজে, এবং জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার ছাত্রগণ রংপুর, রাজশাহী বা কলিকাতায় পড়িতে যাইতেন। তবে কিছু সংখ্যক ছাত্র কুচবিহারেও পড়িতে যাইতেন জলপাইগুড়ি হইতে; কারণ, কুচবিহার কলেজে ব্যয়ের মাত্রা বেশ কম ছিল। ১৯৪৩ সনেও কুচবিহার কলেজে বি, এ, ক্লাসের বেতন ছিল ৫ টাকা এবং ছাত্রাবাসের মাসিক খরচ ছিল ১১ টাকা।

১৯৪১ সনে প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রূপ লইতে শুরু করে। জলপাইগুড়ি শহরের বঙ্কিম পরিবার রাহতরা অগ্রসর হ'ন। আনন্দ চন্দ্র রাহতের জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিনীকান্ত রাহত মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে শহরের উপর ৪ বিঘা জমি ও নগদ পঁচিশ হাজার টাকার মত দান করেন। এছাড়া প্রাথমিক গৃহ-

সংস্থানেরও ব্যবস্থা করেন। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন সোনাউল্লাহ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তরনী মোহন চক্রবর্তী মহাশয় এবং সদর উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দেবেন্দ্র কুমার চন্দ।

১২৪২ সন হইতে কলেজের কাজ শুরু হয়। কলেজের নাম হয় আনন্দ চন্দ্র কলেজ। ঐ বৎসর ছাত্র সংখ্যা ছিল ২১। পরবর্তী বৎসরে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ২১১। কলেজের কার্য্যারম্ভে অবৈতনিক অধ্যাপকদের মধ্যে ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ও ছিলেন। ঐ সময়েই প্রথমে অধ্যাপক ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (অবশ্য তিনি তখনও ডক্টরেট হন নাই) ও পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশদের অন্ততম বল্যাণভূষণ চক্রবর্তী এই কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রথম অধ্যক্ষ কে, সি, দেব। অক্রেয় অধ্যক্ষ ইন্দুভূষণ মজুমদার বহুকাল এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং এখান হইতেই অবসর গ্রহণ করেন।

১২৪৮ সনে বি, এ, ক্লাস খোলা হয়। ১২৪৭ সনে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫৮২।

১২৫০ সনে প্রসন্নদেব বালিকা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রধানতঃ রাজা প্রসন্নদেবের সহধর্ম্মিণী অশ্রমতী দেবীর বদান্ধতায়, নগেন্দ্র নাথ মল্লানবীশ, জীবনগতি রায় ও রায়বাহাদুর বিপুলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ইহা গড়িয়া উঠে। প্রথমে সদর গার্ল'স স্কুলে এই মহাবিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। এই সময়ে স্থনীতিবালা চন্দ মহাশয়া এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অস্থায়ী এবং অবৈতনিকভাবে। প্রথম নিয়োজিত অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন এস, রায় চৌধুরী মহাশয়া। কিছুদিন পরেই অবশ্য চারুপমা বোস মহাশয়া এই মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রায় ১১ বৎসর অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এই মহান দায়িত্ব পালন করেন এবং ইহার উন্নতির জন্য প্রভূত সহায়তা করেন।

১২৫৭ সনে আলিপুরদুয়ার কলেজ এই জেলার কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আসরে নিজের স্থান বাছিয়া লয়। এই মহাবিদ্যালয় স্থাপনার ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার ম্যাক্‌উইলিয়াম স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের অবদান অস্বরণীয়। তিনি এই কলেজের জন্ম প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘা জমি বিনামূল্যে সংগ্রহ করিয়া দেন। জলপাইগুড়ির স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ ও সমাজসেবী সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায় মহাশয়ও এই বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী ও গৃহ-নির্মাণের ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাক-স্বাধীনতাকালে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা

(ক) শিক্ষক-শিক্ষণ :—১৮৭৮ সনের পূর্বে জলপাইগুড়িতে একটি নর্ম্মাল স্কুল ছিল। এই বিদ্যালয়ে ভাবী গুরুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জ্ঞান পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইত তিন বৎসর ধরিয়া। এই বিদ্যালয়ে যে সব গুরুমহাশয় শিক্ষা লাভ করিতেন, তাঁহাদের বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, পাটিগণিত ও বীজগণিত, জ্যামিতি ও রেখামিতি, ভূগোল ও সাধারণ ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানার্জন হইত। কেবলমাত্র ইংরাজী পড়ার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। অবলীলাক্রমে এইসব গুরুমহাশয়গণ Algebraর অঙ্ক বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিলে অনায়াসে তাহা কথিয়া দিতেন।

এই নর্ম্মাল বিদ্যালয়টি ১৮৭৮ সনে রংপুরে উঠিয়া যায়।

পরবর্তীকালে সদর মহকুমার পচাগড়ে (খুব সম্ভবতঃ ১২০০ সনে) ও আলিপুরদুয়ার মহকুমার ভাটিবাড়ীতে (১২০৪ সনে) দুটি গুরু ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলগুলিকে Old Type G. T. School বলা হইত। পচাগড় বর্তমানে পাকিস্তানভুক্ত হওয়ায় ঐ সময়কার কোন তথ্যই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ ভাটিবাড়ী গুরু ট্রেনিং স্কুলের যিনি হেডপণ্ডিত ছিলেন, তিনি আজও জীবিত আছেন। ১২৬৮ সনে তাঁহার এক শত বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় মহেশ চন্দ্র সরকারের নিকট হইতেই ভাটিবাড়ী নর্মাল স্কুল ও আলিপুরদুয়ার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সম্পর্কীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সরকার “Narrow gauge” এর গাড়ীতে ১২০৪ সনে আলিপুরদুয়ার মহকুমা সহরে আসিয়া পৌছান। ঐ লাইনের নাম ছিল তখন C. B. S. R. (Cooch-Bihar State Railway)। গীতালদহ হইতে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ঐ লাইন চালু ছিল। আলিপুরদুয়ার শহরের পার্শ্ববর্তী নদী কালজানীর অপর পাড়ে “খোন্টা” কুচবিহার রাজ্যের একটি বড় গঞ্জ ছিল। এই গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার মহকুমা শহর হইলেও, তাহার অপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল। সরকার মহাশয় আলিপুরদুয়ার হইতে গো-ষানে ভাটিবাড়ী পৌছান। তখন সরকার মহাশয়ের মাসিক বেতন নির্ধারিত ছিল ২০ (কুড়ি) টাকা। সহকারী পণ্ডিত মহাশয়ের বেতন নির্ধারিত ছিল ১০ (দশ) টাকা। এই সহকারী পণ্ডিত মহাশয়ের উপর সংলগ্ন মডেল প্রাইমারী স্কুল বা Practising Primary School এর দায়িত্ব থাকিত। ইনি সাধারণতঃ গুরু ট্রেনিং স্কুল হইতে পাশ করা “ভাল-ফল-প্রদর্শনকারী” ছাত্র হইতেন।

১২০৮ সনে ভাটিবাড়ী গুরু ট্রেনিং স্কুলের স্থান পরিবর্তন ঘটে। উহা উঠিয়া আলিপুরদুয়ারে আসে। ১২১৪ সনে ঐ গুরু ট্রেনিং স্কুল ও পচাগড়ের গুরু ট্রেনিং স্কুল উভয়েরই অবলুপ্তি ঘটে, এবং জলপাইগুড়িতে Reformed type Guru Training School স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে যেখানে Junior Basic Training College আছে, সেখানেই উহার অবস্থান ঘটে।

দ্বিজেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত মহাশয় এই Reformed type Guru Training School এর প্রথম হেডমাষ্টার ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্ম ছাত্র সংখ্যা নির্ধারিত ছিল ৪০ কিন্তু প্রথম বৎসরে মাত্র ৩২ জন ভর্তি হয়। এই বিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা বেশীদিন প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন হরিচরণ অধিকারী মহাশয়। এই ১২৬৮ সনে তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর। তিনি ১২২৬ সনের মার্চ মাস হইতে ১২২৯ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রথম দফায় কাজ করেন, এবং ২য় দফায় ১২৩৪ সনের আগষ্ট মাস হইতে ১২৩৯ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কাজ করেন। তাঁহারই এক ছাত্র শ্রীসুরেন্দ্র মোহন শাস্ত্রী মহাশয় এখন জলপাইগুড়ি জেলার একজন বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের অগ্রতম।

বর্তমান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (শ্রীযুক্ত শিবচরণ ভট্টাচার্য্য) মহাশয়ের পিতৃদেব দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ১২৪৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১২৪৯ সনের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং এই বিদ্যালয় হইতেই অবসর গ্রহণ করেন।

১২৫০ সনে এই বিদ্যালয়টি নিম্ন বৃনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়রূপে রূপান্তরিত হয়।

*

*

*

*

শিল্প বিদ্যালয় :— এ জেলায় দুটি শিল্প বিদ্যালয় চালু ছিল— উভাই ছিল বয়ন বিদ্যালয়। তন্মধ্যে একটি ছিল আলিপুরদুয়ার মহকুমার শামুকতলা নামক স্থানে, অপরটি সদর মহকুমার মণ্ডলঘাট এলাকায়। উভয় বিদ্যালয়ই

খুব সম্ভবতঃ ১৯৩০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়গুলি ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় হিসাবে পরিচালিত হইতে থাকে। বর্তমানে ঐ বিদ্যালয় দুটির একটি মাত্র এই জেলায় চালু আছে। অপরটি উঠিয়া অপর জেলায় চলিয়া গিয়াছে।

*

*

*

*

মেডিকেল স্কুল :—জলপাইগুড়ি শহরেই ১৯৩০ সনে জ্যাকশন মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। ইহা সরকারী পরিচালনাধীন ছিল এবং জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জনই ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রতি বৎসর ৪০ জন ছাত্র লওয়া হইত। উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা হইতেই ছাত্র সমাগত হইত এবং স্থানীয় অধিবাসীরাও বহু ছাত্রের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন। এই বিদ্যালয় হইতে ন্যূনপক্ষে ২০ বৎসরে প্রায় ৬০০।৭০০ ছাত্র L. M. F. ডিপ্লোমা লইয়া জীবিকার্জনের পথে পা বাড়াইয়াছেন। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন চা-বাগানি এলাকায়, এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ডাক্তারের অভাব পূরণ করিয়াছেন। বিভিন্ন জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁহাদের উপর হস্ত হইয়াছে। এই ম্যালেরিয়া আধুষিত অঞ্চলে (অবশ্য ১৯৫৪ সনের পর হইতে এই রোগ প্রায় নির্মূল হইয়া গিয়াছে) এই বিদ্যালয় হইতে সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রগণ জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সরকারী নীতি পরিবর্তনের ফলে, ১৯৫০ সন হইতে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি বন্ধ হয়, কারণ L. M. F. ডিপ্লোমা কোর্স উঠাইয়া দেওয়া হয়। ডিপ্লোমা কোর্স বন্ধের ফলে সরকার কতটুকু লাভবান হইয়াছেন জানিনা; কিন্তু এই জেলার অধিবাসীগণ যে সহজলভ্য চিকিৎসার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে শিক্ষার প্রসার ও তদীয় পরিসংখ্যান

পরাদীনতার শৃঙ্খলমুক্তির পর সাধারণতঃ সবদেশেই একটা চাকল্য দেখা দেয়। বাঁধভাঙ্গা জলের মত দুর্বীর বেগে জাতির প্রাণশক্তি ধাবিত হয়। বাঁধভাঙ্গা জল যদি কোন প্রাচীন খাত পায়, তবে যেমন তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পার্শ্বের অস্থবর জমিতে প্রাণ সঞ্চার করে, তেমনি এই জীবনীশক্তিও ঠিক ঠিক পথ খুঁজিয়া পাইলে জাতির উন্নতি দ্রুত লয়ে চলিতে থাকে। কিন্তু সব জল যেমন খাত পায়না, ফলে বহু গ্রাম নগর ধ্বংস করে, তেমনি এই জীবনীশক্তির প্রবাহের বহুলাংশ খাত না পাইয়া, পার্শ্বে যাহা পায় তাহাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। আমাদের দেশেও স্বাধীনতার পর শিক্ষাক্ষেত্রে এই একই রূপ দেখিতে পাই।

স্বাধীনতার পর যেমন স্কুল কলেজের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ছাত্রসমাগমে শিক্ষায়তনগুলি উদ্বেলিত হইয়াছে, তেমনি আবার ঠিক খাত না পাইয়া তীরের জনপদ ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে—অর্থাৎ সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। সংখ্যাগত বৃদ্ধি হইয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সমীক্ষার সময় আসিয়াছে।

স্বাধীনতার পর জলপাইগুড়ির শিক্ষা ব্যবস্থায় যে উন্নতি হইয়াছে ও সুযোগ আসিয়াছে তাহার কতটা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা লইতে পারিয়াছেন, তাহা বোঝা যাইতেছে না, কারণ কোন Public Examinationএ জেলাগতভাবে পরীক্ষার ফল যে খুব ভাল হয়, তাহা বলা যায় না। যদিও ২৫টি বিদ্যালয় আছে যাহাদের পরীক্ষার ফলাফল সব সময়েই ভাল ছিল এবং এখনও আছে।

পরবর্তী তালিকায় ১৯৪৭ সনে কোন ধরনের শিক্ষালয় কতগুলি এ জেলায় ছিল এবং তাহাদের ছাত্র সংখ্যা কত ছিল এবং পরবর্তীকালে ১৯৫১ সনে (প্রথম পরিকল্পনা শুরু করার সময়ে), ১৯৫৬ (১ম পরিকল্পনা শেষ ও ২য় পরিকল্পনা শুরু), ১৯৬১ (২য় পরিকল্পনা শেষ ও ৩য় পরিকল্পনা শুরু) এবং ১৯৬৬ (৩য় পরিকল্পনা শেষ) সনে কি অবস্থা ছিল, তাহা উল্লেখ করা হইল।

বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে বালক-বালিকাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা পৃথকভাবে দেখানো হইয়াছে।

— এই পরিসংখ্যানগুলির ভিত্তিতে দেখা যাইবে যে, এই জেলার শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৯৪৭ সনের সহিত তুলনামূলক হিসাবে প্রায় প্রতিদিকেই শিক্ষার উন্নততর সুযোগের ব্যবস্থা হইয়াছে : কিন্তু, একটি ক্ষেত্রে পূর্বে যে সুযোগ ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে বিশেষ কোন সুযোগ আসে নাই।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে, ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে চতুর্গুণ ১৯৪৭ সনের তুলনায়।

মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে এই ২০ বৎসরে, এবং ছাত্রসংখ্যা দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিগত দুই দশকে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে ছয়গুণেরও বেশী এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে সাড়ে আটগুণের বেশী।

সাধারণ কলেজের সংখ্যা ১৯৪৭ সনে ছিল এক। তাহা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া তিনটি হইয়াছে ১৯৬৬তে— ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে আটগুণের বেশী।

যন্ত্রবিদ্যা ও প্রয়োগবিদ্যার ক্ষেত্রে যেখানে ১৯৪৭ সনে কোন সুযোগই ছিলনা সেখানে ১টি জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, একটি পলিটেকনিক ও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই তিনটি বিদ্যালয়ে ৮০০/২০০ ছাত্রের পড়ার সুযোগ রহিয়াছে।

শিক্ষক শিক্ষণের সুযোগ ১৯৪৭ সনে কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাও মাত্র ৮০ জনের জন্ম, উহা সম্প্রসারিত হওয়ায় এখন ২১০ জনের জন্ম সুযোগ হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্ম কলিকাতা অথবা তৎসংলগ্ন স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং সারা বাংলার প্রতিযোগিতায় এই জেলার জন্ম ৩৪টির বেশী আসন কখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। অথচ এখন এ জেলাতেই ১২০টি আসন বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

১৯৪৭ সনে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৬—১১ বৎসরের বালক বালিকার শতকরা মাত্র ২৫.৩৩ জন বিদ্যালয়ে আসিত। ছেলেদের ক্ষেত্রে ৩৮.২ জন এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে মাত্র ১১.৭৬ জন বিদ্যালয়ে আসিত।

১৯৬৬ সনে সেক্ষেত্রে ৬—১১ বৎসরের বালক বালিকাদের মধ্যে ৬৭.৮৭ জন বিদ্যালয়ে আসে। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা শতকরা ৮৩.১৩ জন আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ৫২.৬১ জন।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যে পশ্চাতে আছি, ইহা নিঃসন্দেহ।

শিক্ষিতের হারের হিসাবে দেখা যায় যে, যেখানে ১৮৭২ সনে শিক্ষিতের হার ছিল আনুমানিক শতকরা ১'৪৫%, ১৯৬১ সনের হিসাব অনুযায়ী দাঁড়াইয়াছে ১৯'৩২। পুরুষদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই হার শতকরা ২৭'৭৫%।

এ ব্যাপারে আমরা প্রতি ৮ বৎসরে শতকরা এক ভাগ হারে অগ্রসর হইতেছি, ইহা অবশ্য স্লামার বিষয় নহে।

১৯৪৭ সনে শিক্ষিতের হার ছিল ৯'৮১% অর্থাৎ জেলা গঠনের ৭৫ বৎসর পরেও ব্রিটিশ শাসনাধীনে শিক্ষিতের হার প্রতি ১৬ বৎসরে শতকরা একভাগ হারে বাড়িয়াছে। সেক্ষেত্রে ১৯৪৭ হইতে ১৯৬১ এই ১৪ বৎসরে শিক্ষিতের হার ৯'৮১% হইতে ১৯'৩২% অর্থাৎ দ্বিগুণ হইয়াছে বলা চলে। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির গতি এখন দ্রুততর হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতি দেড় বছরে শিক্ষিতের হার শতকরা এক ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আশা করা যায় ১৯৭১ সনে এই হারের গতি আরও দ্রুত হইবে এবং বৎসরে অন্ততঃ শতকরা দুইভাগ হারে বৃদ্ধি দেখা যাইবে।*

* এই প্রবন্ধটি রচনাকালে জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীশিবচরণ ভট্টাচার্য লেখককে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

પરિસંખ્યાન

[illegible]

[পর পৃষ্ঠায় আছে ।]

ପଦ୍ମିନୀସ୍ଥାନ

শিক্ষালয়ের বিবরণ	১৯৬৭			১৯৬৮			১৯৬৯			১৯৭০			১৯৭১			মন্তব্য	
	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট		
শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় :	সংখ্যা—	২	২	৩৩১		১	১		১	২		২	২		২	৩৩ গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়দ্বারা	
[বর্তমান বিনিয়োগী	ছাত্র ছাত্রী—	৫২	৫২	২৮	১১	৩৯	৪৪	২	৫৩	২৮	১৫	১১৩	১২৪	৬৬	১৯০	উন্নতি একটি বিনিয়োগী শিক্ষণ	
শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়]	ব্যয়—	পাওয়া যায় নাই			৮,২০৮		৮,২০৮	২,২১৫		২,২১৫	১৪,৬২৩		১৪,৬২৩	পাওয়া যায় নাই		বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।	
কারিগরী বিদ্যালয় :	সংখ্যা—			১		১	১		১	১		১	১		১		
(পলিটেকনিক)	ছাত্র ছাত্রী—			১১২	১৬	১২৮	২৬১	৩২	২৯৩	৫০২	৫	৫১৪	৬১০		৬১০		
	ব্যয়—			৩৭,১২১		৩৭,১২১	১,১২,১২৮		১,১২,১২৮	২,৭৪,১২৩		২,৭৪,১২৩	পাওয়া যায় নাই				
মেডিকেল স্কুল :	সংখ্যা—	১		১													
	ছাত্র ছাত্রী—	১১২		১১২													
	ব্যয়—	পাওয়া যায় নাই															
ফার্মাসী ট্রেনিং সেন্টার :	সংখ্যা—			১		১	১		১	১		১	১		১	@ পূর্বতন মেডিকেল স্কুলের	
	ছাত্র ছাত্রী—			@ ১৩৬	১	১৩৭	৫৩		৫৩	৫৪		৫৪	৬৬		৬৬	৮৬ জন ছাত্র এই সংখ্যার	
	ব্যয়—			৮৪,৪২০		৮৪,৪২০	৩২,৬২৮		৩২,৬২৮	৪৬,৬০১		৪৬,৬০১	৬৮,৮৮৩		৬৮,৮৮৩	অঙ্গীভুক্ত।	
নাসেস ট্রেনিং সেন্টার :	সংখ্যা—										১	১		১	১		
(দ্ব্যর্থীবিজ্ঞান বিদ্যালয়)	ছাত্র ছাত্রী—										৫৩	৫৩		৩৮	৩৮		
	ব্যয়—										৮০,৮৮৪	৮০,৮৮৪	*	৬৮,২৮৬	৬৮,২৮৬		
শিল্প বিদ্যালয় :	সংখ্যা—	২		২		২	২		২	৪		৪	২		২		
	ছাত্র ছাত্রী—	৪	১৬	২০		১৮	১৮	১	২৬	২১	২৬	৪৭	২	২৭	৩৬		
	ব্যয়—	পাওয়া যায় নাই			২,২২১		২,২২১	১০,০৫৩		১০,০৫৩	৩০,৭৬২		৩০,৭৬২	২৮,৫১৪		২৮,৫১৪	
শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় :	সংখ্যা—									১		১	১		১		
(B. T. College)	ছাত্র ছাত্রী—									৫৪	৩০	৮৪	৮৮	৩৮	১২৬		
	ব্যয়—									৮৮,০০০		৮৮,০০০	১,১৫,০০০		১,১৫,০০০		
										(আনুমানিক ব্যয়)							
কারিগরী মহাবিদ্যালয় :	সংখ্যা—									১		১	১		১		
(Engineering College)	ছাত্র ছাত্রী—									৬৬		৬৬	১৬২		১৬২		
	ব্যয়—									৬৪,৫১৫		৬৪,৫১৫	৫,৮৫,০২০		৫,৮৫,০২০		
মহাবিদ্যালয় (কলেজ) :	সংখ্যা—	১		১	১	২	১	১	২	২	১	৩	২	১	৩		
	ছাত্র ছাত্রী—	২২৮	৪১	৩০৯	৩১২	২০২	৫১৪	৩১৪	২৮৬	৬০০	৮৪৪	৬৩৫	১,৪৭২	১,৭১০	১,০১৭	২,৭২৭	

—: পরিশিষ্ট :—

জেলায় বিভিন্ন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির নাম ও ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে অনুমোদিত
বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা। (১৯৬৮ সন পর্য্যন্ত)

ক্রমিক নং ১	বিদ্যালয়ের নাম ২	ডাকঘর ৩	যে বিষয়গুলি অনুমোদিত ৪	মন্তব্য ৫
১।	জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়	জলপাইগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান, কারিগরী	
২।	ফণীন্দ্রদেব ইন্সটিটিউশন	ঐ	কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য	
৩।	সোনাউল্লাহ ইন্সটিটিউশন	ঐ	কলা, বিজ্ঞান	
৪।	জলপাইগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	কলা ও বিজ্ঞান	
৫।	আলিপুরদুয়ার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	আলিপুরদুয়ার	কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য	
৬।	আলিপুরদুয়ার কলেজিয়েট বিদ্যালয়	আলিপুরদুয়ার কোর্ট	কলা, বিজ্ঞান	
৭।	ম্যাকউইলিয়ম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	কলা, বিজ্ঞান	
৮।	মাল আদর্শ বিদ্যাভবন	মাল	কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য	
৯।	ময়নাগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ময়নাগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য	
১০।	ধূপগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ধূপগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান	
১১।	দেশবন্ধুনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জলপাইগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	
১২।	ইউনিয়ন একাডেমী	কালচিনি	কলা, বিজ্ঞান	
১৩।	লাটাগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	লাটাগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান	
১৪।	ওদলাবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মানাবাড়ী	কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য	
১৫।	বীরপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বীরপাড়া	কলা, বিজ্ঞান	
১৬।	বেলাকোবা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	প্রশন্ননগর	কলা, বিজ্ঞান	
১৭।	সতীশ লাহিড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দেবনগর	কলা, কৃষি	
১৮।	মদনসিংহ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কুমারগ্রামদুয়ার	কলা, বিজ্ঞান	
১৯।	কামাখ্যাগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কামাখ্যাগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান	
২০।	বানারহাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বানারহাট	কলা, বিজ্ঞান	
২১।	মেটেলী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মেটেলী	কলা, বিজ্ঞান	
২২।	চেংমারী চা বাগান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সাধুপুর-চেংমারী	কলা, বাণিজ্য	
২৩।	নাগরাকাটা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	নাগরাকাটা	কলা, বিজ্ঞান	
২৪।	রেমণ্ড মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট	ফালাকাটা	কলা, কৃষি	

২৫। আনন্দ মডেল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জলপাইগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান
২৬। জলেশ লক্ষীকান্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জলেশ মন্দির	কলা, বিজ্ঞান
২৭। মোহিতনগর তারাপ্রসাদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোহিতনগর	কলা, বিজ্ঞান
২৮। শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ	শিলিগুড়ি	কলা
২৯। আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে বিদ্যালয়	আলিপুরদুয়ার জংশন	কলা
৩০। মহাকালগুড়ি মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সান্তালপুর	কলা
৩১। হাসিমারা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাসিমারা	কলা
৩২। মোহনসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	রাঙ্গালীবাজনা	কলা
৩৩। জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়	জলপাইগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, চাকরকলা
৩৪। সদর বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য
৩৫। আলিপুরদুয়ার বালিকা বিদ্যালয়	আলিপুরদুয়ার	কলা, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, চাকরকলা
৩৬। আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	কলা, বিজ্ঞান
৩৭। সেন্ট্রাল গার্লস স্কুল	জলপাইগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
৩৮। কদমতলা বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
৩৯। ময়নাগুড়ি বালিকা বিদ্যালয়	ময়নাগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান
৪০। সোনালী বালিকা বিদ্যালয়	জলপাইগুড়ি	কলা, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
৪১। আলিপুরদুয়ার জংশন বালিকা বিদ্যালয়	আলিপুরদুয়ার জংশন	কলা
৪২। সুভাষিনী বালিকা বিদ্যালয়	মাল	কলা

জলপাইগুড়ি জেলার সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীভবরঞ্জন গাঙ্গুলী

যদিও গহন অরণ্যে, লোকালয়ের বহুদূরে, মানব দৃষ্টির অন্তরালে ফুল ফোটে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে, তার তথ্য প্রকাশ পায় অত্যাশাহী দুর্গম পথযাত্রীর কাছে, কিন্তু লোকালয়ে সব কিছু গড়ে উঠে প্রয়োজনের তাগিদে। বহুকাল যে জমি পড়ে থাকে অবহেলায়, উপেক্ষায়, এমন একদিন হয়ত আসে, এমন তাগিদেই সৃষ্টি হয়, যার ফলে সেই উপেক্ষিত, অবহেলিত ভূখণ্ডে গড়ে তোলা হয়, বিরাট বিরাট অট্টালিকা, কোথাও বা মানুষের বসবাসের জন্য, কোথাও বা কল কারখানার জগু। আবার কোথাও সেই জমি শস্ত্রোৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

জলপাইগুড়ি জেলাও একশত বৎসর পূর্বে গড়ে উঠেছিল তৎকালীন প্রয়োজনের তাগিদে তার পারিপার্শ্বিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ঘটনাবলী ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। সহর জলপাইগুড়িও গড়ে তোলা হয়েছিল, জেলারই প্রয়োজনে। একশত বৎসর সময়ের দিক থেকে খুব বেশী না হলেও সেই একশত বৎসর অনগ্রসরে উত্তরবঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে বিপুল প্রসার ঘটেছে তা প্রকৃতই অভাবনীয়। বাংলাদেশের মধ্যে উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী বিভাগ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী অনগ্রসর। হিমালয়ের সন্নিকটবর্তী এলাকা ছিল অরণ্যময়ী সঙ্কুল। পথ ঘাট সবই ছিল দুর্গম। খরশ্রোতা ছোট বড় বহু পার্বত্য নদী অধ্যুষিত ছিল এই অঞ্চল। শিক্ষাদীক্ষায় ছিল, এযুগের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই অনগ্রসর। আহা, বসনে, ভূষণেও তার পরিচিতি এরূপই ছিল। সে সময় এই গুটীমিকায় নতুন করে এই জেলা ও রাজশাহী বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার্স এই জেলারই সহরে গড়ে তোলা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে একান্ত উত্তমশীল ইংরেজ জাতির উৎসাহ ও উদ্যোগে গড়ে উঠলো এই জেলা ও সহর। তাকে শিক্ষায় দীক্ষায়, কৃষ্টিতে, শিল্পে সবদিক থেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে এলেন উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে পাবনা জেলা থেকে ও পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমা থেকে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি। পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে বহু জায়গার লোকই অবশ্য স্ব স্ব প্রয়োজনের তাগিদে বাষ্টি বা গোষ্ঠীগত ভাবে এ জেলায় চলে আসেন ও গড়ে তোলেন জেলাটাকে সবদিক থেকে যুগের সঙ্গে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য রেখে।

ঐ সময় আর্থিক অভাব এদেশে ছিল। ছিল মনে উদারতা। কিন্তু কোথাও কোথাও স্বশৃঙ্খল জীবন যাপনের ধারায় কিছু কিছু পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হলো। সমাজকে নিয়ম কাহুন ও সুরুচি দিয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল করে তোলার প্রশ্ন অনেকের মনে জেগে উঠলো। কিন্তু কোন দিনই এদেশে বেশী লোক এক সঙ্গে এজাতীয় কাজে প্রথমে অগ্রসর হন না। হয়ত একজন অগ্রণী হন, তারপর তাঁর সহযোগিতায়, সহায়তায় আসেন আরও অনেকে। এমনি করে নানাভাবে গড়ে তোলা একটি জিনিষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে আরও বহু।

ঐরূপ এক সময়ে জলপাইগুড়ির তৎকালীন এক উত্তমশীল যুবক, বিশিষ্ট আইনজীবী ৬শশীকুমার নিয়োগী এম, এ, বি, এল, মহাশয় সমাজ শৃঙ্খলা, সমাজ কল্যাণ ও পারস্পরিক হৃদয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে একটি স্বস্থ পরিবেশ

সৃষ্টি করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে “ত্রিশ্রোতা” নামে একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সম্পাদনায় মাসুকের স্তম্ভ স্তম্ভ জীবনদারার অমূল্য সঙ্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা ও তৎকালীন এই অঞ্চলের বিভিন্ন ঘটনাবলীর তথ্য প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু তিনি অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হন। পত্রিকা সম্পাদনার মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করতে তখনই আর কেহ বোধ হয় অগ্রসর হন নি তাই দীর্ঘকাল এই অঞ্চলের সংবাদ প্রচারের এই ব্যবস্থা তথা পত্রিকাখানা বন্ধই হয়ে যায়।

তার দীর্ঘকাল পর জ্যোতিষ সান্যাল নামে একজন স্থানীয় বিশিষ্ট আইনজীবী সাংবাদিক, সাহিত্যিক তেজস্বী নাগরিক এ পথে অগ্রসর হন। এখন থেকে প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্বে তিনি ‘জনমত’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা গড়ে তোলেন। দীর্ঘকাল কাগজখানা চলার পর তিনিও অকালেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তারপর স্থানীয় অগ্রতম উদীয়মান উকীল, সাহিত্যিক ও সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক এম, এ, বি, এল, উহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তারপর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আইনজীবী শ্রীকুমুদিনী কান্ত চক্রবর্তী, বর্তমান লেখককে সহায়ক করে পত্রিকাটি চালাতে শুরু করেন। তারপর বিশিষ্ট চিকিৎসক, স্থলেখক, দেশনেতা পরবর্তীকালে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত ডাঃ চারু চন্দ্র সান্যাল এম, এস, সি, এম, এল, সি, কয়েক বৎসর উহার সম্পাদনা করেন। তারপর শ্রীমুকুলেশ সান্যাল উহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং তাই চলছে।

‘জনমত’ পত্রিকা সম্পাদনের মাঝামাঝি সময়ে, Barendra নামে একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনাও শুরু করেন ও জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল মহাশয়। উদ্দেশ্য ছিল, অনগ্রসর উত্তরবঙ্গের কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিচয় দান এবং আরও অগাধ বিষয়। কিন্তু জ্যোতিষবাবুর নির্ভীকতার চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকায় অত্যন্ত সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি যেমন তৎকালীন বৈদেশিক সরকারের অপ্রীতিভাজন হয়, তেমনি চাকর প্রভৃৎ প্রধান এই সহরের বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশ এর উপর বিরূপ হতে থাকেন। তখনও এ অঞ্চল তেমন জাগ্রত ছিল না। এত স্থূল, কলেজ ও শিক্ষার এত ব্যাপক প্রসার ছিল না। ফলে এরূপ একখানা ইংরেজি কাগজ চালাবার পক্ষে পাঠকের সংখ্যা খুব বেশী হতে পারেনি। তাই এই ইংরেজি কাগজখানার বিলোপ ঘটে অকালে। তথাপি জ্যোতিষবাবু তাঁর নীতির পরিবর্তন করেননি।

‘জনমত’ পত্রিকা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ প্রায় ৪৬ বৎসর পূর্বে, তৎকালীন এক উদীয়মান আইনজীবী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজসেবী, সমাজ কলাগ কামী ও সুরেশ চন্দ্র পাল এম, এ, বি, এল, “ত্রিশ্রোতা” (সাপ্তাহিক) পত্রিকা পুনঃ প্রবর্তন করেন। দীর্ঘকাল চালাবার পর, তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে, ও সত্যেন্দ্র নাথ মৌলিক এম, এ, বি, এল, সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর পর অস্থায়ীভাবে শ্রীঅজিত কুমার রায় ত্রিশ্রোতার সম্পাদনা করেন এবং তারপর থেকে বর্তমান লেখক এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং সে ব্যবস্থাই চলছে।

১৯২৮ সনে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় ও বর্তমান লেখকের সহযোগীতায়, “মুক্তিবানী” নামে পত্রিকাখানা প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা আইন অমান্য আন্দোলন কালে দেশের জনগণকে অহুপ্রেরণা দান এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় ও অন্যান্য রচনা প্রকাশের ফলে গোড়া থেকেই এই কাগজের উপর তৎকালীন সরকারের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৩১ সনে রাজহোহের অপরাধে সম্পাদক শ্রীদাশগুপ্ত ও বর্তমান

লেখককে প্রেরণার করে ও পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে সরকার স্বত্ত্বলাভ করেন।

স্থানীয় অন্যতম বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীপ্রীতিনিধান রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় 'দেশবন্ধু' নামে একখানা পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মাত্র এক বৎসর এই পত্রিকা চলেছিল।

স্বাধীনতার পর জলপাইগুড়ি সহরে কাগজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেস নেতা শ্রীরবীন্দ্র নাথ শিবদায়ের সম্পাদনায় 'বার্তা' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। এখনও পত্রিকাটি চলেছে। শ্রীবীরেন্দ্র প্রসাদ বসু এম, এ, বি, টি, এর সহকারী সম্পাদক ও পরিচালক।

জলপাইগুড়ি চাকরমচারী-সমিতির মুখপত্র হিসেবে 'আহ্বান' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় কয়েক বৎসর চলে। "নিশান" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও কয়েক বৎসরের জন্য আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন কাজী আব্দুল খালেক বি, এল—এটি ছিল মুসলিম লীগের পত্রিকা।

'ভানপিটেদের আসরের' পক্ষে 'ভানপিটেদের সমাচার' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ও মাসিক শিশুদের উদ্দেশ্যে অনেক বৎসর প্রকাশিত হচ্ছে। 'রত্নাকর' নামধারী ডাঃ সরোজিৎ বাগচী এর ব্যবস্থাপক ও পরিচালক।

উপরোক্ত সাপ্তাহিকগুলো বাদে এ জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে কয়েকখানা মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন ডুয়ার্স থেকে 'ডুয়ার্সবাণী' নামক একটি মাসিক পত্রিকা। শ্রীসুধীর বিশ্বাস এম, এ, বি, টি, কর্তৃক 'উত্তর বাংলা' নামে বহু উল্লেখযোগ্য রচনা সমৃদ্ধ একটি মাসিক পত্রিকা কয়েক বৎসর প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

সহরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আমাদের কথা' ৬ প্রফুল্ল কুমার ত্রিপাঠীর সুসম্পাদনার অনেক বৎসর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

আলিপুরদুয়ার থেকে পর পর অনেক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। যতটা বনে হয় 'হিমালয়' দিয়ে শুরু হয়, শেষের দিকে 'দাবী'। এখনও কয়েকখানা চলেছে।

ময়নাগুড়িতে 'পাবক' নামে একখানা মাসিক সাহিত্য গৌরবেব সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে বিগত কয় বৎসর যাবৎ শ্রীমতী সেনগুপ্তের সম্পাদনায়।

১৯৫৭ সালে ডক্টর রেবতী মোহন লাহিড়ীর সম্পাদনায় এবং সহরের বিশিষ্ট সমাজসেবিকা শ্রীকিরণ রায়ের অর্থায়নকুল্যে 'উত্তর পথ' (মাসিক) প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানি এই জেলার তপশীলী সম্প্রদায় এবং উপজাতির মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। এক বৎসর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

জলপাইগুড়ি সহরে 'নিরপেক্ষ' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা শ্রীদেবব্রত মজুমদারের সম্পাদনায় কয়েক বৎসর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। রাজগঞ্জ থেকে একটি হস্তলিখিত পত্রিকা যথেষ্ট সমৃদ্ধ রচনা ও চিত্রাঙ্কন সহ প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া এ সহরে ও জেলায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, কলেজে ও নানা গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়মিতভাবে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। সবার নামোল্লেখ সম্ভব হলো না।

The Tribes and Tribal Settlements at Jalpaiguri

By B. B. Bhattacharya

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

‘জেলার জনবিন্যাস’

(Population Composition)

The following factors contributed to the interesting development. First, large forest areas and hills trade hunting, collection of forest products and forest products played an important role in the life of Tribals and were by far their most important occupations. Vast forests of forest products and forest products played an important role in the life of Tribals and were by far their most important occupations. The forest also ensured for them undisturbed seclusion from the dust and bustle of towns and villages and the busy stream of general Indian life. Secondly, moderately heavy rainfall which is a pre-condition for the cultivation practised by most of the Tribes in the past, so maintained by availability of vacant land in forest and slopes of hills attracted a good number of Tribes. They used to shift their cultivation and homestead from place to place so as to derive the full benefit of the virgin soil. Thirdly, tea plantation in the Dooars introduced a large number of tribal labourers in this district from Ranchi, Chota Nagpur, Santhal Parganas and other tribal belts of neighbouring States.

Tea Plantations on an industrial level started in this district around 1874-75 and then grew very fast. In 1877, there were 10 to 22 gardens in 1877. Consequently, we notice a spectacular increase in the population of the district during the period 1872-1881 by 1,49,910 persons. This increase of population went on almost steadily during the subsequent census years owing to gradual development of Tea industry and natural growth of population. The increase in population

1. Scheduled Tribes are those tribes or tribal communities or parts of or groups within Tribes or tribal communities who are included in such by public notification by the President under Article 342 of the Indian Constitution.

The Tribes and Tribal Settlements at Jalpaiguri

Sri S. K. Bhattacharya

Even a casual study of the District of Jalpaiguri will not be complete unless it includes in some measure the variegated Tribes inhabiting the district and important aspects of their life. This is so for the reason that Jalpaiguri not only contains the largest Scheduled Tribes' population of all the districts of West Bengal but occupies the highest rank in the State in terms of percentage of Scheduled Tribes population to the total population also.

Thus in the 1961 census while the Scheduled Tribes population of Midnapore, the biggest as well as a tribal concentrated district of the State, was recorded as 3, 29, 736, the corresponding figure for this district was 3, 54, 741. Again, it should be borne in mind that the percentage of Scheduled Tribes population to the total population of West Bengal being only 5.88, the percentage for Jalpaiguri is as high as 26.10. It is also of interest to note that in no other district of West Bengal one will find conglomeration of such a wide variety of Scheduled Tribes. There are altogether more than 20 Scheduled Tribes in this district. Why of all the districts Jalpaiguri contains the largest concentration and the widest admixture of Scheduled Tribes is a subject which calls for careful enquiry.

The following factors possibly contributed to this interesting development. First, large forest area and hilly tracts. Hunting, fishing, collection of fire wood and forest products played an important role in the life of Tribals and were by far their most important occupations. Vast tracts of forest provided an excellent opportunity to them for pursuing these occupations. The forest also ensured for them undisturbed seclusion from the din and bustle of towns and villages and the busy stream of general Indian life. Secondly, moderately heavy rainfall which is a pre-condition for jhum cultivation practised by most of the Tribes in the past, accompanied by availability of vacant land in forest and slopes of hills attracted a good number of Tribes. They used to shift their cultivation and homestead from place to place so as to derive the full benefit of the virgin soil. Thirdly, tea plantation in the Dooars introduced a large number of tribal labourers in this district from Ranchi, Chotnagpur, Santal Parganas and other tribal belts of neighbouring States.

Tea Plantations on an industrial level started in this district around 1874-75 and the leases were first issued to 22 gardens in 1877. Consequently, we notice a spectacular increase in the population of the district during the period 1872-1881 by 1,14,916 persons. This increase of population went on almost steadily during the subsequent census years owing to gradual development of Tea industry and natural growth of population. The increase in population

1. Scheduled Tribes are those tribes or Tribal communities or parts of or group within Tribes or Tribal communities which are declared as such by public notification by the President under Article 342 of the Indian Constitution.

during the earlier census years were primarily due to influx of Tribal labourers in the Tea gardens. D.H.E. Sunder in his survey report of Western Dooars, 1895, attributed the large rise of population (1, 14, 277 between 1881-1891) in western Dooars to immigration from neighbouring districts of Darjeeling, Dinajpur, Rangpur and Cooch-Bihar on the one hand and from Bihar, Orissa, Chotnagpur and other provinces on the other. The statistics given in his report indicate that the former immigration figure (44,418) was insignificant in comparison with the latter (1,14,277) which mostly represented Tribal labourers who migrated to this district during that period.

Sunder's report which was published in 1895 mentions three concentrated tribal settlements or colonies in the district, namely, Mech and Garo colony at Satali, now in Kalchipi P. S., Santhal colony at Santalpur in Alipurduar P. S., and Toto settlement at Totopara now in Madarihat P. S. A block of land approximating 20,000 acres comprising present Satali groups of villages, was set apart by Mr. Sunder as a reserve for Meches and Garos. He settled 766 'jotes' covering 20,593.66 acres with Meches, but 'these represented only a portion of the total community ; the majority still lived a nomadic life and were assessed to capitation tax at Rs. 4/- per head per annum—the Garos being similarly valued at Rs. 3/- per head'. Mr. Milligan in his final Settlement report of the district in 1916 tells us that 'as there are no Meches or Garos now left in Satali.....any revival of such projects (Colony) in the future seems unlikely'. 'By 1907 all Meches in the Western Parganas had sold their jotes and moved eastward ; and by 1915 practically every Mech left the district altogether.' He ascribes this to indiscriminate transfer of lands by the Meches, for 'the leases granted (by Mr. Sunder) allowed the right of transfer and sub infeudation to all and sundry'. Mr. Milligan's account of Satali was however pointed out as wrong by Mr. A. K. Mitra in his Census Handbook, 1951, and he called Mr. Milligan's action in terminating the lease as hasty. As a matter of fact, Satali groups of villages still contain one of the major concentrations of Mech Community. A large number of Mech families were however affected by the acquisition of a Mech village at Satali during the Second World War and Chinese aggression for development of Hasimara airport. Some of the families affected by the acquisition moved to Assam, and the remainder to the adjoining villages. There is however no trace of the Garos in the Satali area.

The second colony which comprised Santhal Christians, on the banks of the Gadadhar and Shamuktala rivers, was founded by Rev. A. J. Shields in 1889. Santhals were brought from Santhal Pargana in Behar and settled in the colony for reclamation of the land, measuring 87 Sq. miles, which was almost entirely covered by thicket and jungle. The colony was managed by a Missionary Superintendent with as little reference as possible to the district authorities. In 1893, the Deputy Commissioner commented that the colony was not very much in a flourishing State. He deprecated the reservation of the large block of land originally proposed by Mr. Sunder, as 'there seems little prospect of so much land ever being developed by this unpromising colony.' The colony area was accordingly reduced to 29 sq. miles in 1894 and further reduced to 14.02 sq. miles in 1901. But by and large the greatest concentration of Santhals of this district may still be seen at Santhalpur.

Mr. Sunder makes a brief mention about the third colony of 'aboriginals' at Totopara

whose main source of livelihood was 'cultivation and trade in oranges.' 'It is noted from different sources that the Totos were sent to this village by the Bhotias from Bhutan about eight generations ago, and they settled down here by expelling the Rabhas towards eastern direction (Assam)'².

With the growth of tea industry more and more tribal people from neighbouring provinces migrated and ultimately settled down in the plantation areas of Jalpaiguri. This resulted in a complete transformation of the composition of tribes and their distribution in the district. Thus while in 1891 census there was mention of only five tribes, e.g., Oraon, Mech, Munda, Santhal and Garo, in the 1961 census more than 20 Scheduled Tribes were recorded in this district (vide Table-1). It will appear from Table—1 that Oraon, Munda, Kharia and Santhal, who number of nearly 3 lakh souls i.e. roughly 85 p.c. of the Scheduled Tribes of the district, constitute numerically the most important tribal group. Of them Oraon alone accounts for more than 50% of the district's total Tribal population. Other Tribes in order of population are shown in the Table.

TABLE—I

Community-wise distribution of Scheduled Tribe population in Jalpaiguri District in 1961.

Serial No.	Name of the Scheduled Tribe	Population	
1.	Oraon	1,81,749	(19,626)*
2.	Munda	53,811	(1,855)
3.	Santhal	38,560	(1,375)
4.	Kheria or Kharia including Lodha	24,009	
5.	Mech	13,178	(17,991)
6.	Mahali	13,098	
7.	Kora	5,563	
8.	Rabha	4,132	
9.	Nagesia	2,876	
10.	Mal Paharia	1,774	
11.	Bhutia, including Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo.	1170	
12.	Chakma	747	
13.	Garo	619	
14.	Mru	536	
15.	Bhumij	519	
16.	Hejong	352	
17.	Hajong	348	
18.	Magh	229	
19.	Lepcha	138	
20.	Unclassified	11,263	
		Total : 3,54,741	

* The bracketed figures indicate 1891 Census Population.

2. Profulla Chakravarty & Kumudendu Chattopadhyay in the Bulletin of the C.R.I. Vol. III, No. 2, 1954. This view, however, is not shared by all authors.

It is worthwhile to mention that the State's largest numbers of Oraon, Munda, Kheria and Mahali live in Jalpaiguri district. Similarly, 68% of the Rabhas and 95% of the Meches of West Bengal are found in this district. Again, the whole family of the Totos, a tiny tribal group of the world, comprising 462 souls, reside in this district alone. Jalpaiguri also shares with the district of Cooch-Bihar the bulk of the Garos of West Bengal.

Within the short space of the present article it is not possible to dwell on all the tribes of this district. I shall therefore confine myself to those tribes which are numerically large in this district, e.g., Oraon, Munda, Kheria, Santhal and Mahali as also the tribes which are peculiar to this district, e.g., Mech, Rabha, Garo and Totos. The distribution of these 9 tribes and that of others in different Police Stations of the district are shown in Table-2. It is seen from the Table that most of the tribals are mainly concentrated in Alipurduar Sub-Division. In Sadar Sub-Division we find a sizable population of tribes mostly in the tea gardens of Dhupguri, Mal and Nagrakata Police Stations. The number of tribals living in villages of Sadar Sub-Division is small compared to those in Alipurduar Sub-Division.

The 9 tribes named earlier may be conveniently classified, on the basis of their physical features into two broad types—Dravidian and Mongoloid. The tribes Oraon, Munda, Santhal, Kheria and Mahali may be tentatively put under the former group, while Mech, Rabha, Garo and Toto may be classified under the latter. In the former type, describes H. H. Risley, "the form of head usually inclines to be dolichocephalic, but all other characters present a marked contrast to the Aryan. The nose is thick and broad, and the formula expressing its proportionate dimension is higher than in any known race, except the Negro. The facial angle is comparatively low; the lips are thick; the face wide and fleshy; the features coarse and irregular. The average stature ranges in a long series of tribes from 156.2 to 162.1 centimetre; the figure is squat; and the limbs sturdy. The colour of the skin varies from very dark brown to a shade closely approaching black." The most important character of the latter group is "a relatively short (brachycephalic) head; a broad face; a short, wide nose, very low in the bridge, and in extreme cases almost bridgeless; high and projecting cheek bones, and eyelids peculiarly formed so as to give the impression that the eyes are obliquely set in the head." The Dravidian group of tribes was introduced in this district by the tea industry; Garos came here from Khasia and Jaintia Hills (according to Mr. Sunder's account) while Mech and Rabhas agriculturist tribes of Kamrup according to Dr. Buchanan Hamilton, migrated to this district from Assam; the Totos on the other hand came to Totopara as already stated, from Bhutan about eight generations ago.

Occupation :

The traditional occupation of Oraon was cultivation, that of Munda cultivation and hunting; that of Kheria, collection of jungle product, farm labour, witchcraft; that of Santhal, collection of forest product, hunting, fishing and cultivation; and that of Mahali basket-making, palanquin carrying, drum beating and agriculture. The hill tribes such as Mech, Rabha, Garo and Toto practised shifting cultivation. Spinning and weaving was also an important occupation of the Meches, Rabhas and Garos. The most important occupation of the Totos, on the other hand, had been cultivation and trading in orange.

Table 2

List of Scheduled tribe communities having 200 or more population in different Police Stations of Jalpaiguri district in 1961.

Name of the Police Station.	Bhutia including Sherpa, Toto etc.	Communitywise Population									
		Bhu- Chak- Ga- mij ma ro	Haj- Ko- ra Ho ong.	Kher- Lep- ia & cha Lodah	Mal- Mun- da -ria	Ma- gh	Ma- hali	Mech Mru gesia	Na- on	Rab- ha.	San- thal.
Jalpaiguri Sub-Divn.											
Jalpaiguri					1482			209	389	7189	1024
Raiganj					416					3400	240
Mainaguri			914								1814
Dhupguri				826	431	9391	2741			21979	1464
Mal		649	378 290 272 3524	2123	305		1696 379	442			
Metiali	307			2684		7479	1232			13456	2208
Nagrakata				905	325	4756	1642			19004	2955
Alipurduar Sub-Divn.											
Falakata			820	998		3679	583			5736	13549
Madarihath	329			3606	214	5030	906	615		18874	204 503
Kalchini	447			7260		7076	2683	3030	930.	25362	1052 1677
Alipurduar				3209		3980	586	4146	210	17982	1589 7981
Kumargam				2311		3145	934	4471		14391	886 2496

In this district, however, the principal subsistence activity of Oraon, Munda, Kheria and Mahali is labour in the tea plantation. It seems from 1961 census report that of the total 'workers' engaged in various professions, e.g., agriculture, industry, construction, trade, transport, services, etc. nearly 64% workers were among the Oraon community, and 74% workers among Munda; 64% of Kheria, and 80% of Mahali 'workers' are engaged in mining, quarrying, livestock, forestry, fishing, hunting, plantations, orchards and allied activities. As persons engaged outside plantation in this category are very small, it may be safely presumed that the above percentages represent mostly tea-garden labourers. Incidence of plantation labour is not so pronounced among the Santhal, Rabha and Garo, while it is insignificant among the Mech and totally absent among the Totos. If arranged in order of proportion of cultivator, both owner and tenant, to the total working force, Toto and Mech occupy the first and second place respectively. Next in order are: Rabha, Santhal, Oraon, Kheria, Garo, Munda and Mahali.

Hunting at one time played an important role in the tribal economy. But owing to clearing of jungles and isolation of the rest of such areas as reserved forest where collection of firewood, hunting, etc. are forbidden, the traditional hunting activities of the tribals are on the decline.

Spinning and weaving still continues, though in a diminished scale so as to be a secondary occupation of the Mech women. But this traditional art has almost totally disappeared from the Rabhas and Garos.

Education :

The tribals are still lagging behind the general population in the field of modern education. Thus while the percentage of literacy in West Bengal is 29.28 p. c. and in the district of Jalpaiguri 19.22 p. c., the corresponding percentage for the tribals of this district was recorded as low as 7.5 p.c. during 1961 census. If we analyse the census figures of this district (vide Table-3), it will be found that incidence of illiteracy is most pronounced among the Rabha (97%), Santhal (95%), Munda (94%), Kheria (93%), Oraon (92%) and Garo (90%) and is much higher than the district average. The only tribe which has achieved some degree of success in this direction is Mech. They are accredited with highest percentage of literacy—20% which though falls far short of the State average, is slightly higher than the district average. The Totos on the other hand are almost one hundred p.c. illiterate. This underlines the importance of laying increasing stress on education of the Scheduled Tribes. The number of persons literate as also educated upto different levels of education among both the sexes of all the Scheduled Tribes of the district is shown in Table-3.

Cross cultural analysis :

All the nine tribes selected for the present analysis are endogamous, i. e., one must marry within the same tribe. Sometimes within the same tribe there are endogamous subdivisions. Thus a Kol—Munda is not allowed to marry a Sad-Munda, Savar-Munda or Mahali-Munda though all of them belong to one and the same tribe Munda. In the Rabha society, on the other hand, observe Das and Raha, 'marriage within the community and also with some Hindu castes.....is sanctioned. But they do not prefer the marriage with any other Scheduled Tribes even with Meches and Garos.' Each of the tribes or sub-tribes is again divided into a number of totemistic (and sometimes non-totemistic also), exogamous septs

Table—3

Education among Scheduled Tribes in Jalpaiguri district in 1961.

Sl. No.	Name of the Sch. Tribe	Total		Illiterate		Literate (without educational level)		Educational Levels			
								Primary or Jnr. Basic		Matriculation and above	
		Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females
1	Bhumij	256	263	222	199	28	42	6	22	—	—
2	Bhutia including Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan & Yolmo.	667	503	625	485	37	17	5	1	—	—
3	Chakma	337	410	321	403	13	6	3	1	—	—
4	Garos	352	267	305	255	25	9	17	3	5	—
5	Hajang	106	242	100	242	6	—	—	—	—	—
6	Ho	138	214	134	214	4	—	—	—	—	—
7	Kora	3033	2530	2822	2480	160	46	50	4	1	—
8	Lepcha	72	66	62	61	7	3	2	2	1	—
9	Lodha, Kheria or Kharia	12116	11893	10926	11563	975	261	192	68	23	1
10	Magh	163	66	156	65	2	1	3	—	2	—
11	Mahali	6753	6345	5808	6144	754	166	166	34	25	1
12	Malpaharia	1060	714	960	697	83	12	16	5	1	—
13	Mech	7050	6128	5153	5464	1094	439	730	219	73	6
14	Mru	251	285	211	285	22	—	16	—	2	—
15	Munda	28609	25272	25748	24815	2255	363	555	85	51	9
16	Nagesia	1483	1393	1369	1347	99	32	15	14	—	—
17	Oraon	93001	88748	82038	85201	8770	3159	1926	356	267	32
18	Rabha	1751	2381	1681	2339	61	30	6	12	3	—
19	Santhal	21831	16729	20361	16373	1019	233	422	121	29	2
20	Unclassified	6360	4903	5825	4775	425	94	105	34	5	—
TOTAL :		185389	169352	164827	163407	15839	4913	4235	981	488	51

or clans, i.e., marriage is not allowed within the same sept. Each such sept bears the name of a totem object, may be animals, birds, trees, or heavenly objects. The members of any of these septs "must abstain from eating or otherwise using, domesticating, killing, destroying, maiming, hurting or injuring the animals or plants or other objects that form this totem, nor must he use anything made from it or obtained from it, and when practicable, he will prevent others from doing so in his presence"³, as he believes that this totem must have helped or protected his ancestor in the past.

Regarding the tree totem of the Oraons, S. C. Roy writes, 'the man of the clan will neither go under the shade of the tree nor cut or burn its wood nor use its produce in any shape'. Some of the specimens selected from among the septs of different tribes are given below. The list of septs are only illustrative and by no means exhaustive.

Name of the tribe	Name of the Sept/Clan	Totem
I Oraon	Tirki	Young mice
	Ekka	Tortoise
	Kispotta	Pig's entrails
	Lakra	Tiger
	Bagh	Tiger
	Kujur	a kind of fruit
	Minj	Fish
II Munda	Horo	a red ant on tree
	Kerketta	Sparrow
	Toppo	a kind of bird
III Kharia	Nag	Cobra
	Kachua	Tortoise
	Hathi	Elephant
	Dhobi	Washerman
	Baske or Kanti	Lal Note Sak (Amaranthus)
IV Santhal & Mahali	Hansda	a kind of vegetables.
	Tudu	Duck
		Ground rat
V Mech	Narjinary	No totem
	Mochari	"
	Basumata	"
VI Garo	Sangma	"
	Marak	"
VII Rabha	Banda	Curd
	Darboth	Baniam tree
VIII Toto	Danku—be }	Names of persons
	Dantro—be }	

It seems that the Dravidian Oraon and Santhals have well defined totemistic septs. Munda, Kharia, Mahali and Rabha have both totemistic sept and also sections which do not have any totem object. Mech, Garo and Toto are divided into *Gotros* which do not have any totems.

In analysing the cultural traits of the nine tribes, the Dravidian group of tribes i.e., Oraon, Munda, Santhal, Kharia and Mahali are taken first. Among them adult monogamous marriage is the general profile. The Mahali marriage custom which is an admixture of both Hindu and tribal customs, recognises both infant and adult marriage. Polygamy is rarely resorted to by these communities and is limited to only men of wealth and high status. A man may however take a second wife if his first wife is barren or if his elder brother dies he may marry the widow.

The bridegroom is required to pay a token bride price for obtaining the wife. There are different systems of payment of bride price among different communities. Among the Oraon, Santhal and Mahali it is paid in terms of Cash (Rs. 25 and four annas) or anything between Rs. 5/- and Rs. 100/- depending on the capacity of the groom. Among the Kharia it is paid in terms of one or more bullock while the Mundas generally pay partly in cash and partly in bullock. The bullock goes to the bride's father and the cash is taken by her brothers.

Divorce is allowed among these communities at the instance of either party and the divorced woman is allowed to re-marry. The divorce is generally made by the *Panch* or some elderly villagers. Among the Santhals it is effected in presence of villagers by the husband tearing asunder three Sal leaves, in token of separation, and upsetting a brass pot full of water. In the case of adultery the seducer is required to pay the full amount of bride price to the husband. If the wife is at fault her father has to repay the bride price in full to the husband. Nothing is, however, paid to the divorced wife's father if the husband is at fault. If a divorced woman has children, they are normally retained by the father.

Widow remarriage is permitted in all these five tribes. The widow is expected to marry her deceased husband's younger brother. No elaborate ritual is necessary for such marriage in the case of Oraon, Santhal and Mahali. Among the Munda and Kharia a widow may marry again by performing the ritual known as *Sagai* which consists of the bridegroom presenting the bride with a new Sari. Divorced wives may marry again on the same terms and in the same form as widow, except that she is not allowed to marry the husband's younger brother.

Patrilocal marital residence is the normal practice among these tribes. They follow patrilineal descent and the clan or 'Sib' also follows the male line.

The Mongoloid group of tribes, except Rabhas, also generally practise both monogamy and adult marriage, group endogamy and clan exogamy. Despite general resemblance of their customs with the former group of people, the Mongoloid tribes are distinguished by many important differences. Among the Rabhas and Totos infant marriage goes side by side with adult marriage. Owing to high value attached to man-power, marriage by service (*Gharjamai*) was very common among the Mech people. They used to refuse to give their daughters in

marriage unless the groom would agree to serve in the father-in-law's house for a number of years. Marriage by force and by payment of bride price was also practised. Now-a-days most of the marriages among these tribes are held by negotiation. Marriage by other means, such as love or mutual consent of the boy and girl, is also prevalent. In the Garo and Toto society payment of bride price is something unheard of.

Among all these communities arrangements regarding marriage are generally made by the parents of the bride and groom and their kinsmen. As adult marriage is the social norm, the consent of both the bride and the groom is taken into consideration. In selecting the groom, however, the opinion of daughter is not much valued except with the Garos where the consent of daughter is sought first. Many young Garo ladies "attain ripe age till inclination induces them to select a partner from among the spruce lads of the *dekachang* or bachelor's hall. As there is no restriction on innocent intercourse, the boys and girls freely mixing together, an amorous young lady has ample opportunity of declaring her partiality, and it is her privilege and duty to speak first"⁴

Certain restrictions are observed by all the tribes in selecting marriage partners. Thus cross as well as parallel cousin marriage is forbidden among all the tribes except Garos. The Garos practise duo-lateral cross cousin marriage, i.e., marriage is allowed with either cross cousin but matrilineal cross cousin marriage is preferred i. e. union preferred with mother's brother's daughter and allowed with father's sister's daughter. While writing on the marriage customs of the Garos, Bose observes, 'A girl is bound to marry her father's sister's son. In his absence she is bound to marry a person from the same family and in absence of the latter from the same *machong* (lineage)'.

In Toto society there are two types of marriages namely, *Jipeca-behoea* or Choto beha and *daba-behoea* or Bara-beha. The former type is practised by most of the Totos while the latter type by the well-to-do Totos only. Marriage generally takes place by negotiation. If the negotiation succeeds the girl proceeds to the groom's house and stays with him till she conceives. It is only then that the ceremonial marriage is performed and it is socially and spiritually recognised.

Divorce, although rare, is permitted among these Tribes also and divorced individuals of both the sexes can re-marry. A Toto widower and widow can marry again only after the lapse of one year (mourning period, when they perform purification), from the date of death of wife or husband, as the case may be. Among the Totos, a man can marry his deceased wife's younger sister, but a woman cannot marry her husband's brother. So also with the Rabhas. There is no such restriction among the Meches and Garos.

Like Oraon, Mun^da, Santhal, Kharia and Mahali patrilocal marital residence is the general profile among Mech and Toto except in cases where marriage is held by service (*Gharjamai*). Among the Rabhas both patrilocal and matrilineal marital residences are noticed.

In a matrilineal family prominence of mother's brothers is often seen, though the importance of father is also recognised unlike the typical matriarchate society. The Garos

4. E. T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*.

practise matrilineal and avunculocal marital residence and in a few cases neolocal and varilocal marital residences are also found.

Among the Mech and Toto clan descends along the male line. In the case of Garo and Rabha it descends through the female line, i. e., sons and daughters get their mother's clan.

Sexual relations :

Of the nine communities, in four (Santhal, Mech, Rabha and Garo) husband and wife have a well-balanced role in the sexual affairs. Active participation in sex matters by both husband and wife is culturally favoured.

• Among Oraon, Munda, Kharia, Mahali and Toto husband plays the dominant role. Their cultural norm demands that the wife should be submissive. Among all these communities 'premarital sex relation is tacitly recognised' and in the case of Mech 'though not expressly recognised, is virtually tolerated'. But this liberty should not be misconstrued. It may be remembered that even today these people are in general true to their words. They will not hastily make engagements, because when they do make them, they intend to keep them. While writing on the Garos, E. T. Dalton observes, 'Notwithstanding the lavish exposure of their persons, the women are chaste and make good steady wives'. Similarly the Santhal women are represented by all who have written about them as exceedingly chaste.

Bachelor's Dormitory :

In the older Oraon and Garo villages all the bachelors in the village used to sleep in a house called *dhumkuria* (by the Oraon) or *dekachang* by the Garos, under penalty of a fine. Dalton says that a similar institution was common among other Dravidian tribes also. In some villages there were maiden's dormitory of *dhumkuria* type for providing sleeping accommodation to young unmarried women under the guardianship of an elderly lady. This was necessitated by two reasons, namely, adult marriage in the society, and inadequate sleeping space for adult boys and girls in the family. Although the bachelor's hall was well-separated from the maiden's sleeping house, 'it is well known that the young girls often find their way to the bachelor's hall and in some villages actually sleep there'. Now-a-days we do not have such dormitory in Oraon or Garo villages. The Garos of Damanpur use their dormitory now for holding village meeting and other purposes.

Inheritance :

In seven communities (e. g., Oraon, Munda, Santhal, Kharia, Mahali, Mech and Toto) out of nine property descends along the male line, i. e., sons inherit to the exclusion of all other heirs. Among the Kharias the eldest son gets two shares more than any of his brothers and on him is supposed to rest the obligation of providing for the maintenance of daughters. In the remaining six communities property is equally shared among the sons, the daughters are shared like livestock by their brothers. If a person dies without a son his wife gets life interest over the deceased's property and after her death the property goes to her husband's brother or brother's son and then to their descendants. A widow with minor sons keeps all the property in her own possession till the sons become adult, the grandfather and uncles

seeing that she does not waste it. If the widow remarries, the grandfather and uncle of the children immediately seize the property, the mother having no right to anything. On some occasions she is given a calf out of kindness.

The rule of inheritance among the comparatively forward section of Rabhas who have become almost completely Hinduised follow male line. But the older Rabha generation and especially the forest Rabhas regard the female folk as the property-owners. But among all of them inheritance of family deity still follows the female line and the mother's property is still inherited by the daughters. 'If the mother's brother dies without any issue, the property is shared by the sister's children, the widowed mother's brother's wife getting the maintenance only. Sometimes the mother's brother, even in the presence of his children, gives some share of his property to his sister's sons and daughters.'⁵ In the case of Garos property is generally inherited by one of the daughters. "Property once in a mother-hood cannot pass out of it."⁶ 'The privileged daughter is known as Nokna (heiress) who becomes the sole heiress to the family property and even her own sisters have no right to live in the family house without her sanction.' 'Sons do not inherit for the reason that after their marriage their children will get their mother's *machong* and so the property would pass out of her *machong* in the second generation.'

Religion :

A section of Oraon, Munda, Santhal, Kharia, Mech and Garo profess Christianity. The rest of the Garos as well as Rabhas and Mahalis practise Hinduism. The Santhal, Munda, and Toto profess animism while the religion of Oraon and Kharia may be defined as a mixture of animism and Hinduism or nature worship. Mech religion may be regarded as an admixture of Hinduism and some form of animism.

Impact of the industry on the material and cultural life of the tribals :

Tea industry has substantially altered the way of life of the tribal people inhabiting this district. A significant change in the material life of tribal workers employed in plantation finds expression in increasing demand for cheap cosmetics, various fashionable and stationery goods, artificial fabrics, etc. They also usually spend a considerable share of their earning for consuming liquor. Unfortunately they have not yet learned to care for the education of their children though there is provision for free primary education in every tea garden. Thrift and economy is something foreign to the qualities of these people and the urge for purchasing immovable properties out of the savings is almost absent among the present generation of workers. Richer section of workers, however, maintain bicycle, torch light, transistor radio sets, etc.

In a tribal family in the tea plantation the wife and even adult Children are also employed as labourers. 'This economic self-dependency'; says Das and Raha, 'on the part of able-bodied members of the Family is resulting in an attitude of disobedience of the older

5. A. K. Das & M. K. Raha, *The Rabhas of West Bengal* (P. 92)

6. Playfair, *The Garos*.

generation by the younger generation and the traditional roles of the husband, wife and their children and the division of labour amongst the household members are generally no longer found to be in existence in the family of workers'.

Among them the clan or sib has lost its traditional value. The clan totems are not worshipped. They, however, do no harm the totem object. The rule of group or tribe endogamy and clan exogamy is only followed in general. Instances of violation of this traditional norm of marriage are not rare. Adult marriage is the general profile and divorce is very common. Cross cousin marriage, both sororate and leverate, are practised by Oraons, Mundas and Kharias of the tea gardens.

Token bride price is paid in case of virgin girls but no such bride price is required for marrying a divorced or widowed woman. Elaborate ritualistic functions usually observed by different communities during marriage have been considerably curtailed by these people owing to their present routine-bound life, which allows them very little scope for going into the details of traditional formalities.

Incidence of promiscuous sexual relation is high. If an unmarried girl conceives as a result, the boy responsible must marry her by paying a token penalty to the girl's parents.

There is also a good deal of difference in the language of the plantation labourers who instead of speaking their own traditional language mostly speak Sadri, a mixture of corrupt Bengali, Hindi and tribal dialects. Some of the tribal folk, e. g., Oraon, Munda, Santhal, etc. speak in their mother tongue at home and amongst themselves, though they know Sadri quite well.

But 'unlike the case of heavy industries, the agro-based plantation industry is not found to have affected the social, religious and psychological life of the workers to the extent as that of heavy industries as the tribal plantation workers live mostly in rather isolated pockets maintaining respective group solidarity to some extent'.

Tribal Policy :

There are two contradictory schools of opinion on what should be the policy about India's Thirty Million tribals—namely, to 'leave them alone' or 'assimilation or detribalisation' of these people. The first policy is commonly attributed to the influence of anthropologists who are often accused of wanting to keep the tribal people in Zoos or Museums for contributing to their 'blessed stock' of knowledge. 'In the present age it is no good to pursue a policy of isolation, for complete isolation has never led to progress and advancement, but always to stagnation and death.....' Besides, it is because of this policy of British Govt. that these people were 'exploited by landlords and Zaminders, robbed by money-lenders, cheated by merchants, and their culture was largely destroyed by foreign missionaries'.

As regards the second policy it is argued that assimilation will lead to better way of living and to economic advance. Continued existence of the tribes as tribes is regarded as of less

importance than the march of civilisation. But history tells us how cultural penetration led to depopulation of the aborigines at New World, Oceania, Africa, and S. E. Asia. 'In Australia many of the aborigines suffered the same fate while the native Tasmanians were reduced from 7000 to 120 by 1764, and in 1876 the last representative of this race passed away from this world'. 'It is important to remember that tribal society, and even the tribal physique, have been adapted through hundreds of years to a special kind of life in a special environment, and that there is grave danger in upsetting too rapidly the harmony between the two.' Among the aboriginal tribes of Oceania and the U. S. A. this rapid environmental imbalance led to the change in birth rate with high masculinity and consequent decline in population.

'The weakening of tribal solidarity and of the folk-legal sanctions deprives the younger generation of their moorings and sets them adrift in an unfamiliar world. All too often, the arts and crafts, the music and dancing, the former self-reliance and independence, the corporate discipline, disappear.' These traditional virtues are almost invariably replaced by the vices of the so-called civilised society.

Free India's tribal policy has recognised these findings of anthropological science and the warnings of history. In India an attempt has been made to steer a middle path between the two extreme views. 'The government of India', declared the late Jawaharlal Nehru, 'is determined to help the tribal people to grow according to their own genius and traditions'. The tribal culture will certainly borrow from the neighbouring society, but the borrowing must be natural and in harmony with the cultural setting and psychological make-up of these people. He also insisted that a measure of protection must be given so that no outsider can take possession of tribal lands or forests or interfere with their way of life ; special provisions have therefore been made in part XVI of the Indian Constitution for safeguarding the interests of the Scheduled tribes. The Directive Principles of State Policy also envisage promotion of educational and economic interests of these people and their protection from 'social injustice and all forms of exploitation.'

In consonance with this policy various schemes have been drawn up for the social, economic and cultural well-beings of the Scheduled tribes. In the social plane, untouchability has been abolished and made punishable under law. Enactments have also been made for preventing economic exploitation of these people. Thus, for protecting their interest on land special provision has been made in the West Bengal Estate Acquisition Act and West Bengal Land Reforms Act, restricting transfer of lands by tribal raiyats. Transfers made in contravention of the procedure laid down in the Act are automatically deemed as void. Rules have also been framed for reservation of vacancies in both Central and State govt. services for the Scheduled tribe candidates for ensuring their representation in different services.

Apart from the above measures, positive schemes for the welfare of these under developed people are also under execution. As pointed out earlier, these people are still backward compared with their brethren in the sphere of education. Consequently, stress has been laid on the extension of facilities of education, both general and technical, among them through award of

stipends and scholarships at various levels of education beginning from the Secondary Stage. Hostels for boys and girls have been setup at selected Secondary and Higher Secondary institutions for providing accommodation to the tribal students coming from distant areas. Free primary schools have also been started and recognised in concentrated tribal villages which were so long without only primary schools. Similarly, schemes are being executed for improving agriculture, irrigation, cottage industry, co-operation, livestock, communication, health, etc. in selected tribal areas. It is true that in view of limited resources these and other schemes undertaken for the welfare of the scheduled tribes are still inadequate. But it is equally true that by implementing these schemes we are gradually instilling confidence into these people, especially the younger generation of tribals. Once this is done and the tribals are themselves involved in the process, the object of integrating them slowly with the general population will have been achieved.

REFERENCE

Abbreviation :

B.C.R.I.—BULLETIN OF CULTURAL RESEARCH INSTITUTE.

1. Chakraborty, Prafulla & Chattapadhyay, Kumaranandan—B.C.R.I., (1954)
Vol. III : No. 2.
2. Daltan, E. T. —Descriptive Ethnology of Bengal. (1871-72)
3. Das, A. K. — The Koras and some Little known communities of West Bengal. (1964)
4. „ „ — Social system—A cross cultural analysis B.C.R.I. (1963) Vol. II : No. 2.
5. Das, A. K. & Banerjee, H. N. — Impact of Tea Industry on the life of the tribals
of West Bengal. (1964)
6. Das, A. K. & Raha M. K.—The Oraons of Sundarban. (1963)
7. —Do— — — The Rabhas of West Bengal.
8. Das, A. K. Roy Choudhury, B. K. & Raha M. K.— Handbook on Scheduled Castes and
Scheduled Tribes of West Bengal. (1966)
9. Elwin, Verrier — A Philosophy for NEFA. (1957)
10. J. Milligan — Final Settlement Report of the district Jalpaiguri. (1916)
11. Mukherjee, B. B. — Report of the Revisional Settlement of the district of
Jalpaiguri. (1935)
12. Playfair, A — The Garos. (1909)
13. Raha, M. K. — Forest in Tribal life, B.C.R.I. (1963) Vol. II : — No. 1.

14. - Do - — The Rabhas of West Bengal, B.C.R.I. (1963) Vol. I : No. 3.
 15. - Do - — The Garos, B.C.R.I., (1966) Vol. V : No. 1 & 2.
 16. Risley, H. H.— The Tribes and Castes of Bengal. (1891)
 17. Roy, S. C. — The Oraons of Chhotonagpur. (1915)
 18. Roy Chowdhury, B. K.— The Mahalis, B. C. R. I. (1963) Vol. I : No. 3,
 19. Sanyal, Charuchandra — The Totos. (1954)
 20. Sunder, D. — Final Settlement Report of Western Dooars. (1894)
 21. Govt. of India Publications —
 - (a) Census of India, 1961, Vol. XVI, West Bengal and Sikkim, part V-A(ii), Tables on Scheduled Tribes.
 - (b) The Constitution of India.
-

রাভা ও তাদের দেবী “রুন্তুক বাশেক্”

শ্রীমুন্সীল পাল

পশ্চিমবঙ্গে যে সব উপজাতি বসবাস করে তাদের মধ্যে উত্তরাঞ্চলের ‘রাভা’ সম্প্রদায় অগ্ৰতম। আচার আচরণের দিক থেকেও এরা অগ্ৰদের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাভাদের বাস জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায়। অধিকাংশই বাস করে বনাঞ্চলে। যারা লোকালয়ে বাস করে তাদের পেশা হল কৃষি। নিজস্ব জমি জমা আছে। যারা বনাঞ্চলে বাস করে, তারা বনবিভাগের শ্রমিক হিসেবে কাজকর্ম করে। ভরণ-পোষণের জন্ত বন দপ্তর থেকে পরিবার পিছু চাষযোগ্য জমির বন্দোবস্ত আছে। সংরক্ষিত বন ও তার নিকটবর্তী রাভারা স্বাবলম্বী। পরিধেয় বস্ত্র এরা নিজেরাই বুনে নেয়, এর জন্ত নিজস্ব “গর্ত তাঁত” (Pit Loom) আছে। এর জন্ত এরা তুলা চাষ করে।

মহিলারা যে পোষাক ব্যবহার করে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তারা দেহের নিম্নাংশ ঢাকবার জন্ত একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করে ও বক্ষাবরণী হিসাবে আলাদা আর একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করে। তাদের ভাষায় বক্ষাবরণীটির নাম “কামাঙ্গ” ও দেহের নিম্নাংশের আবরণীটির নাম “হুঁফুঁন”। এগুলি রঙিন ও নক্সাদার। পূর্বে পুরুষেরা লজ্জা নিবারণের জন্ত এক খণ্ড ফালি কাপড় (নেংটি) ব্যবহার করত। বর্তমানে তারা ছোটো মাপের ধুতি, প্যাণ্ট ব্যবহার করে। লোকালয়ে যে সব রাভা বাস করে তারা ইদানিং অগ্ৰাগ্ৰ সম্প্রদায়ের দেখাদেখি আধুনিক সাজসজ্জা করছে। পুরুষেরা ধুতি, শার্ট, প্যাণ্ট এবং মহিলারা শাড়ী, শায়া, ব্লাউজ পরছে।

অলঙ্কার হিসেবে রাভা মহিলারা একদা শাঁখার মোটা কাঁকন পরত। বর্তমানে মোটা শাঁখা পরার চলন নেই বললেই চলে। কাঁচ-পুঁতির মালা গলায় পরারও চল ছিল এক সময়ে। বর্তমানে যারা লোকালয়ে বাস করে, তাদের মধ্যে সোনা-রূপোর অলঙ্কার পরবার প্রবণতা দেখা যায়। বিবাহিতা মহিলাদের সিঁথিতে সিন্দূর দেবার রীতি আগে ছিল না। এখন অবশ্য অগ্ৰ সম্প্রদায়ের মহিলাদের দেখাদেখি সিঁথিতে সিন্দূর দেবার প্রচলন হয়েছে।

শিক্ষার দিক থেকে এরা এখনও অগ্ৰাগ্ৰ উপজাতি সম্প্রদায়ের চাইতে অনগ্রসর। তবে ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা চলছে যাতে এরাও শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারে।

নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে ‘রাভা’ উপজাতি মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে এখনও এই বৈশিষ্ট্য কিছুটা বজায় আছে। পুত্র-কন্যাদের গোত্র পরিচয় হয় পিতৃ গোত্রের না হয়ে মাতৃ গোত্রের। পূর্বে বিয়ের আগে

পাত্র এসে পাত্রীর বাড়ীতে বসবাস করত। বিয়ে হয়ে গেলে পাত্র ইচ্ছা করলে পাত্রীকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে স্বস্তর বাড়ীতেই বসবাস করতে পারত। অথবা স্বস্তর বাড়ীর কাছেই ঘর বাঁধতে পারত।

বর্তমানে অবশ্য বিয়ে করে পাত্র পাত্রীকে নিয়ে নিজ বাড়ীতেই চলে যায়। লোকালয়ের রাভাদের বিবাহ পদ্ধতি অল্প হিন্দু সম্প্রদায়ের পদ্ধতির মতনই। বিবাহ পরিচালনা করে অসমিয়া ব্রাহ্মণ। এব্যাপারে স্থানীয় 'রাজবংশী' সম্প্রদায়ের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে বলে মনে হয়। বিবাহের পূর্বে যথারীতি পাত্র-পাত্রী দেখা শোনা হয় এবং দেনা পাওনা নিয়েও আলোচনা হয়।

রাভাদের নিজস্ব ভাষা আছে। তাদের ভাষা বোড়ো (Bodo) ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। রাভা ভাষা কথা ভাষা, লিপি নেই। তারা নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলে তখন রাভা ভাষাতেই বলে। অল্প সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে কথা বলবার সময় তারা যে অঞ্চলে বাস করে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় বাসকারী রাভারা সেখানকার আঞ্চলিক ভাষা 'রাজবংশী' ভাষা ব্যবহার করে। দেখা গেছে 'রাজবংশী' বচন, ধাঁ ধাঁ-হেঁয়ালী ইত্যাদিও তারা আত্মস্থ করেছে, এবং সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগও তারা করে থাকে। আসাম গোয়ালপাড়ার রাভারা অসমিয়া ভাষাতে কথা বলে থাকে। বনাঞ্চলের রাভারা নিজেদের ভাষা বৈশিষ্ট্য যথাযথ বজায় রেখেছে। কিন্তু লোকালয়ের রাভারা তাদের ভাষা প্রায় ভুলতে বসেছে।

রাভাদের বিভিন্ন দেব-দেবী আছে। কয়েকটি দেব-দেবীকে স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরাও পূজা করে থাকে। এই সব দেব-দেবী সম্ভবতঃ, সম্ভবতঃ কেন আদতে রাজবংশীদেরই দেব-দেবী বলে মনে হয়। কারণ যে সমস্ত রাভা লোকালয়ের সান্নিধ্যে বসবাস করছে তারা পূজা পার্বন দেব আরাধনা ব্যাপারে রাজবংশীদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। রাজবংশীদের মতনই তারাও অসমিয়া ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দিয়ে পূজা পার্বণ, শ্রাদ্ধ, সংস্কার, ক্রিয়া কাণ্ড করায়। বহু পূর্বে [যখন তারা অসংস্কৃত ছিল] রাভারা পূজা-পার্বণ, শ্রাদ্ধ, সংস্কার ইত্যাদি ক্রিয়া কাণ্ড করাত তাদের নিজস্ব পুরোহিত দিয়ে, যাকে তারা 'দেওসি' বলত। 'দেওসি' রাভা সম্প্রদায়েরই লোক। বর্তমান লোকালয়ে রাভাদের মধ্যে 'দেওসি' নেই বললেই চলে। তবে বনাঞ্চলের রাভাদের মধ্যে 'দেওসি' দিয়ে পূজা-পার্বণ করার ধারা এখনও পুরোপুরি বজায় আছে।

এদের নিজস্ব যে কয়টি দেব-দেবী আছে, তার মধ্যে 'কনতুক'-'বানেশক' দেবী বিশিষ্ট স্থানাধিকার করে আছে। এই দু'টি দেবী তাদের গৃহ-দেবী হিসেবে পূজিতা। সাধারণভাবে তারা এই দেবীদের 'খানসিরি' বা 'ঘর-দেও' বলে উল্লেখ করে থাকে। 'খানসিরি' শব্দটি স্থানেশ্বরী অথবা স্থানত্রী এই মূল শব্দ থেকে আসতে পারে বলে মনে হয়। এ অঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায় এবং আর একটি উপজাতি গোষ্ঠী—বোড়ো (Bodo) দেও গৃহ-দেবী আছে। তারাও তাদের গৃহদেবীকে 'খানসিরি' দেবী বলেই উল্লেখ করে। বোড়ো (Bodo) রা তাদের ভাষায় একে 'মাইনাও'

বলে উল্লেখ করে। তবে পূজাপদ্ধতি প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র। এই নিবন্ধে অগ্নদের সম্পর্কে আলোচনা না করে শুধু রাভাদের গৃহদেবী ‘কন্তুক-বামেশক’ সম্পর্কেই আলোচনা করা হল।

‘কন্তুক-বামেশক’ দেবীর অধিষ্ঠান উত্তর দিকে ঘরের উত্তর-পশ্চিমা কোণের চার কোনা বাশের মাচার ওপরে। রাভা ভাষায় এই মাচাকে বলা হয় ‘চিং সাং গং’। ঘরে বাস করে বাড়ীর কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি।

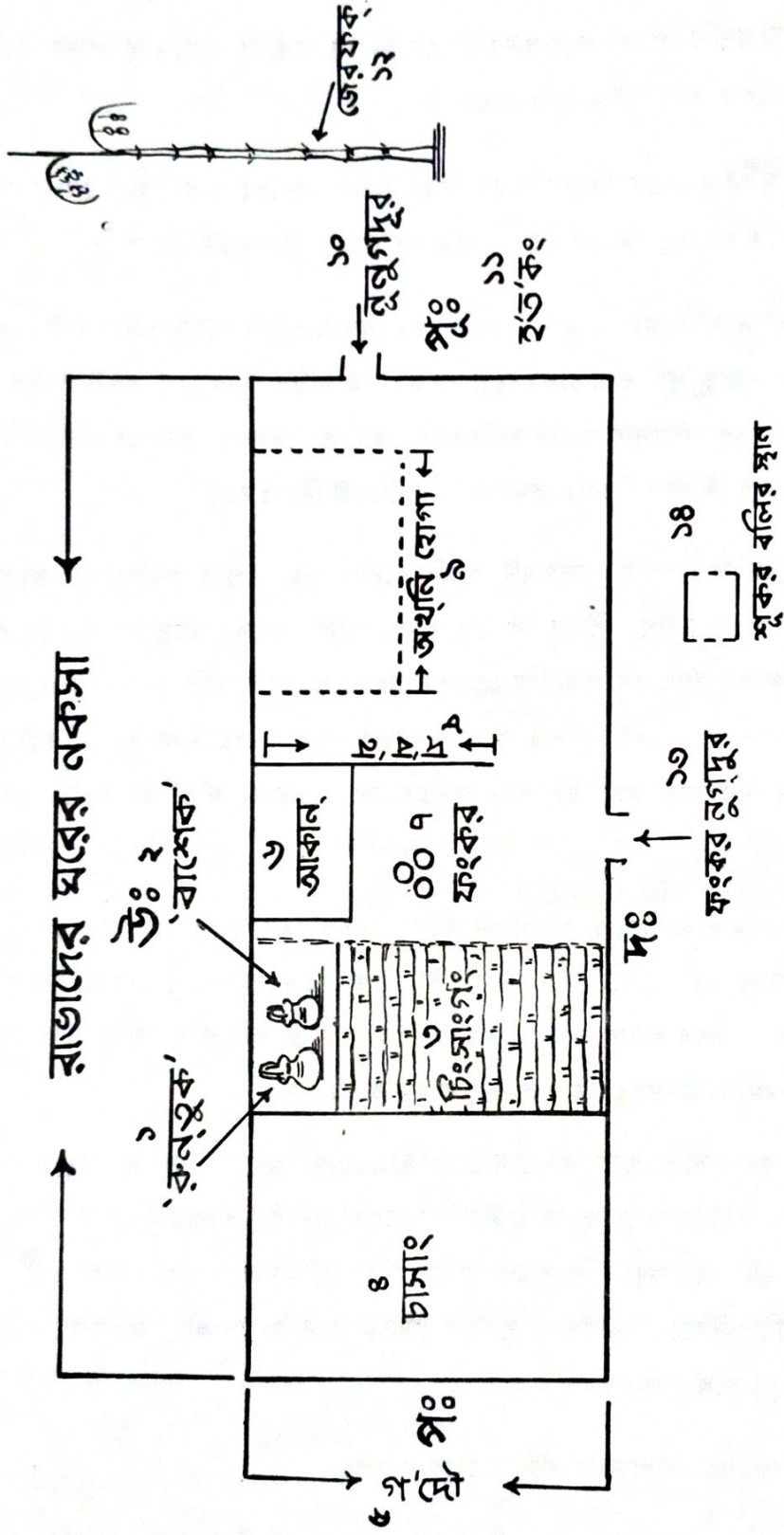
‘কন্তুক বাশেক’ দেবীর কোনো মূর্তি নেই। একে রাভারা ‘ধান লক্ষ্মী’ বলেও উল্লেখ করে। মাটির একটি লাল রঙের হাঁড়ির মধ্যে গলা পর্যন্ত পূর্ণ করে চাল দেওয়া থাকে। ঐ মাটির ঘটের মুখে একটি মুরগীর ডিম ‘তৌ চি’ বসিয়ে দেওয়া হয়। ‘কন্তুক’ বসানোর জন্ত যে পাতিল কেনা হয়, তা কেনবার সময় কোন দর-দাম করা চলে না। কুমোর যা দাম চায় তাই দিয়েই পাতিলটি কেনা হয়। পাতিলটি নিখুঁত হবে।

‘কন্তুক’ বসানোর জন্ত পুরোহিত (দেওসি) মোটামুটি শুভদিন দেখে দেয়। পূজা অহুষ্ঠিত হয় গুরুপক্ষের রাত্রি বেলাতে। উপচার হিসেবে—ধূপ-দীপ, সিন্দূর, কার্পাস তুলো, পিটুলী (চালের গুঁড়ো গোলা) মদ, শূকর, সাদা ও লাল কাপড়ের টুকরো, আতপ চাল, কলা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। পূজোতে বলি দেবার বিধান আছে। মুরগী বা শূকর বলি হিসেবে প্রদত্ত হয়। এই পূজার অগ্রতম উপচার হল রাভাদের নিজস্ব প্রথায তৈরী মদ—‘চকত’। বৎসরে একটি দিন সমারোহ করে এই পূজা অহুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ধূপ-দীপ দেওয়া হয়।

বাড়ীতে অগ্ন কোন পূজা-পার্বন হলে, বিয়ে বা অন্ন-প্রাশন হলে ‘কন্তুক’ এর পূজাই সর্বাগ্রে হয়। যেমন হিন্দুদের দেবতা গণপতির বেলায় হয়। বিয়ে সাদি হলে বাড়ী থেকে বের হবার সময় পাত্র-পাত্রী ‘কন্তুক’কে ভক্তি করে বাড়ী থেকে বের হয়। ফসল কাটার সময় বা ‘নবান’ খাওয়ার সময় ঘটা করে বিবিধ উপচারে পূজা করা হয়। অস্থ-বিস্থ, বিপদ-আপদ উদ্ধারের জন্যও কন্তুককে মানত করা হয়।

‘বামেশক’ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে এই বলে যে ‘রাভারা’ একে ‘কন্তুক’ দেবীর বোন বা সংগিনী বলে থাকে। তাদের কাহ থেকে জানা গেছে যে অনেক বাড়ীতেই ‘বামেশক’ নেই শুধু ‘কন্তুক’ই আছে। ‘বামেশক’ও একটি ছোট মাটির পাতিল। এটি কন্তুকের দক্ষিণ পাশে বসানো হয়। ঐটির মধ্যেও গলা পর্যন্ত চাল দেওয়া হয় ও তার ওপর একটি মুরগীর ডিম বসিয়ে দেওয়া হয়। পাতিল দুটিকেই লাল কাপড় এবং সাদা কাপড়ের টুকরো দিয়ে জড়ানো হয়। গায়ে সিন্দূর গুলে লাগান হয়।

সংগের নন্ডাতে মোটামুটি ‘কন্তুক-বামেশকের’ অবস্থান বোঝান হল।



- ১। কনুতুক—রাভাদের গৃহ দেবী। ২। 'বাসেক'—তার সঙ্গিনী / বা বোন। ৩। চিৎসাংগ—বাসেক কনুতুক যে মাচার উপর অধিষ্ঠান করে, পূজারী বা 'দেওসি' ওইখানে বসেই পূজা করে। ৪। চাঙ্গা—শয়াল গোল। ৫। গ'দো—পাছ দুয়ার—মত পানের জন্য ব্যবহৃত। ৬। থাকান—সিলিং। ৭। ফংক—উত্তর। ৮। দ'বন—বেড়া। ৯। অগ্নি হোগা—শোয়ার জায়গা। ১০। জিৎসাংগ—পূর্ব দুয়ার। ১১। হ'ত'ক—আঙিন। ১২। জেরকব—বাসের ধজা, এতে তুলে ঝুলিয়ে দেওয়া থাকে। ১৩। ফংক জিৎসাংগ—রাভা করার জায়গায় প্রবেশ করার দরজা। ১৪। শূকর বলির স্থান—এখানে বলি প্রদত্ত হয়।

রাভাদের ঘর সাধারণত: পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হয়। বংশের ধ্বজা বা জেরফক'টি পূর্বদিকে সর্বদাই পোতা থাকে। ফংকর নৃগ'র বা রান্না করার জায়গায় প্রবেশ করা দরজার কাছেই নির্দিষ্ট থাকে বলির স্থান। 'কুনতুক-বামশেক' পুজার যে মন্ত্রটি 'দেওসি' রাভা ভাষায় বলে থাকে তা হল:—

‘হল জল জি নেউ ; হল জল জি নাই।

সোনা নগউ না বউ, সোনা নকুং না ঔ।

হত্তিরায় তাসায়

ঘড়া বাউ তাসায়

হল জল জি নেউ ; হল জল জি নাই ॥

অর্থ :—

‘কুনতুক বাশেক’ দেবী তোমরা দুটি বোন ; ও কুনতুক তোমাকে দিলাম সোনার ঘর। ও বাশেক তোমাকে দিলাম রূপার ঘর। আমাদের প্রতি দয়া রাখ, রাগ করে হাতী চড়ে যেয়োনা ; রাগ করে ঘোড়ায় চড়ে যেয়োনা। ও ‘কুনতুক’, ও ‘বামশেক’ দেবী আমাদের প্রতি দয়া রাখ ॥

উত্তরবঙ্গের তপশীলভুক্ত উপজাতীয় অধিবাসীদের মধ্যে ‘রাভা’ সম্প্রদায় অন্যতম। ‘রাভা’ উপজাতি গোষ্ঠীগত ভাবে ‘ইন্দো-মঙ্গলয়েড’। এঁরা স্বল্প পরিজ্ঞাত। এঁদের বসবাস কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। রাভাদের বেশীর ভাগই বাস করেন অরণ্য এলাকায়। এঁরা স্বাবলম্বী। অরণ্য এলাকায় বাসকারী ও লোকালয়ে বাসকারী রাভাদের মূল পেশা হল কৃষি। আচার-আচরণ ও জীবন যাবন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল। এঁদের নিজস্ব ভাষা আছে। কোনো লিপি নেই। এঁদের ভাষা ‘ভোট-চীন’ ভাষা-গোষ্ঠীর ভোট ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত। এই ভাষার সমগোত্রীয় হল এই অঞ্চলের ‘বড়ো’ ভাষা।

অরণ্যের ‘রাভা’রা নিজেদের ভাষার চর্চা পুরোপুরিই বজায় রেখেছেন। কিন্তু লোকালয়ের রাভারা নিজেদের ভাষা প্রায় ভুলে গেছেন। প্রাচীন রাভারা নিজেদের মধ্যে রাভা ভাষাতেই কথা-বাতা বলে থাকেন। কিন্তু নবীন যারা তারা স্থানীয় রাজ বংশী উপভাষায় কথা বলেন। লেখা পড়া বাঙ্গলা মাধ্যমেই করেন।

একদা এঁরা নৃত্য-গীত-শিকার প্রিয় ছিলেন। নতুন যুগের ছোয়া লাগার জন্য এবং কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সেসব আজ লুপ্ত। ধর্মাচরণের ব্যাপারে লোকালয়ের রাভারা হিন্দুধর্মের দেবদেবীর পূজা অর্চনার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছেন। অরণ্য অঞ্চলের রাভারা নিজস্ব অবৈদিক ধর্ম চর্চাই বজায় রেখেছেন।*

লোকালয়ের রাভাদের কয়েকটি ছোটছোট গান এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই গানগুলি আয়তনে ছোট হলেও এগুলির মধ্যে তাদের দুঃখ-বেদনা-আনন্দ-আবেগ চিত্রিত হয়েছে। এইগুলির রচয়িতা কে তা জানা যায়নি। মুখে মুখেই প্রচলিত আছে এখনও।

* প্রবন্ধটি রচনায় সবিশেষ সহায়তা করেছেন কামাখ্যাগুড়ি অঞ্চল প্রধান ও রাভা নেতা এবং ডুরাসের খাতনামা সমাজ সেবক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস। তাছাড়াও মধ্য ও দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ি গ্রামের রাভা অধিবাসীবৃন্দও বিভিন্ন তথ্য জ্ঞাপন করেছেন। তাঁদের সবার কাছে কণ শ্রীকার করছি।

রাভা-গান

১

চিকা জরেইউ পান জেজেউ
ঘু ঘু মাংসা হাপ্‌চা
ওকই মালাম্‌ মালাম্‌
বনেইভ্‌
ওকই আপন হেপা ॥

অনুবাদ : ঐষে দূরে মরা গাছের ডালে
কাঁদছে ঘু ঘু সাথী হারা হয়ে।
তুমি কেন একলা বসে কাঁদছ ওগো
কাঁদছ রয়ে রয়ে ॥

২

তৌসা মাংসা চিয়াও চিয়াও
বায় চোঙর তাঙা
নিন প্রধান বাবু অ
হুহুর পেঙ্‌ বাঙ্‌ পাঙা ॥

অনুবাদ : মুরগীর ছোট ছোট ছা এর মতন
চিঁ চিঁ করে করি অনুন্নয়।
ধরি তাহার দুই চরণ
প্রধান বাবুর নিয়ে শরণ
জানাই সকল ব্যথা
কিন্তু বুথাই যে সব অনুন্নয় ॥

৩

ভাল কৈরেঙা হোআ হোআ
বানতাঙ্‌ দমিই চায়
ওকই আঙো নানা দেকন
চনি রিপাক দায় ॥

অনুবাদ : বেগুন ক্ষেতের পাশে
ছকা ছয়া ছয়া শিয়ালগুলো ডাকে
বন্ধু যখন আছ আমার সাথে
তখন ভয় বা আমার কাকে ॥

৪

সৈরী লো লো পুইমন নেইয়া
উষন বকা তিয়া
হু আঙ্ না না না পা
টাকা রঙ্ তাম পিয়া

অনুবাদ : নীল আকাশে যায় রে উড়ে
সবুজ বরন টিয়া,
ও কণ্ঠা তোমায় আমি নিব কিনে
তিন কুড়ি টাকা দিয়া ॥

৫

যি সিঙ্ ফলেঙ্ ঐড়ায়
তো কনতা সেকা।
ওকই আকানা হেপা,
গঙ্চা গঙ্চা বনেইঙ্
ওঠো গয় ধলেঙ্ কেকা ॥

অনুবাদ : আকাশ ফসী হোলো
শ্বেত মোরগের মতন
রাত্রি হোলো ভোর
তখন তুমি এলে
পান সুপারী নিয়ে
চোখের জলে সেধে ভাঙতে গোসা মোর ॥

৬

নেঙ্ ছকু লে উ আঙ্ পালাউ হুঙ্য়া
সারায় হাসাই নৈমন নকচেঙ্ রেতিহিয়া ॥

অনুবাদ : আমি নিলাম জাঠৈ
তুমি এস খলুই হাতে করি
ঐ যে বহে 'বুড়া' নদী
ঐখানেতে চল চিংড়ি মাছ ধরি ॥

৭

জুতা করপ্ করপ্
খড়ম করপ্ করপ্
নিনি কাবক নৈতা
হত্তি চাকিরিয়াঙ্
মুখি চাকি রিয়াঙ্
দাবল্ বিনিন দাবল্
নিনি কাবক নৈতা ॥

অনুবাদ : আমার উপর মান করেছে ওষে,—
জুতা মচ্ মচ্ করে
খড়ম খট্ খট্ করে
যাচ্ছে চলে দূরে
ওকে ফেরাও ফেরাও
ওষে হাতীর 'মাহত' হতে
ওষে মোষের মৈসাল হতে
যাচ্ছে চলে দূরে
দোহাই ওরে ফেরাও ওরে ফেরাও ॥*

জলপাইগুড়ি জেলার একটি অনগ্রসর জাতি

শ্রীমণীন্দ্র নাথ মিত্র

“হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় ড্রাবিড় চীন

শক-হন-দল পাঠান মোগল একদেহে হ'ল লীন”—

কবিগুরু এই অমরবাণী জলপাইগুড়ির সমাজ জীবনে বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ির জনসমষ্টির মধ্যে রয়েছে সুদূর রাঁচী ও হাজারীবাগ থেকে আগত অগণিত আদিবাসী। অন্তর্দিকে পূর্ব এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে আগত কারস্থ, ব্রাহ্মণ, বৈজ্ঞ, কর্মকার, কুস্তকার, তেলী এবং নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি। জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক সীমায় প্রায় দুইশত চা বাগান অবস্থিত থাকার এই জেলাকে সর্বভারতীয় জাতি সমূহের একটি মিলন স্থান এবং কর্মক্ষেত্র সহজেই বলা যায়।

চা-বাগানগুলি হিমালয় সন্নিহিত ডুয়ার্স অঞ্চলেই অবস্থিত। এইসব বাগিচা এলাকায় বিহার, নেপাল, পাকিস্তান ইত্যাদি রাজ্য থেকে আগত জনসংখ্যা যেমন প্রবল দেখা যায় বাগিচা সন্নিহিত বস্তীগুলিতে তেমন নয়। এইসব বস্তী এলাকাগুলিতে যে সকল জাতির বাস তার মধ্যে রাজবংশী এবং নমঃশূদ্র প্রভৃতি অনগ্রসর এবং দরিদ্র আদিবাসীর সংখ্যাই প্রধান। আদমশুমারীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই জেলায় ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে নমঃশূদ্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২৮০ জন। সেই সংখ্যা ধীরগতিতে বেড়ে এবং কখনও কমে ১২৪১ খ্রীঃ অব্দে এসে দাঁড়ায় ১৮১৮ জন। দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক নমঃশূদ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এসে ঠাঁই করে নিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯১১ সালে জলপাইগুড়িতে এদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭১৬ জন। কিন্তু এর পরের দশকে বিপুল সংখ্যক নমঃশূদ্র পূর্ববঙ্গ থেকে এবং কিছু কিছু দক্ষিণবঙ্গ থেকে এসে জলপাইগুড়ি জেলার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন এবং আলিপুরহাওয়ার, ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি সদর থানায় কয়েকটি ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্বাস্তু পল্লী গড়ে তুললেন। ফলে ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের আদমশুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় যে এঁদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৪৩, ৬৬৫ জন। এই জনসংখ্যা জলপাইগুড়ির মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ। পঞ্চাশের রাজবংশীদের বর্তমান (১৯৬১) জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,১৬,০২০ অর্থাৎ জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ।

অতএব দেখা যায় যে এই জেলার এককগোষ্ঠী হিসেবে (শতকরা ২৪ ভাগ) রাজবংশী জাতির স্থান। রাজবংশীর ভাষা, ধর্মীয় আচারণ, সামাজিক আচার-বিচার, কৃষি, শিল্প এবং এককথায় রাজবংশীর সমাজ জীবন আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জলপাইগুড়ি জেলার তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর পক্ষে আজ রাজবংশীর কৃষ্টি অহুসন্ধানের বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায়। এক্ষেত্রে স্বনামধন্য নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর চারু চন্দ্র সান্যাল যথোপযুক্ত ভাষায় এই প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর “Rajbanshis of North Bengal” নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—“The Study

of folk life and culture of these people has become important when attitudes are changing fast due to impact of western civilisation & more so after the partition of Bengal when a large immigration of people from lower North & East Bengal is taking place in this area & within a very short time a profound culture mixing is sure to take place and some of the age-long customs may disappear altogether."

উপরোক্ত অল্পক্ষেত্রে যে উপযুক্ত কারণ দেখানো হয়েছে সেই কারণেই রাজবংশী জাতির বিষয়ে এই ক্ষুদ্র আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি।

পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে রাজবংশী সমাজ জীবনেও যে প্রচুর পরিবর্তন এসে যাচ্ছে তা অনস্বীকার্য। তবুও পল্লীর অভ্যন্তরে সরল আত্মভোলা রাজবংশী এখনও অনেক অলৌকিক দৈবী এবং ভৌতিক শক্তিতে বিশ্বাস করে এবং সেগুলিকে শাস্ত রাখবার জন্তে পূজা, অর্চনা ইত্যাদি করে থাকে। তাদের বৈবাহিক রীতিনীতি, ধর্মকর্ম এখনও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। ঐ সমাজের খেলাধুলা, হাস্য-পরিহাস, চলতি ছড়া, প্রবচন এবং সঙ্গীত তাদের একাধারে সারল্য এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

রাজবংশী জাতির উৎপত্তি বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা অভিন্ন মতাবলম্বী নন। প্রত্যেক ঐতিহাসিক নিজ নিজ মত প্রকাশ করে গিয়েছেন এবং এর ফলে বিষয়টি বহু বিতর্কিত অবস্থায় থেকে গেছে। বর্তমান নিবন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত পাশাপাশি স্থাপন করে রাজবংশী সমাজের দাবীর বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

ঐতিহাসিক Hamilton সাহেব বলেন কামরূপের কোচ উপজাতিই বর্তমান রাজবংশী জাতির পূর্বপুরুষ। তিনি আরও বলেন কোচ উপজাতি মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত। কোচ উপজাতির যে অংশ সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন তাবাই রাজবংশী নামে খ্যাত।

ঐতিহাসিক Hunter সাহেবের মতেও কোচ, মেচ এবং কাছারী নামক মঙ্গোল শ্রেণীভুক্ত উপজাতিগণের সংমিশ্রণে রাজবংশী জাতির উদ্ভব।

Beverley সাহেবের মতে কোচ, রাজবংশী এবং পলিয়া প্রায় সর্বাংশে একই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও বলেন এরা সকলেই ড্রাবিড় জাতির অংশ। এরা সকলেই মিশ্রিত জাতি।

নৃতত্ত্ববিদ Risley সাহেব তাঁর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Tribes and Castes of Bengal নামক গ্রন্থে বলেছেন যে কোচ, রাজবংশী, পলিয়া এবং দেশী—এরা সকলেই ড্রাবিড় জাতি থেকে উদ্ভূত। তাঁর ধারণা যে এদের নাক, চোখ, মাথা এবং অগ্রাঙ্গ অবয়বের বৈশিষ্ট্য থেকে এই সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না। তিনি আরও বলেন যে এই সব উপজাতির সঙ্গে নিশ্চিতই মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনার অনুসন্ধানে O'Donnel সাহেব বলেছেন যে রাজবংশী অথবা কোচজাতির মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাবই বেশী। কোচবিহারের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপটেন Lewin ১৮৭২ সালে যে মন্তব্য করেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে ভুটান ডুয়ার্স অধিবাসী মেচ উপজাতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুগণের পারস্পরিক বৈবাহিক সংমিশ্রণের ফলেই রাজবংশী জাতির উদ্ভব। কোচবিহারের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বলেন যে রাজবংশী কখনও দু'টি উপজাতির সংমিশ্রণ নয়।

পঞ্চাশতের রাজবংশী সমাজে বিশেষ প্রচলিত যে মতবাদ অনুযায়ী এরা নিজেদের ভাঙ্গ ক্ষত্রিয় বলে মনে করে তাকে আরও বেশী গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন আছে। ইতিহাসের পাঠকেরা সকলেই জানেন যে প্রাচীন কামরূপে (যার বিস্তৃতি ছিল সমগ্র উত্তর বঙ্গ এবং আসামে) কি ভাবে আৰ্য্য বিজেতাদের সঙ্গে কামরূপ অধিবাসীদের মিলন ঘটেছিল এবং সে মিলনের ফলে অনেক পারস্পরিক বৈবাহিকসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বিজেতা আৰ্য্য রাজপুরুষেরা যদি কামরূপী কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারেন, তবে তাদের বংশধরেরাও যে অনুরূপ বিবাহ সঙ্ঘর্ষে আবদ্ধ হয়ে একটি নতুন জাতির সৃষ্টি করবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এই মতের স্বপক্ষে অনেকেই যোগিনীতন্ত্র থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি দিয়ে থাকেন।

“পরশুরাম ভয়াং ক্ষত্রী

সাংকোচাং কোচ উচ্যতে ॥”

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যোদ্ধা পরশুরাম কর্তৃক নিহত হবার ভয়ে যে সব ক্ষত্রিয়েরা সঙ্কুচিত হয়ে পালিয়ে যান তাদেরই কোচ বলা হয়। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই পরশুরামের এই আক্রমণের ঘটনাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করেন। তাঁদের মতে কিছু ক্ষত্রিয় দক্ষিণ দেশ থেকে পালিয়ে কামরূপে এবং উত্তরবঙ্গে এসে আশ্রয় নেন। তাঁরা কালক্রমে স্থানীয় উপজাতিদের সঙ্গে মিশে যান এবং এর ফলে রাজবংশী জাতির উদ্ভব হয়। এই কারণেই রাজবংশীরা নিজেদের ভাঙ্গ ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

সুতরাং রাজবংশী একটি মিশ্রিত জাতি একথা স্বীকার করলেও এই সংমিশ্রণের উভয় পক্ষই অনাৰ্য্য অথবা উপজাতীয় হবার সম্ভাবনার চেয়ে একপক্ষ আৰ্য্য রক্ত সম্ভূত হবার সম্ভাবনাই বেশী।

প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে নৃতত্ত্ববিদগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিই আৰ্য্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত।

রাজবংশীয় গ্রাম

বর্তমান পরিচ্ছেদে বহুজনবিদিত কথাই সংক্ষেপে বলতে যাচ্ছি। দক্ষিণ পূর্ব এবং পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় এলাকায় সাধারণতঃ যেমন সাজানো গ্রাম দেখতে পাওয়া যায় জলপাইগুড়ি জেলার পল্লী অঞ্চলে তেমন কিছু নেই। দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে এসে যারা এ জেলায় বসতি গড়ে তুলেছেন তাঁরা সাধারণতঃ ঘন সন্নিবিষ্ট বস্তীতে বসবাস করছেন এবং তাঁদের অনেকেরই চাষের জমি কিংবা কর্মস্থল ভিন্ন জায়গায় রয়েছে। রাজবংশীয় গ্রাম অন্তরকমের। এ শ্রেণীর লোকেরা নিজের নিজের জমি অথবা জোতের মাঝখানে ঘর বেঁধে বাস করতেই চিরকাল অভ্যস্ত এবং এখনও তাই করছেন যারা সম্পন্ন গৃহস্থ এবং অন্ততঃ ৫০।৬০ বিঘা জমির মালিক। তাঁরা একটি করে প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করেন যার আওতায় বহির্কোণাটী, ভিতরবাটী, দেবদেবীর স্থান, রান্নাঘর, ঢেঁকিশাল ইত্যাদি থাকে। এই রকম প্রত্যেকটি গৃহের চারপাশে গৃহীর আধিয়ারগণ বা প্রজারা ছোট ছোট কুটীর বেঁধে বাস করেন। এই ধরনের গৃহী অথবা জোতদার কখনও অগ্নের জমিতে গৃহ স্থাপন করেন না। আবার পেজা অথবা আধিয়ারের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের জমি আদৌ নেই। তারা তাদের জোতদারের জমিতে তাঁরই গৃহসংলগ্ন জমিতে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে যাচ্ছে। এই রকম কয়েকটি গৃহগুচ্ছকে এক একটি “টারি” অর্থাৎ পাড়া বলা

হয় এবং তিন চারটি টারি নিয়ে একটি মৌজা হয়। এক টারি থেকে অন্য টারিতে যাবার পায়ে চলা আইল পথ অথবা গরুগাড়ীর আঁকাবাঁকা পথ আছে। এক মৌজা থেকে আর এক মৌজায় যাবার মাটির রাস্তা সাধারণতঃ অঞ্চল পঞ্চায়েত অথবা জিলা পরিষদ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। বর্তমানে ডুয়াস এলাকায় এবং বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় (জলপাইগুড়ি-রাজগঞ্জ) সরকারী প্রচেষ্টায় অনেক পাকা রাস্তা হয়েছে যার ফলে জলপাইগুড়ি জেলার স্বদূর পরীতেও যাতায়াতের ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে এসেছে।

জলপাইগুড়ির গ্রাম অর্থাৎ প্রধানতঃ রাজবংশী অধুষিত এলাকা কখনও জনবহুল ছিল না। বর্তমানে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীরা এক রাজবংশী গৃহ এবং অপর গৃহের মধ্যকার ব্যবধান পূরণ করে অনেক ঘর বেঁধেছেন এবং অনেক রাজবংশী গ্রামকেই আধুনিক গ্রামের চেহারা দান করেছেন। পূর্বে এ জেলায় অধিকাংশ অঞ্চল জঙ্গলে ঢাকা ছিল। এক একজন জোতদার একটি স্থানে এসে যত ইচ্ছে জমি দখল করে পশ্চিম থেকে কুলি এনে তাদের দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে চাষবাস শুরু করে দিতেন। এই ভাবেই জোতদার—আধিকারের মিলিত “টারি”গুলি গড়ে উঠতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উদ্বাস্তুদের চাহিদা পূরণের ফলে এখন জমি আর সহজলভ্য নয়। মাথাপিছু জমির পরিমাণও অনেক কমে গেছে। এর ফলে চাষের পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন করতে সকলেই বাধ্য হয়েছেন। আরও পরিবর্তন অপেক্ষমান। প্রাক স্বাধীনতা যুগে যখন জলপাইগুড়ি জেলায় জনসংখ্যার চাপ ছিলনা ব’লেই হয় তখন রাজবংশীরা হৈমন্তিক ধান ছাড়া অন্য কিছু চাষের দিকে মন দিতেন না। সামান্য কিছু জমিতে কলা, কচু, কুমড়া, লক্ষা ইত্যাদির চাষ হ’তো। বাকী জমি আধন ধানের মরশুম ছাড়া অন্য সময়ে পড়েই থাকতো। অবশ্য কান্তিক মাস থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত তামাকের চাষ হ’তো এবং এখনও হয়। জমি বেশী থাকায় এবং ধানের দাম কম থাকায় চাষের উৎকর্ষের দিকে রাজবংশী জোতদারের লক্ষ্যই ছিল না। ধান কাটা, মাড়ান এবং গোলাঘরে তোলার সময়েও দেখা যেত যে জোতদার নিজে হাঁকো হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার মজুররা ইচ্ছেমত কাজ করে চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু চাষীদের আদর্শ স্থানীয় রাজবংশীরাও চাষের দিকে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। এখন খরিফ ফসলের পূর্বে প্রাক খরিফ ফসল যথা, আউস ধান ও পাট চাষ করে রাজবংশীরাও প্রচুর লাভ করছেন। শীতের মরশুমে আলু, কপি, মূলো, পালং, টমেটো, বেগুন, সরষে ইত্যাদির চাষ আবার শীতের শেষে পটলের চাষ আগের তুলনায় অসম্ভব বেড়ে গেছে। এ সমস্তই উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে শেখা।

রাজবংশী গৃহের সাধারণ রীতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। বর্দ্ধিষ্ণু রাজবংশীগৃহ নিম্নলিখিত কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত :—

১। **ডারিঘর বা বৈঠকখানা** :—এই ঘরখানি খুব লম্বা ও চওড়া করে বাইরের দিকে স্থাপন করা হয়। এ ঘর শুধু বৈঠকখানা নয় এটা অতিথিদের রাত্রে থাকার স্থান, গল্প করবার যায়গা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা চালাবার স্থানও বটে। আগে এই ঘর চার চালা করা হ’তো। এখন অনেকেই দোচালা করছেন।

২। **গোলাঘর** :—সাধারণতঃ বাইরের উঠানের এক কোনে উঠানো হয়। গোলাঘর গোলাকৃতি এবং চতুষ্কোণ ছ’রকমেরই দেখা যায়। বাঁশ এবং কাঠের মিশ্রণে গোলাঘর তৈরী হয়। ছাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খড় ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ টিনের চালও করছেন। গোলাঘর বড় হ’লে তাকে ‘গোলা’ এবং ছোট হ’লে

‘মুরকি’ বলা হয়। কাঠের অথবা বাঁশের পাটাতনের উপর ধান ইত্যাদি আলগাই ফেলে রাখা হয়। কখনও বা বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরী গোল চোন্ধাকৃতি ‘ডোলে’ ভত্তি ক’রে রাখা হয়।

৩। ‘গোয়াল ঘর’ :—একখানা অতি সাধারণ রকমের চালাকেই গোয়াল ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে গোয়াল ঘরের অবস্থান সম্বন্ধে রাজবংশীরা তেমন সজাগ নন। অনেক সময় দেখা যায় যে বাসগৃহের অতি নিকটেই গোয়াল ঘর এবং তার পাশেই গোবর পচাবার কুণ্ড তৈরী করা হয়েছে। ফলে দুর্গন্ধে সকলকেই বেশ অস্বস্তি ভোগ ক’রতে হয়। এ কথাও সত্য যে যারা বন্ধিফু গৃহস্থ এবং অল্প বিস্তর শিক্ষিত তাঁরা গোয়াল ঘরকে উন্নত ধরনের (যথা পাকা মেঝে ও পাকা নাল সমন্বিত) এবং যথেষ্ট ব্যবধানে স্থাপন করেন।

৪। ‘ঠাকুরাগীর ঘর’ অথবা ‘থান’ :—রাজবংশী গৃহের বহির্বাটীর উঠানের এক পাশে দু’খানি খুব ছোট ছোট খড়ের ঘর দেখতে পাওয়া যায়। তবে একখানিতে কালীমাতার মূর্তি থাকে অপরখানি ‘মনসা দেবীর’ জন্ত নিদিষ্ট। এই ঘর দু’খানি চার পাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে এবং বেড়ার ভিতরে ফুলের গাছ লাগানো থাকে।

রাজবংশী পরিবারের ভিতর বাটীতে কয়েকটি ঘর থাকে, যথা—

১। বাস্তুঘর বা পারিবারিক দেবতার স্থান—উত্তর পোতায় দক্ষিণমুখে স্থাপন করা হয়। ঘরটির পূর্বদিকে একটি পরিষ্কার বংশদণ্ড মেঝেতে পোতা হয় এবং এর চার পাশে মাটি দিয়ে উঁচু ক’রে একটি বেদী তৈরী করা হয়। বেদীকে গোবর জল দিয়ে লেপে মুছে সব সময় পরিষ্কার রাখা হয়। এই বেদীর উপরেই বাস্তুঠাকুরকে স্থাপন করা হয়। যে বাঁশটির কথা বলা হলো তাকে লাল রংএর কাপড় দিয়ে মুড়ে তাকেই বাস্তুদেবতা মনে করা হয় এবং প্রতিদিন ফুল ও বেলপাতা দিয়ে পূজা করা হয়।

২। ‘বসবাসের ঘর’ অথবা ‘থাকিবার ঘর’ :—রাত্রে থাকিবার ঘর সাধারণতঃ ভিতরের উঠানের পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে বাঁধা হয়। গরীব রাজবংশীদের একখানাই শয়ন ঘর থাকে এবং সে ঘরে কোনো জানালা থাকে না। শুইবার ব্যবস্থা থাকে বাঁশের তৈরী মাচার উপরে। ধানের খড় এবং পাটের বোনা মোটা চট দিয়ে বিছানা তৈরী হয়। অনেকে কাঠের পিঁড়ীকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু বর্তমানে সামান্য অবস্থাপন্ন রাজবংশীরাও কাঠের তক্তাপোষ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি ব্যবহার করেন এবং বিছানা হিসাবে তুলার লেপ, তোষক, বালিশ ইত্যাদি ব্যবহার ক’রে থাকেন। উপরে রাজবংশী গৃহের যে বর্ণনা দেওয়া হ’লো তা ছাড়াও প্রায় সব বাড়ীতেই থাকে রান্নাঘর, ঢেঁকিশাল ইত্যাদি।

পানীয় জল :—প্রত্যেক রাজবংশী গৃহস্থই অতি সহজে তার পানীয় জলের স্বাধীন ব্যবস্থা ক’রে নেয়। যদিও সে ব্যবস্থা আদৌ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্মত নয়। প্রত্যেকেই মাটিতে ১০।১২ হাত গর্ত খুঁড়ে যে কূপের ব্যবস্থা করে তাকে স্থানীয় ভাষায় কাঁচা “চূয়া” বলা হয়। এর জল দেখতে পরিষ্কার কিন্তু রোগ বীজাণু ভর্তি। “চূয়া”র মধ্যে যাতে শিশু ও ছাগল, গরু পড়ে না যায় সে জন্যে চূয়ার উপরে চারিদিকে গোলাকার বাঁশের তৈরী খাঁচা বসানো থাকে। ইদানীং জিলা পরিষদ এবং সরকারী প্রচেষ্টায় অনেক পল্লীতে পাকা অর্থাৎ সিমেন্টের তৈরী কূপ অথবা নলকূপ বসান হয়েছে। কিন্তু সেই পাকা কূপ যদি রাজবংশী গৃহস্থের বাড়ী থেকে সামান্য দূরে থাকে তা’হলে

গৃহস্থ কখনও সামান্য শ্রম স্বীকার ক'রে পাকা কূপের জল আনতে যাবে না। বরং নিজের বাড়ীর কাঁচা 'চুয়া'র জলই স্নান-পানে ব্যবহার ক'রবে।

পায়খানা :—রাজবংশী পল্লীতে পায়খানার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সকলেই মাঠে জমির আইলে কিম্বা বাঁশ বোনের আড়ালে পায়খানার কাজ সেরে থাকেন। বর্তমানে ২১৪ জন শিক্ষিত রাজবংশী বাড়ীতে পাকা পায়খানা অর্থাৎ Sanitary Latrine বসিয়েছেন।

রাজবংশীর সরল গ্রাম্য জীবন

যে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন রাজবংশী আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের জীবনধারার বিশেষ কোন তফাৎ নেই। কিন্তু যে অগণিত রাজবংশী ভাই-বোনেরা গ্রামেই জীবন যাপন ক'রছেন তাঁদের কথা বলা দরকার। কারণ এই অতি সহজ সরল ব্যবহারগুলি হয়তো কালক্রমে পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণের ফলে লোপ পেয়ে যাবে। রাজবংশী চাণী পরিবারের পোষাক, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি লক্ষ্য করলেই জানা যাবে যে তারা কত সরল। একজন সাধারণ রাজবংশী কৃষক একটীমাত্র 'নেংটা' প'রে থাকতে, চলতে, ফিরতে এবং কাজকর্ম ক'রতে কোন অহুবিধা বোধ করে না। কেবলমাত্র হাটে বা শহরে যাবার জন্তে তার একখানি সাধারণ ধুতি এবং যে কোন রংএর একটা ছিটের সার্ট থাকে। সন্ধ্যার পর এপাড়া ওপাড়া যাবার জন্যে সে খড়ম পায়ে দিয়ে চলে। কিন্তু শহরে যাবার সময়ে একজোড়া জুতো ব্যবহার ক'রে থাকে। সে জুতো অন্যসময়ে তোলা থাকে। তার দৈনন্দিন খাওয়া দাওয়া অতি সাধারণ ধরণের। দু'বেলাই ভাত খায়। ভাতের সঙ্গে ডাল অথবা তরকারী কিম্বা বেশী পরিমাণে শাক—একটা কিছু হ'লেই ভাত খাত খাওয়া হয়। খালে, বিলে, পুকুরে যখন নিজেই মাছ ধরে তখন মাছ খায়। সকাল বেলায় কিছুক্ষণ চাষের কাজ করবার পর একবার বাসিভাত অথবা পান্তাভাত খায়। সে দৈনিক স্নান করে এবং শরীরকে যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখে। তবে তেল বা সাবান সব সময় ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। বাহিরে যাবার আগে মাথায় তেল ব্যবহার করে—তাঁও স্নানের পরে।

পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে রাজবংশী স্ত্রীলোকদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যারা কিছু পরিমাণে আধুনিক তারা শাড়ী, ব্লাউজ এবং শাড়ীর নীচে সাদা ব্যবহার করে। কিন্তু যারা গ্রাম্য সে সব স্ত্রীলোক একখানি মাত্র ৫ হাত লম্বা ২১ হাত চওড়া শক্ত রঙ্গীন কাপড় বুকুর উপরে বেঁধে হাটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে ব্যবহার করে। এই ধরণের কাপড়কে ওদের ভাষায় "ফোতা" বলে। কিছুদিন আগেও এই "ফোতা"গুলি গ্রাম্য তাঁতিরাই তৈরী ক'রতো। এখন মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হ'য়ে তাঁতিরা "ফোতা" সরবরাহ প্রায় বন্ধ ক'রেছে। এখন মিলের শাড়ীই বুকু বেঁধে মেয়েরা আবরণের কাজ চালায়। "ফোতার" আর এক নাম "বুকুনী" যেহেতু একে বুকু বেঁধা হয়। এ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে। "হাজার টাকার বুকুনী তাও বান্ধে বুকুনী"—অর্থাৎ একজন কোচরমণী ধনী হলেও "ফোতা" বুকু বেঁধে। রাজবংশী স্ত্রীলোকদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ফর্দ দেখে মনে হয় না যে তারা অন্যান্য জাতির কৃষক রমণীদের থেকে কিছু আলাদা। সকাল থেকে ঘর নিকানো, ধান সিদ্ধকরা, ধান ভানা, রান্নাকরা, কৃষকদের খাবার যোগান দেওয়া, সন্তান পালন এবং কখন কখন হাটে বাজারে যাওয়া এই তার

দিনের কাজ। এই প্রসঙ্গে রাজবংশী রমণীদের মধ্যে বহু প্রচলিত একটি “ধান ভুকার” গান অর্থাৎ ধান ভানার গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

“শ শ শ
তিল নাড়ু খা—
তিল হোলো গটা
নোখালিয়’র হোলো ব্যাটা
মোর হোলো নাতি
কাম করিব’র হাতি।

পূর্বে বঙ্গে প্রচলিত “ভাটগালা” গানের মত উত্তর বঙ্গে অতি পরিচিত “ভাওয়াইয়া” গানের মধ্যে একটি বহুল-প্রচলিত গান উদ্ধৃত না করলে এদের সমাজের কথা সত্যই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই উক্ত সাহিত্যের প্রামাণ্য পুস্তক থেকে একটি গান ও কয়েকটি ছড়ানীচে দেওয়া হচ্ছে।

“ফাঁহাদে পোরিয়া বোগা কান্দেরে
ফান্দ বোসাইসে ফাঁহাদির ঘর
পুঠি মাছো (ক) দিয়া।
ওরে মাছের লোভে বোকা বোগা
পরে উরাল দিয়া।
উড়িয়া যায় চখোয়ার পংখি
বোগীক বলে ঠারে
ওরে তোমার বোগা বোন্দি হোইসে
খোলা নদীর চরে।
এই কথা শুনিয়া বোগী
দুই পাখা মেলিলো
ওরে খোলা নদীর পারে যাবা
দরশন দিলো।
বোগাক দেখিয়া বোগী কান্দেরে
বোগীক দেখিয়া বোগা কান্দেরে।”

শিশুদের ঘুম পাড়ানী গানকে বলা হয় “ছাওয়া ভুরকা”। কয়েকটি ছাওয়া ভুরকা :—

- ১। “চুপরে হোকোশ ছাওয়া
তোর বাবা গেইসে সোর চরেবা
সোর চরাইতে পাইসে টাকা
টাকাক মাইচেচ পাক তার
ছাওয়ার মাও খরিসে ভাতার।”

- ২। “চুপরে চুপরে হোকোশ ছাওয়া
তোর বাবা গেইসে সোর মারিবা
সোর মারিতে পাইসে টাকা
কিনিয়া আনিসে মালদই ফতা।”
- ৩। চুপরে চুপরে বাউ তোর মামা আসেছে
বাঁশের পাতোত্ নাক আনেছে।”
- ৪। “পারোর বাজা গাড়ী টানে
দাকতোর হচে টিহা
বানর যাছে গীত গাবা
টুলি মাথত্ দিয়া”

সবশেষে রাজবংশী সমাজের বিবাহ পদ্ধতি বিষয়ে কয়েকটা কথা জানিয়ে বর্তমান নিবন্ধ শেষ ক’রতে চাই।
বিয়ের বাপারে সর্বশেষ নীতি অনুযায়ী রাজবংশীরা বর্তমানে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের আদব কাগদা সর্বশেষে গ্রহণ
করছেন। তবুও পূর্বকালের রীতিনীতি এখনও লোপ পায়নি। এদের মধ্যে চিরচরিত প্রথা অনুযায়ী কন্যার পিতা
‘কন্যাপণ’ হিসাবে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকেন। পাত্রের পিতা ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে
এই টাকাটা মেয়ের পিতাকে দিয়ে থাকেন। সবচেয়ে আধুনিক যারা তারা অল্প পদ্ধতিতে চলতে আরম্ভ
ক’রেছেন। অর্থাৎ শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন পাত্রের হাতে কন্যাদান করতে হ’লে কন্যার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ
অলঙ্কার এবং ঘোঁতুক দিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে কন্যার পিতাকেই অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হ’তে হয়—কন্যাপণ
পাওয়াতো দূরের কথা। অবশ্য আগেকার “কন্যা বেচা” পদ্ধতি অনগ্রসর রাজবংশীদের মধ্যে এখনও চালু আছে।
মেয়েদের বিয়ের বয়স সাধারণ ভাবে ১৪ থেকে ১৬ এবং ছেলেদের ২০ থেকে ২৩। বিবাহের যে সব পদ্ধতি
রাজবংশী সমাজে চালু আছে তার মধ্যে ‘ফুলবিহা’ সর্বজন গ্রাহ্য এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিয়ে
‘ঘটক’ অথবা পাত্র পাত্রীর অভিভাবকেরাই স্থির করেন। ‘ফুল’ অর্থে মুকুট। এক মাত্র এই ধরনের বিয়েতেই
বর এবং কনের মাথায় মুকুট দিয়ে সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় এবং পুরুত এসে মন্ত্র পড়িয়ে বিয়ে দেন। সাধারণতঃ
কামরূপী ব্রাহ্মণেরাই পৌরোহিত্য করে থাকেন। “ঘর জিয়া বিহা” এবং “পানি ছিটা” বিয়ের পদ্ধতিও চালু আছে।
“ঘর দিয়া” অর্থ ঘর জামাই। এটাও একটা সমাজ স্বীকৃত পদ্ধতি। যে ক্ষেত্রে পাত্র পিতৃ মাতৃহীন অথবা নিঃসন্ত
সে রকম পাত্র কোনও এক স্বজাতি গৃহস্থের বাড়ীতে চাকর হিসেবে কাজ করতে থাকে। কাজ সম্ভাব্যজনক হ’লে
কয়েক বছর পরে গৃহস্থ নিজের মেয়ের সঙ্গে ঐ পাত্রের বিয়ে দিয়ে বাড়ীতেই রেখে দেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে
মেয়ে জামাইকে কিছু সম্পত্তি দান ক’রে আলাদা ঘর বেঁধে দেওয়া হয়। “পানি ছিটা” অথবা “পানি অর্পণ” বিয়ে হ’চ্ছে
এক ধরনের পাত্রের কম খরচায় বিয়ে। পাত্রের পয়সা না থাকায় সে বিয়ে করবার সুযোগ পায়নি। কোনো
এক পাত্রীর অভিভাবককে সে তখন রাজী করায় যে আমার পল্লবে জলের ছিটে মাথায় দিয়ে তাকে ‘কন্যা’ সম্প্রদান
করা হোক। এটা একটা নিরাড়ম্বর বিবাহ। সাধারণতঃ কন্যার মাতা অথবা কোন বর্ষীয়সী মহিলা “মোর
ছাওয়ার লাজ সরম সব তোক্ সপিদিহু” এই কথা বলে বরকনের মাথায় আমার পল্লবে ক’রে জল ছিটিয়ে এই
ধরনের বিয়ে শেষ করেন। ধর্ম বিশ্বাসে এবং পূজা অর্চনায় এঁরা পুরোপুরি হিন্দু। সাধারণতঃ এঁরা মহাকাল

অর্থাৎ মহাদেব, কালীমাতা এবং মা মনসার পূজা করে থাকেন। বর্ণ হিন্দুরা যেমন প্রত্যেক পূজার আগে গণেশ পূজা করে তার পর অন্ন পূজা আরম্ভ করেন—এঁরা তেমনি সর্বাগ্রে মা মনসার পূজা দিয়ে শুরু করেন।

উপসংহার

অনেকেই এরকম আশঙ্কা প্রকাশ ক'রছেন যে অন্যান্য তথাকথিত অগ্রসর জাতি কিম্বা বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে রাজবংশী জাতির নিজস্ব কুষ্টি অথবা সামাজিক জীবনধারা লোপ পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে একটি ঘটনা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার আছে যে রাজবংশী কন্যার ভিন্নজাতির পাত্রের সঙ্গে বিবাহের সংখ্যা নগণ্য। পঁচাত্তরে আজকাল শহরে উপসহরে এবং গ্রামে যে সব রাজবংশী পরিবার বাস ক'রছেন তাঁদের মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণপ্রিয়তাই খুব বেশী ক'রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার গুণেই এই হাওয়া বদল শুরু হ'য়েছে। মনে হয় এরই ফলে রাজবংশী তাঁর চিরপুরাতন অভ্যাস এবং কুসংস্কারগুলি পরিত্যাগ করে অন্যান্য বর্ণ হিন্দুদের মত সর্বাংশে অগ্রসর হয়ে উঠবেন। স্বল্প গ্রামে যারা বাস ক'রছেন তাঁরাও বেশীদিন পিছিয়ে থাকবেন না।

শতবর্ষের দর্শনে দেশের স্বাধীনশাসন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

‘জলসাত্রার লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠান’

জলপাইগুড়ির জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিল্প ও বাসিন্দাদের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। জলসাত্রার লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জলসাত্রার লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি দেশের স্বাধীনশাসনের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এটি দেশের স্বাধীনশাসনের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে।

জলসাত্রার লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি দেশের স্বাধীনশাসনের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এটি দেশের স্বাধীনশাসনের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে।

শতবর্ষের দর্পণে জেলার স্বায়ত্তশাসন

শ্রীসন্তোষ ঘোষ

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় শতবর্ষের পরিক্রমায় এ জেলার স্বায়ত্তশাসনমূলক ইতিবৃত্ত। এর ভিতরে একদিকে রয়েছে সেস বোর্ড, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, স্কুল বোর্ড এবং সাম্প্রতিক পঞ্চায়েতী রাজভুক্ত জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ আর গ্রাম পঞ্চায়েৎ, অপরদিকে রয়েছে শহর এলাকায় পৌরসভা।

এতগুলি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালের কর্মাবলী পর্যালোচনা করে ধারাবাহিক বিস্তারিত বর্ণনায় প্রচুর সময় ও স্থানের প্রয়োজন। তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা করা হল। লেখকের অক্ষমতার জগু বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও নাম বাদ পড়েছে। এজগু প্রথমেই মার্জনা চেয়ে রাখা হল।

পৌর সভা

একদা তিস্তা নদীর তীরে ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবাদী কজা শক্ত করতে চেয়েছিল। তাই সামান্যতম অজুহাতে ১৭৭৩ সালে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট জলপাইগুড়িতে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। ভূটানের হাত থেকে ডুয়ার্স উদ্ধার করে ১৮৬৪ সালে ময়নাগুড়িতে সদর স্থাপন করে এফ. এ. ডনোফ শাসনভার গ্রহণ করলেন। পরে নানা সুবিধার কথা বিবেচনা করে তিস্তার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় তীর নিয়ে নতুন জেলার পত্তন করে ইংরেজ জেলার সদর কেন্দ্র স্থাপন করল জলপাইগুড়িতে ১৮৬৯ সালে। ১৮৭৭ সাল থেকে শুরু হল জলপাইগুড়ি জেলায় চা আবাদের প্রচেষ্টা।

জলপাইগুড়ির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে নানা দিক থেকে মানুষ এল এখানে। ক্রমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং গড়ে উঠল নতুন শহর জলপাইগুড়ি। সে কাহিনী পাওয়া যাবে অন্য প্রবন্ধে।

নানা রাজনৈতিক কারণে তদানীন্তন ইংরেজ শাসক ১৮৮৫ সালে প্রবর্তন করলেন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিধি। তদনুযায়ী ১৮৮৫ সালের পয়লা এপ্রিল স্থাপিত হল জলপাইগুড়ি পৌরসভা। অনিবার্য কারণেই সরকার মনোনীত কতিপয় সদস্য নিয়ে গঠিত হল সেই পৌর সভা। সভাপতি মনোনীত হলেন স্বয়ং জেলা শাসক এবং সহঃ সভাপতি হলেন সিভিল মেডিক্যাল অফিসার (পরে এই পদের সরকারী নাম হল সিভিল সার্জন)।

জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমিশনার জি. ডি. বি. ডালটন (সভাপতি), ডাঃ জে. ওয়াই. বেবুনন (সহঃ সভাপতি), মাধবচন্দ্র দাস, প্রিয়নাথ ব্যানার্জি, নির্মলচন্দ্র সিংহ, বিহারীলাল গাঙ্গুলী, মুন্সী তকিমুদ্দিন ও মুন্সী আবদুল হামিদ। সরকার মনোনীত সদস্য এবং ডেপুটি কমিশনার সভাপতির পরিচালনায় জলপাইগুড়ি পৌরসভা চলল ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। পরিবর্তন শুধু এইটুকু হল যে, সহঃ সভাপতির পদটি সরকারী সদস্যের পরিবর্তে বেসরকারী সদস্যের হাতে গেল। ১৮৮৭ সালের ১০ই অক্টোবর প্রথম বেসরকারী সহঃ সভাপতি মনোনীত হলেন রাজেন্দ্রলাল রায়।

১৮৮৬ সালে জলপাইগুড়ি পৌরসভার বাজেটে ধরা হয়েছিল ৫,৩২৮ টাকা মাত্র।

১৮৮৭ সালে দিনবাজারে একটি বাজার স্থাপনের জন্য পৌরসভা থেকে বৈকুণ্ঠপুরের তদানীন্তন রাণী জগদীশ্বরী দেবীকে অনুমতি দেওয়া হল।

এতদিন পৌরসভার অফিস ছিল নৃপেন্দ্র নারায়ণ হলের একটি কক্ষে। এখন যে গৃহে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস, সেই ভবনটির নাম ছিল নৃপেন্দ্র নারায়ণ হল। জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের শতবর্ষের ইতিকথায় নৃপেন্দ্র নারায়ণ হলের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। একথা বললে অত্যাক্তি হবে না যে, এ জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গোড়া পত্তন হয়েছিল ঐ স্থদৃশ্য ভবনে। ঐ ভবনে ভাড়াটে ছিল জেলা রোড সেস বোর্ড, জেলা বোর্ড এবং জলপাইগুড়ি পৌরসভা। নৃপেন্দ্র নারায়ণ হলের একটি কক্ষে পৌরসভার অফিস ছিল, তার জন্য মাসিক ভাড়া দিতে হত ২০ টাকা।

পরবর্তীকালে জেলাবোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মিত হলে ঐ নৃপেন্দ্রনারায়ণ হল থেকে উঠিয়ে পৌরসভার অফিস জেলা বোর্ড ভবনে আনা হয়। এই অফিস স্থানান্তরিত হয় ১৮৮২ সালের ৩রা আগষ্ট। তার কয়েকদিন পরে ৩১শে আগষ্ট মেহেরুন্নেসা খাতুন ও রহিমুন্নেসা খাতুনের কাছ থেকে পৌরসভার নিজস্ব অফিসের জন্য এক বিঘা জমি কেনা হয়।

১৮২০ সালে জলপাইগুড়ির পৌর এলাকা জরিপ করা হয়। এ কাজ করেন লেনার্ড সাহেব।

জলপাইগুড়ি পৌর সভার ইতিবৃত্তে ১৯১৬ সাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকারী আওতা থেকে ঐ বছর পৌরসভা বহুলাংশে মুক্ত হল এবং ২২শে আগষ্ট প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত হলেন অম্বকুলচন্দ্র মুখার্জি। তারপর থেকে অষ্টাবদি আরও ১২ জন পৌরপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই মোট ১৬ জন পৌরপতির ধারাবাহিক নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :—

পৌরপতিদের নামের তালিকা :—

- ১। অম্বকুল চন্দ্র মুখার্জি
- ২। প্রসন্নদেব রায়চন্দ্র
- ৩। পূর্ণচন্দ্র রায়
- ৪। মৌলভী আব্দুস সাত্তার
- ৫। ডাঃ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
- ৬। বিপুলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
- ৭। মৌলভী মুকুলেশ্বর রহমান
- ৮। ভবকিঙ্কর ব্যানার্জি
- ৯। জীবনগতি রায়
- ১০। সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়
- ১১। অতুল চন্দ্র রায়
- ১২। কামিনী কান্ত রায়চন্দ্র
- ১৩। ডাঃ স্বধীর কুমার বসু

জলপাইগুড়ি পৌর সভা যথাসাধ্য ক্ষমতায় শহর উন্নয়ন কাজে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৩৪ সালে জলপাইগুড়ি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ১৯৩৫ সালে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ শুরু হয়।

যদিও জলপাইগুড়ি বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীর সাথে পৌরসভার কোন সম্পর্ক নেই, তথাপি শহর উন্নয়নে বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিহার্য বলে বিদ্যুৎ কোম্পানী পত্তনের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

গত ১৯৩৩ সালের ১২ই জুন একটি যৌথ কোম্পানী জলপাইগুড়ি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমতি পায়। উক্ত কোম্পানী প্রথম পর্যায়ে দু'টি ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র স্থাপন করে ১৯৩৪ সালের ১৪ই অক্টোবর জলপাইগুড়ি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে। এখানে সংগোচরিত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্বোধন করেছিলেন। প্রথম বৎসর মাত্র ৫৫টি বাড়ীতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করা হয় এবং ঐ বৎসর বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আলোচ্য কোম্পানীর আয় হয় ২,৩৮০ টাকা মাত্র। শহরের শ্রী-বুদ্ধির সাথে সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে ১২০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। শহরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার পক্ষে এই বিদ্যুৎ পর্যাপ্ত নয় বলে আলোচ্য কোম্পানী সম্প্রতি জলঢাকা জলবিদ্যুৎ গ্রহণ করে শহরের একাংশে সরবরাহ করছে। অচিরে এ ব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে জলপাইগুড়ি পৌরসভা এই কোম্পানীর বিদ্যুতের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন পথে ৫৪৪টি বাতি জ্বালাচ্ছে। উপরন্তু এই বিদ্যুতের সাহায্যে পৌরসভার গুয়াটার ওয়ার্কস পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৩৫ সালের আগে জলপাইগুড়ি শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। গত ১৮৮৯ সালের আগষ্ট মাসে তদানীন্তন পৌরসভা নরটন টিউবওয়েল বসাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তার বহু পরে কয়েকটি পাকা ইঁদারা খনন করা হলেও জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা বলা চলে না।

অতঃপর ১৯৩৫ সালে জলপাইগুড়ি গুয়াটার ওয়ার্কস স্থাপন করা হয়। ঐ বছর ৭ই ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন বাংলা সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় জলপাইগুড়ি পৌরসভার গুয়াটার ওয়ার্কসের শুভ উদ্বোধন করেন। এই গুয়াটার ওয়ার্কসের পরিকল্পনা (ডিসেন্ট্রালাইজড স্কীম) রচনা করেন পাবলিক হেলথের তদানীন্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার এফ, সি, গ্রিফিন। সিমেনস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান পাম্পিং মেশিনারী সরবরাহ করে এবং কালিম্পংয়ের খাজনামল সর্দার নামে এক কন্ট্রাক্টর জি, এন, মিত্রের তত্ত্বাবধানে গুয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণ করেন।

এই গুয়াটার ওয়ার্কস স্থাপনে যারা তদানীন্তন পৌরসভাকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় কৃষ্ণজন্দের সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাই জলপাইগুড়ি পৌরসভার গুয়াটার ওয়ার্কসের দু'টি পাম্পিং হাউসের নাম রাখা হয়েছিল কৃষ্ণজন্দের পাম্পিং হাউস এবং রতনমণি (তদীয় পত্নী) পাম্পিং হাউস। এই পাম্পিং হাউস দু'টি থেকে ঘণ্টায় ১৪ হাজার গ্যালন জল পাওয়া যেত। আলোচ্য দু'টি পাম্পিং হাউসই এখন অকেজো হয়ে গেছে। বর্তমানে নতুন দু'টো পাম্পের সাহায্যে জল তোলা হচ্ছে। এই দু'টোর জলোত্তোলন ক্ষমতা ঘণ্টায় ২৪ হাজার গ্যালন। শহরের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় এ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় বলে সম্প্রতি পৌরসভা নতুন পরিকল্পনা রচনা করেছেন। শহরবাসীর সুবিধার জন্য পৃথিপার্শ্বে ৮২টি হাইড্র্যান্ট আছে আর আছে ৩৭৮টি হাউস কানেকশন।

আগে জলপাইগুড়ি পৌর এলাকা ৭টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল এবং এই ৭টি ওয়ার্ড থেকে মোট ১২জন কমিশনার নির্বাচিত হতেন। তারপর ১৯৬৭ সালে জলপাইগুড়ি পৌর এলাকাকে এক-আসনযুক্ত ১২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এই নয়া ব্যবস্থায় প্রথম পৌর নির্বাচন সমাপ্ত হলেও মহামায়া হাইকোর্ট কর্তৃক ইনজাংশন জারির ফলে এই প্রবন্ধ লেখার দিন পর্যন্ত নব নির্বাচিত কমিশনারগণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন নি।

জলপাইগুড়ি পৌরসভার ৮৩ বৎসরের ইতিকথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন আজ পর্যন্ত দু'বার এই পৌরসভাকে সরকার বাতিল করেছেন। একবার ১৯৫৮ সালে, আর একবার ১৯৬৬ সালে। এখনও পৌরসভা একজন এডমিনিষ্ট্রেটরের পরিচালনায় চলছে। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

জলপাইগুড়ি পৌর এলাকার বর্তমান লোকসংখ্যা আনুমানিক ৬০ হাজার। এই শহরের বসতি কি হারে বেড়েছে তা নিম্নের তালিকা থেকে বোঝা যাবে :—

১৯০১—১০,২৮২ জন।

১৯১১—১১,৭৬৫ জন।

১৯২১—১৪,৮১৩ জন।

১৯৩১—১৮,৯৬২ জন।

১৯৪১—২৭,৭৬৬ জন।

১৯৫১—৪১,২৫২ জন।

পৌর এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব পৌরসভাকে বহন করতে হয়। ১৮৮৫ সাল থেকে জলপাইগুড়ি পৌরসভা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে এসেছে। প্রয়োজনের তুলনায় সে ব্যবস্থা কম হওয়ায় ১৮৮৯ সালে তদানীন্তন সরকার প্রাথমিক শিক্ষাখাতে আরও অর্থ ব্যয় করার জন্ত পৌরসভাকে চাপ দেন।

বর্তমানে জলপাইগুড়ি পৌরসভা ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্ত জলপাইগুড়ি পৌরসভা ১৯৫৫-৫৬ সালে ২২,৮২৮ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৬,৮০২ টাকা এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ৫১,৪৫৮ টাকা ব্যয় করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জলপাইগুড়ি পৌরসভা কোন শিক্ষাকর আদায় করে না। এই খাতে কিছু পরিমাণ সরকারী অনুদান পাওয়া যায় মাত্র।

খাণ্ডে ভেজাল নিরোধ পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব। জলপাইগুড়ি পৌরসভাও এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। গত ১৯৫৬-৫৭ সালে পৌর এলাকা থেকে মোট ২৬৮টি খাণ্ডবোর নমুনা ধরা হয় ; তার মধ্যে ৫৫টি নমুনা ভেজাল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে ধরা হয়েছিল মাত্র ৬৮টি নমুনা।

কলেরা-বসন্তের প্রতিষেধক টিকা দেবার ব্যবস্থাও করতে হয় পৌরসভাকে। ১৮৮৯ সালের অক্টোবর মাসে জলপাইগুড়ি পৌরসভায় প্রথম ভ্যাকসিনেটর নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে পৌর এলাকায় ৪০,৮৩১ জনকে বসন্তের টিকা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই সংখ্যা হল ১১,১৩৭ জন।

জলপাইগুড়ি পৌরসভার অধীনে প্রায় সাড়ে নয় মাইল পাকা সড়ক এবং সাড়ে সাত মাইল কাঁচা রাস্তা আছে।

১২৬৭-৬৮ সালে পৌরসভায় মোট আয় হয়েছিল ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ২১১ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছিল ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৭৩ টাকা। পূর্ব বছরের উদ্ভূত টাকা থেকে ঘাটতি পূরণ করতে হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি পৌর এলাকায় ৪,৪০০ খাটা পায়খানা আর ৬৫০টি স্যানিটারী পায়খানা আছে। মল অপসারণ ও সাফাই কাজের জ্ঞতা আছে ২৬০ জন কর্মী।

কোন পৌরসভার ইতিবৃত্ত কেবলমাত্র তথ্যের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না। পৌরসভার ইতিহাস জীবিত থাকে তার জীবন-স্পন্দনে। সে কাহিনী পাওয়া যাবে পৃথক প্রবন্ধে।

এ জেলায় আলিপুরছায়ায়ও কয়েক বছর আগে পৌরসভা স্থাপিত হয়েছে।

জেলা রোড সেস কমিটি

১৮৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিধি প্রবর্তনের পূর্বেই অগ্নাঙ্ক জেলার গ্রাম জলপাইগুড়ি জেলাতেও ছিল রোড সেস কমিটি। স্মৃতিবিচারে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আলোচনা পর্যায়ে না পড়লেও জলপাইগুড়ি পৌরসভা ও জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ড গঠিত হবার পূর্বে একদা সমগ্র জেলার উন্নয়নমূলক কর্মাবলী এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই রূপায়িত হত বলে, জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ আলোচনায় সেস বোর্ডকে বাদ দেয়া সমীচীন নয়।

১৮৬২ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের দুই বৎসর পরে এই জেলার সেস বোর্ড গঠিত হয়েছিল কিনা, তা বলা শক্ত। ১৮৭৮ সালের ২৪শে মার্চ এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেস বোর্ড অফিস পুড়ে যায় এবং সেই সাথে অফিসের যা কিছু নথিপত্র সব ভস্মীভূত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে যে সব পুরাতন কাগজপত্র পাওয়া গেছে তা পর্যালোচনা করে মনে হয়েছে যে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৮৭৬ সালে সেস বোর্ড গঠিত হয়েছিল এবং ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত এর কার্যকাল প্রসারিত ছিল।

মোট ২১ জন সদস্য নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা সেস বোর্ড গঠিত হত। সব সদস্যই ছিলেন সরকার মনোনীত; তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পদাধিকার বলে এবং অবশিষ্টেরা জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সরকারী মনোনয়নে আসতেন। প্রত্যেক দু' বছর পরে নতুন কমিটি গঠিত হত। সেস বোর্ডের সভাতেই সদস্যদের নামগুলি প্রস্তাব করা হত এবং সেই নামের তালিকা বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে সরকারের অনুমোদনের জ্ঞতা প্রেরণ করা হত। নতুন সদস্যদের তালিকা এলে দেখা যেত যে, সভার প্রস্তাবে উল্লিখিত প্রতিটি নামই সরকার অনুমোদন করেছেন। একবারও এর সামান্য ব্যতিক্রমও দেখা যায় নি।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনার হতেন বোর্ডের সভাপতি। সেস বোর্ডের সদস্যগণ দু' বছরে একবার সহঃ সভাপতি নির্বাচন করতেন। সেস বোর্ডের প্রথম সহঃ সভাপতি ছিলেন বেণীমাধব দত্ত। পরে ১৮৭৮ সালের ১১ই জুন তদানীন্তন সরকারী উকিল প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হন। সেস বোর্ডের শেষ দিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন সহঃ সভাপতি।

জেলার সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, পথবর্তী সেতু নির্মাণ, খেয়ার ব্যবস্থা, স্থানে স্থানে ডাকবাংলো স্থাপন ইত্যাদি ছিল সেস বোর্ডের কাজ। এ জেলার প্রায় প্রত্যেকটি সড়কেরই গোড়াপত্তন হয় সেস বোর্ডের হাতে। সদস্যগণ

সভায় মিলিত হয়ে পরিকল্পনা ও বায় বরাদ্দ মঞ্জুর করতেন এবং একজন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কয়েকজন ওভারসীয়ার ও সাব ওভারসীয়ারের সাহায্যে সেই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া হত।

সেস বোর্ডের প্রধান আয় ছিল সেস বা পথকর। তাছাড়া নির্দিষ্ট কাজের জন্য বছর বছর সরকারী অনুদানও পাওয়া যেত। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৭৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলা সেস বোর্ডের সেস খাতে আয় হয়েছিল ৩২,০০৪ টাকা, এবং সরকারী অনুদান পাওয়া গিয়েছিল ১৫,০০০ টাকা। আগে হাউস সেস আদায় করা হত, ১৮৭২ সালে ঐ কর আদায় বর্জন করা হয়।

জলপাইগুড়ি সেস বোর্ডের অফিস ছিল “আয়রন হাউসের” একটি কক্ষে। ঐ কক্ষের জন্য মাসিক ভাড়া দেয়া হত ১০ টাকা। কোচবিহারের মহারাজা ছিলেন ঐ বাড়ীর মালিক। ১৮৮৪ সালের ২১শে মার্চ চাকলাজাত এস্টেটের ম্যানেজার ঐ ঘর ছেড়ে দেবার জন্য নোটিশ দেন। সেস বোর্ড ‘ছ’ মাসের সময় চেয়ে নিয়ে সহঃ সভাপতি প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তারপর প্রায় ৬ মাস পরে সেস বোর্ডের ১৪ই সেপ্টেম্বরের সভায় এ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, মাসিক ঘরভাড়া ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ টাকা করা হল। এই বর্ধিত ভাড়ায় নৃপেন্দ্রনারায়ণ হলের ট্রাষ্টেরা ঘরভাড়া দিতে রাজি আছেন কিনা তা জানতে চাওয়া হল এবং প্রস্তাবে বলা হল যে, ট্রাষ্টেরা ঘরভাড়া দিতে অধিকারী কিনা তা যেন দা হার কাছ থেকে জেনে নেয়া হয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আয়রন হাউসের নাম ৬ মাসের মধ্যে নৃপেন্দ্রনারায়ণ হল হয়েছে, ঘরের মালিক কোচবিহারের মহারাজা হয়েছেন দাতা এবং ট্রাষ্টের হাতে দানের মাধ্যমে ঘরের মালিকানা চলে গেছে। বহু অনুসন্ধান করেও এ সম্পর্কে আর কোনও তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। বর্তমানে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস যে গৃহে অবস্থিত, তাকেই বলা হত নৃপেন্দ্রনারায়ণ হল। সেস বোর্ড শেষ দিন পর্যন্ত এবং জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম দিকে ঐ নৃপেন্দ্রনারায়ণ হলেই অবস্থিত ছিল। মিউনিসিপ্যালিটি মাসিক ভাড়া দিত ২০ টাকা।

১৮৭৬ সালে জলপাইগুড়ি জেলা সেস বোর্ডের যারা সদস্য ছিলেন তাঁদের নাম নিম্নে দেওয়া হল :—

- (১) ডেপুটি কমিশনার
- (২) ডি, সি, র সিনিয়র এসিষ্ট্যান্ট
- (৩) ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ
- (৪) এস, ডি, ও,—বক্সা
- (৫) বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
- (৬) চাকলাজাত এস্টেটের ম্যানেজার
- (৭) আর, হাফটন
- (৮) প্রিয়নাথ ব্যানার্জি
- (৯) বেনৌমাধব দত্ত

- (১০) হরিশচন্দ্র দাস
- (১১) হরপ্রসাদ দাস
- (১২) রঘুনাথ অসোয়াল
- (১৩) মোলভী রহিম বক্স
- (১৪) মোলভী আব্দুল সামাদ
- (১৫) মুন্সী তারিকুল্লা
- (১৬) উপেন্দ্রনাথ জোয়াদ্দার
- (১৭) সি, এইচ, হে
- (১৮) ব্রৈলক্ষ্যনাথ ব্যানার্জি
- (১৯) চন্দ্রকালী মুন্সী
- (২০) প্রাণকৃষ্ণ দাস
- (২১) যোগেন্দ্রদেব রায়কত

১৮৭৮ সালে যে নতুন বোর্ড গঠিত হয়, তাতে পূর্বোক্ত ১৭ থেকে ২১নং পর্যন্ত সদস্যগণ বাদ পড়েন এবং তাঁদের পরিবর্তে নতুন সদস্য হন :—

- (১) আই, আর, ডার্লি
- (২) এ, ভার্গার
- (৩) কালিদাস গুপ্ত
- (৪) শ্রীনাথ চক্রবর্তী
- (৫) কালীকৃষ্ণ দত্ত

তারও পরে যারা নতুন সদস্য হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মোলভী খয়রাত আলী, যোগেশ্বর সিং, হৃদয়নাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ রায়, তারকনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ ঘটক, রামচন্দ্র বসু, রামকুমার সরকার, নির্মল চন্দ্র সিংহ এবং আরও অনেকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জলপাইগুড়ি সেস বোর্ডের অধীনস্থ কর্মচারীদের বেতন হার লক্ষ্য করার মতন।

ডিপ্লিক্ট ইঞ্জিনিয়ার—২৫০—২৫—৩০০ টাকা

ওয়ারসীয়ার—৭২ টাকা

সাব-ওয়ারসীয়ার—৫২ টাকা

ড্রাকটস্ম্যান—৫০ টাকা

হেড ক্লার্ক—১০০-৫-১৫০ টাকা

ক্লার্ক—৩০ টাকা

পিওন—১২ টাকা

সেস বোর্ডের প্রথম দিকে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। প্রথমে সেস বোর্ডের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ম্যাকেনজি সাহেব। তিনি রাজশাহী সেস বোর্ডে চাকরী পেয়ে চলে গেলে ১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে ঐ পদে যোগদান করেন জন জে, বেক। কয়েক মাসের মধ্যেই বেক সাহেব নানা দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। অবস্থার এতই অবনতি ঘটে যে, জনৈক ঠিকাদার আদালতে বেক সাহেবের নামে কয়েকটি মামলা দায়ের করেন। অবশেষে ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সভায় সেস বোর্ড তাঁকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য তদানীন্তন সভাপতি মেজর আর, সি, মানির হস্তক্ষেপে বেক সাহেবকে পদত্যাগপত্র পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়। বেক সাহেবের পরে নভেম্বর মাসে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হন যাদব চন্দ্র দে; তিনি ১৮৮১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর মারা যান। অবশেষে ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ পদে যোগদান করেন গগনচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি সেস বোর্ডের শেষ দিন পর্যন্ত এবং জিলা বোর্ডের প্রথম দিকে জলপাইগুড়ির ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন।

১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত জেলা সেস বোর্ড এ জেলায় বহু পথ ও সেতু নির্মাণ করেছেন। সব পথ ও সেতুর তালিকা দেয়া সম্ভব নয়। বোর্ডের বহু সভাতেই অর্থাভাবের উল্লেখ দেখা গেছে। প্রায় প্রতি বছরই সর্বোচ্চ হারে সেস আদায় করেও সে অভাব পূরণ করা যায়নি। সেস বোর্ড ১৮৭৮ সালে জলপাইগুড়ি শহরে দিনবাজারের কাছে করলা নদীর উপরে সেতু নির্মাণ করেছিল; এজন্য ব্যয় হয়েছিল ৩,০০০ টাকা। ঐ বছরই রেল স্টেশন থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত সড়কটি ২৩১১ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়। ১৮৮২ সালে দিনবাজারের সেতুটি নতুন করে নির্মাণে হাত দেয়া হয়। এদিকে করলার উপরে একটি লৌহ-সেতু নির্মাণের জ্ঞাত সেস বোর্ড চেষ্টা করতে থাকে। ১৮৭৭ সালে ৫০ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দযুক্ত লৌহ-সেতুর প্রায়ন করা হয়। পরে ১৮৮০ সালে সেই প্রায়ন পরিবর্তন করে ২৪,১০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরে কলকাতার মিচেল কোম্পানীকে ঐ লৌহ-সেতু নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৮৭২ সালে সেস বোর্ড স্থির করে যে, জেলার প্রতিটি রাস্তার উভয়পার্শ্বে ক্রমপর্যায় বৃক্ষ রোপণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে স্থির হয়েছিল যে, বেশ কিছু সংখ্যক রবার গাছের চারা লাগান হবে। রবার গাছের চারার দাম সংগ্রহ করে ব্যয়াদিকের জ্ঞাত সেস বোর্ড ঐ পরিকল্পনা বর্জন করে। পরে কেবলমাত্র পাহাড়পুর সড়কের পাশে ১০০টি রবার ফিগ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। ম্যানসন নামে এক সাহেব ঐ চারাগুলি সরবরাহ করেছিলেন।

১৮৮৬-৮৭ সালে সেস বোর্ড ডুয়ার্সে ট্রামপথ স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। বার্নেশ থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে লাটাগুড়ির উপর দিয়ে চালসা পর্যন্ত এই ট্রামপথ হবার প্রস্তাব ছিল। এর দু'টি শাখা লাইনও ধরা ছিল; একটি ময়নাগুড়ি থেকে ধূপগুড়ি হয়ে ফালাকাটা পর্যন্ত এবং অপরটি নাগরাকাটা পর্যন্ত। লয়েড এণ্ড কোম্পানী এই ট্রামপথ স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিল। সেস বোর্ডের শেষ দিকে অল্পস্থিত সভাব বিবরণ পড়ে মনে হয়েছে যে, তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার এই ট্রামপথ স্থাপনের সমর্থক ছিলেন কিন্তু সেস বোর্ডের সভাপতি

অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনার সম্ভবতঃ এ প্রস্তাবের সপক্ষে ছিলেন না। ১৮৮৭ সালের ২০শে জানুয়ারী জলপাইগুড়ি জেলা সেস বোর্ডের সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভার একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল ডুয়ার্সের ট্রামপথ। সভায় এ. বিসেট নামে প্রস্তাবিত কোম্পানীর একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। কতকগুলি সতর্ক আরোপ করে সেস বোর্ড ট্রামপথ স্থাপনের প্রস্তাবটি স্থগিষ্ণ করে সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য সেস বোর্ড যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিল, তার একটি থেকে জানা যায় যে, ১৮৮৪ সালে ৪৫,৭২৬ মণ, ১৮৮৫ সালে ৬২,১০২ মণ এবং ১৮৮৬ সালে ৮৫,৩০৭ মণ চা জলপাইগুড়ির রেল স্টেশনে বুক করা হয়েছিল।

১৮৮৭ সালের ২০শে জানুয়ারীর পরে সেস বোর্ডের আর কোন সভা হয় নি। তারপর সেস বোর্ড উঠে গিয়ে জেলা বোর্ড স্থাপিত হয়। নবগঠিত জেলা বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৭ সালের ৩০শে মে। মধ্যের তিন মাসের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নি।

জলপাইগুড়ি জেলার সড়ক ও সেতুর গোড়াপত্তনের সাথে জড়িত জেলা সেস বোর্ডের ১১ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এখানেই শেষ হল।

জেলা বোর্ড

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন বিধি অনুযায়ী স্থাপিত জেলা বোর্ডের ইতিহাস স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ইতিকথায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বের সেস বোর্ড লোপ করে অধিকতর দায়িত্ব অর্পণ করে বাংলাদেশের জেলা বোর্ডগুলি গঠন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের প্রায় সাত বছর পরে ১৯৬৪ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাঙ্গ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত পল্লী উন্নয়নে রাজ্যের জেলা বোর্ডগুলি অপরিমিত দায়িত্ব পালন করেছে।

১৮৮৭ সালের ৩রা মে তারিখের এক সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী জলপাইগুড়ির জেলা বোর্ড গঠিত হয়েছিল। বিগত ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ৭৭ বৎসরে সেই জেলাবোর্ড এ জেলার পল্লী উন্নয়নে প্রভূত দায়িত্ব পালন করেছে। সেই কর্ম-সমুদ্র থেকে মাত্র কয়েক বিহুক কাহিনী তুলে এই প্রবন্ধে সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই সামগ্রিক ইতিবৃত্তের বহু কিছুই বাদ পড়েছে, সে কথা প্রারম্ভেই বলে রাখা ভাল।

উত্তরাধিকার সূত্রে জেলা সেস বোর্ডের কাছ থেকে প্রাপ্ত সড়ক, সেতু, খেয়া, ডাকবাংলো ইত্যাদি ছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের হাতে এসেছিল জেলার প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পশুচিকিৎসা লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধান, খোঁয়াড় স্থাপন, মেলা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিবিধ দায়িত্ব।

১৮৮৭ সালের মে মাসে জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ড গঠিত হয়েছিল ১৭ জন সরকার মনোনীত সদস্য নিয়ে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন পদাধিকার বলে। প্রথম বোর্ডে যারা সদস্য ছিলেন তাঁদের নাম নিয়ে দেওয়া হল :—

- (১) ডেপুটি কমিশনার (জি. ডি. বি. ডান্টন)
- (২) ডি. সি.র সিনিয়র এসিষ্ট্যান্ট
- (৩) এসিঃ কনজারভেটর অব ফরেস্ট

- (৪) এস. ডি. ও. আলিপুরহায়া
- (৫) সিভিল মেডিক্যাল অফিসার
- (৬) ইনকাম ট্যাক্স ডেপুটি কালেক্টর
- (৭) এল. এ. মাকগেভিন
- (৮) প্রিয়নাথ ব্যানার্জি
- (৯) ডবলু. কে. ডার্লি
- (১০) এফ. টি. ভার্নার
- (১১) ডবলু. এম. নর্থ
- (১২) ফণীন্দ্রদেব রায়কত
- (১৩) হরিদাস মুখার্জি
- (১৪) নির্মলচন্দ্র সিংহ
- (১৫) মুন্সী তাজেমুদ্দিন
- (১৬) কালীমোহন তলাপাত্র
- (১৭) সি. ব্রাউনফিল্ড

প্রতি পাঁচ বছর পরে নতুন বোর্ড গঠিত হত এবং সরকার তাদের মনোনয়ন ও নাম ঘোষণা করতেন।

সরকারী ব্যবস্থানুযায়ী ডেপুটি কমিশনার হতেন জেলা বোর্ডের সভাপতি। সদস্যগণ সহঃ সভাপতি নির্বাচন করতেন। জলপাইগুড়ি জেলাবোর্ডের প্রথম সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হন প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৭ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি জেলা বোর্ডের সহঃ সভাপতি ছিলেন। তারপর তিনি পদত্যাগ করেন।

১৮৯৩ সালে ২২শে আগষ্ট যে নতুন বোর্ড হয় তার সদস্য তালিকায় তারিণী প্রসাদ রায়, হরেন্দ্র কুমার ঘোষ, বিনোদ বিহারী সরকার, কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ, মুন্সী তাজিমুদ্দিন ও গুরুগোবিন্দ সরকার এই কয়টি নতুন নাম পাওয়া যায়। ঐ বছর ইনকাম ট্যাক্স ডেপুটি কালেক্টরকে বাদ দিয়ে ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুলসকে জেলা বোর্ডের সদস্য করা হয়।

১৯০০ সালে ষাঠা নতুন সদস্য হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমাগতি রায়।

১৯০৬ সালে নতুন সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কালীপদ ব্যানার্জি, রসিকলাল ঘোষ, মৌলভী মোশারফ হোসেন ও মৌলভী ওয়ালিয়ার রহমান।

১৯০৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলা বোর্ডের সহঃ সভাপতি ছিলেন ক্যাপ্টেন ডবলু. ডি. রিচি। তিনি পদত্যাগ করায় ১৯০৮ সালের ১৩ই অক্টোবর কালীপদ ব্যানার্জি সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইনিই পরে ১৯২১ সালে জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

সরকার মনোনীত সদস্য আর ডেপুটি কমিশনারকে সভাপতি করে ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলা বোর্ডের কাজ চলে। ১৯২১ সালে জেলা বোর্ডে নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯২১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন সরকার আদেশ দিলেন যে, জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের জ্ঞাত বেসরকারী সভাপতি নির্বাচন করতে হবে। ঐ সরকারী নির্দেশে আরও জানিয়ে দেয়া হল যে, ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বের কাল ১৯২১ সালের ১৪ই মে পর্যন্ত থাকবে

এবং ১৫ই মে থেকে বেসরকারী সভাপতি জেলা বোর্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

১৯২১ সালের ১১ই মে ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে জেলাবোর্ডের পর পর দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তখন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন ডবলু. এইচ. নেলসন। এই সভায় সভাপতি ছাড়া আরও ছয়জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের নাম রায় বাহাদুর কালীপদ ব্যানার্জি (সহ: সভাপতি), জে.এ. পলওয়েল, জি.এল. হাইগ, জি. টারবেট, ডি সি'র সিনিয়র এসিষ্ট্যান্ট এবং খান বাহাদুর মোশারফ হোসেন। জেলা বোর্ডের ঐ সভায় গুটি কয়েক সড়ক সংস্কারের ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন এবং বার্নেশ-ময়নাগুড়ি সড়কের জন্ত পুত বিভাগকে জেলা বোর্ডের জমি দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য সভার শেষে একটি বিশেষ সভা বসে। ঐ সভায় সহ: সভাপতি নির্বাচন করা হয়। কেন না রায় বাহাদুর কালীপদ ব্যানার্জি তার আগে ২২শে মার্চ (১৯২১) তারিখের সভায় ভাবী বেসরকারী প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় ১৫ই মে থেকে সহ: সভাপতি পদ শূন্য হবার কথা। আলোচ্য সভায় আরও দু'জন সদস্য যোগদান করেছিলেন; তাঁরা হলেন ডেপুটি ইনসপেক্টর অব স্কুলস এবং সিভিল সার্জন। সভায় খানবাহাদুর মোশারফ হোসেনের প্রস্তাব ক্রমে এবং রায়বাহাদুর কালীপদ ব্যানার্জির সমর্থনে জে. এ. পলওয়েল ১৫ই মে থেকে নতুন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

তার আগে ২২শে মার্চ (১৯২১) তারিখে জেলা বোর্ডের এক বিশেষ সভায় রায়বাহাদুর কালীপদ ব্যানার্জি সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সভাতে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি কমিশনার ডবলু. এইচ. নেলসন। সভায় আরও নয় জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। জি. এল. হাইগ তাঁর নাম প্রস্তাব এবং আমিনর রহমান সমর্থন করেন।

১৯২১ সালের ১৫ই মে রায়বাহাদুর কালীপদ ব্যানার্জির সভাপতিত্বে নতুন জেলা বোর্ড কাজ শুরু করে।

১৯২২ সালের ৩রা জুন জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের ২১ জন নতুন সদস্যের নাম সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়। তাঁদের নাম : খাসমহলের ডেপুটি কালেক্টর, আলিপুরহাওয়ার এস ডি ও, সিভিল সার্জন, এস পি, ডি আই অব স্কুলস, সি. বেটম্যান, জি. টারবেট, জি. ই. লুয়ার্ড, জয়গোবিন্দ গুহ, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, খানবাহাদুর মোশারফ হোসেন, মৌলভী কমিরুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল করিম প্রধান, ললিতমোহন পালচৌধুরী, রায়বাহাদুর কালীপদ ব্যানার্জি, জে এ পলওয়েল, বিপুলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীমানন্দ ব্যানার্জি, পঞ্চানন বিশ্বাস এবং এফ. এম. গ্রাহাম।

১৯২২ সালের ১৫ই জুন রায়বাহাদুর কালীপদ ব্যানার্জি পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। এবার সহ: সভাপতি নির্বাচিত হন জয়গোবিন্দ গুহ। সভাপতি নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হলেও সহ: সভাপতি নির্বাচনে ঐ বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। এই নির্বাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন খানবাহাদুর মোশারফ হোসেন।

সহ: সভাপতি নির্বাচনের প্রারম্ভে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রস্তাব করেন জয়গোবিন্দ গুহের নাম; সমর্থন করেন পঞ্চানন বিশ্বাস। এদিকে সি. বেটম্যান প্রস্তাব করেন জে. এ. পলওয়েলের নাম, সমর্থন করেন বিপুলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। এর পর ভোট হয়। জয়গোবিন্দ গুহ পান ১০ ভোট আর পলওয়েল পান ৯ ভোট। কাজেই জয়গোবিন্দ গুহ সহ: সভাপতি নির্বাচিত হন। সেবারই প্রথম জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের সভাপতি ও সহ: সভাপতি উভয় পদেই বাঙ্গালী সদস্য নির্বাচিত হলেন।

১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর জয়গোবিন্দ গুহ জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি জেলা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তখন সহঃ সভাপতি ছিলেন বিপুলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি।

১৯৪৪ সালের ২২শে মে রায়বাহাদুর বিপুল ব্যানার্জি এম বি ই জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯৪৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি জেলা বোর্ডের সভাপতির পদে ছিলেন।

১৯৪৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ডাঃ ধীরাজমোহন সেন স্বাধীনোত্তর জেলা বোর্ডের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল। একই দিনে সুরেন্দ্রনাথ রায় জেলা বোর্ডের সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৫ পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন। ১৯৫৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী সুরেন্দ্রনাথ রায় জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৪ সালের ২২শে অক্টোবর জেলা বোর্ডের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থাকেন। ১৯৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের পরিবর্তে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ গঠিত হয়।

রায়বাহাদুর বিপুল ব্যানার্জি এম বি ই'র সভাপতিত্বে জেলা বোর্ডের সর্বশেষ সভা ১৯৪৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় দু'জন নতুন সদস্য সদর এস ডি ও ক্যাপ্টেন আর ঘোষ এবং আলিপুরহাটার এস ডি ও জি. ডি. গোস্বামী "ক্রাউনের" প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করে শপথ গ্রহণ করেন! ঐ সর্বশেষ সভায় যে সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম নিয়ে দেয়া হল :—

- (১) রায়বাহাদুর বিপুল ব্যানার্জি এম বি ই (সভাপতি)
- (২) খানবাহাদুর মোকলেম্বর রহমান (সহঃ সভাপতি)
- (৩) সুরেন্দ্রনাথ রায় (দ্বিতীয় সহঃ সভাপতি)
- (৪) এস ডি ও সদর
- (৫) এস ডি ও আলিপুরহাটার
- (৬) জি. ই. নর্মিংটন
- (৭) রায়বাহাদুর আব্দুল মুখার্জি
- (৮) খানসাহেব আব্দুল করিম মিয়া
- (৯) ধীরেন্দ্র কুমার ভৌমিক
- (১০) জে. এস. টার্নার
- (১১) এইচ. মর্শেল
- (১২) নগেন্দ্রনাথ রায়
- (১৩) রমাপ্রসন্ন সরকার
- (১৪) তাজামুল হোসেন প্রধান

নিম্নলিখিত অবশিষ্ট সাত জন সদস্য এই শেষ সভায় উপস্থিত ছিলেন না :—

- (১) রাজমোহন রায়
- (২) এল. টকার
- (৩) নিত্যানন্দ রায়
- (৪) রায় সাহেব মনীশচন্দ্র রায়
- (৫) সি. জি. শ্বিথ
- (৬) সৈয়দুর রহমান
- (৭) খান বাহাদুর গোলাম কিবরিয়া

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পরে চার মাসাধিককাল পুরানো জেলা বোর্ড চলার পরে অবশেষে ৩০শে ডিসেম্বর নব কলেবরে জেলা বোর্ড গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মনোনীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ স্বাধীন জেলা বোর্ডের প্রথম সদস্য হন :—

- (১) খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
- (২) যজ্ঞেশ্বর রায়
- (৩) ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল
- (৪) বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ
- (৫) পীযুষকান্তি মুখোপাধ্যায়
- (৬) ডাঃ ধীরাজ মোহন সেন
- (৭) স্বরেন্দ্রনাথ রায়
- (৮) নগেন্দ্র নাথ রায়
- (৯) নিত্যানন্দ রায়
- (১০) ধীরেন্দ্র কুমার ভৌমিক
- (১১) আব্দুল করিম মিল্লা
- (১২) মোলভী মহম্মদ এজারত আলী।

১৯৪৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর জেলা বোর্ডের উপরোক্ত সদস্যগণ “ভারতীয় সংবিধানের” প্রতি আহুত্যা প্রকাশ করে শপথ গ্রহণ করেন। তারপর সভাপতি ও সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হন।

নতুন বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী। প্রথম সভার প্রথম প্রস্তাবটি বাংলায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এর আগে জেলা বোর্ডের কোন প্রস্তাব কোনদিনই মাতৃ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সেই প্রস্তাবের প্রতিলিপি নিয়ে দেয়া হল :—

“মহাত্মা গান্ধীর অনিদিষ্টকালের জন্ত আকস্মিক অনশন ব্রত গ্রহণে জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের সভ্যবৃন্দ বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন এবং যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি উক্ত মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সাফল্যের জন্ত সভ্যবৃন্দ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন। সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে

সনির্বন্ধ অহরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন সকল বিভেদ-বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাত্মার অমূল্য জীবন রক্ষা করেন।”

জেলা বোর্ডে সভার কার্য-বিবরণ প্রথামুযায়ী ইংরেজিতেই লিপিবদ্ধ করা হত। উপরোক্ত প্রস্তাব বাতীত আরও একটি প্রস্তাব তদানীন্তন জেলা বোর্ডের সভার কার্য-বিবরণীতে বাংলায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরে ১৯৪৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী জেলা বোর্ডের সভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাবটি বাংলায় রচিত হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, সেস বোর্ড অফিস নৃপেন্দ্রনারায়ণ হলে অবস্থিত ছিল। জেলা বোর্ড স্থাপিত হবার পরে ঐ ঘরেই অফিস করা হয়। এদিকে নৃপেন্দ্রনারায়ণ হল ছেড়ে দেবার জন্য বার-বার তাগিদ আসতে থাকায় ১৮৮৭ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখের সভায় জেলা বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্ত ১১,৮৪৫ টাকা ব্যয় বরাদ্দযুক্ত একটি প্রান অনুমোদন করা হয়। তদানীন্তন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার গগনচন্দ্র বিশ্বাস এই প্রান রচনা করেছিলেন। ১৮৮৮ সালের ২৩শে জানুয়ারীর সভায় নির্মলচন্দ্র সিংহের প্রস্তাবক্রমে এবং ইনকাম ট্যাক্স ডেপুটি কালেক্টর (সদস্য) প্রিয়নাথ মুখার্জির সমর্থনে জেলা বোর্ড ভবন নির্মাণের জন্য বড় ডাকঘরের পশ্চিম দিকে এক একর পরিমিত ভূমিখণ্ড সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে ঐ জমির উপরেই জেলা বোর্ড ভবন নির্মিত হয়। ঐ ভবনে জেলা বোর্ড এবং পৌরসভা উভয় প্রতিষ্ঠানেরই অফিস অবস্থিত ছিল। ১৮৮৯ সাল থেকে জেলা বোর্ডের শেষ দিন অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত জেলা বোর্ডের অফিস ঐ ভবনেই ছিল। ঐ ভবনেই এখন জেলা পরিষদের অফিস চলছে।

জেলা বোর্ডের ৭৭ বৎসরের ইতিহাসে যে বিপুল পরিমাণ কর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া পত্রিকায় স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্নও আছে। এ জেলার সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেতু বা খেয়ার ব্যবস্থা করা, জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ডাকবাংলো নির্মাণ ইত্যাদি ছাড়াও জেলা বোর্ডকে বহুবিধ কাজ করতে হত। জেলা বোর্ডের পরিচালনায় ছিল ৭০টি থেয়া, ১৪৭টি খোঁয়াড় ও ১০টি ডাকবাংলো। সড়ক ছিল ৫৫৭ মাইল ৪.৫১ ফার্ন।

জেলার প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রথম থেকেই জেলা বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। উপরন্তু বিভিন্ন বিদ্যালয়ের জন্ত জেলা বোর্ড থেকে বার্ষিক অনুদান দেয়া হত। ১৯৩৬ সালে জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ গঠিত হবার পরে জেলা বোর্ড থেকে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নবগঠিত জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের উপরে অর্পিত হয়। এ সময় জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৬৫টি।

জলপাইগুড়ি জেলার পল্লী অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থায় জেলা বোর্ডের অবদান উল্লেখযোগ্য। এ জেলায় ম্যালেরিয়া, ব্র্যাকওয়াটার ফীভার, কালাজর, কলেরা প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যের প্রচণ্ড অন্তরায় ছিল। জেলা বোর্ডের হাতে প্রথমে জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব ছিল না। ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য আইন পাশ হবার পরে ১৯২১ সালে জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ড সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার নিয়োগ করে। ১৯২৮ সালে প্রতি থানায় একটি করে পাবলিক হেলথ সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিকে ১৮৯১ সাল থেকে জেলা বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা শুরু করে। ১৯১৮ সালে বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, রাজগঞ্জ, মাল, শামুকতলা প্রভৃতি

স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিকে আরও উন্নত করা হয়। ১৯২১ সালে প্রত্যেক থানায় অন্ততঃ একটি করে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৫২ সালে জেলা বোর্ডের হাত থেকে জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করে। এদিকে সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের সাথে সাথে জেলা বোর্ডের কয়েকটি চিকিৎসালয় বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত জেলা বোর্ডের হাতে থাকে ৮টি চিকিৎসালয়। ১৯৩৭ সালে জেলা বোর্ড এই শহরে পাবলিক হেলথ লেবরেটরী স্থাপন করে। ১৯৩৮ সাল থেকে ঐ লেবরেটরীতে থ্যাণ্ড্রব্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫২ সালে সরকার এই লেবরেটরীর দায়িত্ব গ্রহণ করে।

পল্লীঅঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থাকল্পে ক্রমে ক্রমে জেলা বোর্ড ১৬৩৫টি পাকা কূপ এবং ৩৮টি নলকূপ স্থাপন করে।

জেলা বোর্ডের শেষ দিকে জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মাল, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার, কুমারগ্রাম, কামাখ্যাগুড়ি ও কালচিনিতে মোট ১০টি ডাকবাংলো ছিল।

জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের সুদীর্ঘ জীবনের ব্যাপক কর্মধারার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানেই শেষ হল।

লোকাল বোর্ড

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় লোকাল বোর্ডেরও একটি ভূমিকা রয়েছে। জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড এই উভয় প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে মহকুমা পর্যায়ে একটি সংস্থা গঠন করে তদানীন্তন ইংরেজ শাসক রাজনৈতিক চতুরতার পরিচয় দিয়েছিল সত্য, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব প্রত্যক্ষ কোন আয় না থাকায় পল্লী-উন্নয়নে লোকাল বোর্ডের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। অন্ততঃ জলপাইগুড়ি জেলায় লোকাল বোর্ড স্থায়ী কিছুই করে যেতে পারে নি।

১৮৮৫ সালে স্থানীয় শাসন আইন (বঙ্গীয় আইন পরিষদের অ্যাক্ট নং ৩) রচিত হলে তাতেই লোকাল বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সরকার মনোনীত নয়জন করে সদস্য নিয়ে লোকাল বোর্ড গঠিত হত। মহকুমা শাসক পদাধিকার বলে লোকাল বোর্ডের সভাপতি হতেন।

১৮৯৯ সালে তদানীন্তন সরকারের ৪৪৭৮ নং নির্দেশে আলিপুরদুয়ার লোকাল বোর্ড গঠিত হয়েছিল। এর এলাকা ছিল ১,০৫১ বর্গ মাইল, তখন লোক সংখ্যা ছিল ২,০২,৭০১ জন।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার জন্য লোকাল বোর্ড গঠিত হয় বহু পরে ১৯৩০ সালের পয়লা ডিসেম্বর। উভয় বোর্ডই ১৯৪৮ সালের পয়লা জানুয়ারী লোপ পায়।

জেলা বোর্ড থেকে প্রতি বছর উভয় লোকাল বোর্ডকে কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হত। এই টাকা দিয়ে তাঁরা গ্রামের পথ সংস্কার করাতেন, কিছু সংখ্যক কূপ খনন করাতেন ইত্যাদি। ঐ কাজ জেলা বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডও করতে পারত। লোকাল বোর্ড আরও একটি কাজ করত। পাশাপাশি দু'টো ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে লোকাল বোর্ড তা মিটিয়ে দিত। দুই ইউনিয়ন বোর্ডের সীমানা, খেয়া বা খোঁয়াড়ের মালিকানা নিয়ে প্রায়ই বোর্ডে বোর্ডে বিরোধ দেখা দিত। লোকাল বোর্ড এই বিরোধ মিটিয়ে শান্তি স্থাপন করত। ইউনিয়ন বোর্ডের করণিকের বেতন হার মঞ্জুর করাও লোকাল বোর্ডের অন্ততম কাজ ছিল। তখন বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ডে

করণিকের জন্ম বিভিন্ন বেতন হার প্রচলিত ছিল। তাই জলপাইগুড়ি সদর লোকাল বোর্ডের ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ তারিখের সভায় ইউনিয়ন বোর্ডের করণিকের জন্ম একই বেতন হার মঞ্জুর করা হয়। এই বেতন হার ছিল : যে ইউনিয়ন বোর্ডে বেক কোর্ট আছে সেখানে মাসিক ১২ টাকা থেকে ১৮ টাকা, বার্ষিক বৃদ্ধি ১ টাকা। যেখানে বেক কোর্ট নেই সেখানে মাসিক ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা, বার্ষিক বৃদ্ধি ১ টাকা।

প্রথমে সরকার মনোনীত সদস্যদের নিয়ে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার লোকাল বোর্ড দ্বয় গঠিত হয়েছিল। পরে অবশ্য এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। তখন পদাধিকার বলে সরকারী সদস্য ও নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে বোর্ড গঠিত হত। জলপাইগুড়ি সদর লোকাল বোর্ডে প্রথম বেসরকারী সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর এ, এম, এল, রহমান। কিছুকাল সভাপতিত্ব করার পরে তিনি ১৯৪৪ সালে নভেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন। আলিপুরদুয়ার লোকাল বোর্ডের প্রথম বেসরকারী সভাপতি ছিলেন গোবিন্দসুন্দর ভৌমিক, পরে পঞ্চানন বিশ্বাস।

লোকাল বোর্ড দ্বয়ের কৃত্যক সম্পর্কে মোটামুটি ধারণার জন্ম জলপাইগুড়ি সদর লোকাল বোর্ডের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ তারিখে অস্থগিত সভার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী নিয়ে দেয়া হল :—

এই সভায় সলসলাবাড়ী ইউনিয়ন বোর্ডের এবং সাকোয়াঝোরা ইউনিয়ন বোর্ডের করণিকদ্বয়ের মাসিক ১২ টাকা বেতন অনুমোদন করা হয়।

এই সভায় বিভিন্ন পল্লীর জন্য মোট ১৭টি কূপ খননের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়।

কালিয়াগঞ্জ খোঁয়াড়ের মালিকানা নিয়ে পাহাড়পুর ও পাতকাটা ইউনিয়ন বোর্ডদ্বয়ের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে চেয়ারম্যানের অনুসন্ধানাত্মিক রিপোর্ট সভায় অনুমোদন করা হয় এবং স্থির হয় যে, কালিয়াগঞ্জ খোঁয়ার পাতকাটা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে থাকবে।

সীমানা নিয়ে এবং রংখামালী খোঁয়াড়ের মালিকানা নিয়ে বারপাটিয়া-নূতনবাস এবং পাতকাটা ইউনিয়ন বোর্ডদ্বয়ের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে চেয়ারম্যানের রিপোর্ট সভায় অনুমোদন করা হয় এবং স্থির হয় যে, চেয়ারম্যানের রিপোর্টে বর্ণিত সীমানাই উভয় ইউনিয়নের সীমানা হবে এবং রংখামালী খোঁয়াড় পাতকাটা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে থাকবে।

উপরোক্ত বিবরণী থেকে লোকাল বোর্ডের কর্মধারা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হবে।

১৯৪৪ সালে জলপাইগুড়ি সদর লোকাল বোর্ড এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল যে, এই বোর্ডের কোন কোন সদস্য ইংরেজি ভাষা ভাল বুঝতে পারে না, তাই জেলা বোর্ড থেকে লোকাল বোর্ডে প্রেরিত প্রস্তাবাদি এবং চিঠিপত্র বাংলা ভাষায় লেখা হোক। বলা বাহুল্য, জেলা বোর্ড ঐ প্রস্তাব গ্রহণীয় বলে মনে করেন নি। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সভার বিবরণ ও পত্রাদি মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ হবার ব্যবস্থা ১৯৬৪ সালে পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তনের পরে গৃহীত হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পরেও কয়েকমাস লোকাল বোর্ডদ্বয়ের অস্তিত্ব বজায় ছিল। তারপর ১৯৪৮ সালের পঞ্চম জানুয়ারী জলপাইগুড়ি সদর ও আলিপুরদুয়ার লোকাল বোর্ডদ্বয় লোপ পায়। পরবর্তী পঞ্চায়েতী রাজ প্রথায় মহকুমা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক কোন প্রতিষ্ঠান রাখা হয় নি।

জলপাইগুড়ি জেলার এক শতাব্দীর ইতিকথায় লোকাল বোর্ডের ইতিবৃত্তের বিশেষ অবদান না থাকলেও, এর কথা বাদ দেয়া চলে না। তাই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করার পূর্বে জলপাইগুড়ি সদর লোকাল বোর্ডের সর্বশেষ সভায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হল।

জলপাইগুড়ি লোকাল বোর্ডের সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর। স্থান জেলা বোর্ড সভাকক্ষ, সময় অপরাহ্ন তিন ঘটিকা। স্বাধীনতা লাভের পরে তদানীন্তন লোকাল বোর্ডের আর একটি মাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখে। সর্বশেষ সভায় মিলিত হবার কালে লোকাল বোর্ডের সদস্যগণ জানতেন যে, এটাই তাঁদের শেষ সভা। মোট ৯ জন সদস্যের মধ্যে নিম্নলিখিত ৬ জন সদস্য সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

- ১। শ্রীনিত্যানন্দ রায় (সভাপতি)
- ২। শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মৈত্র
- ৩। মৌলভী সামসুদ্দিন আহম্মদ
- ৪। শ্রীনগেন্দ্র নাথ রায়
- ৫। শ্রীধনেশ্বর দাস
- ৬। খান সাহেব আব্দুল করিম মিক্রা

এ দিনের সভায় নিম্নলিখিত গ্রাম্য পথসমূহ সংস্কারের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয় :—

- ১। বুড়াবুড়ী—আমাইদীঘি সড়ক — ১,১২৫ টাকা।
- ২। শিকারপুর—কাঁঠালগুড়ি সড়ক — ১,৫০০ টাকা।
- ৩। রাজগঞ্জ - চাউলহাটি সড়ক — ৪৮০ টাকা।
- ৪। রংধামালী - বোদাগঞ্জ সড়ক — ২৯০ টাকা।

তা ছাড়া সর্বশেষ সভায় সদর লোকাল বোর্ডের পিওন জনাব সহিরুদ্দিন আহম্মদের জন্ম অনধিক ১৫ টাকা ব্যয়ে পোষাক সরবরাহের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

লোকাল বোর্ডের উঠে যাবার পরে সাব ওভারসীয়ার, করণিক, পিওন প্রভৃতি কর্মচারীদের জেলা বোর্ড গ্রহণ করায় এ বিষয়ে কোন সমস্যা উপস্থিত হয় নি। জলপাইগুড়ি জেলার লোকাল বোর্ডের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

ইউনিয়ন বোর্ড

গ্রাম্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কমিটি বা ইউনিয়ন বোর্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও জলপাইগুড়ি জেলার শতাব্দীর ইতিবৃত্তে ইউনিয়ন বোর্ডের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। সুদূর ১৮৮৫ সালে তদানীন্তন শেতাঙ্গ শাসক লর্ড রিপনের আমল থেকে বঙ্গদেশে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল সত্য, কিন্তু উত্তর বঙ্গে আঞ্চলিক অনগ্রসরতার অজুহাতে ইউনিয়ন কমিটি গঠন বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার অবস্থা খুব করুণ না হলেও উল্লসিত হয়ে ইতিবৃত্ত লেখার মতনও কিছু নেই। এ জেলার স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অগ্রগতির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এ জেলায় একটিও

ইউনিয়ন কমিটি বা ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়নি। ঐ বছরের জলপাইগুড়ি জেলাবোর্ডের বার্ষিক বিবরণীতে এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় : “এ জেলায় কোন ইউনিয়ন কমিটি বা ইউনিয়ন বোর্ড নেই। তবে তিস্তা নদীর পশ্চিম তীরে স্থায়ী বাসযুক্ত এলাকায় ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় কোন সফল পাণ্ডর্য ঘাবে কিনা সন্দেহ, কেন না এ জেলার পল্লীবাসিগণ খুবই অনগ্রসর।”

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় সম্বন্ধে এখানে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। উপরে “স্থায়ী বাসযুক্ত এলাকা” বলা হয়েছে। সকলেই জানেন যে, তিস্তা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী রংপুর জেলার এবং ভুটানের কাছ থেকে অধিকার করা ডুমুরার একাংশ যোগ করে অতীতের জলপাইগুড়ি জেলা গঠন করা হয়েছিল। পূর্বোক্ত রংপুর জেলার অংশকে “স্থায়ী বাসযুক্ত এলাকা বা পার্মানেন্টলী সেটেলড এডিয়া” এবং ডুমুরার ঐ অংশকে “নন-রেগুলেটেড এরিয়া” বলে অভিহিত করা হত। আইনগত স্ববিধার জ্ঞে এরূপ অভিধার প্রয়োজন হয়েছিল। এই একই ব্যবস্থায় দার্জিলিং জেলার ন্যায় জলপাইগুড়ি জেলাকেও সিডিউল্ড ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাক্ট (১৮৭৪) অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী আমাদের সংবিধান চালু হবার সাথে সাথে এ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। তার পূর্ব পর্যন্ত এ জেলার সমাহত একে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট না বলে ডেপুটি কমিশনার বলা হত। ১৯১৯ সালে গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট প্রবর্তনের পরে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাকে “অনগ্রসর অঞ্চল” বলে ঘোষণা করা হয়। এই আইন অনুযায়ী তদানীন্তন বংলাটকে এই ক্ষমতা দেয়া হয় যে, কোন ভারতীয় বা প্রাদেশিক আইন প্রয়োজনীয় রদবদল করে তিনি এই দুই জেলায় প্রবর্তন করতে পারবেন। বঙ্গদেশের ছোটলাটকেও অনুরূপ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয় বলে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হল না। ইংরেজ সরকার যে এ জেলাকে “অনগ্রসর অঞ্চলের” তালিকাভুক্ত করেছিলেন, কেবলমাত্র সে তথ্যটুকুই আমাদের প্রয়োজন। এই অনগ্রসরতার জ্ঞে জলপাইগুড়ি জেলার পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গুরুত্বরূপে ব্যাহত হয়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯২৯ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় একটিও ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়নি। গত ১৯৩০ সাল থেকে, অর্থাৎ মাত্র ৩৮ বছর পূর্বে এ জেলায় পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় প্রথমে তিস্তানদীর পশ্চিম তীরবর্তী বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের কাজ শুরু হয়। তারপরে হাত দেয়া হয় ময়নাগুড়ি থানায়। কালক্রমে জেলার সব থানাতেই ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হলেও সব থানাতে যে এর উৎসাহজনক রূপায়ণ হয়নি তা পরবর্তী পরিসংখ্যান থেকে উপলব্ধি করা যাবে। বস্তুতঃ, স্বাধীনতা লাভেরও বেশ কয়েক বছর পরে ১৯৬৪ সালে পঞ্চায়েতীরাঙ্গ প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এ জেলার পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সামগ্রিক রূপে পরিগ্রহন করেনি।

এ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহকালে একথা মনে হয়েছে যে, কেবলমাত্র অনগ্রসরতাই এই অব্যাহার জ্ঞে দায়ী নয়। এ জেলার অতীতের বিরল বসতি, স্বল্প সংখ্যক গ্রাম, চা-শিল্পভুক্ত এলাকাসমূহের অধিক অগ্রগতি প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা জলপাইগুড়ি জেলায় পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হয়েছে। তাই এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমেই ধরা যাক চা-শিল্পের কথা। জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হল ১৮৬৯ সালে। পাঁচ বছরের ব্যবধানের ১৮৭৪-৭৫ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম চা-বাগিচা স্থাপন করা হল। ১৮৭৭ সালে দেখা গেল যে, মোট

২২টি চা-বাগিচা স্থাপনের জন্তু উমি লিভ দেয়া হয়েছে। এ ভাবে অগ্রসর হয়ে ১৮৯৫ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় চা-বাগিচার সংখ্যা দাঁড়াল ১৮২টি। ইতিমধ্যে কয়েকজন ভবিষ্যৎপ্রাপ্ত বাদ্গালীও চা-শিল্পে হাত দিলেন। ১৮৭৯ সালে পত্তন হল প্রথম ভারতীয় চা-বাগিচা। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এ জেলার পল্লী অঞ্চলে চা-শিল্প বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ গ্রাম্য পথ, স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের কর্মসূচী রচনা করে থাকে। সাধারণ গ্রামের তুলনায় এ জেলার চা-বাগিচাভুক্ত এলাকাগুলি পথঘাট, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে এতই এগিয়েছিল বা রয়েছে যে, চা-বাগিচাগুলিকে পল্লীস্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সীমাবদ্ধ ব্যবহার অন্তর্গত করার প্রয়োজন হয়নি। এ কথা আজও সত্য। তাই কি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনে, কি পরবর্তী পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তনে, চা-বাগিচাগুলিকে বরাবরই পরিহার করা হয়েছে। একদা চা-বাগিচাকে কেন্দ্র করেই দুয়ার্শে নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল বলে এ জেলায় পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনে সেরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়নি বলে অনেকেই মনে করেন।

স্বাধীনোত্তর জলপাইগুড়ি জেলার ঘন বসতি দেখে অতীতের জলপাইগুড়ি জেলাকে কল্পনাও করা যাবে না। বিরল বসতি এ জেলায় পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রধান অহরায় ছিল। একথা আজ চিন্তা করাও কঠিন যে, ১৮৭২ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে বাস করত মাত্র ৮৫ জন মানুষ! থানা হিসাবে বসতির হার শুনলে আরও আশ্চর্য মনে হবে। ১৮৭২ সালে প্রতি বর্গ মাইলে কুমারগ্রাম থানায় বাস করত ১৬ জন, আলিপুরদুয়ার থানায় ২৪ জন আর কালচিনি থানায় ১২ জন মানুষ। বসতির অবস্থা যদি এরকম হয়, তাহলে পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রশ্নই ওঠেনা। তারপর জলপাইগুড়ি জেলায় জন-বসতির যে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, সে প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, জেলায় তখন চা-বাগিচার সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সম্পর্কে নিয়ে একটি তথ্যমূলক তালিকা দেয়া হল :—

সাল প্রতি বর্গমাইল বসতি

১৮৮১ — ১৩৩ জন

১৯০১ — ২২৯ জন

১৯২১ — ২৯২ জন

১৯৩১ — ৩১১ জন

১৯৪১ — ৩৫৬ জন

১৯৫১ — ৩৮৫ জন

১৯৫১ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় উদ্বাস্তু আগমন ও অগ্ন্যাগ্নি কারণে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক এক অপরিসংখ্যিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে এ জেলায় প্রতি বর্গমাইলের জনবসতির সংখ্যা প্রায় ৬০০ জন।

পল্লীকে ভিত্তি করেই পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা রূপায়িত হয়ে থাকে। কাজেই এ জেলার গ্রামের সংখ্যাভিত্তিক তথ্য এ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের

পরে জেলার পাঁচটি থানা পাকিস্থানে চলে যায়। তাতে গ্রামের সংখ্যা সাময়িকভাবে হ্রাস পেলেও ১৯৫১ সালের মধ্যে তার পরিবর্তন ঘটে।

সাল	গ্রামের সংখ্যা
১৮৮১	— ৪৪১
১৯০১	— ৪১৪
১৯২১	— ৪১২
১৯৩১	— ৪২৯
১৯৪১	— ৮৮৯
১৯৫১	— ৭৭৬
১৯৬৪	— গ্রামসভার সংখ্যা ৫৭৫

এবার ইউনিয়ন বোর্ডের আলোচনায় আসা যাক। আগেই বলা হয়েছে যে, জলপাইগুড়ি জেলায় ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কোন ইউনিয়ন বোর্ড ছিল না। ১৯৩০ সাল থেকে এ জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ১৯৪০ সালে ১১টি এবং ১৯৪১ সালে ৩টি নতুন বোর্ড অনুমোদন করার পরে আরও ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের কাজ চলতেই থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি থানা পাকিস্থানে চলে যাবার সাথে সাথে ৪৪টি ইউনিয়ন বোর্ডও এ জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। দেশ বিভাগের পরে জলপাইগুড়ি জেলায় থাকে ১২টি থানা এবং এই ১২টি থানার অধীনে ৭৬টি ইউনিয়ন বোর্ড। এ সময় জলপাইগুড়ি জেলা ৫টি সার্কেলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সার্কেলে একজন করে সার্কেল অফিসার ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁরাই ইউনিয়ন বোর্ডগুলির তত্ত্বাবধান করতেন। অবশ্য ইউনিয়ন বোর্ডের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করত জেলা বোর্ড। দেশ বিভাগের পরে কোন থানার অধীনে কয়টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল তার হিসাব নিম্নে দেয়া হল :—

থানা	ইউ-বি'র সংখ্যা
জলপাইগুড়ি	— ১২
রাজগঞ্জ	— ১০
ময়নাগুড়ি	— ১০
ধূপগুড়ি	— ৭
মাল	— ৮
মেটেলী	— ১
নাগরাকাটা	— ২
ফালাকাটা	— ৬

(২৪৩)

মাদারীহাট	—	২
কুমারগ্রাম	—	৪
কালচিনি	—	২
আলিপুরছয়ার	—	১২

মোট ৭৬টি

পাকিস্থানে যায় ৪৪টি

সর্ব মোট ১২০টি

ইউনিয়ন বোর্ডগুলি পল্লী অঞ্চলে বিবিধ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে রত ছিল। প্রধানতঃ চৌকিদারী ব্যবস্থা পরিচালনা করাই ছিল এগুলির কাজ। অর্থাভাবে এবং পরিমিত কর্ম-স্বাধীনতার অভাবে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করতে পারে নি। এদের কর্মাবলী সম্পর্কে যাতে মোটামুটি ধারণা করা যায়, তার জন্য এ জেলার রাজডাঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ডের বাজেট থেকে কতিপয় তথ্য নিয়ে সন্নিবেশিত হল :—

রাজডাঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ড

বাংলা ১৩৬৬ সন

আয় :—

ইউনিয়ন রেট—	...	...	৩২৩০-৩৭ পয়সা
চৌকিদারী চাকরাণ জমির খাজনা	...	...	নাই
দফাদার ও চৌকিদারের বেতন ও পোষাক বাবদ			
সরকারী সাহায্য	...	...	নাই
খোঁয়াড়ের আয়—	...	...	নাই
থেয়ার আয়—	...	...	নাই
জেলা বোর্ড হইতে নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য	...	...	১৫০-০০ পয়সা
দৈনিক কার্য পরিচালনার জন্য সরকারী সাহায্য	...	...	০-২৪ পয়সা
খাল বাবদ আয়—	...	...	৪০-৫৫ পয়সা
শিক্ষা কর আদায়—	...	...	২৬৯-২০ পয়সা
গরুর সার্টিফিকেট—	...	...	১১২-০০ পয়সা

মোট আয় — ৩৮০২-৩৬ পয়সা

ব্যয় :—

১জন দফাদার ও ২জন চৌকিদারের—

১৫ টাকা ও ১২ টাকা হারে বার্ষিক বেতন	...	১৪৭৬-০০ পয়সা
কেরানীর বেতন ১ বৎসরের	...	৪২০-০০ পয়সা

অগ্রাঙ্ক সেবস্তার ব্যয় —	...	...	২১১-২৭ পয়সা
ট্যাক্স আদায়ের খরচ —	...	...	৩১০-০০ পয়সা
রাস্তা মেরামত —	...	...	৫২২-০০ পয়সা
পানীয় জল সরবরাহের উন্নতি	...	...	১০০-০০ পয়সা
শিক্ষা কর আদায়ের কমিশন	...	...	২৬-৮৭ পয়সা
বিবিধ —	...	...	১৭৬-৮৬ পয়সা

মোট ব্যয় — ৩৩১৩-৭০ পয়সা

অগ্রাঙ্ক ইউনিয়ন বোর্ডের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করলে ঐ একই চিত্র পাওয়া যাবে। বার্ষিক তিন-চার হাজার টাকা ব্যয় করে একটি ইউনিয়নের উন্নয়ন সাধন সম্ভব ছিল না।

জলপাইগুড়ি জেলায় ১৯৬৪ সালে ২৩শে অক্টোবর পঞ্চায়েতীরাঙ্গের প্রবর্তন হয়। অবশ্য তার আগে থেকেই জেলার আটটি ব্লকে ক্রমপর্ষায়ে গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠন করা হয়। বলা বাহুল্য যেখানেই অঞ্চল পঞ্চায়েৎ হয়েছে, সেখানেই ইউনিয়ন বোর্ড বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৬৪ সালে পঞ্চায়েতীরাঙ্গ প্রবর্তনের পরে জলপাইগুড়ি জেলায় ৭৬টি ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে ২৩টি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠিত হয়েছে। এই ২৩টি অঞ্চলের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫৭৫টি গ্রামসভা আছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের গত ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ৩৪ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এখানেই শেষ হল। পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় তদানীন্তন ইংরেজ সরকার যদি যথার্থই পল্লীবাসীর হাতে কল্যাণমূলক কর্মাবলীর দায়িত্ব অর্পণ করতে ইচ্ছুক হতেন, তা হলে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির চেহারা, আর্থিক সম্বল ও ক্ষমতা অল্প ধরণের হত। সীমাবদ্ধ হযোগের মধ্যেও কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে সংসাহসের পরিচয় দিয়েছিল।

জেলা স্কুল বোর্ড

জেলা বোর্ডের হাত থেকে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ১৯৩৬ সালে জেলা স্কুল বোর্ড নামক একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পণ করা হয়। অর্থাৎ জলপাইগুড়ি পৌর এলাকা বাদে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব স্কুল বোর্ডের হাতেই রয়েছে।

প্রথমে ১৫জন সরকার মনোনীত সদস্য নিয়ে স্কুল বোর্ড গঠিত হয়। পদাধিকার বলে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন বোর্ডের সভাপতি। ১৯৪৪ সালে প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত হন খান বাহাদুর মুকুলেশ্বর রহমান। তারপর ১৯৫৫ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন রবীন্দ্রনাথ সিকদার। তিনি আজও বোর্ডের সভাপতি পদে রয়েছেন।

১৯৩৬ সালে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৬৫টি। দেশ বিভাগের পরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৬২৬টি। ১৯৬৮ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,১০৬টি। ১৯৪২-৫০ সালে ব্যয় হয় ৪,৮৩,২১২ টাকা, ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩৫,৬৬,০০০ টাকা। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৯৪২-৫০ সালে ৩৪,৪৫১ জন, ১৯৬৭-৬৮ সালে ১,০৮,৪২১

জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযুক্ত বালক-বালিকার সংখ্যা ১,৭০,০৩১ জন। ১৯৪২-৫০ সালে প্রাইমারী ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করেছে ৮৮৪ জন, ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪,৭১৮ জন, ১৯৬৭-৬৮ সালে ৮,৫৭০ জন।

একটু তুলনামূলক হিসাবের জ্ঞান দেয়া হল :—১৯৬৭ সালে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ১২,৮৪০ জন, ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল ১২,৬৪১ জন, তাদের মধ্যে পাশ করেছে ৮,৫৭০ জন।

পঞ্চায়েতীরাঙ্গ

১৮৭৬ সাল থেকে জলপাইগুড়ি জেলায় পল্লী স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ধারায় যে প্রবাহ শুরু হয়েছিল গত ১৯৬৪ সালে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৯৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর জলপাইগুড়ি জেলায় পঞ্চায়েতীরাঙ্গ প্রবর্তিত হয়। এক বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে পঞ্চায়েতীরাঙ্গ প্রথার গোড়াপত্তন।

জলপাইগুড়ি জেলায় এর প্রস্তুতি পূর্ব থেকেই চলেছিল। এ জেলায় ১৩টি উন্নয়ন ব্লক স্থাপন এবং তন্মধ্যে ৮টি ব্লকে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠনের কাজ তার আগেই সমাপ্ত হয়েছিল।

১৯৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ গঠিত এবং সাথে সাথে জেলা বোর্ডের অবসান ঘটল। জেলা পরিষদের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হলেন মনীন্দ্রনাথ রায়। সহঃ সভাপতি হলেন হীরালাল সিংহ। পরে সহঃ সভাপতি হন ধীরেন্দ্র নারজিনারী। ১৯৬৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে সর্ব প্রথম একজন মহিলা সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হন ; তাঁর নাম ইলা গঙ্গোপাধ্যায়।

পঞ্চায়েতীরাঙ্গ প্রবর্তনের ফলে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৩টি আঞ্চলিক পরিষদ, ২৩টি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ এবং ৫৭৫টি গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠিত হয়েছে।

মাত্র চার বৎসরের কর্মাবলী ভিত্তি করে পঞ্চায়েতীরাঙ্গ প্রথার পর্যালোচনা করা সমীচীন নয়। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে বৃহত্তর স্বযোগে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। উপরন্তু পঞ্চায়েতীরাঙ্গ নতুন বিধানে এখন আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়। সরকার পঞ্চায়েতীরাঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের জ্ঞান নতুন বিভাগ খুলেছে।

একদা বিদেশী সরকার দেশীয় মানুষের হাতে স্বায়ত্তশাসনের লাল ঝুমঝুমি দিয়ে তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে প্রশমিত করতে চেয়েছিল। সেই ব্যবস্থার মধ্যেও পল্লী উন্নয়নের জ্ঞান যা কিছু করা হয়েছে তার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব হল না। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত পরে ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এ জেলার বহু স্বসন্তান এই প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের একাংশের নামও এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি।

জলপাইগুড়ি জেলায় সমবায় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত

শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায়

আগামী ১৯৬৯ সনের জাহ্নবীর মাসে জলপাইগুড়ি জেলার শতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।* শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকে বিভিন্ন প্রকার অভিমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। জলপাইগুড়ি জেলার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের দ্বারা জেলার সৃষ্টি, সামাজিক অর্থনৈতিক ও অগ্রগত সর্বপ্রকার ক্রমোন্নতি ও বিবর্তনের উপর আলোকপাত করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। কাজেই ইহা বলা নিশ্চিতই বাহ্যিক হইবে না যে, ভবিষ্যতে এই প্রচেষ্টা একটি ঐতিহাসিক উত্তম বলিয়া অভিনন্দিত হইবে এবং এই সকল সংকলন আগামী-দিনের জেলাবাসীর নিকট এক বিরাট শিক্ষণীয় দলিল হিসাবে পরিগণিত হইবে।

জলপাইগুড়ি জেলার গত একশত বৎসরের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ইহার ক্রমোন্নতি ও বর্তমান রূপরেখার উপর আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতঃই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার কথা মনে আসে। প্রথমতঃ যৌথ মূলধনী প্রচেষ্টা ও দ্বিতীয় সমবায়িক প্রচেষ্টা। জলপাইগুড়ি জেলা, মূলতঃ চা জেলা হিসাবে খ্যাত। প্রাথমিক অবস্থায় জেলার চা শিল্পের ক্ষেত্রে মূলধন সংগঠন করিয়া কতিপয় উদ্যমী ব্যক্তি একত্রিত হইয়া যৌথ মূলধনী ব্যবসা শুরু করেন। যৌথ মালিকানা ব্যবসা স্বভাবতঃই বৃহৎ জনসমষ্টির আর্থিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। ধনশালী ও বিত্তশালী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই এই সকল কারবারে সকল মুনাফার অধিকারী হন ও একচ্ছত্রভাবে ব্যবসা পরিচালনা করেন। এই সকল কারবারে বৃহৎ অংশীদারগণের নির্দ্ধারিত নীতি অনুযায়ীই ব্যবসা পরিচালিত হয় ও মূলধনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অপরপক্ষে সমবায় সমিতি একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। অধিক মূলধন বিনিয়োগ করিলেও সমবায় প্রতিষ্ঠানে কেহ অধিক ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। ব্যক্তি প্রাধান্যের নীতিই সমবায় সমিতিতে স্বীকৃত হইয়া থাকে। তত্পরি যৌথ মূলধনী কারবারে কোন ব্যক্তি সর্বাধিক মুনাফা লাভের আশায় অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারেন কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠানে মূলধনের উপর লভ্যাংশের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে। যৌথ মূলধনী কারবারে মুনাফা অর্জনের প্রবণতা সর্বদাই লক্ষ্য করা যায় কিন্তু অপরপক্ষে সমবায় প্রতিষ্ঠানে সভাগণকে সেবা করিবার দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা হয়। মুনাফা বা উদ্ভূতের স্থান দ্বিতীয়। কাজেই ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে বিত্তহীন বৃহৎ যে জনসমষ্টির আর্থিক কল্যাণ যৌথ মূলধনী প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না, তাহাই সম্ভব করিবার জগৎ সমবায়ের সৃষ্টি। Culvert সাহেবের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'Co-operation is a form of organisation wherein persons voluntarily associate together as human beings on a basis of equality for promotion of economic interest of themselves.' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে 'অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার যে উপায়

* প্রাবনের পূর্বে লিখিত—সঃ

তাহাকেই সমবায় নাম দেওয়া হইয়াছে'। আমার কাছে মনে হয়, এই 'কো-অপারেটিভ' প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।

জেলায় আর্থিক কল্যাণে এপর্যন্ত সমবায়ের ভূমিকা নিরূপণ করা এই প্রবন্ধ রচনার প্রধানতম উদ্দেশ্য। একান্তভাবে এই জেলার বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা ভারতবর্ষে সমবায় স্থপির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই জেলার শতবর্ষপূর্তি সমাপ্ত হইলেও ভারতবর্ষে সমবায়ের শতবর্ষপূর্তির জন্ত আমাদেরকে আরও ৩৫ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। ২০০৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের সমবায় শতবর্ষে পদার্পন করিবে।

তখন দেশে ইংরেজ রাজত্ব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং কৃষক সমাজ এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়। গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট কুটীর শিল্পগুলি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হয় এবং অবশ্রম্ভাবীরূপে গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় সম্পূর্ণই কৃষির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত কৃষক সমাজের দুর্গতির স্বযোগে money lender বা মহাজনদের আবির্ভাব হয় এবং ঋণ লাভের অন্য কোনও উপায় না থাকায় অসহায় কৃষক সমাজ মহাজনদিগের দারস্থ হইয়া ঋণভারে জর্জরিত হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে পর পর কয়েকবার অনাবৃষ্টির দরুণ ব্যাপকহারে ফসলহানি ঘটায় ঋণভারে জর্জরিত, শোষিত বৃহৎ কৃষক সমাজ সহিংস হইয়া পড়ে। ১৮৭৫ সনে পুণা ও আহমেদাবাদে কৃষকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মহাজনদের নিকট হইতে তাহাদের ঋণ রসিদ ও জামিনের কাগজপত্র সমূহ ছিনাইয়া লয়। এ অবস্থায় সরকার যথাক্রমে ১৮৭২ সনে 'দাক্ষিণাত্য কৃষি আইন', ১৮৮৩ সনে 'জমি উন্নয়ন ঋণ আইন' ও ১৮৮৪ সনে 'কৃষক ঋণ আইন' রচনা করেন। পরবর্তী দুইটি আইন 'তাকাভি আইন' নামে সুপরিচিত।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ইহা অস্বীকার করিতে সক্ষম হন যে এই ব্যবস্থা সমূহ কৃষক সমাজের আর্থিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে এবং একমাত্র সমবায় ব্যবস্থাই এই সমস্যা সমাধানের সক্ষম। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাজ সরকার ১৮৯২ সনে স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন নামক এক রাজকর্মচারীকে কৃষকদিগের ঋণ সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্ত ইউরোপে প্রেরণ করেন। স্যার নিকলসন ১৮৯৫ ও ১৮৯৭ সনে দুই পর্য্যয়ে তাঁহার রিপোর্টে এদেশে সমবায় ঋণদান সমিতি পত্তনের সুপারিশ করেন এবং জার্মানীর র্যাফেসান পদ্ধতিতে সমবায় সমিতি পত্তনের জন্ত মন্তব্য করেন। মাত্র দুইটি কথায় নিকলসন তাঁহার রিপোর্টের সার সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। 'Find Raiffeisen' অর্থাৎ রাফেসনের অনুকরণে গ্রামভিত্তিক ঋণদান সমবায় গড়িয়া তোল।

এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার ১৯০১ সনে স্যার এডওয়ার্ড ল এর নেতৃত্বে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার বিষয় পর্যালোচনা করিবার জন্ত এক কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটি দৃঢ়ভাবে অনতিবিলম্বে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৪ সনে 'সমবায় ঋণদান সমিতি আইন' বিধিবদ্ধ হয়। কাজেই সরকারীভাবে ১৯০৪ সনেই ভারতে সমবায়ের জন্মলগ্ন বলা যাইতে পারে।

এবার আমরা আমাদের জেলার কথায় আসিব। দাক্ষিণাত্যের কৃষকগণের যে অসন্তোষ হিংসার রোষ বহ্নিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা হয়ত আমাদের জেলায় পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে অসন্তোষের কারণ

সমূহ জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকগণের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। ঐ শতাব্দীর প্রথমভাগে জেলার কৃষক সমাজ চরম দুর্দশা ও দুর্গতির মধ্যে কালযাপন করিত। চাষের জ্ঞান প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য অতিলোভী মহাজন ভিন্ন আর কোনও দ্বার খোলা পাওয়া যাইত না। জেলার বিত্তবান ব্যক্তিদিগের সমুদয় মূলধন প্রধানতঃ অধিকতর লাভজনক চা ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। গোলাভরা ধান, পুবুরভরা মাছের কাব্য তাহাদের নিকট দিব্যস্বপ্নের নামাস্তর বলিয়া মনে হইত। তাহাদের হতাশাজর্জর জীবনে সমবায়ের আলোক বতিকা লইয়া কেহ তখনও আসে নাই। সুদূর দাক্ষিণাত্যের সমবায়ের ঢেউ হিমালয়ের পাদদেশে তখনও পৌছায় নাই।

এমন এক হতাশাজর্জর অবস্থার মধ্যে ১৯১১ সনে জলপাইগুড়ি জেলায় যিনি সমবায়ের মন্দাকিনী প্রবাহকে প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন তাহার নাম নিত্যানন্দ রায়। অতাবধি জেলার সমবায়ীগণ তাহাকে ভগীরথ আখ্যা দিয়া থাকেন। নিত্যানন্দের বাস ছিল সদর থানার অন্তর্গত বোনাপাড়া গ্রামে, অধ্যয়ন করিতেন কুচবিহারে। গ্রামে মহাজনের শোষণ ও নিরবচ্ছিন্ন অভাবের হাহাকার তাহাকে ছাত্রাবস্থাতেই ব্যথিত করিয়া তোলে ও কুচবিহারে অধ্যয়নকালে তিনি ইহার সমাধানের চিন্তা করিতে থাকেন। মহাজনগণ গ্রামে যে অর্থ দানন করিত তাহাতে কৃষকদিগকে টাকা প্রতি মাসিক ৮০ এক আনা ও কোন কোন ক্ষেত্রে ৮০ দুই আনা পর্যন্ত সুদ দিতে হইত। ইহার ফলে আসল কর্জ আর কৃষকদিগের শোধ দেওয়ার সৌভাগ্য হইত না। প্রতি বৎসর ফসল হইতে নগদ অর্থ অথবা সম পরিমাণ ফসল সুদ হিসাবে দিতে হইত। এ সময় তরুণ নিত্যানন্দ সমবায় সম্পর্কে অবহিত হন এবং স্থির করেন মহাজনের করাল গ্রাস হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে তাহার গ্রামে সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা সমবায় সমিতি সংগঠন করা দরকার। এ অবস্থায় তাহার বাসভূমি বোনাপাড়া গ্রামের ১৩ জন কৃষককে একত্রিত করিয়া তিনি ‘বোনাপাড়া গ্রামসমবায় ধর্মভাণ্ডার’ সংগঠন করেন এবং ঐ সমিতি ১৯১১ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রীভুক্ত হয়।

প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে জানা যায় ঐ সময়ে জেলায় আরও একটি সমবায় সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল কিন্তু উক্ত সমিতি বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই। কাজেই বোনাপাড়া সমবায় সমিতিতেই আমাদের জেলার প্রাচীনতম সমিতি মনে করা উচিত হইবে। ১৯১১ সনে ১৩৬।০ আনা মূলধন সংগ্রহ করিয়া এই সমিতি তাহার সভ্যগণের ভিতর কৃষি ঋণ দানন শুরু করে। কিন্তু কেবল শেয়ার মূলধন দ্বারাই সকল কৃষকের ঋণের প্রয়োজন মেটে না। কাজেই সরকারের সুপারিশ ক্রমে বোনাপাড়া সমবায় সমিতি শিলংএর পাইওনীর ব্যাংক হইতে ৫০০৮ টাকা ঋণ সংগ্রহ করে। পরে ১৯১৫ সনে এই সমিতি ঢাকাস্থিত ‘ইষ্টার্ন বেঙ্গল এণ্ড আসাম সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক’ হইতে ২০০০৮ দুই হাজার টাকা ঋণ সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে জানা যায় সমিতির সংগঠনের এবং ইহার হিসাব পত্র পরীক্ষায় ও ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারে সরকারী আনুকূল্যের অভাব ছিল না। নিত্যানন্দের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ১৯১১ সনে এক সমবায় ইনস্পেক্টর তাহার রিপোর্টে লেখেন ‘The idea of the establishment of the Society was however first brought about by Babu Nityananda Roy, a young educated Jotedar of Bonapara and he has been keeping constant watch over the progress of this institution, for which act of his, our thanks are due to him.’

CERTIFICATE OF REGISTRATION.

OFFICE OF THE REGISTRAR OF CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETIES, EASTERN BENGAL AND ASSAM.

In pursuance of the provisions of the Co-operative Societies Act, 1912, I hereby certify that the following Co-operative Credit Society has been registered in my office as a Co-operative Credit Society and has been entered in the Register of Co-operative Credit Societies on the 22nd day of January 1913.

The name of the Society is Baranagar Co-operative Credit Society and its registered office is at Baranagar.

The name of the Society is Baranagar Co-operative Credit Society and its registered office is at Baranagar.

The name of the Society is Baranagar Co-operative Credit Society and its registered office is at Baranagar.

Baranagar, 22nd January 1913.

[Signature]

[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য শ্রীনিত্যানন্দ রায় ১৯৪১ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকে সহসভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উক্ত বর পর্য্যয়ে সমবায়ের সেবা করেন। সমবায় আন্দোলনের এই ভগ্নীপথ ১৯৬৬ সনের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে জলপাইগুড়ি সহরে পরলোকগমন করেন। নিত্যানন্দ বাবুর পুত্র শ্রীপতোজ রায় উক্ত বজ্রের লোকসংগীত গায়ক হিসাবে জেলায় সুপরিচিত।

১৯১১ সনে যে বোনাপাড়া সমিতি জলপাইগুড়ি জেলায় জয়যাত্রার সূচনা করিয়াছিল আজও তাহার যাত্রা অব্যাহত রহিয়াছে। ১৯১১ সনে যে সদস্য সংখ্যা ১৩ ছিল ১৯৬৮তে তাহা ৫২তে দাঁড়াইয়াছে এবং কৃষি ঋণ দাননের পরিমাণ ৫০০ টাকা হইতে ১৯৬৮ সনে ১২,৭০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

জেলার প্রাচীন সমিতি সমূহের নাম ও তাহাদের সৃষ্টির সময় নিম্নে দেওয়া হইল। ইহাতে তৎকালের সমবায় আন্দোলনের গতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবহিত হওয়া সম্ভব হইবে।

মহাকালগুড়ি সমবায় সমিতি—আলিপুরছার, ১৯১২ সন

ফরিকগঞ্জ সমবায় ব্যাংক—সদর থানা, ১৯১৩ সন

মৌয়ামারী সমবায় সমিতি—রাজগঞ্জ থানা, ১৯১৩ সন

জমিদার পাড়া সমবায় সমিতি—রাজগঞ্জ থানা, ১৯১৩ সন

সহরাঞ্চলের প্রাচীন ব্যাংকসমূহের মধ্যে—

পিপলস্ কো-অপারেটিভ ব্যাংক—১৯১৩ ও

পোষ্টাল ডিভিসন ঋণদান সমিতির (১৯১৬) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাথমিক অবস্থায় জলপাইগুড়ি জেলায় কিছু সংখ্যক সমিতি সংগঠিত হইলেও ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারে সমবায় সমিতি সমূহকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কারণ সুদূর শিলং বা ঢাকা হইতে ঋণ সংগ্রহ সহজসাধ্য ছিল না। অত্যাগত জেলাতেও একই অসুবিধা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। জেলাতে সমবায় সমিতি সমূহকে ঋণের অর্থ সরবরাহের জন্য জেলা ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করিলেন এবং ১৯১২ সনের সমবায় আইনে জেলায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক সংগঠনের সিদ্ধান্ত করা হইল। ঐ বৎসরই সমবায় কেন্দ্রীয় বিষয় হইতে প্রাদেশিক বিষয়ে রূপান্তরিত হইল।

১৯১২ সনের আইনানুযায়ী জলপাইগুড়িতে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সনের ২২শে মার্চ জলপাইগুড়ির তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার মিঃ এফ. ডব্লিউ. ট্রং সাহেবের সভাপতিত্বে এক সংগঠনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খান বাহাদুর মৌলভী মোশারফ হোসেন, ডেপুটি কালেক্টর বাবু ললিত কুমার সেন, বাবু উপেন্দ্রনাথ কর্মকার, বাবু বসন্তকুমার সর্বাধিকারী, বাবু যোগেন্দ্রনাথ নন্দী, বাবু স্বরেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ ও জেলার পঁচিশটি সমবায় সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিয়ামক খান বাহাদুর আতোয়া রহমান মহোদয় রাজসাহী হইতে আসিয়া সংগঠনী সভার তদারক করেন। অতঃপর এই সভার প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯১৯ সনের ৬ই এপ্রিল তারিখে ‘জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকিং ইউনিয়ন’ নামে জেলার সমবায় ব্যাংক রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের প্রথম চেয়ারম্যান

নির্বাচিত হন ডেপুটি কমিশনার মি: এফ. ডব্লিউ. ট্রুং মহোদয় ও বাবু উপেন্দ্রনাথ কর্মকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গত ১৫ বৎসর যাবৎ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে বে-সরকারী ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়া আসিতেছেন।

এই ব্যাংকের প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যানরূপে এই প্রবন্ধ লেখক ১৯৫৩ সনের ১২শে জানুয়ারী তারিখে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং অতাবধি তিনি ঐ দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন।

জেলায় একটি সমবায় ব্যাংক স্থাপিত হওয়ায় কৃষকগণের ঋণ পাইবার বিশেষ সুবিধা হইল। সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক মূলতঃ ইহার সদস্য—সমবায় সমিতি সমূহকে চাষের বায় নির্বাহার্থে সভাগণকে দানন করিবার নিমিত্ত স্বল্পমেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে। গ্রামীণ অর্থনীতি প্রধানতঃ ইহার সমবায় সমিতির কর্মতৎপরতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল কারণ গ্রামাঞ্চলে কৃষিই একমাত্র উপজীবিকা বলা যাইতে পারে এবং কৃষিকার্যের ব্যয়ের একটি প্রধান অংশ সমবায় সমিতির মারফৎ সরবরাহ হয়; আবার এই সমিতি সমূহ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের অর্থই দানন করিয়া থাকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জেলা ব্যাংকের কর্মতৎপরতা গ্রামীণ অর্থনীতি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে বলা যাইতে পারে। জেলার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক যে অর্থ কৃষকদিগকে দানন করে তাহার একটি বৃহৎ অংশ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক সরবরাহ করেন; আবার প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাংকে এজ্ঞা একটি স্বতন্ত্র কৃষি ঋণ দান বিভাগ বা Agriculture Credit Department রহিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে কৃষি ঋণের বিষয়টি শীঘ্র হইতে রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং একটি সংস্থা অপরের সহিত ঘনিষ্ঠ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আমাদের জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক বর্তমানে অগ্নাগ্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতন সকল প্রকার ব্যবসা করিতেছেন এবং রাজ্যসরকার ইহার একজন বড় অংশীদার হইয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক চাষের নিমিত্ত সার, বীজ, ক্রয় ইত্যাদি প্রয়োজনে ঋণ সরবরাহ করে কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। কৃষক সমাজ তো ঋণভারে ও শোষণে জর্জরিত। সে পুরাতন ঋণ শোধ করিবার অর্থ কোথায় পাইবে? কোথায় পাইবে সেচের জন্ত অর্থ, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত উন্নত যন্ত্রপাতি, হাল বলদ ও আইল বাধা? এই সকল অর্থই বা কে তাহাকে সরবরাহ করিবে? এই সকল কার্যের জন্ত কৃষকের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দাননের উদ্দেশ্যে জমি বন্ধকী ব্যাংক বা Land Mortgage ব্যাংকের পত্তন করা হয়। ভারতের প্রথম জমি বন্ধকী ব্যাংক ১৯২০ সনে পাঞ্জাবে সংগঠিত হয় এবং দ্বিতীয়টিও ঐ একই বৎসরে বঙ্গদেশের রাজসাহী জেলার নওগাঁতে কার্য শুরু করে।

আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক ১৯৫৩ সনের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত হয়, কিন্তু এই জেলার ভূমি ব্যবস্থার জটিলতার দরুন ইহা প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৮-৫৯ সনের পূর্বে জেলায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দাননের কার্য শুরু করিতে পারে নাই। জমি বন্ধকী ব্যাংকেও প্রথম অবস্থায় সরকারী ব্যক্তি চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান হিসাবে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক ১৯৬৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং অতাবধি তিনি উপরোক্ত দায়িত্ব বহন করিয়া আসিতেছেন।

নিম্নে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও জমি বন্ধকী ব্যাংকের যথাক্রমে সল্ল ও মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দাননের লগ্নীর পরিমাণ দেওয়া গেল।

সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক

১৯১২-২০—	৫৬,৯১২'০০
১৯২২-৩০—	১২,৯০৭'০০
১৯৩২-৪০—	৫৮,০২৮'০০
১৯৪২-৫০—	১,৪৭,০০০'০০
১৯৫২-৬০—	৬,৯৭,৮৭৫'০০
১৯৬৪-৬৫—	৩২,৫৪,৪৫৪'০০
১৯৬৫-৬৬—	৩৬,৬০,৮৮৫'০০
১৯৬৬-৬৭—	৩৯,৬১,৩৯৪'০০
১৯৬৭-৬৮—	৫১,৫২,০০০'০০

কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাংক

১৯৫৮-৫৯—	২২,৯০০'০০
১৯৫৯-৬০—	২১,৮৫০'০০
১৯৬৪-৬৫—	২,৫২,৯৬২'০০
১৯৬৫-৬৬—	১০,৫০,৯৮১'০০
১৯৬৬-৬৭—	১১,৫১,৪৮১'০০
১৯৬৭-৬৮—	১৩,৫৬,৮২৩'০০

জেলার সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক ১৯৫৮-৫৯ সনে ২২,৯০০ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দানন করিয়া যে যাত্রা সূচনা করিয়াছিল ১৯৬৭-৬৮তে সেই লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০,৬৭,৪২৫'০০ টাকায়। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরছায়ায় ১৯৬৮ সনে আরও একটি প্রাথমিক জমি বন্ধকী সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্র দ্বারা ১৯১২-২০ সন হইতে ১৯৬৭-৬৮ সন পর্যন্ত সমবায়ক্ষেত্রে কৃষি ঋণের লগ্নীর পরিমাণের তারতম্য প্রদর্শিত হইল।

উপরোক্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান দুইটির প্রসঙ্গে আরও দু' একটি কথা না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের সংগে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল ব্যাংকের উপরও খানিকটা আঘাত আসিয়া পড়ে। জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি থানা যাহা জেলার শস্যভাণ্ডার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল সেইগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে ঐ এলাকার সমবায় সমিতিসমূহে জেলা কো-অপারেটিভ ব্যাংকের লক্ষাধিক টাকা লগ্নী করা হইয়াছিল। এই ক্ষতি প্রতিষ্ঠানের উপর আকস্মিক আঘাতের মত আসিয়া পড়ে।

যাহাহউক আমরা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা নিরীক্ষায় জলপাইগুড়ি জেলা সুপারি চাষের পক্ষে যোগ্যস্থান বিবেচিত হওয়ায় ৪র্থ পরিকল্পনাকালে জলপাইগুড়িতে সরকার ব্যাপকহারে সুপারী চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহার প্রয়োজনীয় ঋণ জেলার সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক মারফৎ সরবরাহ হইবে। ইতিমধ্যেই সমবায় ব্যাংক ৮৭,৩৫৭'০০ টাকা সুপারী চাষের জন্ত ঋণ প্রদান করিয়াছেন এবং প্রায় ৫০ একর জমি সুপারী চাষের আওতায় আনা হইয়াছে।

এখন আমরা জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সমবায় সমিতি সমূহের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করিব।

১। **গ্রামাঞ্চলের কৃষি সমিতি** :—জলপাইগুড়ি জেলায় সমবায় আন্দোলনের প্রারম্ভকালে গ্রামাঞ্চলে যে সকল সমবায় সমিতি কার্য করিত সেগুলি কৃষি ঋণ দান করা ভিন্ন অগ্ৰাণ্য কার্য প্রায় করিত না বলিলেই চলে। এই সকল সমিতিসমূহ প্রায় সমস্তই অসীম দায়বদ্ধ বা Unlimited liability type ছিল। ১৯৪৬ সনে Co-operative Planning Committee সীমাবদ্ধ দায় বা Limited liability type সমবায় সমিতি গঠনের সুপারিশ করেন। ১৯৫৪ সনের Rural Credit Survey কমিটি Limited liability type সমিতি ও বৃহদায়তন সমবায় ঋণদান গঠনের সুপারিশ করেন। তদনুসারে জেলায় গ্রামীণ সমবায় সমিতিসমূহ ১৯৫৫-৫৬ সন হইতে সবই সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন সমিতি হিসাবে (Limited Liability Type) গঠিত হইল এবং সার্ভে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বৃহদায়তন সমিতিও গঠিত হইল। বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলায় গ্রামাঞ্চলে ১২টি বৃহদায়তন সমবায় ঋণদান সমিতি রহিয়াছে। কিন্তু ১৯৫৮ সনের শেষার্ধ্বে National Development Council বৃহদায়তন সমবায় সমিতি সমূহ গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং সুপারিশ করেন যে অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলে বৃহদায়তন সমিতি গঠন বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক ও ইহার পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকার সমিতি গঠিত হউক। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৯-৬০ সন হইতে সেবা সমবায় সমিতি (Service Co-operative) সংগঠনের যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়।

আমাদের জলপাইগুড়ি জেলাতেও এই সময় হইতে গ্রামাঞ্চলে সেবা সমবায় সমিতি সংগঠিত হইতে থাকে। ১৯৬৮ সনের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় জেলায় মোট ২৭৭টি সেবা সমবায় সমিতি রহিয়াছে। National Development Councilএর সুপারিশ অনুযায়ী প্রথমে ‘এক গ্রাম এক সমিতি’ ভিত্তিতে সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল কিন্তু ১৯৬০ সালের মেহতা কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ৩/৪ মাইল এলাকা লইয়া এক একটি সমিতি পরবর্তীকালে সংগঠিত হয়। সেবা সমবায় সমিতি সমূহ গ্রামের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। প্রকৃত অর্থে সভাদিগকে সম্ভাব্য সকল প্রকারে সেবা করিবার সুযোগ ইহার উপবিধি Bye-Lawতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সভাদিগকে চাষের জগু ঋণ সরবরাহ, সার, বীজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সভাগণের ফসল বিপণনের ব্যবস্থা, গুদাম ঘর নির্মাণ করিয়া শস্য সংরক্ষণ, এমন কি সভাদিগের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীও এই সেবা সমিতি সরবরাহ করিতে পারে। আমাদের জেলায় ২৭৭টি সেবা সমিতির অনেকগুলিই এখন বহুবিধ কার্য করিতেছে। এই প্রবন্ধে সকল সমিতির কর্মতৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে তবে সেবা সমবায় সমিতি সমূহের যে সকল সেবা সমিতি উল্লেখযোগ্য কার্য করিতেছেন তন্মধ্যে উদাহরণস্বরূপ আমাদের জেলায় সদর থানার অন্তর্গত ‘বরুয়াপাড়া সেবা সমবায় সমিতি’র নাম করা যাইতে পারে। এই সমিতি ১৯৬০ সনের মার্চ মাসে রেজিস্ট্রীকৃত হয়। বর্তমানে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা চার শতেরও অধিক। এই সমিতি তাহার সদস্যদিগকে উন্নত জাতের বীজ, সার ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে এবং শস্য সংরক্ষণের জগু গুদামের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমিতির ৩,৫০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে এই সমিতি প্রায় ৬৫,০০০ টাকা ঋণ সভাদিগের মধ্যে দান করিয়াছে। ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য যে শস্য বিপণনের জগু জলপাইগুড়ি জেলায় ১৭টি বিপণি বা Marketing সমিতি রহিয়াছে।

২। **ক্রেতা সমবায়** :—সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ‘ক্রেতা সমবায়’ এখন সর্বাধিক জনপ্রিয় নাম। কাজেই আমাদের জেলায় ক্রেতা সমবায়ের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। ক্রেতা সমবায় কি? ন্যায্যমূল্যে, সঠিক ওজনে ভেজালহীন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইবার জগু

যখন ক্রেতা সাধারণ একত্রিত হইয়া সমবায় ভিত্তিক বিপণি গঠন করেন তাহাকেই আমরা ক্রেতা সমবায় বলি। প্রকৃতপক্ষে লোভী অতি লোভী মুনফা শিকারী ব্যবসায়ীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে আজ জলপাইগুড়ি জেলায় ২টি পাইকারী সমিতিসহ ৬৬টি ক্রেতা সমবায় সংগঠিত হইয়াছে। ১৯৬৭-৬৮ সনে ইহাদের সভ্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১০,৫০০ এবং মূলধন সংগঠিত হইয়াছে ২ লক্ষ টাকার অধিক। ১৯৬৭-৬৮ সনে ক্রেতা সমবায় মারফৎ প্রায় ৫৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকার দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়াছে। ইহা প্রকৃতই গৌরবের বিষয়। অবশ্য জলপাইগুড়ি জেলায় ক্রেতা সমবায় সমিতি সমূহের বিস্তার গত কয়েক বৎসরের অধিক হইয়াছে। ১৯৬১ সনের ৩০শে জুন তারিখের হিসাবে যেখানে জেলায় মোট ক্রেতা সমবায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯, সেখানে ১৯৬৮ সনের ৩০শে জুনের হিসাবে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬৬—এই অগ্রগতি নিঃসন্দেহে জেলার ক্রেতা সাধারণের ক্রমবর্ধমান সমবায়িক চেতনার সাক্ষ্য দিতেছে। পূর্ববর্তীকালে বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলিই ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ দ্বারা ক্রেতা সমবায়ের কার্য করিয়া আসিতেছিল। এতদ্ব্যতীত বাস্যকাল হইতে স্থলে পাঠ্যাবস্থায় যাহাতে ছাত্রগণ হাতে কলমে সমবায় সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে সেজন্য উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র ক্রেতা সমবায় বিপণি গঠনের পরিকল্পনা হইয়াছে এবং জেলায় ইতিমধ্যেই তিনটি বিদ্যালয়ে ছাত্র সমবায় সংগঠিত হইয়াছে এবং উহার। বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে কার্য করিতেছে। ঐ তিনটি যথাক্রমে মাল আদর্শ বিদ্যালয়, ময়নাগুড়ি বালিকা বহুমুখী বিদ্যালয় জলপাইগুড়ি হাই স্কুলে সংগঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র ট্রেনিং কলেজে ও দুইটি ক্রেতা সমবায় বিপণি সাফল্যের সঙ্গে কার্য করিতেছে।

৩। **শিল্প সমবায়:**—শিল্প সমবায় সমিতি সমূহ সমবায় আন্দোলনের এক উজ্জ্বলতম দিক-নিদর্শনের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বিত্তহীন বৃহৎ জনসমষ্টি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এককভাবে মূলধন সংগ্রহ করিতে অক্ষম। কাজেই তাহাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে একত্রীভূত করিয়া তাহারা শিল্প সমবায় সমিতি সংগঠিত করিয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলায় বর্তমানে ১৭টি সমবায় সমিতি রহিয়াছে যাহাদের মোট সভ্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২৮০০ এবং মোট সংগঠিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪,৪০,০০০ (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা। প্রসঙ্গত আমরা জলপাইগুড়ি সহরের বিপ্লবী কর্মী শিল্প সমবায়ের উল্লেখ করিব। যাহাদের তৈয়ারী এ্যালুমিনিয়ামের বাসন ও তৈজসপত্র ইতিমধ্যেই বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ইহা ছাড়া টালি শিল্প, চামড়া শিল্প সমবায় ও তন্তুবায় শিল্প সমিতি ও দুইটি সমবায় চাউল কল রহিয়াছে।

৪। **বহুমুখী সমবায় সমিতি:**—বহুমুখী এই শব্দটির ভিতরই এই জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সেবা সমবায় সমিতির কার্য বৃহদায়তনে এ সকল সমিতি করিত। ঋণ সরবরাহ, শস্যের বিপণন, কৃষির উন্নয়ন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ইত্যাদি বহুবিধ কার্যই এ সকল সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। জলপাইগুড়ি জেলায় বর্তমানে ১৭টি বহুমুখী সমবায় সমিতি রহিয়াছে যাহার সদস্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২০০০ এবং সংগঠিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জেলার এই সকল বহুমুখী সমিতি সমূহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও Controlled Goods বা নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্তমানে এ জাতীয় সমিতি আর সংগঠিত হইতেছে না। দেশ বিভাগের পর বহুমুখী সমিতির মাধ্যমে বহু উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন সম্ভব হইয়াছে,—ইহার মধ্যে ফাটাপুকুর মোহিতনগর প্রভৃতি সমিতি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়াছে।

৫। **জেলা সমবায় ইউনিয়ন:**—সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমবায় ইউনিয়নের আবির্ভাব এক

নবদিগন্তের সৃষ্টি করিয়াছে। কেবলমাত্র মানবদেহের অধিকারী হইলেই আমরা কোন ব্যক্তিকে মানুষ আপ্যাদিতে পারি না—শিক্ষার আলোকে তাহার মানবিক গুণসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই সে প্রকৃত মানুষ হিসাবে পরিচিত হইতে পারে। সমবায়ের ক্ষেত্রেও সেরূপ কেবলমাত্র সমিতির অংশীদার হইলেই প্রকৃত সমবায়ী হওয়া যায় না। সমবায় দর্শন, নীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ কোন অংশীদারকে সমবায়ী হিসাবে পরিচিতি দিতে পারে।

সমবায় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, সমবায়ের নীতি আলোচনা ও সমিতি সমূহের উন্নয়নমূলক কর্মসমূহে সহায়তা করিবার জন্য ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন রহিয়াছে। সমবায় শিক্ষা প্রচার, সমবায় কর্মীবৃন্দের শিক্ষণ ইত্যাদির সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের উপর গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্যস্বত্রে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলাস্বত্রে জেলা সমবায় ইউনিয়নের উপর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। আমাদের জেলায় এই জাতীয় সমবায় শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৯ সনে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের সভাপতিত্বে জেলা সমবায় ইউনিয়ন সংগঠিত হইয়াছে। দুই জন জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক এ জেলায় সমবায় শিক্ষা প্রচারের দায়িত্বে নিযুক্ত রহিয়াছেন। জেলা সমবায় ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে তাঁহারা এ পর্যন্ত শতাধিক সমবায় শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং প্রায় ৪০০০ সমবায় সমিতির পরিচালক ও সদস্যকে সমবায় শিক্ষাদান করিয়াছেন। এইভাবে জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় সমিতি সমূহের উন্নয়নে ও সমবায় নীতি প্রচারে জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়ন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন।

৬। **গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি** :—‘ধরণীর এককোণে এতটুকু বাসা’ কবিগুরুর ভাষায় এই ‘এতটুকু বাসার’ আকাঙ্ক্ষা মানবমনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষকে আশ্রয়ের জন্য অন্ততঃ গুহাবাসী হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মাথা গোঁজার আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের অনেকের ক্ষেত্রেই শুধু কল্পনাই রহিয়া যায়। সমবায় তাই মানুষের এই সর্বাধিক প্রয়োজনটিকে উপেক্ষা করে নাই। আমাদের জেলায় এই জাতীয় সমবায় সমিতি একেবারে নূতন বলা যাইতে পারে। মাত্র একবৎসর কালের মধ্যে এ জেলায় ৪টি গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি সংগঠিত হইয়াছে, তবে ইতিমধ্যেই এই জাতীয় সমিতির জনপ্রিয়তা জলপাইগুড়ি জেলায় আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা করা যায় অচিরেই আরও বহু গৃহ নির্মাণ সমবায় জলপাইগুড়ি জেলায় সংগঠিত হইবে।

উপরে আমরা এ জেলার বিশেষ কয়েকটি সমবায়ের প্রকৃতি, বিবর্তন ও বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিলাম। উপরোক্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও বহুবিধ সমবায় সমিতি এ জেলায় রহিয়াছে। তন্মধ্যে মৎস্য সমবায়, যানবাহন সমবায়, হিম ঘর সমবায় প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ৩০শে জুন, ১৯৬৮ তারিখে জলপাইগুড়ি সমবায় রেঞ্জ নিম্নোক্ত পর্ষদের মোট ৭৩৩টি সমবায় সমিতির হিসাব পাওয়া যায়।

সেবা সমবায়—	২৭৭
অসীম দায়বদ্ধ ঋণদান সমিতি—	১৩৭
বৃহদায়তন ঋণদান—	১২
ক্রেতা সমবায়—	৬৪
পাইকারী ক্রেতা সমবায়—	২

হিমঘর—	১
সেন্ট্রাল ব্যাংক—	১
জমি বন্ধকী ব্যাংক—	১
জেলা সমবায় ইউনিয়ন—	১
সহরাকলে ঋণদান—	১৩
শস্য ব্যাংক—	২৪
শিল্প—	২৩
বিপণন—	১৭
যৌথ চাষ—	১৫
গৃহ নির্মাণ—	৪
চাউল কল—	২
অগ্রাণু—	১৩২
মোট—	৭৩৩

প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ে আলোচনা না করিলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। জেলার সমবায় সমিতি সমূহ রেজেষ্ট্রীকরণ, উহাদের তত্ত্বাবধান ও হিসাব পরীক্ষার জন্ত আমাদের জেলার ১ জন সমবায় সহ-নিয়ামক রহিয়াছেন, তাঁহার অধীনে বহু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী রহিয়াছেন যাহারা বিভিন্ন সময়ে এই সকল সমিতি পরিদর্শন করেন ও উহাদের তত্ত্বাবধান করেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রহিয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলার সমবায় সমিতি সমূহ পূর্বে দার্জিলিং-এর অফিস হইতে পরিচালিত হইত। ১৯৬১ সন হইতে জলপাইগুড়িতে স্বতন্ত্র Range সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহা পরিতাপের বিষয় যে জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমাকে প্রায় ১২ বৎসর হইল কুচবিহার সমবায় অফিসের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। শিলিগুড়ি মহকুমাকে যদিও জলপাইগুড়ি অফিসে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তথাপি আমাদেরই জেলার একটি মহকুমা অগ্রাণু জেলা অফিস কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় বহু বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত সমবায় ক্রমশঃই উন্নত ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং আশা করা যায় আগামী দিনে কৃষকের সমৃদ্ধ প্রয়োজনই সমবায় সমিতি সমূহ সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবে। চাষের জন্ত উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা প্রয়োজন। চাষবাসে প্রচলিত পদ্ধতি কৃষিক্ষেত্রে কখনই বিপ্লবের সূচনা করিতে পারিবে না, এজন্য চাই উন্নত ধরনের ট্রাক্টর ও চাষের অগ্রাণু যন্ত্রপাতি। এতদ্ব্যতীত কৃষকের চাষের গরু চুরি বর্তমানে আমাদের জেলায় নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—গরু চরিবার উপযুক্ত গোচারণ ক্ষেত্রেরও প্রচণ্ড অভাব। সমবায় সমিতি সমূহ চাষের উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ দ্বারা ইহার প্রতিকার করিতে পারে। সেবা সমিতি সমূহের উপবিধিতে এই সকল যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে এবং এজন্য পৃথক সমবায় গঠনের প্রয়োজন নাই।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করিলে আর অবকাশ পাওয়া যাইবে না। জলপাইগুড়িতে দুগ্ধ সরবরাহ করিবার অগ্রাণু কোন সমবায় সমিতি নাই। ভারতবর্ষের অগ্রাণু প্রদেশে দুগ্ধ সমবায় সমিতি সমূহ অভূতপূর্ব সাফল্য

লাভ করিয়াছে, আমাদের জেলায় দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি সংগঠন করা আশু প্রয়োজন, উহাতে গ্রাম ও সহরাকলের দুধের দুঃপ্রাপ্যতার সমাধান হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা জেলার সমবায় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলাম। আমাদের জেলায় সমবায় আন্দোলন কতখানি সাফলালভ করিয়াছে তাহা বিচার করিবেন জেলাবাসী। তবে এ জেলায় আমরা সমবায়ীরাও মুষ্টিমেয় নহি। জেলার সমবায়ী জনসংখ্যা ৫৫,০০০এ দাঁড়াইয়াছে—ইহা সমবায়ের ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচয় অবশ্যই বহন করে।

১৯৫৪ সনের Rural Credit Survey কমিটি হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছিলেন যে দেশের কৃষি ঋণের প্রয়োজনের মাত্র ৩.১% সমবায় মারফৎ সরবরাহ হয়। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় আমাদের জেলার কৃষি ঋণের প্রয়োজনের কিস্কিদিধিক ৫ ভাগ সমবায় মারফৎ সরবরাহ হয়। বাকী টাকা বিত্তহীন কৃষক সমাজকে সংগ্রহ করিতে হয় প্রধানতঃ সেই অতি লোভী মহাজনদিগের নিকট হইতে। ইহা আমাদের লজ্জা এবং বেদনার কথা। তবু আমাদের কখনও হতাশ হইলে চলিবে না। সাফল্যের অতি সামান্যই আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে—এখনও অনেক দূরত্ব, দুর্গম পথ আমাদের অতিক্রম করিতে হইবে। স্বার্থাশ্বেষীদিগের লোভ হয়তো কষ্টক হিসাবে আমাদের পথরোধ করিবে, তবু আমাদের পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। সমবায়ের আলোকে আমরা সেই অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া পাইব—সমবায় আমাদের প্রাচুর্যের অমৃত লোকের সন্ধান দিবে, জেলার তথা দেশের সমগ্র জনসমষ্টিকে বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজকে সমবায়ের আশ্বাসের সাড়া দিতে হইবে—সমবায়ের জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে আমরা যে ত্যাগ ও ক্রেশ সহ্য করিয়াছি সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনয়নের সংগ্রামে আমাদের তদপেক্ষা আরও অনেক ক্রেশ অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। ব্যর্থতা ও সমালোচনা হয়তো আমাদের বিক্ষত করিবে তথাপি সাফল্যের প্রতিজ্ঞায় আমাদের অটল থাকিতে হইবে—মনে রাখা দরকার সমবায় ভিন্ন বাঁচিবার পথ নাই। সংবিধানে উল্লিখিত সেই সমবায় সাধারণতন্ত্র আমাদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমবায়ের পথ মুক্তির পথ। কবি নজরুলের ভাষায়—

“ওরে নিপীড়িত ! ওরে ভয়ে ভীত ! শিখে যা আয়রে আয় !

দুঃখ ভয়ে নবীনমস্ত্র সমবায় ! সমবায় !”

প্রকৃতই নিপীড়িত নিঃসহায়ের বাঁচিবার একমাত্র পথ সমবায়। বিত্তহীন বৃহৎ জনসমষ্টির কল্যাণের এক ও অদ্বিতীয় পথ সমবায়। “আজ যাহারা জীবধাত্রী পল্লীভূমির রিক্ত স্তনে স্তন্য সঞ্চার করিবার ব্রত লইয়াছেন, যাহারা নিরানন্দ অন্ধকরের ঘরে আলো আনিবার জন্য প্রদীপ জালিতেছেন, মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, ত্যাগের দ্বারা, তপস্বী দ্বারা, সেবা দ্বারা, পরস্পর মৈত্রী বন্ধন দ্বারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা ভারতবাসীর বহুদিন সঞ্চিত মূঢ়তা ও ঔদাসীন্যজনিত অপবাদ রাশির সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট দেবতার অভিশাপকে সেই সাধকের দেশ হইতে তিরস্কৃত করুন এই আমি একান্তমনে কামনা করি”—সমবায়ী রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাদই আমাদের যাত্রাপথে পাথর হউক।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଦିକାରୀ ଡୋଥେ

ରାଜବଂଶୀ ସମାଜ

ସମ୍ପଦ୍ଧ ପରିଚ୍ଛେଦ

“ଆଜି ହତେ ଶତବର୍ଷ ଆଗେ”

ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଜନ-ସମାଜ

ধনসিং অধিকারীর চোখে রাজবংশী সমাজ

[বাংলা ১৩৭০। সবে শীত ফিরে যাচ্ছে হিমালয়ে। গরমকাল একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। এমনি দিনের এক বিকেলে জলপাইগুড়ি সহর থেকে মাইল পাঁচেক উত্তরে পাতকাটা গ্রামে একটুখানি কুটিরে হাজির হয়েছি। হাত দশেক লম্বা, হাত ছয়েক চওড়া আর হাত চারেক উঁচু, বেড়া নাই, চারদিক খোলা এমনি একটা ‘ডারিঘর’ বা বৈঠকখানায় যেয়ে দাঁড়ানাম। কুটিরের মালিক বুড়ো ধনসিং। চেনা ছিল। খুব খাতির করে মাটির মেঝেতে পুরোণো মাদুর বিছিয়ে দিল। সেখানে বসলাম। কাছেই বুড়ো বসলো একখানি কাঠের পিঁড়িতে। কুশলাদির পর বল্লাম বুড়ো তোমার জীবন কথা লিখবো। অবাক হয়ে বল্লো গরীব ছোটলোকের জীবনের কি দাম যে লিখবেন। আমার মতলবটা বলতেই হেসে বল্লো তবে লিখুন। তার কাছে যা শুনেছি, চলতি বাংলায় লেখা হচ্ছে।]

—আমার নাম ধনসিং অধিকারী। আমি রাজবংশী হিন্দু। বাংলা ১২৮০ সনে আমার জন্ম। এখন নব্বই বছর পার হয়ে গেল। তবুও চলাফেরা কাজকাম করি। অনেক পুরুষ এখানে আছি। ওপরের পাঁচ পুরুষের নাম আমার মনেই আছে। আমরা পুরোহিত বংশ। সবচেয়ে বড়, চক্রধারী বা গদীয়ান শ্রেণী। একদল ছোট পুরোহিত বংশ আছে, তাদের বলে ‘কান তুলসী’। আমার পঁচিশ হর শিষ্য আছে। বছরে একবার যাই তাদের কাছে। কাপড়, চাল, তরকারী ও সাধ্যমত কিছু টাকা পয়সাও দেয়। আমি একটু কবিরাজীও করি। এতেও কিছু আয় হয়। আমার চার হাল অর্থাৎ যাইট বিঘা চাষের জমি আছে। এইসব থেকে যা আয় হয় এতেই আমার সংসার চলে যায়। আমি যখন ছোট, এদিকে জঙ্গল ছিল খুব। চাষের গাই বলদ প্রায়ই বাঘে নিয়ে যেত। জংলা শুয়োরের উৎপাতে মাঠে ধান রাখাই মুশ্কিল হত। মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে আসতো হাতীর দল। বিপদ হতো খুবই। আমাদের জমিদার বৈকুণ্ঠপুরের রাজা। সবাই মিলে রাজাকে বল্লাম দুঃখের কথা। আমরা যে কেউ সরাসরি রাজা বাহাদুরের সাথে দেখা করে কথা বলতে পারতাম। গেলেই রাজা পান-গুয়া দিয়ে সম্মান করতেন এই গরীব প্রজাদেরও। রাজা তাঁর হাতী চড়ে ‘গাদা বন্দুক’ নিয়ে আসতেন প্রায়ই। কিছু শুয়োর মারা পড়তো, কচিং কখনও একটা বাঘ। এতেই কিছুদিন উৎপাত কমে যেত। তখনকার দিনে ‘গাদা বন্দুক’ (মাজল লোডার) চল ছিল। অনেক বছর বাদে রাজবাড়ীতে ‘টোটা বন্দুক’ (ব্রীচ লোডার) দেখেছি। পরে ‘রাইফেল’ও দেখেছি। এখন অনেক লোক এসেছে। জঙ্গলের লেশ মাত্র নাই। সব জমি চাষ হচ্ছে। এমন কি ‘গারাম’ অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতার জন্ম যে জমি আছে, সেটার ওপরেও হামলা করেছে লোকে। একটা উঁচু জমি দেখিয়ে বল্লো ঐ ‘গারামের’ কিছু জমি কেটে নিয়েছে এক সাঁওতাল চাষী। [ধনসিং-এর খুব ভয় ‘গারামের থান’ কাটা হয়েছে, গ্রামে বিপদ আসবেই।]

ছোটকালে জ্বর হতো খুব। ভয়ানক শীত ও কাপুনি। শুনেছি এই জ্বরের নাম ম্যালেরিয়া। ‘লতাপাতার পাঁচন’ খেতাম। কবিরাজ হিসাবে আমিও দিতাম আমার রোগীদের। এর সাথে ‘দ্বাণ্ড’ অর্থাৎ জরদেবীর পূজা চলতো। এখনও চলে। একে আমরা বলি ‘স্যাবা’ দেওয়া।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে এদিকে হয়েছিল ‘গুটি’ (বসন্ত) ব্যারাম। বালাপাড়া, কামাতপাড়া, চৌদ্দ ফিরানী, হালুয়াপাড়া গ্রামে বহু লোক মারা পড়লেন। ১৩১৮ থেকে ১৩৪২ পর্যন্ত কালজরে এদেশ প্রায় উজাড় হয়ে গিয়েছিল। এখন এ সব ব্যারাম দেখি না।

আমার বয়স যখন ষোল, আমার হয়েছিল ‘গুটি’ রোগ। বাবার সাথে যাচ্ছিলাম কাছের এক জলাতে মাছ ধরতে। আমার ‘ধরকা’র (মাছ ধরার খাঁচা) জন্য একটু দড়ির দরকার হ’ল। পথের পাশে একটা ঘরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই দেখি মেঝেতে একটা মড়া। ভয় পেলাম খুব। কাকেও কিছু না বলে দরজাটি বন্ধ করে ফিরে এলাম। মাছ ধরার সময়েই এল জ্বর। তিন দিন বাদে সারা গায়ে ‘গুটি’। খুঁহু কবিরাজকে ডাকা হল। পাঁচন দিয়ে গেল। ‘স্যাবা’ দিয়ে মন্ত্রপূত ‘ঘোট’ (ঘট) এর ওপরে একটি বাঁতি দিন-রাত আমার ঘরে জ্বলতে থাকলো। প্রায় সাতদিন জ্ঞান ছিল না। সারা গায়ে ছুঁক্ক, আর দলে দলে মাছি ছেঁকে ধরলো আমাকে। বাচার কোনই আশা নাই। এই সময়ে হঠাৎ এক রাতে স্বপ্ন দেখি এক বুড়ি এসে বললো—তোমার গ্রাম ছেড়ে চললাম ভারতের বাড়ি ভিন্ গাঁয়ে। আমার বাবাও এই স্বপ্ন দেখলেন। আর খুঁহু কবিরাজ স্বপ্ন দেখলো একটাকে খেয়ে ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছে বুড়ি। স্বপ্নে বুড়ি বলে গেল ব্যারাম সারলে ‘গারামে’ একটা পাঠা বলি দিস্। কি আশ্চর্য! পরদিন থেকে একটাও মাছি নাই। ধীরে ধীরে ভাল হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার ছোট ভাইটি এই ব্যারামে মারা গেল। ভাল হয়ে ‘গারামে’ পাঠা দিয়ে ‘স্যাবা’ দিলাম।

ছোট বয়সে কড়ি দিয়ে কেনাকাটা করতাম। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে আমার পয়সা দেখতে পেলাম। সহরে বাজার করতাম এই পয়সা দিয়ে। কিন্তু গ্রামের হাট বাজারে কড়ি দিয়ে বেচাকেনা হতো। পয়সাগুলির কি সুন্দর রং। যেন লাল সোনা—পরে দেখলাম আমার ডবল পয়সা। বড় বড় পয়সা দেখতে খুব সুন্দর। সবচেয়ে ভাল লাগতো পাই পয়সাগুলি। একটা পাই পয়সা নিয়েই বাজারে ছুটতাম মুড়ি কিনতে। সহরের দোকানে জিলিপী, গজা, নিমকি পাওয়া যেত এক পাইতে। তারপর এলো রুপার টাকা, আধুলি, সিকি ও দো-আনি। ক্রমে ছোট চেহারার। কড়ির চলন আর নাই। তামা ও রুপার সুন্দর পয়সা, টাকা, আনি আর নাই। এখনকার টাকা বাজে না। কিছুদিন পরে কালো হয়ে যায়। এখন দেখছি কাগজের টাকা। এর পরে কি হবে, তা আর দেখে যাব না।

আমি গরীব। দেখছেনই তো আমার বাড়িতে ছোট চারটি খড়ের ঘর আর এই ‘ভারি ঘর’ যেখানে আমরা বসে আছি। আমাদের সামনে একটু দূরে যে তিনটি দোচালা কুঁড়ে দেখছেন তার ভেতরে আছেন কালী, মনসা আর সন্নাসী (মহাদেব)। এঁরাই আমার গৃহ দেবতা। কয়েকদিন আগে দোল পূজা হয়ে গেল। তাই দেখেন সন্নাসীর ঘরে একটি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। বাড়ির ভিতর ‘এগিনায়’ (উঠানে) এক ধারে আছে তুলসী গাছ। এটাও আমাদের ‘দ্বাবতা’ (দেবতা)। আমাদের ভেতরে ‘ঠাকুরের’ (গুরুদেবের) নামে আছে ‘পড়ুয়া’ যাকে আপনারা বলেন ‘প্রবর’। আমি নিত্যানন্দ প্রভুর কৃষ্ণপাঠ ‘পড়ুয়া’। আরও অনেক ‘পড়ুয়া’ সম্প্রদায় আছে যেমন নিত্যানন্দ রামানন্দ, কৃষ্ণ, নিমানন্দ, সহিদগুরু, কানাইয়া, বলাইয়া, বলরাম পাঠ প্রভৃতি। পূর্বে একই ‘পড়ুয়া’র ভেতরে

বিবাহাদি হতো না। এখন সে সব মানা হয় না। বিয়ের সময় স্ত্রী পাখি স্বামীর ‘পড়ুয়া’। আমরা সবাই কান্তপ গোত্র। আমার কিন্তু মনে হয় আসল গোত্র এই ‘পড়ুয়া’।

বাংলা ১৩০০ সনে চ্যাতনসরীকে বিয়ে করি। তখন আমার বয়স প্রায় বৃড়ি আর চ্যাতন বারো। কন্তাপণ দিয়েছি পঞ্চাশ টাকা। প্রথমা স্ত্রী জীবিত থাকতেই আবার যজ্ঞসরীকে বিয়ে করি। তখন আমি একত্রিশ আর যজ্ঞ ষোলো। চ্যাতনের পাঁচ আর যজ্ঞের তিনটি সন্তান হয়েছে। কন্যাদের বিয়েতে পণ পেয়েছি ৬৫ টাকা থেকে ২৫ টাকা। কিন্তু ছেলেদের বিয়েতে দিতে হয়েছে ১০৫ টাকা থেকে ২৮৫ টাকা পর্যন্ত। নাত্নীদের বিয়েতে এই টাকা উল্লস করেছি। প্রত্যেকের বিয়েতে ২০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করেছি। আজকাল নেপালে মোরংএর ছেলেরা ৮০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত ‘কইনা পণ’ দিয়ে আমাদের অনেক মেয়ে নেপালে নিয়ে যাচ্ছে। বাপ-মাও ‘কইনা বাচাঘে’ (মেয়েদের বিয়ে দিয়ে) বেশ টাকা পাচ্ছে। এখন লেখা পড়া জানা ছেলেরা মেয়ের বাপের কাছেই চায় টাকা। আপনাদের মতো বাবুদের কাছ থেকে এটা শিখেছে। আগে বিয়ের আগে ছেলের বাড়ি থেকে এক বৃড়ি আসতো মেয়ের বাড়িতে। একে বলতাম ‘দানী বৃড়ি’ কোথাও বলে ‘মহলানী’। কইনা পণ মিটিয়ে দিয়ে, ছেলের বাড়ির কাপড়, গয়না দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে নিয়ে যেত ছেলের বাড়িতে। সেখানে হতো বিয়ে। পরদিন ছেলে, বৌ, বরষাত্রী সবাই আসতো মেয়ের বাড়িতে। সেদিন খুব খাওয়া হতো ‘খনি-ভাত’ (মাংস-ভাত)। এই খাওয়ার নাম ‘দান-পারা’। [তখনই এক কবিতা শুনিয়ে দিল]:—

‘হাউলীর ভাত অদল বদল, বিয়ের ভাত কিনা।

সোগোল কাথা বুঝা যাবে, দান পাবার দিনা ॥’

অর্থাৎ যার লোক নাই গ্রামের সবাই মিলে তার জমি চাষ করে দেয় ও সেখানে খায়। এমনি ভাবে বাড়ি বাড়ি খাওয়া চলে। বিয়ের সময় পয়সা খরচ করে আশীর্বাদ দেবার পর খাওয়া। কিন্তু দান পারার নেমন্তন্ত্রের দিন নিমন্ত্রিতদের কিছুই দিতে হয় না। কেবল খাওয়া। [রসিক বটে]।

পরের দিন সবাই ফিরে যায় ছেলের বাড়িতে। এখানেও যায় এক ‘দানী বৃড়ি’। এখন ছেলে যায় দলবল নিয়ে মেয়ের বাড়িতে বিয়ে করতে। এখন বিয়ের সাথে আঙণের সামনে হয় ‘হোম’। আমরা যে এখন কত্রিয় হিন্দু। ছেলের বাড়িতে হয় বাসি বিয়ে, বৌ-ভাত (ঢাকন ভাত)। আট দিন বাদে হয় ‘আঠোরা’, যেমন আপনাদের ‘অষ্ট মঙ্গল’। আজকাল আপনাদের মতো বর্ণহিন্দুদের মতোই বিয়ে হয়। আগে আমরাই গদীয়ান অধিকারীরাই ছিলাম পুরোহিত। বেশ কিছু আয় হ’তো। এখন সে কাজ করে কামরূপী ব্রাহ্মণেরা।

আমার ‘গিরি’ (জ্যোতদার) নস্র মহম্মদ ছিলেন খুব ধার্মিক। তিনি থাকতেন ‘স্বাথের পাড়ায়’। এখান থেকে আধ মাইল দূরে। ছোট বেলায় ঐ গ্রামেই আমি থাকতাম। তাঁর প্রজার ছেলেদের একটু লেখাপড়া শেখাবার জন্তু খুলেছিলেন এক পাঠশালা। একজন পণ্ডিতও নিযুক্ত করেছিলেন। নিজেই স্নেট, পেন্সিল, বই কিনে আনতেন আমাদের জন্তু। আমরা বিনে পয়সায় পেতাম। সেখানে আমি কিছু বাংলা লেখা পড়া শিখি। গোমোস্তা পাড়ায় একটা পাঠশালা হল। পণ্ডিত ছিলেন শঙ্কর দাস। কিছু দিন বাদে তারাপাড়াতেও একটা পাঠশালা হল। পণ্ডিতকে বলতাম তারু পণ্ডিত। এ দুটো আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে। আমি লেখাপড়া শিখি আমার বাবার খুব ইচ্ছা ছিল না। তাঁর মতে লেখা পড়া করে পেটে ভাত জুটবে না। তার চেয়ে চাষ

আবান্দ শেখাই ভাল। তবুও জোতদার নস্রু মহম্মদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পেতেন না। এখানে একটু লেখা পড়া শিখে আমার কিছু বেশ লাভ হয়েছিল। ১৩১০ সনে কয়েকজন বন্ধু আমাকে বাংলায় দলিল লেখা শেখান। আমি সহরের রেজেষ্টারী আপিসে ভূমি বিক্রি, বন্ধক প্রভৃতি দলিল লেখা বৈশিষ্ট্য কিছু উপার্জন করতাম। তখন দলিলে যত টাকার টিকিট লাগতে হতো, লেখাই খরচ সেই পরিমাণ টাকা আমরা নিতাম। বাবা মারা যাবার পরে এঁকাজ ছেড়ে দিতে হয়। জমিজমা তো দেখতে হবে। এখন আমার গ্রামের কাছেই অনেক ইন্সুল হয়েছে। আমার নাতী, নাতনীরা বিনে পয়সায় এঁ সব ইন্সুলে পড়ে। আমি আপত্তি করি না।

আমি আবার একজন 'গীদাল'। আমি গান লিখি, তাতে স্বর দেই। 'ধাম' অর্থাৎ যাত্রাগানের বই লিখি। নানা দেব দেবী বিষয়েও গান লিখি। অনেক দূরের গ্রাম থেকে গানের দল আসতো গান শিখতে। মুখে মুখে গান বলতাম, তারাও মুখে মুখে শিখে নিত। সবাই তো লিখতে জানতো না। এখনও অনেকে আসে গান নিতে। কিন্তু আমার নাতী নাতনীর দল এ সব গান বেশী পছন্দ করে না। তাদের ভাল লাগে বাইস্কোপের গান ও এখনকার কবিদের গান। হয়তো কিছুকাল বাদে আমাদের পুরোনো গান এরা ভুলেই যাবে।

আমার ছোটকালে মিথ্যা কথা বলতে শুনি নি কাউকেও। কথার দাম ছিল। চুরি বা লোক ঠকান কচিং শুনে পেতাম। কেউ নেশা করতো না। একমাত্র নেশা ছিল তামাক খাওয়া। ছেলে বড়ো সবাই এক সাথে বসে তামাক খেতাম। এখনও খাই। এতে কোন দোষ আছে আমরা মনে করি না। কেউ খাবারে ভেজাল দিত না। এতে পাপ হয়। এখন দেখি মিথ্যা কথা বলা, খাণ্ডে ভেজাল দেওয়া যেন রেওয়াজ হয়ে গেছে। কি যে হবে বলা যায় না। এত পাপ ভগবান কি সহিবেন!

খাওয়ার অভাব কোন দিনই বোধ করি নাই। 'আকাল' (ভিক্ষা) শুনি নাই। ভিক্ষা কেউ করতো না পেটে খাওয়ার অভাবে। বছর পচিশেক আগে বিলাতে (ইউরোপে) যুদ্ধের সময় কিছু দিন অন্নবিধা হয়েছিল। বছর পনের আগে তিস্তা নদীর বন্যা পর পর কয়েক বছর ফসল নষ্ট করেছিল। কিন্তু পলি পড়ায় বন্যার পরের বছর খুব ধান হতো। গোলায় এক বছরের ধান আমাদের জমা থাকতো। কোন বছর ফসল কম হলে কষ্ট হতো না। আমাদের সরকার এই বড় বাঁধ দিয়ে তিস্তার বন্যা থেকে জমি রক্ষা করেছেন। কিন্তু বছর বছর ফসল কমে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে জানি না। হয়তো পলি আর পাওয়া যাচ্ছে না। এখন লোকের খুব অভাব। গোলাতেও ধান নাই। অথচ একটা চালের কল এদিকে বসে গেল।

খাই আমরা খুব সাধারণ। সকালে মুড়ি, চুড়া (চিঁড়া), গুড় অথবা 'পহা' (ভাতে জল দিয়ে সারারাত রাখা) অথবা 'খোকরা ভাত' (বাসি ভাত) খাই। দুপুরে খাই গরম ভাত। ধান বাড়িতেই 'ভুকাই' (ছাম গাইনে চাল বানাই)। গরম ভাতের সাথে 'শাক' (তরকারী), মাছ যদি ধরতে পারি। 'ডিম' (ডিম), বা 'মসম' (মাংস) কচিং কখনো। ভাল কিনতে পারি না।

বিকলে খাই মুড়ি, চিঁড়া, দই ও গুড়। চিনির দাম বড় বেশী তাই গুড়ই খাই। 'আতিতেও' (রাত্রিতে) গরম ভাত খাই দুপুরের মতো। এখন মাঝে মাঝে 'উটি' (রুটি) খেতে হয়। এ গুলি আমরা বানাতেও পারি না খেতেও ভাল লাগে না। আমার বাসার নতুন 'বহুগিলা' (বউরা) ও নাতী নাতনীর দল খুব চা খেতে শিখেছে। 'চা-হা' (চা) না হলেই চলে না। আমিও এক দিন একবাটি খেয়ে দেখলাম। ভালই লাগলো। (এই সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে এক পেয়লা চা ও কিছু শুকনো চিড়া লেখকের জন্তে এসে গেল।)

আমার ছেলেবেলায় 'কারাসিন ত্যাল বা মাটিয়া ত্যাল' পাওয়া যেত না। বাসায় ছিল 'আগা' (এরও) গাছ। সেই গাছের ফল কলার ছাই এর সাথে 'ছাম গাইনে' গুঁড়া করতাম। সেগুলি গরম জলে সিদ্ধ করা হতো। তেল ভেসে উঠতো। একটু ঠাণ্ডা হলে বাড়ির মেয়েরা ধীরে ধীরে ঐ তেলে হাতের চেটো লাগিয়ে এক বাসনে সেই তেল কেচে ফেলতো। কিছু সংগ্রহ হলে মাটির হাঁড়িতে রেখে দিতাম। সন্ধ্যাকালে মাটির 'ভিয়ারী'তে (প্রদীপে) একটু এই তেল দিয়ে তাতে পাটের সলতা ডুবিয়ে বাতি জালতাম। এটা ছিল মেয়েদের কাজ। রাতে ভিন্নগায়ে যেতে হলে কয়েকটা আগার বীচি একটা বাশের কন্ধিতে গেঁথে নিয়ে তাতে আগুন ধরাতাম। খুব ধোঁয়া হতো কিন্তু আলো হতো বেশ।

• কখনও 'সিন্জার' (পাট কাঠির) এক গোছায় আগুন লাগিয়ে 'আরেয়া বা উকা' (মশাল) তৈরী করে যেতাম। এই 'উকার' আলোতে রাতে মাছ ধরতাম। এখন হয়েছে লঠন, বিজলীর টর্চ প্রভৃতি। হাজারক্বাতি জলে দোকানে, যাত্রাগানে, নেমন্ত্রণে, বিয়েতে। সহরে দেখি বিজলী বাতির জোলুস। এই জীবনে কতই না দেখলাম।

এণ্ডির চাষ ছিল আমাদের। চরকা বা 'তাপুরি' (টাকু)তে সূতা কাটা হতো এণ্ডির পোকা থেকে। মেয়েরাই করতো। আমরা ঘরে ছোট তাঁতে 'গিলাপ' (চাদর) তৈরী করতাম। তুলার সূতা কাটতাম। গ্রামের তাঁতীরা তৈরী করতো 'ফোতা' (মেয়েদের মোটা সাড়ী)। এগুলি টিকতো বহুবাল। পরে কলের সূতায় 'ফোতা' তৈরী হতো। পাটের সূতা তৈরী করে বানাতাম 'ধকরা' (সতরঞ্চ)। এ দিয়ে 'স্যাজা' (বিহানার) চাদর ও শীতে লেপের কাজ হতো। এখন কলের কাপড়, সাড়ী, চাদর হাটে হাটে বিক্রি হয়। এণ্ডির চাষ আর হয় না। সূতা অভাবে 'ফোতা' তৈরী হয় না। নাতনীরা 'ফোতা' পরেই না। মেয়েরা পছন্দ করে ফুল পাড় কলের শাড়ী। তাঁত চলে না। তাঁতীর দল এখন চাষ আবাদে কাজ নিয়েছে, কেউ এদেশ ছেড়ে চলে গেছে, কিছু না খেয়ে মারা গেছে। 'ধকরা' তৈরী হয় না বলেই চলে। সব পাট বিক্রয় হয় নগদ টাকায়। আমার তো জীবন শেষ হয়ে এল। যারা থাকলো তাদের যে কী হবে, ভাবতেও আমার দুঃখ হয়।

[এই কথা বলতে বুড়োর চোখ দিয়ে দুর্কোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। বুড়োর একটা ফটো তুলে নেব মনে করে এই বছরের প্রথমেই তার বাড়ি যেয়ে শুনি মাস খানেক আগে হঠাৎ সে ইহলোক ছেড়ে গেছে। রেখে গেছে প্রায় একশো বছরের স্মৃতি।]*

ধনসিং মেচের চোখে মেচ সমাজ

আমার নাম ধনসিং মেচ। বয়স একশোর কিছু বেশী। আমার গ্রামের নাম শিশুঝোমরা, থানা মাদারীহাট, জেলা জলপাইগুড়ি। আমার পিতার নাম থয়ের সিং মেচ। আমি নারজিনারী সম্প্রদায়ভুক্ত। আমি লেখাপড়া জানি না। চাষ আবাদ করি। আমার বাড়ীতে মাত্র চারটি খড়ের চাল দেওয়া ঘর, মধ্যে একটি ছোট উঠান। বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া, মাটির মেঝে। উঠানের উত্তর পূর্ব কোণে আছে একটি 'সীজু' অর্থাৎ সীজ মনসার গাছ। এর চারিদিকে ঘেরা পাঁচভাগে বাঁশের বেড়া। একে আমরা বলি 'পান্‌চো ভূত'। পূর্ব দিকের ঘরের পিছনে আছে ছোট ছোট তিনটি খড়ের চালা। এতে আছেন বিষহরি, কালী ও ঠাকুর। আমাদের গ্রাম্য দেবতাকে আমরা বলি 'ঠাকুর'। সীজ গাছটি আমাদের বড় দেবতা। এঁকে আমরা বলি 'বাথউ' অর্থাৎ শিবঠাকুর বা মহাকাল। উত্তর দিকের ঘরের ভিতরে আছেন 'মাইনো'। ইনি আমাদের বড় দেবী। এঁকে আমরা বলি 'মহামাঞি'।

ডুয়ার্সের রাজা তখন ভূটান। এখন যেখানে রিয়াবাড়ি চা বাগান, চামুটির নিকটে, সেটাই ছিল আমার পিতার জমি। সেখানে চাষ আবাদ করিতেন। এখন যেটা আমবাড়ি চা বাগান সেখানে আমার পিতার প্রায় তিনশত বিঘা চাষের জমি ছিল। এখানেই আমার পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়। আমি তখন খুব ছোট। আমার 'আয়ং' অর্থাৎ আমার বড় ভাই আমাদের ফাঁকি দিয়া সব সম্পত্তি নিজেই গ্রাস করেন। নিরুপায় হইয়া এখন যেখানে বাঁধাপানি চা বাগান হইয়াছে সেখানে কিছু জমি লইয়া চাষ আবাদ করি। তখন ডুয়ার্সের সর্বত্র জঙ্গল। যেখানে খুসী জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদ করিতাম। কেহই কিছু বলিত না। বাঁধাপানি হইতে আসি এখন যেটা মরাঘাট চা বাগান সেখানে। সেখান হইতে এই গ্রামে। একশত কুড়ি টাকা দিয়া বারো বিঘা জমি কিনিয়া চাষ আবাদ করিতেছি গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।

আমবাড়িতে আমাদের প্রচুর ধান হইত। তিন বেলা ভাত খাইতাম। জলের খুব অভাব ছিল। রোজ পাঁচ মাইল হাঁটিয়া আসিতাম 'পানার হাটে' পানীয় জল সংগ্রহ করিতে। এখন এই স্থানকে বলে 'বানার হাট'। মনে হয় এখন প্রতিবৎসর এখানে 'বানা' অর্থাৎ বন্তা হয় তাই বোধ হয় এই নাম হইয়াছে। রোজ যাতায়াত করিতাম দশ মাইল। আমাদের কোনই কষ্ট হইত না।

ধান বিক্রয় করিয়া লবণ কিনিতাম। পাট খুবই কম বুনিতাম। পাটের দাম ছিল মোটে আড়াই টাকা মণ। নিজেদের ব্যবহারের জন্য যতটুকু দরকার মাত্র সেই পরিমাণ পাট আবাদ করিতাম। আমার বয়স যখন কুড়ি আমি বিবাহ করি হাজোয়ারী সম্প্রদায়ের এক কন্যাকে। এই দ্বীর চারি পুত্র ও চারি কন্যা আছে। এই দ্বীর মৃত্যু হইলে আমি পুনরায় বিবাহ করি। এবারেও এক হাজোয়ারী কন্যাকে। এই দ্বীর গর্ভে চারি পুত্র ও চারি কন্যা। এই দ্বী এখনও বর্তমান আছে। এই ষোলটি সন্তান লইয়া মাত্র

বারো বিঘা জমিতে খুবই কষ্টে আছি। এখন দুই বেলাও ভাত খাইতে পাই না। একটু একটু রুটি খাওয়া অভ্যাস করিতেছি। শাকসব্জি সিদ্ধ করিয়া একটু লবণ দিয়া খাই। ভাত জুটিলে ভাতের সঙ্গে নচেৎ এমনই। পয়সা জুটিলে একটু তেল কিনি। সেদিন ভালই খাই, একটু ভাজাও খাই। নদীতে মাছ ধরিলে কোন কোন দিন মাছ সিদ্ধ করিয়া লবণ দিয়া খাই। আমরা মূর্গি ও শুয়োর পুষি। মাংস প্রায়ই খাই। মাংসও সিদ্ধ করিয়া লবণ দিয়া খাই। তেল, ঘি, মশলা কিনিবার পয়সা নাই। আমরা মূর্গি বা শুয়োর এক কোপে কাটি। সাঁওতালদের মত অত কষ্ট দিয়া মারি না।

বৎসরে একদিন 'শাল পূজা' করি খুব ধুমধামে। একটা মাটির টিপি আমাদের দেবতা। প্রতিমা নাই কোন দেবতারই। পূজা করে আমাদের পুরোহিত। তাকে আমরা বলি 'রোজা' (ওঝা)। ফুল, তুলসী পাতা, আলো চাউল, চিঁড়া, পাকা কলা, কাঁচা কলা, গুড় এই সব দিয়া পূজা হয়। বলি দেই হাঁস, মূর্গি, কবুতর, শুয়োর। এক কোপে কাটি। দেবতাকে দেই তাদের রক্ত আর আমরা খাই মাংসটা। পূজার পর দেবতা তাঁর ছোট কুটিরই থাকেন, জলে বিসর্জন দেই না। জঙ্গলে কাঠ কাটিতে যাইবার আগে একটি শাল গাছকে বনদেবী হিসাবে পূজা দেই। এই পূজার নাম 'শালশিরি' পূজা। এই পূজা দিয়া বনে গেলে কোন জন্তু আমাদের ক্ষতি করে না।

বাড়িতে এণ্ডির পোকা পুষি। টাকুয়াতে সূতা কাটি। আগে নিজেরাই কাপড় বুনিতাম। এখন তাঁতীকে দিয়া কাপড় বুনাইয়া আনি। কিছু বিক্রয় করি, কিছু আমরা ব্যবহার করি।

একটু ভয়েই বলি। বাবার কাছে শুনিয়াছি ভুটানের আমলে সংসার প্রতি বৎসরে আট টাকা খাজনা দিতাম আর যত ইচ্ছা জমি চাষ করিতাম। ইংরাজ আসিল। খুব ভাল কথা বলিল, আমরা খুসী হইলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে সব জমি চলিয়া গেল। জাঠা মহাশয়েরও জমি থাকিল না। কেমন করিয়া যেন নিঃশ্ব হইয়া গেলাম। শুনিলাম আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে। পরিবর্তন কিছুই বুঝিতেছি না।*

একজন শিক্ষকের চোখে সহরের আদিম রূপ

॥ স্মৃতি চারণা ॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ (বয়স ৯০)

বিশ্বতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া ছায়াচ্ছন্ন অতীতের মায়াময় দিনগুলির আকর্ষণ যেন কোন্‌ শক্তির বলে বার্ষিক্য বিড়ম্বিত আজকের এই মনটাকে নিয়ে চলে হৃদয় অতীতের পানে। সমুদ্রের বালুকাময় তটভূমিতে পদচিহ্ন যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকেনা, মাহুঘের মনেও প্রত্যেকটি ঘটনারই স্মৃতি তেমনই অক্ষয় আসন লাভ করে না। আমার এই দীর্ঘ নব্বই বৎসরের জীবনে কত ঘটনাই তো বিস্মৃত হয়েছি। কিন্তু তথাপি, আমার জীবনের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরের অতীত দিনের এমন সব ঘটনাকে এক স্মৃত্ত্রে গেঁথে রেখেছি, যা কোনদিনই ভুলবার নয়। আজকের পাঠকের কাছে আমার অতীত জীবনের সঙ্গে বিজড়িত শহর জলপাইগুড়ির পুরাতন কথাই কিছু নিবেদন করব। সহৃদয় পাঠক হয়তো বিস্ময়াবিষ্ট চিন্তে প্রশ্ন করছেন, কে এই বৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি আজ স্মৃতি রোমন্থন করতে বসেছেন? কৌতূহলের নিবৃত্তি আমি আমার ব্যক্তি-পরিচয় দিয়েই করছি। আমার নাম শ্রীযতীন্দ্র নাথ সিংহ। দীর্ঘ তেতাল্লিশ বৎসর অধুনা পরিচিত ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ে (পূর্বনাম সদর মধ্য বাংলা বিদ্যালয় ও সদর উচ্চ বিদ্যালয়) শিক্ষকতা ত্রুতে নিযুক্ত থেকে আজ প্রায় ষোল বৎসর হ'ল অবসর গ্রহণ করেছি।

খৃঃ ১৯০২ সালে এন্ট্রাস পাশ করে কুচবিহারে ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যয়ন কালে, পূজাবকাশে উকিল পাড়ায় আমার ভগ্নীপতির গৃহে একমাস অবস্থান করেছিলাম। তখন জলপাইগুড়ির যারূপ দেখেছিলাম, তখন তাকে একটা বড় বস্তী ব্যতীত শহর বলা চলে না। রেলওয়ে স্টেশন, বড় ডাকঘর, রাজবাড়ী এবং কুচবিহার কাছারী এই চারিটি ছোট দালান ব্যতীত কোন ইষ্টক নির্মিত পাকা বাড়ী শহরে ছিল না। বর্তমান টাউন ক্লাব মাঠে রাজসাহী কমিশনারের বাংলো ছিল খড়ের আটচালা ঘরে। কমিশনার অফিস, ডেপুটী কমিশনার অফিস, দেওয়ানী কাছারী ইত্যাদি সবই ছিল লম্বা লম্বা টিনের চালাঘরে। সদাগর পট্টিতে ছিল গুদামঘর সদৃশ লম্বা টিনের চালা। তার মধ্যে বেশী ছিল কাপড় আর বাসনের দোকান। শহরের রাস্তাগুলি ছিল কাঁচা এবং অপ্রশস্ত। যানবাহন ছিল ধুলিতে গগন আধার করা একমাত্র গরুর গাড়ী। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন ছিল বাঁশের ঝাড়। বর্তমানে শহরের কেন্দ্রস্থল ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানেও ছিল বড় বাঁশ ঝাড়। অধুনা কতোয়ালী থানা অঞ্চলে ছিল ভোম পল্লী। কদমতলা চৌমাথা ছিল শহরের শেষ সীমা। ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে কৃষকপল্লী ও ধানক্ষেত দেখা যেত। বর্তমানে যে স্থানে কদমতলা বালিকা বিদ্যালয়, ঐ স্থান ছিল জঙ্গল ও গর্তে পূর্ণ ভাগাড়। শহর বর্তমানে বৃক্ষ বহুল; পূর্বে ছিল জঙ্গল বহুল। প্রায়ই বাঘ এসে শহর থেকে গৃহপালিত পশু ধরে নিয়ে যেত। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রেলি ব্রাদার্সের পাটগুদাম ব্যতীত কোন বাসগৃহ ছিলনা। সবই ছিল গর্ত ও ধানক্ষেত। দূরে পাণ্ডাপাড়া অঞ্চলে একটি বস্তী ছিল। উকিল, মোক্তার, আমলা, কেরানী প্রভৃতি নিয়ে গুণতি যে কয়েকটি বাসা ছিল, তাও গড়ে উঠতো দূরে দূরে এক একটি প্রাঙ্গণ নিয়ে। জনসাধারণের বাসাগুলি প্রায়ই ছিল খড়ের। মাঝে মাঝেই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া যেত। অগ্নি নির্বাপনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পৌরসভা নামে মাত্র একটা ছিল বটে, কিন্তু তা

পানীয় জল সরবরাহ বা পথে আলোকদান কিংবা জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম ছিল না। রাত্রে কেরোসিনের মিটমিটে আলো কিছুক্ষণের জন্যে পথে জ্বলতে দেখা যেত। একটিমাত্র বাজার ছিল তা দিনের বেলাতেই বসত একটি চালাঘরে। ওরই সম্প্রসারিত বর্তমান রূপ দিনবাজার।

কাঠের ছাউনী দেওয়া একটি চালাঘরে ছিল শহরের একমাত্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—জেলা স্কুল। তাতে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শত। সর্বসাধারণের সন্তানের শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল “সদর মধ্য বাংলা বিদ্যালয়”। ঐটি সম্প্রসারিত হয়ে ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বালিকাদের শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র ছিল সদর মধ্য বাংলা বালিকা বিদ্যালয়।” এর বর্তমান নাম সদর বহুমুখী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়।

খৃঃ ১৯০৮ সালে আমি আবার যখন জলপাইগুড়িতে আসি, তখন সেটি ছিল “বঙ্গভাঙ্গের অগ্নিযুগ।” সে সময়ে বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। জলপাইগুড়িতেও আর্থ্যনাট্য সমাজ গৃহে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। করলা নদীর ধার হতে আরম্ভ করে ৬শ্রীনাথ হোড় মহাশয়ের বাড়ী পর্যন্ত ছিল স্কুলের ওয়ার্কসপ্। লোহা এবং কাঠের নানা ধরনের কাজ এখানে শেখান হত। আমার সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্য এই যে, আমি ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ৬শ্রীশুকুমার নিয়োগী ছিলেন জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং ৬তারিণী প্রসাদ রায় ছিলেন সভাপতি। অত্যাগত উকিল ও মোক্তার মহোদয়গণ ছিলেন কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য। সদস্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আদালতের কার্য শেষ করে জাতীয় বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপনা ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। ঐ অবকাশে আমরা একটু বিশ্রামের সুযোগ পেতাম। ছাত্রদের গভীর অহুসঙ্কিতা ছিল। তারা নূতন বিষয়কে জানবার জন্যে এত আগ্রহী ছিল যে, তাদের সেই কোতূহল নিবারণ করা আমাদের সাধ্যের অতীত মনে হত। তখন উপলব্ধি করতাম, কত অল্প জ্ঞান নিয়ে আমরা শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হতে চাই! ছাত্রদের সঙ্গে একাসনে বসে আন্তরিকভাবে পাঠ্য বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং সেই সঙ্গে তাদের বক্তব্যকেও মর্যাদা দিয়েছি। দুর্ভাগ্য সমস্যার সমাধান ছাত্ররা নিজেই করেছে,—আমরা সহায়তা করেছি মাত্র। প্রত্যেক ছাত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা অন্বেষণ করতে চেয়েছি তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সহকর্মী স্থাপন করে এবং সহযোগিতা করে। কোন ছাত্রকেই কোনদিন অজ্ঞ মনে করতে পারিনি। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে মিশে মনে হত, দেশসেবায় তাদের মধ্যে কে কি ধরনের কাজ করবে, তা যেন আগে থেকেই স্থির করে রেখেছে। তাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারা দেখে আমার সে অহুমান দূট হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদ্বয় শ্রীমান সতীশ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমান সত্যেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বাস প্রথম বিভাগে খুব উচ্চস্থান অধিকার করেছিল। শ্রীমান সতীশ ময়মনসিংহ জেলায় দেশের বহু কাজ করেছে এবং শ্রীমান সত্যেন্দ্র জলপাইগুড়িতে চা-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে।

পরবর্তীকালে একমাত্র যাদবপুর ব্যতীত সবকটি জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল এবং স্থানীয় বিদ্যালয়টিরও একই দশা হল। এখন যেটি ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়, পূর্বে তা ছিল সদর মধ্য বাংলা বিদ্যালয়। আমি ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দিই। শিক্ষকদের মাসিক বেতন ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওতেই ছোট একটা সংসার মোটামুটিভাবে চলে যেত। জিনিষপত্র ছিল খুব সস্তা। স্বর্ণকুম্ব খুব সস্তা চাল ছিল এক টাকায় দশ সের এবং খাঁটি গব্যঘৃত ছিল দশ আনা (বর্তমানে বাষটি পয়সা) সের এবং সর্ষের তেল ছিল পাঁচ আনা (একত্রিশ পয়সা) সের। তিলিরা বাড়ী বাড়ী খাঁটি তেল বিক্রয় করত। ভাল সূর্য্যপুত্রী

আম ছিল আট আনায় একশত এবং বড় কমলালেবু এক টাকায় একশত পাওয়া যেত। দেড় টাকায় একগাড়ী বোঝাই জ্বালানী কাঠ বিক্রয় হত। স্থানীয় লোকেরা তিস্তা নদীতে ভেসে আসা কাঠ ধরে বিক্রয় করত। দুধ ছিল এক টাকায় ষোল সের। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই গরু পালন করা হত। প্রচুর গোচারণ ভূমি ছিল এবং গো-পালন বর্তমানের মত এত ব্যয়সাধ্য ছিল না। মাত্র চার আনা পারিশ্রমিক নিয়ে রাখাল একমাস ধরে গরু চরাত। ঘোড় দৌড়ের মাঠ বেকে সন্ধ্যায় গরুগুলির ফিরবার দৃশ্যটি বড় সুন্দর লাগতো। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগতো যে, গরুগুলি ঠিক নিজের নিজের বাসায় প্রবেশ করত। *হরে সে যুগে কড়ির প্রচলন ছিল এবং আধ পয়সার ব্যবহার খুব বেশী ছিল। স্থানীয় জনসাধারণ খুব সরল ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। ছল-চাতুরী এবং খাণ্ডে ভেজাল দেওয়ার রীতি মোটেই ছিল না। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব ছিল। কিন্তু বহিরাগত কিছু সংখ্যক কাঠমোস্তার আগমনের পর থেকে বিভেদ ও বিদ্বেষের সূত্রপাত হতে থাকে।

প্রয়োজনীয় সমস্ত বিভাগগুলির গোড়াপত্তন আগে থেকেই ছিল। ক্ষুদ্রাকার একটা খড়ের চালাঘরে ছিল হাসপাতাল। বর্তমানে ঐ স্থানে ট্রেডিং ব্যাঙ্কের স্মৃৎ দ্বিতল বাড়ী। পোষ্ট মর্টেম হাউস ছিল করলা নদীর ধারে। বোধহয় কুসংস্কার বশতঃ কেহ ঐ স্থান কিনতে রাজী না হওয়ায় পরে ঐখানে ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বর্তমানে যে স্থানে গুর্জংঝোরা বিল্ডিং, ঐ স্থানে ছিল শহরের একমাত্র আদি ব্যাঙ্ক 'ট্রেডিং ব্যাঙ্ক।' টিনের একটি দোতলা ঘরের উপরে ছিল ব্যাঙ্ক এবং নীচে ছিল পাবলিক লাইব্রেরী। দৈনিক, মাসিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন গ্রন্থাদি এখানে জনসাধারণের জন্ম রাখা হত। চা-শিল্পের উন্নতিতে ট্রেডিং ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ছোট একটি মাত্র ছাপাখানা ছিল "জলপাইগুড়ি প্রেস"। উকিল পাড়ায় ওটি আজও বর্তমান।

সংক্রামক রোগ খুব একটা দেখা দিতনা; তবে ডুয়ার্স অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার খুব ভয় ছিল। ম্যালেরিয়ার ভয়ে ভাল চাকরী পেলেও কেউ ডুয়ার্স অঞ্চলে যেতে সাহস পেতেন না।

বিবাহরি এবং ছুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজবাড়ীতে বিরাট মেলা বসত। তখন গ্রামাঞ্চল থেকে বহু নরনারী মেলা দেখতে আসতেন। আজও যখন রাজবাড়ীর মেলায় গ্রাম্য নরনারীকে ভিড় জমাতে দেখি, তখন সেইসব পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে। আমারই চোখের সামনে সেদিনের এই জলপাইগুড়ি দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল! ক্ষুদ্র একটি অঙ্কুর যেমন ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে মহীকুহে পরিণত হয়, একটি বস্ত্রী-সদৃশ এই জলপাইগুড়িও নিশ্চয়ই মহানগরীতে পরিণত হবে, এ বিশ্বাস আমি রাখি। সেই অনাগত শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমি বসে রইলাম বার্লোকের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে।*

আমার কথা

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ময়নাগুড়ির খুব পুরাতন বাসিন্দা। ১৮৬৫ সনের পূর্বে ময়নাগুড়ি ছিল বৈকুণ্ঠপুর জমিদারীর অন্তর্গত রংপুর জেলার অংশ। ইংরেজ এদেশ জয় করিবার পরে এখানে একটি কাছারী ছিল, ছোট খাট মামলা মকদ্দমাও হইত। ১৮৬৬ সনে টুইডি নামে এক সাহেব এখানে এসিষ্টেন্ট কমিশনার হয়ে আসেন। তখন ময়নাগুড়ি অতি ছোট জায়গা, সামান্য কয়েকটি বাড়ি, চারিদিকে ময়না গাছের জঙ্গল। জনবিরল। ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপ ভয়াবহ। বহু জন্তুর উৎপাতে সন্ধ্যার পরে ঘরের বাহির হওয়া ছিল বিপজ্জনক। ১৮৬৯ সনে জলপাইগুড়ি জেলা তৈয়ারী হইলে এই টুইডি সাহেব ময়নাগুড়ি থেকে আমার পিতাকে সঙ্গে লইয়া জলপাইগুড়ি সহরে আসেন। ইতিপূর্বে আমার পিতৃদেব ঢাকা কালেক্টরীতে কাজ করিতেন। এখানে হইলেন ডুয়ার্স খাসমহলের রেভিনিউ অফিসর। তখন রেল ছিলনা এদিকে। তিনি আসিলেন নৌকায়, পান্ধীতে ও ঘোড়ায় চড়িয়া। ছোট তিস্তা নদী, অথচ গভীর। নৌকায় পারাপার করিতেন।

এদিকে জমি ছিল অনেক অথচ লোক কম। অল্প বয়স্কজন রাজবংশী কিছু জমি চাষ আবাদ করিত। বহিরাগত অনেকে বহু জমি লইয়া বড় বড় জোতদার হইয়া গেলেন ও অর্থবান হইলেন। ইংরাজ অতুগ্রহে এদের প্রতিপত্তি খুব হইল। সকলে ভয় ও সম্মান করিত। ধীরে ধীরে লোক ও বসতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জঙ্গল পরিষ্কার হইল। ময়নাগুড়ির পূর্ব পার্শ্ব দিয়া যে নদী তিন মাইল দূরবর্তী জলেশ্বর মন্দিরের নিকট দিয়া প্রবাহিত তাহার দুই পার্শ্বেই জনবসতি হইল। কালাজর দেখা দিল। জেলা বোর্ড একটি ডাক্তারখানা খুলিলেন। এই জেলা বোর্ডের ডাক্তারই ছিলেন একমাত্র ভরসা। ক্রমে ক্রমে ময়নাগুড়ি কেন্দ্র করিয়া ডুয়ার্সের ভূটান যাইবার 'ডুয়ার' বা গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ হইল। জরধা নদীর উপর সেতু নিমিত হইল। ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত ময়নাগুড়ি ছোট একটি থানা সহরই থাকিল। এই সময় হইতে অল্প পর্য্যন্ত অভূতপূর্ব পরিবর্তন হইয়াছে। বিরাট বাজার, ধানের কল, অসংখ্য গৃহ, বড় হাসপাতাল, অনেক স্কুল, মোটর গাড়ি, রিক্সা, বিজলী বাতি, সিনেমা, রেল লাইন, পৌচালা রাজপথ। যেন পূর্বযুগের কোন এক দানব আসিয়া নূতন সহর গড়িয়া দিয়া গিয়াছে। সবই হইয়াছে কিন্তু পুরাতন ময়নাগুড়িবাসীর মধ্যে যে ভালবাসা ও সততা ছিল তাহা যেন উড়িয়া গিয়াছে। আমরা এখানকার প্রাচীন পরিবার, ভাবিতেছি ভাল হইল না মন্দ হইল। কালের গতি কোন দিকে লইয়া যাইতেছে জানি না।

of Japan, 1949-1964. . .

অষ্টম পরিচ্ছেদ

A BRIEF HISTORY OF THE TEXTILE INDUSTRY IN INDIA

‘দুইটি পাতা একটি কুঁড়ি’

‘দুইটি পাতা একটি কুঁড়ি’

The Development of the Tea Industry in the District of Jalpaiguri : 1869-1968.*

Shri B. C. Ghosh

Introduction

• The North Bengal Districts of Jalpaiguri and Darjeeling, situated at the foot of the Himalayas in a submontane region, are famous for three Ts—Tea, Timber and Tobacco. The first two could be found in both the districts and are the unique features of Bengal but the areas where the last product was grown in the district of Jalpaiguri was mostly transferred to Pakistan by the Radcliffe award. To trace the early history of introduction of tea plantation on a large scale in Jalpaiguri district one has to go back to the story as to how tea was introduced in India.

A SHORT HISTORY OF THE TEA INDUSTRY IN INDIA

The first recorded tea plantation in India was in 1780, when a few bushes from Canton in China were planted in Calcutta. These did not survive long, either for want of culture or due to weather or soil conditions. As a matter of fact, these bushes were planted more for luxury than for any other purpose. Serious thoughts were given in 1788 to the culture of tea as a commercial proposition in India to replace the expired monopoly of tea trade in China. Bihar and Cooch Behar were found to be suitable for tea cultivation. Assam, still then, did not come under the administration of the East India Company. It was not, however, until the annexation of Assam in 1826 that earnest attention was riveted to this direction, and any real progress was recorded in 1834, in which year, Lord William Bentinck, the then Governor General, appointed a committee to investigate the possibilities of cultivation of tea in India. Subsequently, a Government experimental area was opened at Sadiya with seeds from China. Later, another experimental garden was opened at Chabua planted with Assam indigenous seed which was discovered during the Burma expedition. Experiments were also conducted in South India under the auspices of the tea committee. It is thus found that the Government of that day were the pioneers for industry which has been instrumental in opening up of large areas of jungle for the cultivation and manufacture of a commodity which now earns for the country the essential foreign exchange, so much needed for her economic development. It is but meet that the present administration should direct its endeavours to the fostering of a climate in which tea industry may continue to play its proper role.

As an obvious development of the administrative set-up of the time, British nationals took up the pioneering in the line and the Assam Company, the first tea company of India, took over part of the British Government's experimental areas in 1839. Tea was first planted

* Want of space has compelled us to publish an abridged version of this well documented article.

in Darjeeling in 1839 and thereafter in Sylhet and Cachar in about 1855, in Terai in 1862 and in the Duars in 1874. The pioneer garden in Chittagong dates from 1840. While experiments were carried out in South India in the early days, little progress was made until after 1883, only some 11,000 acres in all having been planted previous to that date.

The Indians came late in the field and the earliest entry, as recorded, was about in 1876. But sustained efforts on a commendable scale did not start before the second decade of the present century.

Discovery and experiments

After the first phase of the short-sighted exploitation of Bengal by the East India Company's servants had ended, the practical mind of Warren Hastings clearly realised that if the Company were to prosper it must promote industrial development. Silk, cotton-cloth, indigo and several other commodities received his attention and at the same time he devoted particular efforts to the promotion of trade with Tibet and other neighbouring countries. In 1774 he made provisions by treaty for the duty-free trade in North Bengal of Bhutanese goods. It is not, therefore, surprising to learn that when China tea seeds began to arrive in India, Warren Hastings had a selection of them sent to George Bogle, the British emissary then in Bhutan. No practical result seemed to have followed, but the general impetus to trade and industry given by Hastings had results in many directions. In 1778 Sir Joseph Banks was to prepare a series of notes for the East India Company on the cultivation of new crops, and in them he advocated the cultivation of tea in India. He began by discussing the geographical limits within which satisfactory tea could be produced, and on the basis of the experience in China and Japan arrived at the conclusion that black teas could be grown best between the 26th and 30th parallel in high altitudes, and green teas between the 30th and 35th.

Early experiments in Assam

A report of the special committee appointed on 1. 2. 1834 was submitted on 24. 12. 1834. The report is interesting.

It states

"that the tea shrub is beyond doubt indigenous in Upper Assam, being found there, through an extent of country of one month's march within the Honourable Company's territories, from Suddya and Nefsa (Neffa) to the Chinese frontier province of Yunnan, where the shrub is cultivated for the sake of its leaf. We have no hesitation in declaring this discovery, which is due to the indefatigable researches of Captain Jenkins and Lieutenant Charlton to be by far the most important and valuable that has ever been made on matters connected with the agricultural and commercial resources of this empire. We are perfectly confident that the tea plant which has been brought to light, will be found capable, under proper management, of being cultivated with complete success for commercial purposes, and that consequently the object of our labours may be before long fully realised."

Formation of the first tea company

"The high price fetched by the tea sent home in 1838-9 to the Court of Directors at once attracted the attention of enterprising businessmen alike in Calcutta and London. Early in 1839 the Bengal Tea Association was formed in Calcutta and a few weeks later preliminary steps taken by a separate party of individuals for the formation of the Assam Company in London."

In March, 1840 practically all the East India Company's plantations, except those at Chabua and Dinjoy and two other small gardens, were handed over to the Assam Company, rent free for ten years.

Tea in Jalpaiguri

Jalpaiguri District was formed in 1869 after the annexation of Bhutan Duars from the Bhutias in 1864-65. The portion of the Duars within the district of Jalpaiguri was called Western Duars. The portion of the Duars in Assam annexed earlier was called Eastern Duars. The Western Duars is about twenty two miles in width and about seventy miles in length from the Teesta to the Sankosh rivers from the East to the West. It is a flat land traversed by numerous streams and full of forests with patches of cultivated areas in between.

THE FIRST TEA GARDEN

From records available in the Collectorate it appears that Latchmand Westfield Barantee took the first lease of 502 acres for tea cultivation on 1.4.75. According to the District Gazetteer and Gruning's report the first garden was opened at Gazaldoba in Western Duars by Mr. R. Haughton in 1876, who was the pioneer of tea industry in the Darjeeling District, where it was started on a commercial basis from 1856. The District record shows that Dr. H. P. Brougham took the first lease of 996 acres in Gazaldoba on 16.2.1876. He opened a tea garden in this area employing one Tichard Haughton who appears to be the pioneer tea planter in the Jalpaiguri District.

Almost immediately afterwards, gardens were established at Fulbari and Bagrakote, and by 1876 thirteen gardens had been started, The China type of bush was first planted and it was not until sometime later that the greater merits of an Assam-China hybrid or Assam and Manipur indigenous varieties were realized.

Thus the first garden to start according to the District Gazetteer was Fulbari T. E. and Gruning's account of subsequent development is interesting. He writes :—

"Fulbari was the next place to be planted and was opened out by Late Mr. Pillans who gave his name to the market called Pillanshat and was owned by Col. Money. Bagrakote followed, opened out by late Mr. North and owned by Mr. S. Cresswell."

Apparently the last mentioned gentleman is Mr. W. S. Cresswell who started many more gardens in the Dooars and subsequently started the renowned Firm of M/s. W. S. Cresswell & Company.

1876. In the year 1876 six leases were issued including those for Fulbari, Gazaldoba, Bagrakote and Dalimkote and Rangatee.

1877. 1877 was a remarkable year, for in this year the first Indian to take a lease was Munshi Rahim Baksh, who apparently utilising his position as Peshkar of the Deputy Commissioner induced the "Saheb" to allow him a grant for the purpose of cultivation of tea and this was the Jaldhaka Grant taken on 17.8. 1877 for 728 acres. In 1877 Baintbarrie, Bamandanga, Ellenbarrie, Dam Dim, Kumlai and Washabarrie tea estates were started. At this time one Mr. Shillingford and his family came into picture. They were responsible for starting many a garden.

1878. In 1878 more tea estates came into being and an interesting venture was the grant taken by Mr. Johnson on behalf of Land Mortgage Bank. This was known as Kalabari Grant for 800 acres taken on 9. 3. 1878. Subsequently this grant was passed on to Dr. Nilratan Sarkar, the then eminent physician of Bengal and Smt. Sarojini Ray. It appears that Dr. Sarkar and Smt. Ray could visualise the "shape of things to come." In 1878 Good Hope, Ranicherra, Manabarrie, Balabarrie, Altadanga, Money Hope (Fulbari), Chael and Patabari grants were taken. An interesting event at this time was that one Babu Kali Mohan Ray and Smt. Durgabati Sen somehow got Altadanga Grant of 310 acres on 19. 9. 78; but very soon they transferred it to one Shri Beharilal Ganguly. The latter passed on the grant at a subsequent date to the Jaldhaka Grant taken by Munshi Rahim Baksh. A yearwise list of Tea Gardens established, as could be found from the District Records, is given in *Annexure* to this account.

1879 is a landmark in the history of Tea venture by Indians. Joint Stock Companies were formed in Jalpaiguri for the cultivation of Tea. Late Bhagwan Chandra Bose, father of the illustrious Scientist Late Sir J. C. Bose, posted as Deputy Magistrate in Jalpaiguri just after the district was born, took great initiative in the formation of tea gardens.

The First Indian Company

The grant of the table lands in the Dooars to the Europeans for the purpose of establishing tea estates and successful opening of tea plantations by them made Sri Bose think as to whether the Indians could venture in this field. To get a Tea Lease, an applicant must satisfy that he had capital at his disposal, and he would have to deposit the cost of surveying the land calculated at Re. 1/- per acre and thereby get a preliminary lease for 5 years (it being rentfree for the first year). Thereafter a Thirty-years Lease was granted. Late Bhagwan Chandra Bose thought that Indians should come in. The first Indian Tea Garden—Mogalkata was started in 1879, though actually the Company got a grant for 741 acres on 9. 3. 1881. The preliminary arrangements for the formation of the Company by the Indians and management thereof are interesting. These will be found in detail in Mitra's Census Report.

The First General Meeting of the shareholders was held on the 2nd June, 1879 and the first and second meetings of the Directors on the 4th June and 3rd July respectively. The first Tea Company was named the JALPAIGURI TEA CO. LTD. The names of shareholders and directors present in the said meetings are given below :-

The First meeting of Jalpaiguri Tea Co. Ltd.,

Chairman—Shri Jay Chandra Sanyal

Present—Shri Mahim Chandra Ghose

Shri Gopal Chandra Ghose

Shri Jay Chandra Sanyal

Shri Keshab Chandra Ghatak

Shri Ram Chandra Sen

Shri Harish Chandra Adhikari

Shri Jadav Chandra Chakravorty

Shri Madan Mohan Bhowmick

Munshi Asiruddin Mohammed

The First Half-yearly meeting dated 13. 7. 79.

First Directors : Shri Srinath Chakravorty

Shri Jay Chandra Sanyal

Shri Gopal Chandra Ghose

Shri Mahim Chandra Ghose

Shri Jadav Chandra Chakravorty

First Secretary : Shri Umanath Chakravorty on a monthly salary of Rs. 20/-

First Manager :—Salary Rs. 50/- to Rs. 75/-

(Mr. Lucas, the first Superintendent was paid Rs. 150/-)

In 1879 ten other Tea grants were actually issued, viz. :

1. Rupnee
2. Soongachi (I) & (II)
3. Bamandanga (Extension)
4. Washabarrie (I) (Extension)
5. Monabarrie (Extension)
6. Balabarrie (I) (Extension)
7. Nagrakata
8. Ellenbarrie (II) (Extension)
9. Bagrakote (VII) (Extension)

Some of the grants, as the figures show, were the second or subsequent grants to the Estates already established and it would now appear that the plantation which started on the bank of the Teesta River had covered Dam Dim and Mal area and by now, had reached Nagrakata area.

1880 & 1881. 1880 was a comparatively quiet year and in this year only the first Thirty-Years Lease of the grants given in 1876 were issued. In 1881 altogether ten grants were issued, but apparently the new gardens started were Hahaipatha, Oodlabari, Bytagool and Neora Nuddy.

1882. In 1882 two Indian ladies Bibi Meherunnessa and Bibi Gulabjan took a grant for 777.82 acres in Chengmari Taluk and here is an evidence of efforts made by the Indian ladies but subsequently the efforts failed and the grant was transferred in 1888 to one Mr. J. Anderson who had taken it really for Carron Tea Co. Ltd. Being emboldened by their earlier success the same promoters of Jalpaiguri Tea Co. Ltd. established Northern Bengal Tea Corporation in Jalpaiguri, and Needam Tea Estate was started, the other garden started in the year being Carron (Mujnai grant).

1883. After a lull in 1883 when only Toonbarrie was started, there was a lot of activities in 1884. There was an effort by two Indians, Babu Chandra Kanta Das and Babu Prasanna Kumar Das to start two Tea Gardens by virtue of Youngtong Grant and Chalauni Grant. But being unable to start the Tea Estate they transferred the grants to the Chalsa Tea Co. Ltd and Chalauni Tea Co. Ltd. Babu Beharilal Ganguly, Mahim Chandra Ray and Jagat Chandra Roy made big efforts by taking a grant of 758 acres, but failing to establish a Tea Garden, soon relinquished the grant. As already stated, Shillingford family played an important role and by this time they took a number of grants in the Mal, Chalsa and Nagrakata areas. The activities of the Needam Tea Co. Ltd., Aibheel Tea Co. Ltd. and Matelli Tea Co. Ltd. increased at this time. North Sylhet Tea Co. Ltd., also came into picture; but it appeared that some of the gardens started by them were soon transferred to others. The gardens established in the year 1884 are :—

Young Tong	Needeem
Chalouni	Matelli
Nagaisuree	Chulsa
Ingo	Alston (Needeem Tea Co. Ltd.)
Zurrantee	Sundree
Moortee	Banks } (Needeem Tea Co. Ltd.)
Aibheel	Sylee }
Kilcott	Meenglass

Round about this time the activity of Duncan Brothers in Tea started and they established Meenglass in 1884, Hope in 1885, Jiti and Chalauni in 1886.

1885. In 1885 though 16 grants were issued (of which one was resumed,) only seven new gardens were actually started viz :—

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Baintguri | 5. Kurti |
| 2. Rangakotte (Bagrakote) | 6. Indong |
| 3. Chengmari | 7. Chapaguri (Nedeem Tea Co. Ltd.) |
| 4. Nakhati | |

1886. In 1886 besides Jiti and Chalouni, a number of Tea Estates was started of which one was by Bibi Rahimannessa, wife of Munshi Rahim Baksh—the Estate was known as Mal Nuddy with 329 acres of land. In this year also the Northern Bengal Tea Corporation

succeeded in getting a pucca Lease in lieu of the preliminary five-years Lease. The other Indian Garden that was started in this year was Gurjanghore Tea Co Ltd., which took a grant of 799.34 acres on 21. 5. 86. Rangate and Forest Hill (Nedeem Tea Co.), Nagrakata, Spring Field, Sukanbari (Duars Tea Co. Ltd), Hope, Bhagatpur, Looksan, Gatia and Tondoo were the other Tea Estates started in this year. One Babu Benode Behari Dutta took a grant for 600 acres but was unable to husband the resources and ultimately these grants passed on to the promoters of the Dooars Tea Co. Ltd.

1887. In 1887 Patharjhors T. E. and the Glencoe T E. were also started.

1888. In 1888 Munshi Rahim Buksh, emboldened by his earlier success, took Kujih Grant of 468 acres in Chengmari Taluk but this time he failed to get his resources and the grant passed on to Carron Tea Co. Ltd a year later. The Huldibari T E. was started in this year. An interesting account of the activity of Duncan Group at about this time is reproduced from the Duncan Century Story :—

“At about this time several planters in the Dooars (Mr. Fischer being among them) had secured various grants of land which later become known as the Chalouni Tea Estate and had begun to lay out to the extent of about 50 acres. On hearing this, and obtaining information as to the character of the soil, the Calcutta resident partners in the firm proposed to take over the property with the agency. This was agreed to by the planters. Nothing was done, however, for some months as the attitude of Glasgow was known to be unfavourable to further extensions. But when Mr. Walter Duncan visited India at the end of 1886 he was so impressed with Chalouni when he saw it that he bought all the shares then available in the Company which had been started. Before doing so he had been to Cachar and he was therefore in a position to compare the new property with the gardens in that district.

Carron Tea Estate, which was secured in 1887-88, was originally a grant called Chua Patang taken up by a native of Jalpaiguri. It lies to the east of Hope and at the time was said to be obtainable for Rs. 10,000/-, but nobody seemed to have made a bid for it. Mr MacGregor was visiting Hope at this time and Mr. Fischer, the manager of that garden, met him at Jalpaiguri. On the way they called at Bhogotpore and in course of conversation the manager mentioned that his Calcutta agents had bought the place. The correctness of this statement was doubted by Mr. MacGregor and he despatched a messenger to Jalpaiguri to enquire from the Vakil who had taken up the grant if it were still available. On the evening of the third day the messenger came back with the reply that it was still on the market. So on his return journey to Calcutta Mr. MacGregor met the Vakil at Jalpaiguri and told him that he would wait until he (Mr. MacGregor) had reached Calcutta. The vakil agreed and the grant was secured by telegram. It was then floated as a limited Company under the name of Carron, with the hope that it would be as lucky as the Carron Company after which it had been named. This, it may be mentioned, was the well-known iron company incorporated by Royal Charter at Carron near Falkirk in Stirlingshire and which had evidently achieved considerable success by 1888 the founder of the firms was resident in the neighbourhood.

Another garden, Nagaisuree, was brought into the Agency in 1888. It consisted of five grants with 2,724 acres, of which about 400 had been planted. The purchase price was Rs. 1,50,000/-. Nagaisuree belonged mainly to the Shillingford family and Mr. Henderson secured it through Mr. Geo. Shillingford, the Managing Proprietor.

Advent of Indians in the Tea industry

The pioneers were :—

1. Peshkar Rahim Baksh
2. Srinath Chakravarty
3. Gopal Chandra Ghose
4. Joy Chandra Sanyal
5. Srinath Roy
6. Jadav Chandra Chakravorty
7. Hridaya Nath Bagchi
8. Tarini Prasad Ray
9. Munshi Abdul Hamid

How far the Indians in Jalpaiguri, specially the Bengalees, with their slender means advanced in tea cultivation from 1879 to 1910 will be apparent from the progress of the following eleven tea companies.

Original Capital.	Present Capital.	Name of the Company	Year of origin	Gross acreage under tea.
50,000	7,00,000	Jalpaiguri Tea Co. Ltd.	1879	1495/560
1,00,000	4,00,000	Northern Bengal Tea Co. Ltd.	1882	898/520
85,400	8,41,600	Gurjanghora Tea Co. Ltd.	1882	800/612
2,25,000	7,75,000	Anjuman Tea Co. Ltd.	1889	4026/1112
50,000	5,00,000	Chamurchi Tea Co. Ltd.	1891	2190/877
75,000	7,87,500	Katalguri Tea Co. Ltd.	1895	2325/778
75,000	5,00,000	Chuniajhora Tea Co. Ltd.	1896	1834/512
75,000	5,25,000	Atiabari Tea Co. Ltd.	1900	1823/1034
1,30,000	8,97,000	Ramjhora Tea Co. Ltd.	1907	1522/858
1,35,200	10,81,000	Devpara Tea Co. Ltd.	1909	1500/900
1,24,200	4,96,800	Diana Tea Co. Ltd.	1910	1250/690
<u>11,24,800</u>	<u>75,03,900</u>			<u>19,663/8453</u>

Of the gardens owned by individuals, Munshi Rahim Bux (later on 'Khan Bahadur') extended his Jaldhaka grant by further addition of 115 acres. The Shahas of Amla Sadarpur (Nadia) established Totapara Tea Estate in 1892. In the year 1896 Munshi Rahim Bux started Rahimabad Tea Estate in Alipurduar Sub-Division. The Saha family of Amla-Sadarpur

started Ambari Tea Estate in 1908. By the year 1909 a few Bengalee gentlemen of Alipurduar started Turturi Tea Estate.

A very interesting account of the growth of tea industry in Jalpaiguri is to be found in Jalpaiguri Gazetteer by J. P. Grunning written in 1911.

Parts of the accumulated profits went to increase the capital in the form of bonus shares issued to the shareholders. Subsequently, more lands were brought under cultivation and the area under tea increased considerably.

During the period 1911 to 1924 some more tea companies in Jalpaiguri came into being. Tea Estates in Assam and in the Terai of Darjeeling District were also opened by the Jalpaiguri people.

In 1912-13, the gardens named Gour Nitai, Monmohinipur, Halmari and New Assam in Assam and Sukna in the Terai were opened by the Jalpaiguri people. In 1917 Merry View Tea Co. was started with its garden in the Terai. In the Baikunthapur Zamindary Danguajhar, the only European managed tea estate, was existing but the Zaminder Prasannadev Raikut agreed to have more tea estates within his Zamindary. Thus in 1917 Saraswatipur, and Karlavalley were opened. In 1919 Bhandiguri of Good Will Tea Co. was started. The Zaminder himself started Shikarpur and Bhandarpur Tea Estates of his own. In the Duars, Devpara Tea Estate was started in 1918, Diana and Dheklapara were also started in the same year. In 1912 five tea companies in Jalpaiguri were registered e.g. Bengal Duars National Tea Co. Ltd., The Eastern Tea Co. Ltd., Gopalpur Tea Co. Ltd., Khayerbari Tea Co. Ltd., and Kohinoor Tea Co. Ltd.

Bengal Dooars National Tea Co. Ltd. purchased 1593.15 acres of land near the river Dhawla in Alipur Duar Sub-Division of Jalpaiguri, and the garden was called Dhawljhora Tea Estate. Khayerbari Tea Co. Ltd. sponsored by the Neogi and Bagchi families of Jalpaiguri, purchased some lands in Khayerbari Mouza near Madarihat of Jalpaiguri. Tea plantation on this land proved a failure. Then the Company purchased some lands in Mimiti-Domohani area in Alipurduar and started tea plantation there. Hence although the name of the Company was Khayerbari, the name of the garden was Mimitijhora.

The Eastern Tea Co. Ltd. purchased some lands with tea plantation in Malbazar area and planted more tea there. But subsequently the river Tista advanced into the plantation so much so that the garden had to be abandoned. Another plot of land in Aphalchand Forest area under Malbazar was secured and Kailashpur Tea Estate came into being through the efforts of the Rahut family.

Sri Gopal Chandra Ghose of Gopalpur Tea Company bought some lands in the Duars and established a first class tea estate there which afterwards developed to a great extent through the efforts of Sri Jogesh Chandra Ghosh.

Palashbari Company purchased some lands in Banarhat area and planted tea there in 1912 with Sri Sasi Kumar Banerjee at the helm of affairs. In the same year Waliur

Rahaman, a local pleader of repute, started Reabari Tea Estate in Banarhat area. The Pal Choudhuris of Nadia started Radharani Tea Estate in Alipurduar Sub-Division.

In 1913 some lawyers of Alipurduar started Patkapara Tea Estate. The people of Jalpaiguri started plantations in Dhowlajhora in 1915 and in Kohinoor in 1916.

Saroda Tea Co. Ltd. was started mainly by Sri Tariniprosad Ray in 1917 by the acquisition of a large plot of land in Alipurduar Sub-Division and this became the biggest tea estate amongst the gardens of Bengali Tea Planters. In 1922, Alipurduar entrepreneurs started Turturi Tea Estate.

From 1924 to 1930

Bijonagar Tea Estate was started in the Terai in 1924 and Malhati in the Duars in 1926 ; Kadambini and Luxmikanta in 1930 and Soudamini in the Duars in the same year, all through the efforts of Jogesh Chandra Ghose.

In 1924 Anandapur Tea Estate was started by the Rahut family of Jalpaiguri on their own lands as a private enterprise.

In 1925 Ratabari and in 1927 Nipuchapur Tea Estates were started in the Duars through the endeavours of Makhleswar Rahaman.

In 1925 Jadavpur Tea Estate was opened in the Duars through the initiative of Sri Makhan Lal Chakravorty of this town.

In 1928 Diabari Tea Co. Ltd. started the Madhu Tea Estate in the Alipurduar Sub-Division with Sri Tariniprosad Ray at the helm.

In 1929 Rahimpur Tea Estate was started by the renowned Rahaman family of this town. Mr. M. L. Rahaman and Sir F. Rahaman were the pioneers.

In 1929 Jahwri Babu, an ex-employee of Dalsingpara Tea Estate started a small tea estate named Gopimohan Tea Company at the Jalpaiguri-Bhutan border.

The Red Bank Tea Estate was started in 1921 but being unprofitable it was sold to Shri D. N. Bhowmick of this town. He has made it nice and profitable.

Difficulties of the Bengali pioneers.

The first settlers of this town of Jalpaiguri were mostly lawyers. They were men of small means, but with indomitable energy, honesty of purpose and ready to undergo any hardship. Following the example of the European tea planters they mooted the idea of starting tea industries in the Duars. Europeans were then the masters of India and the Bengali entrepreneurs naturally had to cross many hurdles. But that could not slow the speed of the run. They started with very small capitals which they could gather as none could subscribe a large portion of the capital. Practically it was an association of poor men determined to do a big thing. With the progress of plantation more money was required and these men did not hesitate to pledge their belongings in order to secure money to develop the industry. Duars was then terribly plagued by malaria, which took a considerable toll every year. Drinking water was scarce,

only a few hill streams being available for the supply. Ferocious denizens of the forests wrought havoc in the gardens. Roads were few. Thus not only money but many lives had to be sacrificed to bring the tea industry in the Duars to its success. Many entrepreneurs e.g. Jatin Chandra Chakravorty, Satish Chandra Lahiri, Purna Chandra Das, Jagat Bandhu Sarkar and a host of other risked their lives to secure lands for the tea estates. But many of them have now passed into oblivion.

The names of second batch of Indian pioneers are given below :—

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Akshaya Kumar Basu | 11. Abdul Rahim |
| 2. Gagan Chandra Biswas | 12. Mushraff Hossain (later Nawab) |
| 3. Bhawani Charan Ghattak | 13. Janoki Nath Saha |
| 4. Sasi Kumar Banerjee | 14. Adhar Chandra Saha |
| 5. Rashik Chandra Chakravorty | 15. Bhagwan Chandra Saha |
| 6. Ganga Govinda Sen | 16. Kalinath Saha |
| 7. Waliur Rahaman | 17. Kedar Nath Saha |
| 8. Sasi Kumar Neogie | 18. Bipradas Pal Choudhury |
| 9. Abdul Hamid | 19. Devendra Chandra Sen |
| 10. Salimuddin Mahammad | |

The third group of entrepreneurs were :—

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Kumud Nath Karmaker | 9. Srinath Hore |
| 2. Jogesh Chandra Ghose | 10. Rajendra Kumar Neogie |
| 3. Taraprosad Biswas | 11. Abinash Chandra Ray |
| 4. Jay Govindo Guha | 12. Tarak Nath Karmakar |
| 5. Ganga Nath Bagchi | 13. Nurul Hossain |
| 6. Annada Charan Sen | 14. Ganesh Chandra Sanyal |
| 7. Sureswar Sanyal | 15. Karimuddin Ahmed |
| 8. Purna Chandra Ray | 16. Bishnu Prasad Misra |

Some names may have escaped as all names are not available after such a long lapse of time but their deeds are still alive and inspiring to the posterity.

It would be in the fitness of things if the names of the earliest managers of Tea Estates were mentioned. Some of them are named below; none of them are now living but the fruits of their efforts still exist :—

1. Umesh Chandra Neogie of Kathalguri Tea Estate.
2. Narendra Nath Sarkar of Kathalguri Tea Estate.
3. Paresh Chandra Mukherjee of Chamurchi Tea Estate.
4. Md. Abdul Mazid of Chamurchi Tea Estate.
5. Radhika Pandit of Totapara Tea Estate.
6. Haranath Chakravorty of Atiabari Tea Estate.
7. Ambica Charan Sen of Makrapara Tea Estate.

8. Indra Kumar Sarkar of Makrapara Tea Estate.
9. Girija Nath Choudhury of Gopalpur Tea Estate.
10. Aswini Kumar Pandit of Gopalpur Tea Estate.
11. Rakhal Bose of Ramjhora Tea Estate.
12. Upendra Nath Choudhury of Ramjhora Tea Estate.
13. Lalit Behari Ghose of Sarada Tea Estate.
14. Hara Kumar Chakravorty of Mujnai Tea Estate.
15. Rajani De of Mujnai Tea Estate.
16. Jamini Kumar Bose of Mujnai Tea Estate.
17. Sasadhar Mukherjee of Nedam Tea Estate.
18. Srigopal Mukherjee of Nedam Tea Estate.
19. Ratneswar Das Gupta of Ambari Tea Estate.
20. Radhika Mohan Majumder of Ambari Tea Estate.
21. Kedar Nath Sarkar of Devpara Tea Estate.
22. Abani Mohan Bose of Devpara Tea Estate.
23. Tarak Nath Biswas of Saraswatipur Tea Estate.
24. Birendra Nath Neogie of Madhu Tea Estate.
25. Jadu Nath Chanda of Bhandiguri Tea Estate.
26. Monmohan Chakravorty of Dhawljhora Tea Estate.
27. Ashutosh Bhattacharjee of Kohinoor Tea Estate.
28. Ambika Charan Basu of Gurjangjhora Tea Estate.
29. Munshi Badar-Uddin Ahamed of Gurjangjhora Tea Estate.
30. Barada Nath Das of Palashbari Tea Estate.
31. Kamaksha Mukherjee of Joypur Tea Estate.
32. Kamini Mohan Ghose of Malhati Tea Estate.
33. Chand Mia of Sukna Tea Estate.
34. Prasanna Ghosh of Sukna Tea Estate.

The early environments of the Duars Tea Estates :

In the early days no university educated men were available to work in tea gardens. But the so called uneducated managers and planters built and made the gardens prosperous. No qualified doctors could be found. Doctors were manufactured *in situ* by training intelligent officers in the rudiments of medicine. So afterwards a doctor could become a garden manager. At that time the relation between the European and Indian managers was very cordial and mutual help was practically the custom. The language bar did not stand in the way. From the year 1921 a few graduates entered into tea cultivation work and some of them rose to eminence as planters. Duly qualified engineers could not be found to look after the machines. A few home-made mechanics somehow kept the machines going. Later on, a few men, passed from the Bengal Technical Institute of Calcutta, took jobs in the tea estates and did very well. Some of them became managers in later years. After the Second World War, malaria in the Duars practically disappeared, mostly due to the intensive

antimalaria work of the military. Unemployment amongst the educated has mounted up. So university educated men are now taking jobs in the tea estates. Now there is hardly any terrible disease ; there are many hospitals and highly qualified doctors. Tarmac roads have run past many tea gardens ; regular transport, telegraph and telephone connections, regular supply of newspapers and last of all, the radios have given the Duars all the facilities of an urban life.

Labour force :

When these tea gardens were set up the population of the Duars was very thin. The local people had plenty of land and were engaged in food cultivation. They loved easy life. So local men were not available for the arduous job of tea plantation and these people did not like to experience the life of a labourer in an industry. So labour force had to be recruited from outside. Both the European and Indian tea planters had to do this. In a few years the number of tribal people from Bihar, Madhya Pradesh, Madras, Nepal and Terai began to increase and now their number is considerable. Formerly the labourers used to go home after the term of contract—they were repatriated. But now they have settled in the Duars permanently and are swelling in numbers giving rise to a host of new problems. After Independence labour Unions have grown up. But instead of peaceful collective bargaining they have resorted to strikes, go-slow movements and forced agreements between the employers and the employed. Political parties are getting hold of the labour unions.

Land settlement in the Duars :

There are several types of land tenures. The old Mal can be alienated at will. The new Mal requires a formal permission to sell. 'D' Form—The land for general cultivation and where sub-tenants can be settled requires a permission to sell. 'A' Form—land for the actual tillers which should not exceed twenty-five acres per family. This land is expressly reserved for actual cultivation. 'Tea Grant'—this a tea grant with a lease for thirty years which should be renewed in perpetuity. But the Government reserves the right to fix the rent, provided that it shall not be less than twelve annas per acre on the entire land. In Maynaguri Tahsil the rent was two rupees per acre on tea land and it was the lowest in Bhalka Tahsil. This fixation of land revenue has been revised lately increasing the rent enormously.

Management—then and now :

In the early days the highest holding of a person or a family was never more than Rs. 2500 or Rs. 5000 of the face value of shares—nearly 5% to 10% of the capital. From the year 1912 the holding per person or family increased so much that the highest holder had the biggest voice in the management ; it came to 25% to 30% of the capital. During 1919-20 Managing Agency came into being. The highest holding went upto about 35%. There was further concentration of capital. From 1950 onwards it went upto 40% to 51% of the capital. Although in 1967-68 Managing Agency was abolished, the amendment of the Company's Act favoured more concentration.

In the early days the number of small holders was many and so the profits were distributed among many and thus many people were interested in the industry. As concentration of capital started, less and less people got interested and the baneful effect is being felt.

Old Memorandum of the companies reveals how the then management tried to control the voting rights. They stipulated that there should be one vote per share upto twenty shares, upto 20 to 100 shares 5 shares will have one vote and above 100 shares ten shares will have one vote. But after Independence the amendment of the Company's Act provided that there should be one vote per share irrespective of the holding. As a result monied people are buying 51% shares and getting the entire control of the management reducing the holders of 49% shares as helpless spectators. After this amendment, management of the companies is changing hands and the monied people are getting the greatest benefit.

Plantation labour laws :

The laws have given large benefit to the labourers and there has been considerable increase of wages and comfort. But the efficiency in quantity and quality is not commensurate with the benefits given. The cost of production has gone up enormously and the industry itself has been faced with a crisis. Something must be done to keep this industry in a prosperous condition.

Tea Associations :

The Indian Tea Association was started at Calcutta with the Managing Agents on behalf of the Companies floated outside India. The European Managerials started Duars Planters Association in 1880. Afterwards it was named Duars Branch of Indian Tea Association. The list of Chairmen of this Association has been given in the Appendix.

The Indian planters of Jalpaiguri started their own Association in 1919 and got it registered under the Societies Act XX of 1860. The first Chairman was Sri Tarini Prasad Ray, the first Vice-Chairman was the Hon'ble Aminur Rahman and the first Secretary was Sri Jyotish Chandra Sanyal. Slowly it made its existence felt in the tea industry and the then British Government recognised this association as the only mouthpiece of the Indian Tea Planters.

The list of office bearers is given in the Appendix.

A table of the wages and earnings has also been appended for those interested.

A chronological list of tea estates has also been inserted in the appendix for ready reference.

Ups and downs of tea trade :

Tea is an international commodity. The British in India at first mooted the idea of producing tea in India and selling it to international market, specially in England. From 1870 to 1910 the British were the masters of the sea and the trade passed on smoothly in spite of small rifts in the international peace. The planters were content to produce eight to ten maunds of tea per acre and happy with the price it fetched. The cost of production was near about three to five annas per pound and the sale price was about four to eight annas according to quality.

In 1914 a terrible war called the First World War, engulfed the whole of Europe and lasted for the bitter four years. Trade was disrupted to a great extent. There was a stock-piling of tea to serve the army. As the war suddenly closed the stock could not be disposed of, while produced tea added to the stock every year. Like all other capitalistic productions tea also had periods of boom and slump.

During the said war tea market rose and there was a boom so great that a tea company in Jalpaiguri paid 364% dividend to the shareholders. But after the war, depression set in and it reached its nadir during 1926-1933. A patched up agreement saved the industry for the time being but the cost of production began to rise and the spectre of another slump cautioned the planters. The tea industrialist harnessed the brains of the scientist in a research station in Assam to find out ways and means to increase the production per acre and improve the quality. After many years Indian Planters of Jalpaiguri started a research station at Mal but had to close down after a brief period as the Indian Tea Research Association was created by the free Government of India for the same purpose.

The second and the more devastating world War was preceded by a boom and as usual followed by a slump. Thus the political situation of the world has a great impact on tea trade.

Now the consumption of tea in India is rising rapidly but the cost of production has also gone up to Rs. 3.50 to Rs. 4.00 per kilo and the external market price hovers between Rs. 5/- to Rs. 6/- and the internal market sometimes falls below the cost of production. The slump is becoming a continued process.

There has been a further attempt by the scientists to 'Clone' cultivation of tea to produce 40-50 kilos of tea per acre and to improve the quality necessitating the cultivation of less acreage—this will bring down the cost of production.

Tea is the only industry worth the name in the district of Jalpaiguri.

Impact of tea on the economy and culture of Jalpaiguri :

The common people of Jalpaiguri derived some income from the tea companies and tea estates either as shareholders or as suppliers, contractors etc. The industry employed many educated persons and a host of labourers. All this resulted in the general prosperity of the people. So the cost of living in this district was much higher than that in many other districts of Bengal.

As for cultural development, the numerous schools including the defunct Jackson Medical School, Colleges of various descriptions, which grew up in this town and district had the primary funds collected from the tea industry. The Opera houses, play grounds, clubs, libraries drew their sustenance from the funds of tea industry. Medical literary, political, musical and other cultural conferences held in this district, were mainly patronised by the tea industry. In fact, true urbanisation with all facilities in the town and sub-division was mainly the product of money and men of the tea industry.

With the passing of time the people seem to have been divided into sections with conflicting interests and concerted action is becoming a remote possibility, while it is good to remember that the promotion of Tea Industry was the out come of concerted action.

APPENDIX
DOOARS PLANTERS' ASSOCIATION
and

• DOOARS BRANCH INDIAN TEA ASSOCIATION

List of Chairmen from 1907 to 1968

A. W. C. Chaplin Esqr.	Sam Sing T. E.	1907
W. Alston Esqr.	Matelli T. E.	1908
A. W. C. Chaplin Esqr.	Sam Sing T. E.	1909
The Hon'ble Mr. A. W. C. Chaplin	"	1910
The Hon'ble Mr. A. W. C. Chaplin	"	1911
The Hon'ble Mr. A. W. C. Chaplin	"	1912
G. F. Stoddart Esqr.	New Glencoe	1913
W. L. Travers Esqr.	Baradighi	1914
W. L. Travers Esqr.	"	1915
W. L. Travers Esqr.	"	1916
W. L. Travers Esqr.	"	1917
W. L. Travers Esqr.	"	1918
W. L. Travers Esqr. O. B. E	"	1919
Sir W. L. Travers Kt. C.I.E., O.B.E.	"	1920
G. L. Haig Esqr.	Kumlai	1921
C. Bateman Esqr.	Sathkyah	1922
C. Bateman Esqr.	Sam Sing	1923
G. E. Laurd Esqr.	Choonabhutti	1924
C. Bateman Esqr.	Sam Sing	1925
C. Bateman Esqr.	"	1926
G. E. Laurd Esqr.	Choonabhutti	1927
G. E. Laurd Esqr.	"	1928
G. L. Haig Esqr.	Kumlai	1929
F. M. Graham Esqr.	Hantapara	1930
G. E. Laurd Esqr.	Choonabhutti	1931
F. M. Graham Esqr.	Hantapara	1932
F. M. Graham Esqr.	"	1933
F. M. Graham Esqr.	"	1934
J. Edmond Esqr.	Good Hope	1935
F. M. Graham Esqr.	Hantapara	1936
F. M. Graham Esqr.	"	1937

F. M. Graham Esqr.	"	1938
Geo. McIntosh Esqr	Gargada	1939
" " "	Hantapara	1940
Geo. McIntosh Esqr. E.D.	"	1941
" " " "	"	1942
" " " "	"	1943
" " " C.B.E., E.D.	"	1944
A. Johnson Esqr.	Baradighi	1945
A. Johnson Esqr.(Upto 31st Oct, 1946)	"	1946
R. H. Rankin Esqr.	Dalmore	1946
G. E. Normington Esqr. (From 14th April' 47	Bundapani	1947
G. E. Normington Esqr.	"	1948
W. D. Simpson Esqr.	Telepara	1949
G. Kydd Esqr.	Ethelbari	1950
Guy Carlton Esqr. (From 25th Feb. to 30th April 1951)	Chuapara	1951
N. B. Haggart Esqr.	Sam Sing	1951
N. B. Haggart Esqr.	"	1952
Guy Carlton Esqr.	Chuapara	1953
J. A. D Wilkins Esqr.	Huldibari	1954
Guy Carlton Esqr.	Chuapara	1955
J. P. Shaw Esqr.	Dam Dim	1956
K. R. Standing Esqr. (upto 1st April, 1958)	Killcott	1957
*G. A. Verinder Esqr. (from 2nd June' 58)	Toorsa	1958
G. A. Verinder Esqr.	Dalsingpara	1959
D. J. Stradwick Esqr.	Jiti	1960
J. A. D. Wilkins Esqr.	Huldibari	1961
J. G. Gay Esqr.	Kalchini	1962
H. K. T. Turner Esqr.	Ghatia	1963
G. E. Stevenson Esqr.	Ranicherra	1964
F. G. Turner Esqr.	Lankapara	1965
F. H. Stroud Esqr.	Chuapara	1966
R. Fraser Esqr.	Meenglas	1967
A. S. Bruce Esqr. A.C.	Sam Sing	1968

*From 1st April until 1st June, 1958, the Office of the Chairman was administered by the Secretary Mr. F. H. Stevens, O. B. E.

INDIAN TEA PLANTERS' ASSOCIATION, JALPAIGURI

List of Office-bearers from 1930 to 1964

Year	Chairman	Vice-chairman	Secretary
1930 to 1933	Sri T. P. Ray	Sri J. C. Ghose	Sri Biraj Kr. Banerjee (Hony. Secretary) Sri Debes Ch. Ghose (Hony. Jt. Secy.)
1934 to 1942	do	Rai J. G. Guha Bahadur	do
1943 & 1944	do		Sri D. C. Ghose (H.J.S.) „ B. C. Ghose (H. ADDL. S.)
1945 & 1946	do	Sri Biraj K. Banerjee „ Debes Ch. Ghose „ N. R. Ghose	Sri B. C. Ghose (H. S.) „ Bhaba Kr. Banerjee (H.J.S.) „ S. P. Ray (H.A.S.)
1947	do	do	Sri S. P. Ray (H.S.) „ Bhaba K. Banerjee (H.J.S.) „ A. B. Ray (H. A. S.)
1948 & 1949	Sri Biraj K. Banerjee	Sri B. C. Ghose (svc)* „ Bhaba K. Banerjee „ C. C. Sanyal	Sri S. P. Ray (H.S.) „ A. B. Ray (H.J.S.) „ Sukumar Neogi (H.A.S.)
1950	do	Sri B. C. Ghose (svc) „ C. C. Sanyal „ S. P. Ray	Sri Bhaba K. Banerjee (H.S.) „ A. B. Ray (H.J.S.) „ K. K. Rahut (H.A.S.)
1951	Sri B. C. Ghose	Sri S. P. Ray (svc) „ A. B. Ray KB G. Kibria	Sri Bhaba K. Banerjee „ S. K. Banerjee (H.J.S.) „ K. K. Rahut (H.A.S.)
1952	Sri S. P. Ray	Sri L. C. Ghatak (svc) „ A. B. Ray KB G. Kibria	do
1953	Sri L. C. Ghatak	Sri Bhaba K. Banerjee (svc) „ A. B. Ray KB G. Kibria	Sri K. K. Rahut (H.S.) „ S. K. Banerjee (H.J.S.) Sri P. B. Saha (H.A.S.)
1954	Sri Bhaba K. Banerjee	Sri N. R. Ghose (svc) „ N. N. Karmakar „ S. P. Ray	Sri K. K. Rahut (H.S.) „ P. B. Guha (H.A.S.) „ S. K. Banerjee (H.A.S.)
1955	Sri N. R. Ghose	Sri C. C. Sanyal (svc) „ N. N. Karmakar „ S. P. Ray	do
1956	Sri C. C. Sanyal	Sri N. N. Karmakar (svc) „ S. P. Ray. „ K. K. Rahut	Sri P. B. Guha (H.S.) „ S. K. Banerjee (H.J.S.) „ A. C. Ray (H.A.S.)

*SVC (Senior Vice-chairman)

1957 Sri N. N. Karmaker	Sri K. K. Rahut (svc)	
	„ B. C. Ghose	do
	„ I. Hossain	
1958 Sri K. K. Rahut	Sri B. C. Ghose (svc)	Sri P. B. Guha (H.S.)
	„ I. Hossain	„ H. K. Neogi (H.J.S.)
	„ T. N. Ghatak	„ A. C. Roy (H.A.S.)
1959 Sri B. C. Ghose	Sri T. N. Ghatak (svc)	Sri A. C. Ray (H.S.)
	„ I. Hossain	„ H. K. Neogi (H.J.S.)
	„ P. B. Guha	„ D. N. Moitra (H.A.S.)
1960 Sri T. N. Ghatak (Died on 4. 9. 60) Sri I. Hossain	Sri P. B. Guha (svc)	Sri A. C. Ray (H.S.)
	„ N. R. Ghose	„ N. N. Bagchi (H.J.S.)
	„ R. Daga	„ D. N. Moitra (H.A.S.)
1961 Sri P. B. Guha	Sri R. Daga (svc)	
	„ N. R. Ghose	do
	„ S. P. Ray	
1962 Sri R. D. Daga	Sri B. C. Ghose (svc)	Sri D. N. Moitra (H.S.)
	„ A. C. Ray	„ N. N. Bagchi (H.J.S.)
	„ N. R. Ghose	„ A. B. Sarkar (H.A.S.)
1963 Sri B. C. Ghose	Sri A. C. Ray (svc)	
	„ S. P. Ray	do
	„ N. N. Bagchi	
1964 Sri A. C. Roy	Sri N. N. Bagchi (svc)	
	„ N. R. Ghosh	do
	„ S. R. Kalyani	
1965 Sri N. N. Bagchi	Sri S. R. Kalyani (svc)	Sri A. B. Sarkar
	„ D. N. Moitra	
	„ B. B. Ghosh	
1966 Sri S. R. Kalyani	Sri D. N. Moitra (svc)	Sri A. B. Sarkar
	„ B. B. Ghosh	
	„ N. R. Ghosh	
1967 Sri D. N. Moitra	Sri B. B. Ghosh	Sri A. C. Ray
	„ B. C. Ghose	
	„ R. D. Daga	

Recently the Tea Association of India has also started its activity in the Duars.

Conclusion

The Industry now supports 2½ lakhs of labour, 5 lakhs of people, earns about 30 to 40 crores of foreign exchange and covers a total cost of 75 crores and provides all sources of development for the Jalpaiguri District.

According to Tea Directory 1966 the following figures of Jalpaiguri District are of interest :—

1. Number of Tea Estate :— Sadar 88,	Alipurduar—61 : Total : 149.
2. Area of total Grant.	
Sadar : 159,317 acres	64,473 Hectares
Alipurduar 135,206 acres	54,717 Hectares
294,523 acres	119,190 Hectares
3. Area of the Tea under cultivation :	
Sadar : 80,803 acres	32,700 Hectares
Alipurduar 59,045 acres	23,895 Hectares
139,848 acres	56,595 Hectares
4. Jalpaiguri District production in 1966 : 149, 246, 612 lbs.	(67,839,369 kgs)
5. All India Production in 1966 : 822, 350, 848 lbs.	(373, 795, 840 kgs)

***Housing :**

The position in 1968 is given briefly by these figures :—

1. Houses required to be constructed for 153 gardens of Jalpaiguri District :	79,901
2. Houses constructed upto the end of the year 1967 :	41,929 (52.47%)
3. Houses still to be constructed after 1967 :	37,972 (47.53%)

*These figures have been compiled on the basis of figures available from the Housing Advisory Board, West Bengal. In these figures Gopimohan and Bholanath Tea Estates have been excluded as returns from them were not available to the Housing Advisory Board.

Number of Hospital Beds upto 31. 12. 1966

1 No. of workers.	2 No. of Hospital beds constructed upto the end of the year 1966.	3 Hospital beds required to be constructed as per P. L. Rules (15 beds per 1000 workers)	4 Hospital beds constructed over the requirement as per P.L. Rules.
1,15,493 D.B.I.T.A.	2,623	1,732	891
35,430 I. T. P. A.	759	531	228
<u>1,50,923</u>	<u>3,382</u>	<u>2,263</u>	<u>1,119</u>

It will thus be seen that more beds have been constructed than the requirements, the total number of beds are about three times of what exists to-day in the rest of the district.

All the Tea Estates are now approachable by good roads. Malaria which at one time was the biggest enemy of Dooars, is now almost conspicuous by its absence ; but the prosperity of Dooars gardens has been affected by the heavy pressure of Taxation.

WAGES AND EARNINGS.

The Rege Report (1945) gives the following description of the prevailing conditions :

“WAGES AND EARNING”

Piece - rate system

“Payment in Bengal plantations is generally on the hazira and ticca system. Though there is no standard hazira, the hazira rate for men, women and children in Dooars is 0-4-0, 0-3-0, and 0-2-0 respectively. Some gardens pay children 0-1-6. The hazira is usually completed in about 4 hours. When the first hazira is completed, a labourer can undertake a second task which is called doubli. Doubli is smaller than hazira but is paid at the same time rate as hazira. In the same way, a decreasing 3rd and even 4th tasks are theoretically possible, but in actual practice it was found that two tasks (one hazira and one doubli) were the usual output”.

“The hazira rate has not been altered for a good many years. Most of the gardens have, however, reduced the task since 1939 to enable workers to earn more”.

“Plucking is paid in the Dooars on the same hazira rate as for other works for a fixed weight of leaf plucked. This weight varies from 16 lbs. to 24 lbs. for men, from 10 lbs. to 20 lbs. for women, and 10 lbs. for children. Any leaf plucked over and above the first task is paid at the rate of 3 or 4½ pies per seer or 2 lbs.”.

TIME - RATE SYSTEM

“Such work as can not be formulated on a task basis is paid for on daily rates. The chaukidar, daffadar and others are also paid on a monthly basis”.

The chart below would show how the earnings have increased as years have passed.

WAGES & EARNINGS

PRESENT WAGE :

*Statement showing wage increase to labourers employed in tea estates
in the Dooars from 1939 to January, 1968.*

Year	Size of the Garden	Category of Workers	CASH EARNING							Total Cash Wage Rs. As.P.	Reference
			Basic Hazree As. P.	Wage Doubli As. P.	D. A. As. P.	C. C. As. P.	Ad hoc wage increase As. P.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1939	All gardens	Adult Male	4-0	4-0	—	—	—	0-8-0	Rege Committee's report		
		"Female	3-0	3-0	—	—	—	0-6-0	Page 77, 81		
		Children	2-0	2-0	—	—	—	0-4-0			
1941	do	Adult Male	4-0	4-0	0-6	—	—	0-8-6	Rege Committee's report		
		"Female	3-0	3-0	0-6	—	—	0-6-6	Page 81		
		Children	2-0	2-0	0-3	—	—	0-4-3			
1944	do	Adult Male	4-0	4-0	1-0	—	—	0-9-0	Rege Committee's report		
		"Female	3-0	3-0	1-0	—	—	0-7-0	Page 81		
		Children	2-0	2-0	0-6	—	—	0-4-0			
1945	do	Adult Male	6-0	6-0	—	—	—	0-12-0	I.T.P.A. Circular No. 96/48		
		"Female	5-0	5-0	—	—	—	0-10-0	Dated 26. 10. 46		
		Children	3-0	3-0	—	—	—	0-6-0			
1947	do	Adult Male	6-0	6-0	2-0	—	—	0-14-0	Halder Committee's report		
		"Female	5-0	5-0	2-0	—	—	0-12-0	Pages 9 and 10		
		Children	3-0	3-0	1-0	—	—	0-7-0			
1948	do	Adult Male	6-0	6-0	5-6	—	—	1-1-6	Halder Committee's report		
		"Female	5-0	5-0	5-6	—	—	0-15-6	Page 11		
		Children	3-0	3-0	3-0	—	—	0-9-0			
1951	do	Adult Male	6-0	6-0	7-0	—	—	1-3-0	Govt. of West Bengal Labour		
		"Female	5-0	5-0	7-0	—	—	1-1-0	Deptt. Notification dated 5.9.		
		Children	3-0	3-0	4-0	—	—	0-10-0	51 and I.T.P.A. Circular No. 236/51 dated 1. 10. 51.		

WAGES & EARNINGS

Year	Size of the Garden	Category of Workers	Basic Wage Hazree Doubl	D. A. C. C.	Ad hoc wage increase	Tsage total Wages	Reference	
1	2	3	As. P. As. 4	P. As. 5	P. As. 6	P. As. 7	P. Rs. As. P. 8 9	
February 1953	500 acres & above	Adult Male " Female Children	6-0 5-0 3-0	6-0 5-0 3-0	7-0 7-0 4-0	2-6 2-6 1-3	1- 5-6 1- 3-6 0-11-3	Minimum Wages Committee's meeting dated 5th & 6th Feb. 1953 : ITPA Circular No. 55/53 dated 27. 3. 53. Price of concessional cereals was increased from Rs. 5/- per maund to Rs. 15/- per maund; other concessions were withdrawn.
From 15th June, 1953	Below 500 acres	Adult Male " Female	6-0 5-0	6-0 5-0	7-0 7-0	2-0 2-0	1- 5-3 1- 3-0	ITPA Circular No. 117/53 dated 6. 6. 53
	500 acres & above	Adult Male " Female Children	6-0 5-0 3-0	6-0 5-0 3-0	7-0 7-0 4-0	3-6 3-6 1-9	1- 6-6 1- 4-6 0-11-9	
	Below 500 acres	Adult Male " Female Children	6-0 5-0 3-0	6-0 5-0 3-0	7-0 7-0 4-0	2-6 2-6 1-3	1- 5-6 1- 3-6 0-11-3	
From 15th Oct. 1953	500 acres & above	Adult Male " Female Children	6-0 5-0 3-0	6-0 5-0 3-0	7-0 7-0 4-0	5-6 5-6 3-6	1- 8-6 1- 6-6 0-13-6	ITPA Circular No. 186/53 dated 13. 10. 53. and Circular No. 93/54 dated 18. 5. 54.
	Below 500 acres	Adult Male " Female Children	6-0 5-0 3-0	6-0 5-0 3-0	7-0 7-0 4-0	5-0 5-0 3-6	1- 8-0 1- 6-0 0-13-6	
From January 1955	500 acres & above	Adult Mate " Female Children	6-0 5-0 3-0	6-0 5-0 3-0	7-0 7-0 4-0	5-6 5-6 3-6	3-0 3-0 1-6	Minimum Wages Committee's meeting dated 12. 2. 55.; ITPA Circular No. 39/55/ d/-16 2 55.
	Below 500 acres	Adult Male " Female Children	6-0 5-0 3-0	6-0 5-0 3-0	7-0 7-0 4-0	5-0 5-0 3-6	3-0 3-0 1-6	Plucking rate 5. 5. paise per kg.

From February 1953 cereals are being supplied to the workers @ Rs. 15/- per md. as per West Bengal Govt Notification.

CASH & EARNINGS

Year	Size of the Garden	Category of Workers	Basic Wage Hazree Doubli	D. A.	C. C.	Ad hoc wage increase	Total cash Wage	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			As. P. As.	P. As.	P. As.	P. As.	P. As.	P. Rs. As. P.
From 31st August, 1959	500 acres & above.	Adult male	0-62	0-62	0-60	—	—	1-84
		„ Female	0-56	0-56	0-60	—	—	1-72
		Children	0-35	0-34	0-31	—	—	1-00
	Below 500 acres	Adult male	0-63	0-62	0-56	—	—	1-81
		„ Female	0-57	0-56	0-56	—	—	1-69
		Children	0-35	0-34	0-31	—	—	1-00

R e f e r e n c e

10

West Bengal Govt. Labour Deptt.
Notification No. 779.IW/IW/2W-23/58.
dated 20.8.59.

Factory Workers of all gardens will get wages at rates at which plantation workers of 500 acres & above gardens will get.

From February 1953 cereals are being supplied to the workers
@ Rs. 15/- per maund as per West Bengal Government Notification.

CASH EARNINGS (Continued)

Year	Size of the garden	Category of workers	Basic Wages		D.A.	1st Int. Wages increase Rs. P.	2nd. Int. Wages increase Rs. P.	V.D.A.		Total Cash Wages Rs. P.	Reference
			Hazri - Doublis					Rs. P.			
			Rs. P.	R. P.	Rs. P.	R. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1962 From 27th August	500 acres & above	Adult Male	0 62	0 62	0 60	0 08	—	—	—	1 92	
		" Female Children	0 56	0 56	0 60	0 07	—	—	—	1 79	
	Below 500 acres	Adult Male	0 63	0 62	0 56	0 08	—	—	—	1 89	
		" Female Children	0 57	0 56	0 56	0 07	—	—	—	1 76	
		Children	0 35	0 34	0 31	0 04	—	—	—	1 04	
1964 From 10th June	500 acres & above	Adult Male	0 62	0 62	0 60	0 08	0 06	—	—	1 98	
		" Female Children	0 56	0 56	0 60	0 07	0 05	—	—	1 84	
	Below 500 acres	Adult Male	0 63	0 62	0 56	0 08	0 03	—	—	1 07	
		" Female Children	0 57	0 56	0 56	0 07	0 03	—	—	1 95	
1966 from 1st April	500 acres & above	Adult Male	2 13	—	—	—	—	—	—	2 13	According to Recommendations of Wage Board. Food concessions are to continue.
		" Female Children	1 96	—	—	—	—	—	—	1 96	
	Below 500 acres	Adult Male	2 10	—	—	—	—	—	—	2 10	Hazree & doublis are merged into one Wage for the day.
		" Female Children	1 93	—	—	—	—	—	—	1 93	
		Children	1 15	—	—	—	—	—	—	1 15	
1968 from 1st April	500 acres & above	Adult Male	2 13	—	—	—	—	0 12	2 25		
		" Female Children	1 96	—	—	—	—	0 12	2 08		
	Below 500 acres	Adult Male	2 10	—	—	—	—	0 06	1 21		
		" Female Children	1 93	—	—	—	—	0 12	2 05		
		Children	1 15	—	—	—	—	0 06	1 21		

Cereals are made available at Rs. 40 .19 per quintal (Rs. 15.00 per maund)

A TABLE SHEWING YEARWISE ESTABLISHMENT OF TEA ESTATES IN DOOARS

(As could be ascertained from records)

1875		Oodlabari
Gazulduba		Neora Nuddy (Upper Neora)
1876		Mogalkata (9, 3, 61)
Fulbari		Bytagool
Rangatee		1882
Bagrakote		Nedam
Gandhabheel		Carron (Mujnai Grant)
Dalingkote		1883
1877		Toonbari
Jaldhaka		1884
Baintbari		Yongtong
Bamandanga		Chalouni
Ellenbarrie		Indong
Dam Dim		Ingo
Kumlai		Zurrantee
Washabari		Moortee
1878		Aibheel
Kalabari		Kilcott
Good Hope (Sisubari)		Nedeem (Nedeem Tea Co. Ltd.,
Ranicherra		Matelli
Moneyhope		Chulsa
Manabari		Sundree
Ballabari		Alston (Nedeem Tea Co. Ltd.)
Altadanga		Banks (" " " ")
Chael }	(Leesh	Sylee (" " " ")
Patabari/ }	River)	Meenglass
1879		Chengli
Mogulkata		Bhuttabaree
Rupnee		Ranikhola
Soongachi		Sathkhaya
Nagrakata		1885
1880		Baitguri
1881		Rangakotte
Hahaipatha		

Note : In this period Danguajhar (Rangamalee) Tea Estate was started in Baikunthapur area of Jalpaiguri.

Chengmari
 Kurti
 Nakhati
 Indong
 Chupaguri (Nedeem Tea Co. Ltd.)
 1886
 Springfield
 Suknabaree (Dooars Tea Co. Ltd.)
 Hope
 Tondoo
 Jitee
 Malnuddy
 Rungatee
 Gurjongjhora
 Nagrakata
 Ghatia
 Bhogotpur
 Looksan
 Forest Hill (Nedeem)
 Chalauni
 1887
 GLENCOE
 Puthurjhora
 1888
 KUIH (Carron)
 Huldibari (Tallyhe Grant)
 1889
 CHENG MARI
 GRASSMORE
 SAUGAON (Bagrakote)
 1890
 Telipara
 GAIRAKATTA (Angersakha &
 Huntupara)
 MUJNAI (Anjuman Co.)
 1891
 MAKRAPARA (Anjuman Co.)
 HANTUPARA
 1892
 BUNDAPANI
 LANKAPARA

CHAMURCHI
 Totapara (Nuddia)
 1894
 CHUNABHATI
 HARTALGURI
 NEWLANDS
 DOODOOMARI (Assam Duars)
 GANDRAPARA
 CHUAPARA
 1895
 NAKHATI
 Rangamattee (Imperial Tea Co.)
 Chuapara
 Toorsa (Nedeem)
 KATHALGURI
 Banarhat (Chapaguri Grant)
 Karballa
 Jointee
 1896
 Huldibari (Assam Duars Tea Co.)
 CHUNIAJHORA
 BARODIGHI
 DURLAH (?)
 GUABARI (?)
 Palashbari 1st (New Duars)
 HASIMARA (7 Grants)
 KALCHINI
 ROHIMABAD
 BIRPARA (Birpiti & other Grants)
 1897
 Garganda
 Nuktijhora
 Mateejhora
 Lakhipara
 Reti (?)
 Shyamjhora (?)
 Kalchini
 Dalgaon
 Dalmoni (Nedeem)
 Dalsingpara

Bhutam Duars (X)	RUPAI (?)
Raidak	ATIABARI
1898	1906
Binaguri	BATAIGOLE
Debpara	1907
Lankapara	DUMCHIPARA
Ahabari	1908
Phaskawa (Kalikhola Grant)	AMBARI
1899	1909
GALUPARA	Dimaa
4, Grants of McLeods	DALMORE
1900	RAMJHORA
GANDRAPARA	1910
CHUARPARA	TURTURI
Rangamattee (Central Duars	Rajabhat
Tea Co.)	1911
Dalsingpara	DAM DIM
Rangatee 2nd. (?)	DEBPARA
1901	DIANA
1902	1912
NAGRAKATA	Lakhipara
DIMDIMA	1913
Baintbari (Nedeem)	GOPALPUR
BARADIGHI	HOSSAINABAD
GANDABHEEL (Fulbari Tea Co.)	JAYBIRPARA
CHUNIAJHORA	DHEKLAPARA
KALCHINI	NIMTIJHORA
Hatipotha } Imperial	PALASHBARI
Dhoala }	RHEABARI
1903	RADHARANI
TASHATI	1915
DALMONI (Nedeem)	PATKAPARA
Bhatkhawa (Date of ineorpora-	DHOWLAJHORA
tion of the Com-	KOHINOOR
pany 3. 9. 1900)	1917
Kumlai	(*) SARASWATIPUR
1904	1918
EMERARAD (Assam Dooars	(*) Sunny Valley (Joypur)
Tea Co. Ltd.)	(*) Karala Valley

(x) Not known if the Estate was started at all in that year.

(*) In Baikunthapur area, Sikarpur & Bhandapu Gardens were also started.

1919
 Majerdabri
 SATALI
 MATHURA (SARADA)
 BITRI (Hantupara)
 BARRON
 MORAGHAT
 1922
 RED BANK
 1923
 NANGDALA
 1924
 ETHELBARI
 HARTALGURI
 1926
 BATABARI
 Jadabpur

1927
 MALHATI
 Anandapur
 Sreenathpur
 1928
 Kadambini
 1929
 Madhu
 Laxmikanta
 Rahimpur
 1930
 Soudamini
 Gopimohan
 1933
 Nepuchapur
 1934 - 1968
 Surendranagar
 Dharanipur

Information given about incorporation by the Agency Houses is reproduced :—

1. MESSRS. MCLEOD & CO. LTD.

Name	Date of incorporation
Bhatkawa Tea Co. Ltd., (Bhatkawa T. E.)	3rd. September, 1900
Rajabhat Tea Co. Ltd., (Rajabhat T. E.)	21st. May, 1910
Ranicherra Tea Co. Ltd., (Ranicherra T. E.)	22nd. December, 1908

2. MESSRS. MACNEILL & BARRY LTD.

Northern Dooars Tea Co. Ltd., (Binaguri T. E.)

Preliminary lease of land in the Western Dooars was granted by the Deputy Commissioner of Jalpaiguri to D. S. Mackintosh Esqr., on the 29th April, 1898.

MORAGHAT TEA CO. LTD. (Moraghat T. E.)

On 22nd. December, 1919 the Garden was started by the acquisition of some land from Northern Dooars Tea Co. Ltd., Later on the Garden was extended to its present position.

NAGDALA TEA CO. LTD., (Moraghat T. E.)

On 22nd. December, 1919 approximately 1500 acres of land had been taken from the Northern Dooars Tea Co. Ltd. and the Garden was created. Later on the Garden was extended to its present position.

3. MESSRS. GILLANDERS ARBUTHNOT & CO. LTD.

The Dooars Tea Company Limited was incorporated in England in 1885 for the purpose of acquiring and developing the Tea Estates of the following Companies situated in the Western Dooars :—

Dooars Tea Co. Ltd.,
Tondoo Tea Co. Ltd.,
Northern Dooars Tea Co. Ltd.,
Nagrakata Tea Co. Ltd.,

The Estates were Bamandanga, Tondoo, Nagrakata (to which Sukunbari was subsequently added) Ghatia and Indong comprising a total of 2,045 acres of Tea. It must be presumed that Bhagotpore, Hilla and Grassmore were acquired and developed between 1885 and 1894 in which year the acreage under Tea had increased to 6,119. In the Report for 1894 all the Gardens, including the last three, were mentioned by name for the first time.

The *Singlo Tea Company Limited* and *The Empire of India & Ceylon Tea Company Limited* were both incorporated in 1896, the former acquiring, in addition to Estates in Assam, Bundapani and Tasati in the Dooars. It seems probable that Tasati was started in the early part of this century.

GAIRKHATA TEA CO. LTD.

“Gairkhata Tea Estate started on or about 1889/90. Before that it was probably an Indigo planting area. One Mr. D. Steward Mackintosh, Ex-Manager of a Cachar Garden, took over charge of this Tea Estate. He was Superintendent and Managing Director also. The Managing Agents were M/s. Mackillican & Co., of 7, Church Lane, Calcutta. Mr. D. Steward Mackintosh joined Gairkhata as a great shareholder of the Company and started manufacturing Black Tea on or about 1896. Tea Seed was the main income of this estate and was exported to Java, Sumatra, New Guinea and other countries regularly in the early part of this Century. Messrs. Gillanders Arbuthnot & Co. Ltd., took over absolute management of the Garden in the year 1934. Gairkhata is one of the oldest estates in the Dooars”.

চা শ্রমিকদের পরিবার সংগঠন

ত্রিদিনেশ চন্দ্র রায়

• জীববিজ্ঞানে যাকে উভচর বলে, নৃতত্ত্বে তারই নাম প্রান্তিক। চা শ্রমিকরা সেই প্রান্তিঘেঁষা বাদিন্দা। মূল সমাজে তখন পিতৃকুলের দোদাঁড় প্রতাপ, মাতৃকুল বিনয় প্রভাবহীন এবং আদিম কৃষিব্যবস্থার বণ্টনরীতিতে কতিপয়কে লাভবান ও অগণিতকে ভূমিদাসে পরিণত করেছে। আদিম সাম্যবাদের প্রয়োজন অনুপাতে উৎপাদন এবং সমবন্টন তখন ইতিহাস মাত্র। এই অর্থনৈতিক সংকটে উনিশ শতকের প্রথম দশকে রাঁচি এবং ছোট নাগপুর অঞ্চল থেকে আদিবাসীরা ব্যাপকভাবে জীবিকার সন্ধানে চা-শিল্পে যোগ দেন, কারণ ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতিতে কৃষি সমাজের সবচেয়ে নীচুস্তরের মেহনতি মানুষরাই উন্নততর জটিল উৎপাদন ব্যবস্থাতে প্রথম অংশ গ্রহণ করে থাকে। উপজাতিরা যখন ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন তখনও আদিম সমাজের মূল্যবোধ ও ইনঅরগ্যানিক কালচারের প্রভাব তাঁরা পেছনে জঞ্জালের মতো ফেলে আসতে পারেন নি,—কিন্তু চা শিল্পে আবাসস্থলের নতুন পরিবেশ, অচেনা মজুরী অর্থনীতি, আদিভূমির সঙ্গে তাঁদের ক্রমক্ষীয়মান যোগাযোগ ক্রমশঃ নতুন সামাজিক মূল্যবোধের জন্ম দিতে থাকে। শ্রমিকদের পারিবারিক জীবনে সেই পরিবর্তনের প্রথম ছাপ পড়েছে।*

চা শ্রমিকদের পরিবার বিবাহভিত্তিক কনসান্ডাইন বা রক্তসম্পর্কের ওপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে নিয়েই তাদের সংসার। এই উপজাতি শ্রমিকরা ছোট সংসার পছন্দ করে এবং কোন তরফ (স্বামী বা স্ত্রী) থেকেই অতিথি এসে স্থায়ীভাবে পরিবারে থাকে এটা পছন্দ করে না। ফলে পরিবারের আকার ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে।**

এক হাজার পরিবারের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগের লোকসংখ্যা ৩-৫ জন, ৩৫ ভাগের সভা সংখ্যা ৫-৭ জন, মাত্র ২ ভাগের জনসংখ্যা ৮ জনের বেশী। শ্রমিকরা প্রধানতঃ মনোগ্যামাস (monogamous)। চা শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে মনোগামী কোন রীতি নয়, বাস্তব অবস্থা মাত্র। মনোগামী প্রভাবিত সমাজে স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবারের আয়তন ছোট হতে বাধ্য, আদিম পিতৃপ্রধান কৃষি ব্যবস্থার বহু বিবাহরীতি মজুরী অর্থনীতিতে সামাজিক প্রথা হিসাবে অব্যাহত থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ কৃষি ব্যবস্থার সার্থক পরিচালনা পরিবারের ঘনীভূত আনুঃ-

* ইউনেস্কো প্রকাশিত (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে শিল্পায়নের প্রভাব নিরূপণের জন্ত গবেষণাপত্রে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নউ' (Now) এবং 'পরিচয়' পত্রিকাতে লেখকের সমীক্ষাগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে নতুন উপকরণ, তথ্য এবং পরিমার্জন সহ উক্ত সমীক্ষাগুলিকে সংহত করে চা শ্রমিক জীবনের একটা পরিপূর্ণ চিত্র দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

** এক হাজার পরিবারের (লোকসংখ্যা মোট পাঁচ হাজার) মধ্যে সমীক্ষা চালানো হয়। (উপজাতি অনুসারে লোকসংখ্যা বিভাজন সংক্ষিপ্ততার জন্ত বাদ দেওয়া হলো)। প্রধানতঃ ওঁরাও, মুণ্ডা, মহালী, খাসি, গোয়ালী, মাল—পাহাড়ীদের মধ্যেই এই অনুসন্ধান চালানো হয়। আলিপুরদুয়ার থানার অধীনে ধওলাঝোড়া, কোহিনুর, তুড়ুড়ি চা বাগানে যে সব পরিবার ১০ বৎসরের অধিককাল বসবাস করছে তাদের মধ্যে সমীক্ষার নমুনা স্থির করা হয়েছে।

মানবিক সম্পর্কের (সমবেত শ্রমের) ওপর নির্ভরশীল কিন্তু যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাতে প্রতিটি শ্রমিক পৃথকভাবে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি ইউনিট এবং ফলশ্রুতি হিসাবে পরিবারের আকারকে সোজাসুজি হ্রাসকরণের পক্ষে অস্বীকার। সেইজন্য কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে সবসময়েই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মজুরী অর্থনীতিতে শ্রীলোকেরা উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য লাভ করে। সাক্ষাৎকারের সময় এটা পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে মহিলা শ্রমিকরা কিছুতেই স্বামী এবং সন্তানসম্বন্ধি ছাড়া আর কাউকে প্রতিপালন করতে রাজি নয়।

চা বাগানে ছেলে মেয়েরা ১৩-১৬ বৎসরের মধ্যে রোজগার শুরু করে এবং ১৮-২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করে স্বাধীন বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাসগৃহে বসবাস শুরু করে। চা শিল্পের মালিকরা বিনা-ভাড়াতে বাসগৃহের সংস্থান করেন। পৃথক ও স্বতন্ত্র পরিবার গঠন করলে তা পৃথক ইউনিট হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সমস্ত সুবিধাগুলি পেয়ে থাকে (যে সুবিধাগুলি পিতা-মাতার সঙ্গে যৌথভাবে থাকলে তারা পায় না)। তাছাড়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য নববধূরা নিজেদের ঘর নিজেরা রক্ষা করতে চায়, বড়দের খবরদারী পছন্দ করে না। সাবালক শ্রমিকরা সাধারণতঃ বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। প্রায়ই দেখা যায় বাগানে বৃদ্ধ অশক্ত শ্রমিকদের (লেখড়া চালান) হাঙ্কা কাজ দিয়ে প্রতিপালন করতে হয়। সুতরাং শ্রীলোকেরা শ্রমিক পরিবারের কর্তৃত্ব করে এবং তারা পরিবারের আকার কিছুতেই বড় করতে চায় না—এজন্য নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে যেতেও কোন আপত্তি নেই।

উদীয়মান মাতৃপ্রাধান্য এবং ক্রমশঃ উদীয়মান পিতৃশাসনের মাঝখানে চা শ্রমিকদের পরিবার এখনও কোন পরিপূর্ণ চেহারা পায়নি। বহু বিবাহ দ্বারা চিহ্নিত পুরুষ-প্রধান সমাজ থেকে শ্রমিকরা এসেছে সুতরাং পরিবারের শাসন ব্যবস্থাতে পুরুষদেরই শেষ কথা বলার অধিকার থাকা উচিত—অন্ততঃ পিতৃপ্রধান সমাজের এটা অন্ততম লক্ষণ। কিন্তু চা বাগানে ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে যে যৌন আচরণেও শ্রীলোক অবিকত স্বাধীনতা গ্রহণ করেছে।* স্বামীদের ক্ষমতা ক্রমশঃ খর্ব হচ্ছে। একটা অসুস্থতায় দেখা গেছে যে শতকরা ৯৮টি ক্ষেত্রে জননীরাই ছেলেমেয়েদের বিবাহ স্থির করেন এবং পিতা সেই সিদ্ধান্তে বাধ্যতামূলকভাবে সম্মতি দিয়ে কর্তব্য শেষ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেখানে আন্তঃ-ইউনিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সেখানে কোন দিকে যোগ দিতে হবে সেটা মেয়েরাই ঠিক করেন। এর ফলে জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন বিক্ষোভে মেয়েরাই নেতৃত্ব নেয়। ১৯৬১ সালে এ বিষয়ে একটা সমীক্ষার ফলে জানা যায় ৪০টি ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ডুম্বার্সের চা বাগানে হিংসাত্মক গৃহতীর আশ্রয় নেয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলারা পুরোভাগে ছিলেন,—সেজন্যই ৮টি পুলিশি গুলিচালনার ঘটনাতে একমাত্র মহিলারাই নিহত বা আহত হন।

নারী শ্রমিকদের দৈনিক শক্তি উল্লেখযোগ্য। পাতিতোলার মরশুমে প্রতিদিন ৪০।৫০ কে, জি, বহন করে মেয়েরা গড়ে ২।৩ মাইল পায়ে হেঁটে ওজন দিতে আসে। মেয়েদের আয় সীমিত, ব্যয় পরিমিত। পুরুষদের মদ এবং জুয়ার অপব্যয় তারা কিছুটা পূরণ করেন।

পরিবারের আয়ের পুরুষের প্রাধান্য সাধারণতঃ অবিসংবাদি। কিন্তু গত কয়েক বছরে এ ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, নিচের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে :—

* প্রমুখতর সাহায্যে ১৯৬২ সালে ১০০০ বিবাহিত রমণীর মধ্যে একটি সমীক্ষার ফলে দেখা যায়—৮০০ জন শ্রীলোক জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে (খ) ১১০ জন মন স্থির করতে পারেন নি (গ) ৯০ জন জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে, কিন্তু এক বছর পরে দেখা গেলো যে ৮০০ জন বধূ জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ছিলেন তারা তাদের স্বামীদের আকস্মিক ও উচ্ছৃঙ্খল যৌন আচরণের জন্য জন্ম-প্রতিষেধক বস্তুগুলি ব্যবহারই করতে পারেন নি।

মোট পরিবারের সংখ্যা—১০০০

সাল	পরিবারের আয়বায়ের ওপর নারীর পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে এমন পরিবারের সংখ্যা।	পরিবারের আয়বায়ের ওপর নারীর আংশিক কর্তৃত্ব আছে এমন পরিবারের সংখ্যা।
১৯৬১ ...	১৮.৫	১.৫
১৯৬২ ...	২২.৬	২.২
১৯৬৩	২৭.৮	২.২

সূত্র—সাক্ষাৎকার : ১নং তালিকা

সম্মান সম্বন্ধিত ভবিষ্যৎ গঠনের জন্ত পরিবারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রকৃতপক্ষে ক্লানের (clan) স্বতোতে পরিবারগুলোর মালা গাঁথা হয়, ভৌগোলিক পরিস্থিতি সেই স্বতোকে মোমের মত পালিশ করে মজবুত করে; কিন্তু উপজাতিরা আদিম সমাজ থেকে অগ্রসর সমাজে চলে আসার পর তাদের ক্লান সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। একই গোষ্ঠির পরিবারগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর একথা সকলেরই জানা আছে যে উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমেই সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিগত চক্রাতপের জন্ম দেয়। সুতরাং প্রত্যেকটি পরিবারের দুটি ভূমিকা আছে—সামাজিক ও ব্যক্তিগত।

উপজাতিদের বিহার থেকে বাংলাদেশে মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে কোন ন্যূনতম নীতিও মানা হয় নি। ঠিকাদারদের মাধ্যমে চা বাগানে এই উপজাতি শ্রমিক সংগ্রহ করা শুরু হয়। কারণ ইতিমধ্যে এটা নিশ্চিত হয়েছিল যে চা বাগানে বৈচিত্র্যহীন আবহাওয়ার সঙ্গে এঁরা সামঞ্জস্য করে নিতে পারবেন। ডুয়ার্স তখন যে কোন মানুষের পক্ষে নরকতুল্য ছিল। সেই ভয়ানক ম্যালেরিয়া এবং ব্র্যাকওয়াটারের কথা স্মরণ করে আজও পুরাতন অধিবাসীরা আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। এই উপজাতিরা যখনই এই আবহাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণিত হল সে সময় থেকেই তাঁদেরকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা শুরু হোল। এই আড়কাঠিদের নিষ্ঠুরতায় সেই অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় দাস ব্যবসায়ীরাও বোধ হয় লজ্জা পেত। ক্রমশঃ এই ‘রং রুট’রা সারা আসাম আর পশ্চিম বাংলার চা বলয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়লো। প্রকৃতপক্ষে এই আড়কাঠি প্রথা এই শতকের বিশদশক থেকে পাঁচের দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বর্তমানে আর এর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং আদিম সমাজ একেবারে ভেঙ্গে যাওয়াতে চা শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যাবলীকেই সামাজিক কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করলো।

ছেলে মেয়েদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করা পরিবারের অগ্রতম কর্তব্য। কিন্তু লক্ষণীয় যে এক হাজার পরিবারের মধ্যে মাত্র শতকরা ৪.৫ পরিবার ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। এক হাজার পরিবারের সভ্যসংখ্যা পাঁচ হাজার। ৫ থেকে ১১ বছরের বালক বালিকার সংখ্যা ১৪৫০। এদের মধ্যে ১৯৫৩ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে মাত্র ১০৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে এই কয় বছরে মাত্র ২০ জন প্রবেশ করেছে। ১৯৫২ সালের আগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছে এমন ছাত্রছাত্রীর কোন সাক্ষাৎ মেলেনি। চা বাগানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষাতে উৎসাহ দেবার

জন্ম টিভোর্ড এবং মালিকপক্ষ বহুভাবে সাহায্য করেন, তবু পোষ্যদের শিক্ষা দেবার জন্ম শ্রমিকদের কোন আগ্রহ নেই। অর্থবান শ্রমিকরা কিশোর বালক-বালিকাদের নানাভাবে অর্থকরী ব্যাপারে নিয়োগ করেন।

চা বাগানের কাজ সকাল সাতটায় শুরু ও সন্ধ্যা পাঁচটায় শেষ। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা আতিশয্যে উন্মুক্ত স্থানে কাজ করা খুবই কষ্টসাধ্য, এর মধ্যে জননী শ্রমিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। কর্মস্থানে সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ও দেখাশোনা করা পূর্বে রেওয়াজ ছিল। কিন্তু পঞ্চাশ সনের পর থেকে শিশু লালনাগারের (ফ্রেস) প্রচলন হয়েছে এবং এসম্পর্কে ৪০টি চা বাগানে সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে জননী শ্রমিকরা পুরোমাত্রায় লালনাগারগুলি ব্যবহার করেন। ময়দানের কাজেও ভ্রাম্যমান লালনাগারের ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং শিশু পালন পরিবারের হাত থেকে সামাজিক পর্থায়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

চা বাগানে নতুন-পরিকল্পিত গৃহ-উপনিবেশের প্রভাব শ্রমিক জীবনে লক্ষণীয়। গ্রাম দেশে কৃষকদের যেমন চারিদিকে প্রচুর এলাকা নিয়ে ঘরের বাসগৃহ থাকে তেমনি ব্যবস্থা আগে চা বাগানে ছিল। বর্তমানে ছাঁচে ঢালা আটোসাটো পরিকল্পিত বাসগৃহ প্রস্তুত করা হচ্ছে। একটি সমীক্ষাতে দেখা গেছে যে পাকা বাসগৃহে বসবাসকারী ২০০ পরিবারের হেফাজতে ১৩৩৩ একর জমি সজী বাগানের জন্ম ছিল। ১৯৫৭ সালে এই ১৩৩৩ একর জমি পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২ সালে ১২২ একরে শাকসজি লাগানো হয়েছিল। কিন্তু কাঁচা বা পুরাণো ধরণের বাসার বাসিন্দাদের হেফাজতে জমি পুরো ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে কি নতুন ধরণের বাসস্থান শ্রমিকদের আয়েসী করে তুলেছে? এর উত্তর খুঁজতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। শ্রমিক পরিবারগুলির গোপালন স্পৃহা অনেক কমে গেছে।

মোট পরিবারগুলির

সাল মালিকানায় গরুর সংখ্যা

১৯৫৭	...	১৫৪০
১৯৬২	...	১০০০

২নং তালিকা :—মন্তব্য, এই সময়ে কোন গো মড়ক হয়নি।

সাক্ষাৎকারের ফলে জানা যায় শ্রমিকরা গরু রাখতে চায় না কারণ ক) গরু খাদ্য সংগ্রহ করার পরিশ্রম বর্তমানে কাজের শেষে কেউ করতে চায় না; খ) গরু বাড়ি নোংরা করে; গ) গরু রাখা লাভজনক নয়।

আগে শ্রমিকরা ভাত পচিয়ে তা থেকে সুরাসার প্রস্তুত করতো, তার চলতি নাম হাঁড়িয়া। এজন্ম শুষ্ক বিভাগের কাছ থেকে প্রতিবছর এদের পচাই লাইসেন্স নিতে হোত। অহুসন্ধানে দেখা যায় ১৯৫৭-৫৮ সালে উল্লিখিত এক হাজার পরিবার এই লাইসেন্স নিয়েছে। কিন্তু ১৯৬২ সালে কোন একটি পরিবারও এই অহুমতি চায় নি। বে-আইনী চোলাই এখন প্রতি ঘরে। আয়-ব্যয় এবং সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। নীচের তালিকা থেকে তা বোঝা যাবে :—

সাল *	পরিবারের সংখ্যা	জীবনবীমার পরিমাণ
১৯৬০	৭৩	১০০০
	১৭	৩০০০
	১০	৫০০০ এবং তদুর্ধ্বে

*সমস্ত ক্ষেত্রেই সমীক্ষাকৃত মোট পরিবারের সংখ্যা ১০০০।

তালিকা নং ৩

মন্তব্য — জীবনবীমাতে টাকা বিনিয়োগ করা শ্রমিকদের পক্ষে খুবই নতুন।

জমিতে অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে সংবাদ

সাল	পরিবারের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বিঘা)
১৯৬৩	২০	১—৫
১৯৬৪	৫৫	৫—১০
১৯৬৫	৫১	১০ এবং তদুর্ধ্বে

তালিকা নং ৪

সঞ্চয় সম্পর্কে খবর : সমীক্ষার বৎসর — ১৯৬৩

পরিবারের সংখ্যা	বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের কাছে জমানো টাকার পরিমাণ	সমবায় সমিতিতে সঞ্চিত টাকার পরিমাণ	সদস্যদের কাছে জমা আছে এমন টাকার পরিমাণ
১২০	১২,০০০	—	—
২২৩	—	১৬,০০০	—
৫২	—	—	৩,৫৭,৫০০

তালিকা নং ৫

কোন পরিবারে কতজন উপার্জন করে : সমীক্ষার বৎসর ১৯৬২

উপার্জনকারীর সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা
০—২	৭২৫
২—৩	২২৩
৩ এবং তদুর্ধ্বে	৫২

তালিকা নং ৬

আয়ের হিসাবানুসারে বিভাজিত পরিবারের সংখ্যা : সমীক্ষার বৎসর — ১৯৬৩

আয়ের পরিমাণ টাকা	পরিবারের সংখ্যা
১০০০ — ১৮০০	২৪৮
১৮০০ — তদুর্ধ্বে	৫২

তালিকা নং ৭

ব্যয়ের আকার প্রকার : সমীক্ষার বৎসর — ১৯৬৩

মোট আয়ের ৩০% ভাগ ব্যয় হয় খাদ্যের জন্য
 ,, ,, ২৫% ভাগ ব্যয় হয় বস্ত্রের জন্য
 ,, ,, ৪৫% ভাগ ব্যয় হয় হুসা ও জুয়া।

তালিকা নং ৮

উপরোল্লিখিত তথ্যাবলী থেকে এই সিদ্ধান্ত খুব সহজে করা যায় যে চা শ্রমিকদের বাড়তি অর্থ এসেছে, মূলধনের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই উপজাতীয় শ্রমিকদের নতুনভাবে সম্পত্তি সৃষ্টির প্রবণতা এসেছে। এই রকম অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে তাদের জীবনের মূল্যবোধ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পরিবারের অন্তর্মানবিক সম্পর্কের মধ্যে এর প্রভাব সবচেয়ে চোখে পড়বে।

জলপাইগুড়ির চা-শিল্প ও তার শ্রমিক

শ্রীদেবেন সরকার

জলপাইগুড়ি জেলার চা শিল্প একটি আদি ও প্রধান শিল্প। ডুয়ার্সের চা বলতে জলপাইগুড়ি জেলার চা বুলতে হবে। চা শিল্পপতিরা চা উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে কতগুলি চা জিলাতে ভাগ করেছিলেন। যেমন দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স, প্রভৃতি এক একটি চা জেলা (tea district)। সে জুই দার্জিলিং চা বলতে শুধু দার্জিলিং পাহাড়ী এলাকার (Darjeeling Hill district) চা বোঝায় — তরাই এর চা বোঝায় না, যদিও তরাই দার্জিলিং জেলার ভিতরে।

১৮৩৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনে চা-এর একচেটিয়া ব্যবসা নষ্ট হওয়ার পর ভারতবর্ষে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চা উৎপাদন শুরু করেন। চা উৎপাদনে প্রথম প্রয়োজন জমির। তা নাম মাত্র মূল্যেই পাওয়া যেত। আসামে প্রথম ১৫ বৎসর বিনামূল্যে জমি দেওয়া হয় — ১৫ বৎসরের পর ১০ বৎসর পর্যন্ত একর প্রতি তিন আনা এবং ৭৪ বৎসরের জন্ত একর প্রতি ছয় আনা কর ধার্য করা ছিল। ১৮৭৪ সালে এ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা (revise) করা হয় এবং কর বাড়িয়ে একর প্রতি আট টাকা ধার্য হয়। মাত্রাজে সাধারণ ভাবে এই হার একর প্রতি এক টাকা ছিল।

১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সমগ্র চা শিল্পে নিয়োজিত মূলধন ১১৩'০৬ কোটি টাকা ছিল (১০০ একরের নীচে ক্ষুদ্র হোল্ডিং ছাড়া)। এর মধ্যে ৭২'৫৫ কোটি অভ্যন্তরীণ এবং ৪০'৫১ কোটি টাকা ভারতীয় মূলধন। নিয়োজিত মূলধনের শতকরা ৫৭ ভাগ আদায়ীকৃত এবং শতকরা ৪৩ ভাগ রিজার্ভ ফান্ডের টাকা। প্রাটেশন ইনকোয়ারী কমিশন ২৪৭টি কোম্পানীর ব্যালান্স শীট পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে ১৯৬২ হ'তে ১৯৫৩ সালের মধ্যে নীট সম্পত্তির (net assets) পরিমাণ দ্বিগুণ হ'য়েছে এবং এর বেশীর ভাগই বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৫৬ সালের পর। ভাসমান সম্পত্তির (floating assets) পরিমাণ শতকরা ২০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীগুলির শতকরা ৮০ ভাগ মূলধনের অংশ অ-ভারতীয়দের হাতে ছিল, তারমধ্যে কলিকাতার মাত্র ১৩টি এজেন্সী হাউস উত্তর-ভারতীয় চা উৎপাদনের শতকরা ৭৭ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর মধ্যেও ৭টি হাউস উহার শতকরা ৫০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে (Economic Surveys — Tea—by William Morgan)।

চা শিল্পের ইতিহাস — এর জন্মকাল থেকেই শ্রমিকদের শোষণ ও তাদের চোখের জলের ইতিহাস। তখনকার দিনে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চল হ'তে প্রধানতঃ তিন বৎসরের চুক্তিতে শ্রমিকদের আমদানী করা হ'ত। ১৯৩৮-৪২ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের মাসিক উপার্জন ছিল মাত্র ৭ টাকা হ'তে ৮ টাকা পর্যন্ত কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থজড়িত রিক্রুটিং এজেন্টরা কমিশন পেতেন প্রতি শ্রমিকের জন্ত ৬৫ টাকা এবং রিক্রুটিং খরচ বাবদ (যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ বাবদেই) পেতেন শ্রমিক পিছু ১২০ টাকা (রেগে কমিটির রিপোর্ট)। কোন কোন ক্ষেত্রে ২০০ টাকা পর্যন্ত কমিশন দেওয়া হ'ত।

১৯৫০ সনে সমস্ত ভারতবর্ষের চা শিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৩৩ হাজার। ঐ বৎসর পশ্চিম বাংলায় চা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ২৯ হাজার। ১৯৬৫ সালে ঐ সংখ্যা ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শ'তে দাঁড়ায়। ডুম্রাসের চা শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার থেকে ক'মে ১৯৬২ সালে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৯ শ'তে দাঁড়ায়। বর্তমানে এই সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৩ হাজারের মত।

স্বাধীনতার বহু পূর্ব যুগে চা শ্রমিকদের দাসের (serf) মতই রাখা হ'ত। এদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল খুপড়ি ঘর। শ্রমিকদের লাইনে কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী বা রাজনৈতিক কর্মীর ঢুকবার অধিকার ছিল না। বাগানের মানেজার ছিল সর্বসর্বা। তার মুখের কথাই ছিল আইন।

সমগ্র চা বাগান অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হ'তে কিছু কিছু বাগানে প্রাথমিক বিদ্যালয় গ'ড়ে উঠতে থাকে। ১৯৫১ সালে চা বাগানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আবাদী শ্রমিক আইনের (Plantation Labour Act) আওতায় আনা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থা স্কুল বোর্ডের হাতেই রাখা হয়। তিন বৎসরের চুক্তিতে আমদানীকৃত শ্রমিকের দ্বারা চা শিল্প পরিচালিত হ'ত বলে চা শ্রমিকদের কোন স্বেচ্ছা সমাজ-জীবন গ'ড়ে উঠতে পারেনি এবং নিদারুণ অশিক্ষা এর দ্বিতীয় কারণ। বিদেশী সরকার এবং শিল্পপতিগণ এদের সামাজিক জীব বলেই মনে করতে পারতেন না।

১৯৪৬-৪৭ সনে যখন ভারত সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার কথাবার্তা পাকা হ'তে থাকে তখন থেকেই রাজনৈতিক কর্মীরা চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা আরম্ভ করে এবং চা বাগানগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নের জন্ম হ'তে থাকে। ১৯৪৮ সালে গ্রাসমোর চা বাগানে বাংলাদেশের চা শিল্পে সর্বপ্রথম নিয়ম-তান্ত্রিক ভাবে ১১ দিনের ধর্মঘট চলে এবং নাগ্রাকাটা থানার সবগুলি চা বাগানে একদিনের জগ্গ সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট পালিত হয়। ডুম্রাসে এটাই প্রথম সুসংগঠিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হ'তেই চা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হ'ত বলেই ট্রেড ইউনিয়নগুলিও দলগত ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। বহু ভাঙ্গা গড়ার পর আজও এই দলগত ভিত্তিতেই ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলন চলছে। চা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা এবং আন্দোলনের চাপ যতই বাড়তে থাকে তাদের বেতন ও অগ্রাণু সুযোগ সুবিধাও বাড়তে থাকে। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই বেতন চার আনার বেশী ছিল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বেতন ১০ আনা থেকে বাড়তে বাড়তে ১৯৫০ সালে ডুম্রাসের চা শ্রমিকের বেতন একটাকা ছয় পয়সায় দাঁড়ায়। ১৯৫০ সালে ন্যূনতম মজুরী আইন (Minimum Wages Act) চা শিল্পে প্রবর্তিত হয় এবং ঐ আইন অনুসারে ডুম্রাসের চা শিল্পে নিম্নতম মজুরী একটাকা তিন আনা নির্ধারিত হয়। মণপ্রতি পাঁচটাকা দরে রেশন সরবরাহ ব্যবস্থা চালু থাকে।

১৯৫১ সালে আবাদী শ্রমিক আইন (Plantation Labour Act) পাশ হয়। ঐ আইন অনুসারে শ্রমিকদের বাসগৃহ সহ কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা যথা—সবেতন বাৎসরিক ছুটি, সিক লিভ (sick leave), ক্রেস, ক্যান্টিন, রক্ষনমূলক পোষাক (protective clothings) প্রভৃতি বাধ্যতামূলক করা হয়। আইনে প্রতি বৎসর শতকরা ৮টি পাকা গৃহ (standard house) নির্মাণের নির্দেশ থাকলেও অধিকাংশ বাগানে এই নির্দেশ সম্পূর্ণ কার্যকর করা হয় নি।

১৯৬৬ সালে ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইণ্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশন (D.B.I.T.A.) এর সঙ্গে এবং ১৯৫৭ সালে আই টি, পি, এর সঙ্গে জালানী কাঠ সরবরাহ সম্পর্কে চা শ্রমিক ইউনিয়নের এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে ডুয়ার্স ও টেরাই এর চা শ্রমিকগণ প্রতি পরিবারের জন্য ২ পিল (২৫ মণ) জালানী কাঠ বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন এবং সাবষ্টাক্ পদানুক্রমিক তিন পিল ও চার পিল পেয়ে থাকেন। টাকার অঙ্কের হিসাবে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের চা শিল্পে এটাই প্রথম এবং প্রধান দ্বিপাক্ষিক চুক্তি (collective bargaining)।

১৯৫২-৫৩ সালে চা শিল্পে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয় সেই সঙ্কটের বোঝা প্রধানত চা শ্রমিকদের উপর চাপানো হয়। তার ফলস্বরূপ শ্রমিকেরা রেশন বাতিরেকে যে ডাল, তেল, গুড় ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য স্বল্পমূল্যে পেতেন তা উঠিয়ে দিয়ে তৎপরিবর্তে ক্ষতিপূরণ বাবদ সাড়ে পাঁচ আনা বেতনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রেশনের চালের দামও বাড়িয়ে ১৫ টাকা মণ ধার্য করা হয়। এই কয় বৎসরে শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে ধাপে ধাপে বেড়ে ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের বর্তমান বেতন দৈনিক ২ টাকা ৪৫ পয়সা। ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের বেতন ২ টাকা ৬৭ পয়সা। কিন্তু আজও অসংগঠিত যাবতীয় শিল্পের মধ্যে চা শিল্পের শ্রমিকদের বেতন সর্বনিম্ন।

চা শিল্প 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ির যুগ পার হয়ে একটি পাতা একটি কুঁড়ির যুগে এসে পৌঁছেছে। চা শিল্পের শ্রমিকগণও অন্ধযুগ প্রায় পার হয়ে এসেছে। এদের সমাজ জীবনে নূতন আলোড়ন এসেছে — সমাজ জীবনের ধারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আজ এরা শুধু বেতন বৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট নয় — শিক্ষার সুযোগ, খেলাধুলা, আমোদ ফুটির সুযোগ এবং সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার জন্য এদের দাবী ক্রমশঃ মোজার হ'য়ে উঠছে। রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কেও চা শ্রমিকগণ সচেতন হ'য়ে উঠছে।

নবম পরিচ্ছেদ

‘স্বাধীনতা আন্দোলনে জিলাবাসী’

স্বাধীনতা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি

শ্রীমুকুলেশ সাহা

জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা লিখতে গেলে সবার আগে পূর্বলেখ অনস্বীকার্য। ঠিক যেমনি সন্ধ্যা-বেলায় প্রদীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো। স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ নেবার আগের চেহারাটাকে বা স্বরূপটাকে স্বাদেশিকতা বলতে চাই। কারণ বুটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার আগের যে কর্মকাণ্ড তার সঙ্গে সত্যিকারের রাজনৈতিক আন্দোলনের সায়ুজ্য নেই। কিন্তু ফসলের পরিমাপ করতে গিয়ে যদি জমির উৎপাদন শক্তি কিংবা সার সেচের কথা ভাবা না যায় তবে প্রথমেই ভুল হবে। এবং এই ভুলটা বৈজ্ঞানিক ভুল।

কাজেই আন্দোলনের রূপরেখা দেবার আগে সার ও সেচের কথা চিন্তা করতে হবে। তাছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলনের যে চেহারা আমরা চট্টগ্রাম, বরিশাল, মেদিনীপুর বা মাদারীপুরে দেখেছি, জলপাইগুড়ির সে চেহারা দেখা যায়নি, এবং দেখা যাওয়াও সম্ভব ছিল না। কারণ জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেহারা ছিল ভিন্নরূপ। বিচারের দিক থেকে দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা স্বাভাবিক।

হিমালয়ের প্রত্যন্ত দেশ জলপাইগুড়ি জেলা। পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড়ী নদী বিধৌত এই জেলার অধিবাসীরা রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কোচ, রাভা, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতিভুক্ত। আরো কয়েকটি উপজাতি আছে, রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই নোতুন জেলার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে শহরের অধিকাংশ অধিবাসীদের মিলের চেয়ে অমিলটা ছিল বেশী। শহরের অধিকাংশ অধিবাসীদের মধ্যে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার কিংবা কয়েক ঘর সরকারী আমলা। এই অধিবাসীদের অধিকাংশ এসেছিলেন ঢাকা, মানিকগঞ্জ, পাবনা ও রাজশাহী থেকে। জীবিকার প্রয়োজনে এঁরা এই জেলায় এসেছিলেন। কাজেই এই সম্প্রদায় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এতে আশ্চর্য কিছু নাই।

শহরে এঁদের যে সামাজিক জীবন — তার সঙ্গে জেলার অধিকাংশের কোন যোগ ছিল না। না আত্মিক না অর্থনৈতিক। এই জেলার অধিবাসীদের জীবিকা ছিল চাষ-অবাদ। জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের সঙ্গে কোচ-বিহারের রাজপরিবারের একটা আত্মীয়তা ছিল, এবং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রঙপুরের অধিবাসীদের মধ্যে যেমন সম্প্রদায়গত মিল ছিল তেমনি ছিল সংস্কৃতিগত। ইংরেজ শাসকের চোখে এটা ধরা পড়েছিল — তাই ইংরেজ চেষ্টা করেছিল এদের কিছুটা স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা দিয়ে যাতে শহরের অ-রাজবংশীয় সম্প্রদায় থেকে এদের তফাৎ করে রাখা যায়। ইংরেজ শাসক জানতো এই তিন জেলার সরল গ্রামীণ মানুষের মধ্যে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের প্রভাব আছে। কাজেই রাজপরিবারগুলিকে ঠিক রাখতে পারলে রাজবংশী অধ্যুষিত এই জেলাগুলিকে ঠিক রাখা যাবে। শহরের মানুষের ক্রটি ছিল — তারা বিরাট অংশের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারেনি।

সেই কারণে ১৯২১এর আগে এই জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের তেমন চেহারা দেখা যায় নি। শহরে গুটি কয়েক পরিবারই শহরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁদের অধিকাংশের জীবিকা ছিল ওকালতী, ডাক্তারী, মোক্তারী কিংবা অন্যান্য জাতীয় ব্যবসা। জমির উপরেও এই পরিবারগুলির দখল আসছিল। ইংরেজ সরকার-পুষ্টি ইংরেজ চা-বাগান শিল্পপতিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চা শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। ডুমুরের অরণ্য কেটে চা-চাষ শুরু করা হয়েছে। ইংরেজের চোখে এটা ভালো লাগছে না। বিস্তীর্ণ ভূটানের সীমান্ত দিয়ে ইংরেজ বণিকেরা শুধুমাত্র চা-চাষ করছিল না তখন, তারা দ্বিতীয় ফ্রন্ট লাইনের কাজ করছিল। কাজেই একদিকে বাঙালীরা চা-শিল্পে পাল্লা দিচ্ছে অপর দিকে শাসনকার্যের বিপ্লব ঘটানো ইংরেজ শাসকের চোখে ভালো লাগার কথা নয়। অথচ যারা চা-শিল্পে অগ্রণী তাঁরা এটা জেনেই শিল্পে অগ্রগমনে ব্যস্ত। অপরদিকে তাঁদের যে সামাজিক জীবন সেখানেও তদানীন্তন সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ একটানা বিলাসের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হচ্ছে না। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের ধ্যান ধারণা নবাশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে তখন কার্যকরী। তখন দেখি যুবকদের ভিতরে চরিত্ররক্ষা, ব্যায়াম শিক্ষা, সাধনা, সমাজের অস্তাজ শ্রেণীর ভিতরে সেবামূলক কাজ নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা। এখানেও মাঝে মাঝে সংঘাত বেধেছে পুরাণো চিন্তার সঙ্গে নবতর দীক্ষার। “উদ্ভিষ্টত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।” “সদা সত্যকথা বলিবে,” “মদুমদেয়মপেয়মগ্রাহম্,” “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন,” “বন্দেমাতরম” ছিল শুধু শ্লোগান নয় নব্য সম্প্রদায়ের পক্ষে বাণীমন্ত্র—কলকাতা কলেজি শিক্ষা ও কোচবিহার কলেজের আচার্য ব্রজেন শীলের দীক্ষার প্রভাব। আইনজীবীদের মধ্যে যেমন তদানীন্তন কংগ্রেসের চিন্তাধারার প্রভাব বিস্তার করেছে, ঠিক তেমনি পাশাপাশি গোপন সমিতি ও সন্ত্রাসবাদের ধারা চলেছে। উকীল অন্নদাচরণ সেন ও ত্রৈলোক্য নাথ মৌলিক মহাশয় এই জেলা থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করতেন। বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এই সময়ে উকিল হয়ে আসেন এবং তিনিই সর্বপ্রথমে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন। কিশোরী মোহন মৌলিক, অক্ষয়কুমার মৌলিক, মাখন লাল ভৌমিক ও রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এই গুপ্ত সমিতির সক্রিয় সদস্য। বুকের রক্ত দিয়ে তাঁরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন স্বাধীনতার জন্ত তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাঁদের গুপ্ত ক্রিয়া কর্মের পাঠ চলতো শিল্প সমিতি পাড়ার গভীর জঙ্গলে। শিক্ষা দিতে কোলকাতা থেকে আসতেন যোগেন সরকার মহাশয়, তাঁরা এসে উঠতেন তারাপ্রসাদ বিশ্বাসের বাড়ীতে। এই হাসিখুশি মানুষটি কি কারণে জলপাইগুড়িতে আসতেন তা অনেকেই জানতেন না।

১৯০৫ সনে বিলেতী কাপড় বর্জন আন্দোলন শুরু হলো। দীন বাজারে, বিলাতী কাপড় পোড়ানোর চেষ্টা করতেই পুলিশ এসে লাঠি চালালো। প্রিয়নাথ গোস্বামী ও চণ্ডী চক্রবর্তীর মত কম বয়সী ছেলেরা পালালো, ধরা পড়লেন দুর্গাদাস চক্রবর্তী, আত্মনাথ মিশ্র ও অন্নদা বিশ্বাস। দু' সপ্তাহ জেল হলো। খালাসের দিন যোগেশ চন্দ্র ঘোষ অনেক ছেলের দল নিয়ে গেলেন জেল গেটে অভ্যর্থনা করতে পুলিশী ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে—এ জাতীয় কাজ দুঃসাহসিক ব্যাপার সেই যুগে।

১৯০৭ সনে ‘বাঙলার সামাজিক ইতিহাস’এর লেখক ষাট বৎসরের বৃদ্ধ উকীল দুর্গাচরণ সান্যাল হিলি টেনশনে কোর্ট ও স্মার্ট সাহেবকে জখম করায় চার বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এ নিয়ে সারা বাঙলায় হৈ চৈ। দেশী সংবাদপত্রগুলি সোচ্চার হয়। কিন্তু জেল খাটতেই হলো। ফলে সান্যাল পরিবারের কেউ আর ইংরেজ সরকারের চাকরী পায় নি। ১৯০৭ সালে আর্থ নাট্য সমাজে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে এরকম জাতীয় বিদ্যালয় অনেক জায়গায় গড়ে উঠেছিল। শশীকুমার নিয়োগী, জয়চন্দ্র সান্যাল, মাধব সান্যাল, ষ্টেশানচন্দ্র দাশগুপ্ত, তারিণীপ্রসাদ রায়, তারা প্রসাদ বিশ্বাস, সুরেশ্বর সান্যাল, শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক ও অন্নদাচরণ সেন প্রমুখ ব্যক্তি ছিলেন উদ্যোক্তা। অক্ষয় রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও বিনয় সরকার এই জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন ও কয়েকদিন শিক্ষকতাও করেন। এ ছাড়া বঙ্কুবিহারী পাল, জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সিংহ, পঞ্চানন চক্রবর্তী, চুণীলাল প্রামাণিক ও মাখন লাল ভৌমিক এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রও জুটেছিল শহরের প্রায় প্রতিটি বাড়ী থেকে। সত্যেন বিশ্বাস, কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, তারানাথ ঘটক, মহেন্দ্র ঘটক, জয়চন্দ্র চক্রবর্তী, সতীশ ঘোষ, মোহনলাল রায়, পূর্ণ বাগচী, অবিলাস সান্যাল, প্রফুল্ল সান্যাল, প্রাণতোষ সান্যাল, পঞ্চানন নিয়োগী, সতীশ বসু, সুরেশ মৈত্র, হরেন ভৌমিক, বীরেন মুখার্জী ও রমেশ মুখার্জী ছাত্র ছিলেন। শেষ সম্পাদক ও শিক্ষক মাধবচন্দ্র সান্যাল।

১৯১১ সালে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ছাত্র বীরেন দত্তগুপ্ত এখান থেকে পালিয়ে কোলকাতা হাইকোর্টের ভেতরে সামন্তল হক্কে হত্যা করেন। ফলে তাঁর ফাঁসী হয় এবং পুলিশ জলপাইগুড়িতে এই জাতীয় কার্ধ-কলাপকে বন্ধ করার জন্ত উঠে পড়ে লাগে।

বিলেতী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে “মাঘের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে” আন্দোলন শুরু হলো। শিল্প সমিতি পাড়ার বন কেটে কাপড়কল তৈরী হলো, মাদ্রাজ থেকে তাঁতী এলো। যজ্ঞেশ্বর সান্যালকে জাপান থেকে কাপড় তৈরী শিখিয়ে আনা হলো। গুলাওঠা রোগে প্রায় সব তাঁতীই মারা গেল, কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের মালিক এটা কিনে নিলেন।

“স্বদেশী শিল্প ভাণ্ডার” ও “যুবক ভাণ্ডার” খোলা হলো। কিশোরী মৌলিক, অক্ষয় মৌলিক, মাখন ভৌমিক, শরৎ সেন ও জীতেন রায় এই দোকান চালাতেন।

যুবক দল শুরু করেছে শরীর চর্চা, কিন্তু পুলিশ এটাকে ভালো নজরে দেখছে না। যুবক দলের লক্ষ্য “মস্তের লাধন কিম্বা শরীর পাতন।” সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের প্রাণ মাতানো গান “বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন, এক হউক এক হউক, এক হউক হে ভগবান” ছেলে মেয়েদের মুখে মুখে। যোগেশ চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে রাজবাড়ীর দীঘির পাড়ে শিব মন্দিরে যুবকরা জমায়েত হয়ে প্রতিদিনের পাঠ নিতেন। আন্দোলন জোর হলো, ভাঙা বাঙলা জোড়া লাগলো। স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ থাকলো না। যদিও সম্মুখে কোন রাজনৈতিক আদর্শবাদ ও কর্মপন্থা নেই। পরাধীন ভারতের মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু কোন্ পথ?

গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল। এর সঙ্গে যুক্ত হলেন পঞ্চানন নিয়োগী, সতীশ ঘোষ, পূর্ণদাস (মোক্তার), অন্নদা বিশ্বাস, মহেন্দ্র সরকার, দুর্গাদাস চক্রবর্তী, জীবন রায়, বীরেন দত্তগুপ্ত, উপেন রায়, শচীন মজুমদার, স্খাংশু সরকার, কেশদার দত্ত, সীতানাথ প্রামাণিক, চুণীলাল রায়, পূর্ণ বাগচী, জনার্দন গোস্বামী, কাহ্ন চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র মৈত্র (কদমতলা), খগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, দেবেন ঘোষ প্রমুখ। এঁদের উৎসাহ যোগাতেন মাধব সান্যাল, দীননাথ গোস্বামী অন্নদা চরণ সেন ও যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়। রঙপুর থেকে আসতেন শশধর কর মহাশয়। তিনি রংপুরের কর্মীদের সাথে জলপাইগুড়ির কর্মীদের যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যেতো এঁরা কীর্তন করেন, গীতা পড়েন, মক্কাইট খেলেন। কিন্তু এঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র সংগ্রহ। শহরে কয়েকটি বন্দুক চুরি

গেলো। হৈ চৈ পড়ে গেলো। মোগলকাটা নিদাম অফিস থেকে বন্দুক চুরি গেছে। সওদাগর পট্টির তালেবর মিঞার দোকান থেকে বন্দুক চুরি গেছে। ভূটান রাজ্যের সীমান্ত রাজ্য মাকরা পাড়া চা বাগানে নাকি বিপ্লবীরা কুচ কাণ্ডযাজ শিখছে। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ে এঁরা এসব করতেন। কিন্তু কোন সমিতিই টিকতনা। শশধর কর মহাশয় আবার স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসে এই সমিতিকে সজীব করে তুলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু ততদিনে বারুদ নিভে গেছে। শশধর কর মহাশয় রংপুরে সর্বপ্রথম ১৯১৩ সনে ফৌজদারী আইনে ১০৯ ধারায় গ্রেপ্তার হন। বেরিয়ে এসেই রংপুরের সহকারী পুলিশ সুপার নন্দলাল ঘোষকে হত্যার অপরাধে ৩০২ ধারায় দণ্ডিত হন। অর্থাৎ জেল। তিন মাস পর প্রমাণ অভাবে মুক্তি। ভারত রক্ষা আইনেও বহুবার গ্রেপ্তার হন। তিনি সন্ত্রাসবাদকে টিকিয়ে দল গঠনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বীরেন দাশগুপ্তের ভারত ত্যাগ করায় এবং সতীশ দাশগুপ্তের নজর বন্দী হয়ে থাকায় ইতিপূর্বেই দল ভেঙে গেছে, শেষে তিনি “ফান্টানীদা” নাম নিয়ে ফান্টানী বাস চালাতেন। যুবক দলের তিনি নেতা। সন্ত্রাসবাদ বিদায় নিল সত্যি। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন রাজনৈতিক ধারায় বইতে শুরু করলো। ১৯২০ সনে গান্ধীজী আনলেন অহিংস অসহযোগের জোয়ার। এই জেলাতেও তার ঢেউ এসে লাগলো। সন্ত্রাসবাদীরাও এই ডাকে সাড়া দিল—এই কারণে এতে যে, গন সংযোগ হবে। স্কুল কলেজ বয়স্কটের হিড়িক পড়লো। বিদেশী কাপড় পরা বন্ধ হ'লো। বিদেশী জিনিষ ব্যবহার বন্ধ। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য শুরু হলো, বিরাট আলোড়ন। ইতিমধ্যে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এলেন। তিনি রায়কত বাড়ীর মাঠে জনসভায় বক্তৃতায় জালিয়ানওয়ালা বাগের সেই মর্মস্পর্শ দৃশ্যের কথা বললেন। সভা শুষ্ক, হাজার হাজার নরনারী আবেগে আপ্লুত। গণেশ সান্যাল মহাশয় আইন ব্যবসা ছাড়লেন। জগদীশ দেব রায়কত অনারারী মেজিষ্ট্রেটের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। যোগেশ চন্দ্র ঘোষ ও গণেশ চন্দ্র সান্যাল মহাশয় দেশবন্ধুকে দিয়ে দ্বারে দ্বারে চাঁদা তুললেন কংগ্রেস ফাণ্ডের জন্ত।

১৯২১ সালে জলপাইগুড়িতে জেলা কংগ্রেস গড়ে উঠলো। সভাপতি তারিনীপ্রসাদ রায়, সহঃ সভাপতি যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও সম্পাদক জ্যোতিশচন্দ্র সান্যাল। জ্যোতিশ সান্যাল মহাশয়কে সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হলো, এই কারণে যে ইতিপূর্বে তাঁর ইংরেজ বিদ্বেষ, নিভীকতা ও গভীর পাণ্ডিত্য স্বপ্রমাণিত। কাছারির কাছে করলার উপরে যে পুলে ইংরেজ সন্তান ভিন্ন কেউ যেতে পারতো না সেই পুলের উপর দিয়ে সকলের যাবার অধিকার তিনিই আদায় করেন। লার্ট সাহেবের দরবারে সরাসরি গিয়ে জানান—লার্ট সাহেবের নিরাপত্তার জন্ত শাস্তিকামী পথচারীদের পথরোধ করার অধিকার ইংরেজ সরকারের নেই। এঁদের সঙ্গে জুটলেন চারুচন্দ্র সান্যাল ও খগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয়। চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের মত মেধাবী ছাত্র ডি-এস-সির গবেষণা অসমাপ্ত রেখে মেডিকেল কলেজ ছেড়ে চলে এলেন কংগ্রেসের ডাকে। খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও আইন পড়া বন্ধ রাখলেন। জ্যোতিশ সান্যাল মহাশয়ের পরে সম্পাদক হন ডাঃ তারাপদ সান্যাল। ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব যোগেশ দত্তের উপরে। গ্রামের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়। চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় ডাক্তারী করতে গিয়ে গ্রামের লোকের সঙ্গে মিশছেন ও খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বক্তৃতা করে গ্রামের লোকের মনে ইংরেজ বিদ্বেষ জাগাচ্ছেন। বীরেন দত্ত, হিরণ্যকান্তি বসু ও অধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুল ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। স্বরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও স্বরেশচন্দ্র মৈত্র এই দলে আছেন—তাঁরা তখন গ্রামাঞ্চলে। ধূপগুড়ি, নাগুরমারা, শিল বাড়ী হাট, মাদারী হাট, ফালাকাটা, কালচিনি, আলিপুরছয়ার, প্রভৃতি স্থানে আন্দোলনের

প্রসার ঘটেছে। এই স্বেচ্ছাসেবকেরা ইংরেজ সরকারকে পদু করতে চরকা কাটা, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, মাদক দ্রব্য বর্জনের জগু আন্দোলন করছেন, সভা করছেন, বক্তৃতা করেছেন।

১৯২২ সনে জলপাইগুড়িতে একটি বয়ন বিদ্যালয় খোলা হলো। প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজের গৃহে, পরে কামার পাড়ার একটি খালি বাড়ীতে উঠে আসে। চারু সাংঘাল ছিলেন পরিচালক। বিরণ সিকদার, হেরম্ব বসু, নগেন সাংঘাল, শিবেন ভট্টাচার্য্য, নিশিকান্ত রায়, যোগেশ রায়, কান্দুক মহম্মদ সবলেই কর্মী। নিজেরা চরকা কাটছেন, ঘরে ঘরে চরকা কাটার ব্যবস্থা করছেন। এঁদের পরামর্শদাতা ছিলেন সীতানাথ প্রামাণিক ও রমেশ চক্রবর্তী মহাশয়। বিরণ সিকদার কুষ্টিয়া থেকে এই তাঁত আনান এবং গ্রামে ও শহরে প্রচারের ভার নেন। হেরম্ব বসু প্রকৃত পক্ষে ম্যানেজার। সবটা তিনিই দেখাশোনা করেন। কিন্তু ১৯২৫ সনের পর এই স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। সকলেই গ্রামের দিকে যান। সঙ্গে মুসলমান কর্মীও জুটেছে এবং মুসলমান সমাজের মধ্যেও সাড়া ভাগছে।

১৯২২ সনে বগুড়া, রাজসাহীতে প্রবল বন্যা হয়। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সেবা সমিতি খোলা হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর অক্লান্ত সেবা তরুণদের মনে উৎসাহ জাগিয়েছে। জলপাইগুড়ি থেকেও এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গেলেন আক্কেলপুর ক্যাম্পে। নেতৃত্ব দিলেন চারুচন্দ্র সাংঘাল ও খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। মাখন সাংঘাল, নীরেন বাগচী, নগেন সাংঘাল, অবনী গোস্বামী ও যতীন রায় স্বেচ্ছাসেবক। ১৯২২ সনে স্বরাজ্য দল সৃষ্টি হয়। ১৯২২ সনে সুরাট কংগ্রেসের মত এবারও কংগ্রেসের দুটো দল হলো, এবার Pro-changers এবং no-changers দল হলো, প্রথম দলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু। অপর পক্ষে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। রাশিয়ার “ডুমা” ধ্বংস আন্দোলনের মতো দেশবন্ধু দাস কাউন্সিলে প্রবেশ করে ইংরেজকে বানচাল করে দিতে চেয়েছিলেন। এটা যে সম্ভব হতো না, প্রাদেশিক গভর্নর ভেটোর জোরে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিতে পারতেন, তা তিনি জানতেন। তিনি এটাও জানতেন এতে কাউন্সিলের ভেতর ও বাইরে আন্দোলনের জোট বাধবে। চিত্তরঞ্জন দাস জলপাইগুড়িতে প্রীতি নিধান রায়ের বাড়ীতে এলেন। বর্ধন প্রাঙ্গণে সভা হলো। কিন্তু সেদিন একমাত্র জ্যোতিষচন্দ্র সাংঘাল ছাড়া চিত্তরঞ্জন বড় সমর্থক পেলেন না। এই সময়ে জলপাইগুড়িতে উত্তর বঙ্গ কংগ্রেস সম্মেলন হয়। কর্মীদের অধিকাংশ কেন সকলেই No-changers দলভুক্ত। কোলকাতা থেকে পণ্ডিত শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং বগুড়া থেকে যতীন্দ্র রায় মহাশয় ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এলেন। এঁদেরই দলভারী।

স্বরাজ্য দলের মনোনীত প্রার্থী হয়ে কাউন্সিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন উকীল পূর্ণচন্দ্র মিত্র মহাশয়, তাঁর পক্ষে জ্যোতিষচন্দ্র সাংঘাল। পূর্ণচন্দ্র মিত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রসন্নদেব রায়কতের কাছে পরাজিত হন। সেদিনের রাজনৈতিক ইতিহাস এটা প্রমাণ করেছিল, চিত্তরঞ্জন দাসের দৃষ্টিভঙ্গী কত স্বচ্ছ ছিল। স্বরাজ্য দল হিন্দু মুসলমানকে এক করে সেদিন ব্রিটিশ সরকারকে প্রায় অচল করে দিয়েছিল। No-changers দল গান্ধীজীর আদর্শে সেবা কার্য্য করতেন। জলপাইগুড়িতেও কংগ্রেস থেকে একটা সেবা সমিতি খোলা হলো, সভাপতি রাজেন্দ্র কুমার নিয়োগী মহাশয়। সম্পাদক চারুচন্দ্র সাংঘাল ও কোষাধ্যক্ষ মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। মধুসূদন দাশগুপ্ত, ননী রায়, ভবরঞ্জন গান্ধুলী, মণীন্দ্রনাথ রায়, অবনী গোস্বামী, প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত, যতীন রায়, মোহিনী ভৌমিক, প্রিয়নাথ গোস্বামী স্বেচ্ছাসেবক। পুলিশ এটাকেও বন্ধ করতে বাধ্য করলো। ১৯২৭ সনে এই সেবা সমিতি উঠে গেল কিন্তু সেবা কার্য্য ঠিকই চালু রইল। কিন্তু এই সময়টাতে আন্দোলনে ভাঁটা এসেছে। খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বাসার কাছে আবার খাদি ভাণ্ডার খোলা হলো। কিন্তু ১৯২৩ সনে খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করা হলো। ১৯২৬ পর্যন্ত তিনি অন্তরীণ। ১৯২৪ সনে রায়কত পাড়ায় আবার বয়নাশ্রম নামে একটি তাঁতশালা খোলা হলো। মধুসূদন

দাশগুপ্ত, অমৃত বসু, হরেশ মৈত্র, দেবেশ ঘোষ এর উদ্যোগ। বয়ন বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হরেশ বসু এখানে যোগ দেন। ১৯২৭ এ এটিও বন্ধ হলো। ১৯২৫ সনে এই শহরের কৃতিছাত্র কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েও চাকুরী না নিয়ে ব্যবসা করতে নামলেন। তাঁর বক্তৃতা শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্ত আন্দোলন দরকার। স্বাদেশিকতা ছিল প্রচণ্ড, তাই এ জাতীয় আন্দোলনে তাঁরা নামলেন, কিন্তু অল্প পুঁজি নিয়ে তিনি যে দেশলাই কারখানা করলেন, মাল মশলার অভাবে সেটিও কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল। মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় সরিষার তেলের কল দিলেন, কিন্তু সরিষার অভাবে এটাও বন্ধ হলো। যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছে তখন এমনিতে গঠনমূলক কাজের উদ্যোগ চলেছে।

১৯২৫ সনের ১৪ই জুন কংগ্রেস সভাপতিরূপে মহাত্মা গান্ধী জলপাইগুড়িতে আসেন, সঙ্গে আসেন মহাদেব দেশাই, সতীশ দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়। পাটনা থেকে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারিণীপ্রসাদ রায়, সহঃ সভাপতি যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক অন্নদাচরণ সেন। আম বাগানের মাঠে অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে জে. ওয়াই. এম. এ. আছে সেখানে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। স্বৈচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালনায় ছিলেন মধুসূদন দাশগুপ্ত, ননী রায়, চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়। সেদিন বিংশ-ত্রিংশ হাজার শ্রোতা নির্ধারিত হয়ে গান্ধীজীর বক্তৃতা শুনেছিলেন। পরদিন চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের মাধ্যমে ছাত্রদল জানালো তারা গান্ধীজীর কাছে বিশেষ কিছু শুনেতে চায়, গান্ধীজী তাদের আবেদনে সাড়া দিলেন। আধ ঘণ্টা ধরে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, কিন্তু এক সময়ের জন্ত ছাত্রদের স্কুল কলেজ ছাড়তে বললেন না বরং চরকা কাটার উপর জোর দিয়েছিলেন।

১৯২৬ সনে তেজেশ ঘোষ দেওঘর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন। তবে প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়ে জামিনী যান। ১৯২৬ সনে কংগ্রেসী আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। যুবকেরা চুপকরে বসে থাকতে পারে না। অস্থূলন পার্টি তখন সক্রিয়। এই সময়ে কয়েকটি ব্যায়াম সমিতি গড়ে ওঠে। হরেশ দে, শরৎ দাশ ও দীনদয়াল সরকারের শিক্ষকতায় যুবকেরা শরীর চর্চা করে, কিন্তু পুলিশ এটাকে সুনজরে দেখলো না। পরে পুলিশ এটাকে ভেঙে তছনছ করে দেয়। রমেশ মজুমদারকে পুলিশ খোঁজা খুঁজি করে। কিন্তু তিনি এখান থেকে চলে যান। বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শৈলেন নিয়োগী প্রথমে কোলকাতায় ও পরে ব্রাসগোতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান।

১৯২৮ সনে আর্থানাট্য সমাজগৃহে যুব সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয় দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নলিনী রঞ্জন ঘোষ মহাশয়। বীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় সম্পাদক। ১৯২৯এ অনুষ্ঠিত হয় জেলা ছাত্র সম্মেলন। অধ্যাপক অতুল চন্দ্র সেন সভাপতি এবং চারুচন্দ্র সান্যাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই সম্মেলনীতে এত সাড়া পড়ে যে সহরের আপামর জনসাধারণ যোগ দিয়েছিল।

১৯২৯ থেকে আন্দোলন জেগে ওঠে। খগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয় জেল থেকে বেরিয়ে ‘মুক্তিবাণী’ কাগজ বের করেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে পুলিশের তাড়নায় তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। জ্যোতিষ চন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের ‘জনমত’ পত্রিকা তখন লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার। ইংরেজের রোষবহি কিন্তু সেদিন জনমতকে বন্ধ করতে পারে নি। জ্যোতিষ চন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের লেখনীতে ছিল রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা, বাঙলার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের মননশীলতা, চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও আপোষহীন নির্ভীকতা।

১৯৩০ সনে আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ার এলো, শহর গ্রামের মানুষ জোট বাঁধলো—“ইংরেজ আইন মানবোনা।” বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা নিয়ে করলা নদীর দুই পাশে শোভাযাত্রা বের হয়েছে বিরাট বিরাট নৌকা করে। নদীর দুই পাশে অগণিত দর্শকের ভীড়। প্রতিমা নিয়ে যে নৌকা চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি করে নৌকা। তাতে প্রতিমা নেই—তাতে প্রচার হচ্ছে “স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।” “বিলেতী জিনিষ বয়কট কর”, অস্পৃশ্যতা দূর কর”, “মাদক দ্রব্য বর্জন কর।” সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের আক্রমণ। সেদিন মিছিলের নেতা ছিলেন বীরেন দত্ত মহাশয়। সে সময়ে রাজকোষের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো— চাক্রচন্দ্র সান্যাল, শশধর কর, অজিত চক্রবর্তী, অনিল বাগচী, বিজয় হোড়, বীরেন দত্ত, রজত গুহ ঠাকুরতা, স্বপ্নকাশ দত্ত, শচীন দত্ত, চুনীলাল বসু, ভূপতি চন্দ্র, যতীন রায় প্রমুখ যুবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। এই সময়ে জলপাইগুড়ি জেলে বন্দীদের উপরে নির্যাতন করা হয়। বীরেন দত্ত মহাশয় ভীষণভাবে আহত হন। এই সময় জেলার অনেকেরই দীর্ঘদিন জেল হয়। এই সময় শহর ও গ্রামে বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার করা হয়, কিশোর যুবক থেকে শুরু করে নেতাদের পর্যন্ত আটক করা হয়, এবং বিভিন্ন জেলে চালান দেওয়া হয়। খগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, ভবরঞ্জন গাঙ্গুলী, সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী, যোগেশ দত্ত, নীরেন বাগচী, ভবানী চক্রবর্তী, অঘোর সরকার, নৃপেন মৌলিক, নীরেন সান্যাল, শচীন দাশগুপ্ত, অরুণ চক্রবর্তী, সত্যগোপাল, ডাবলু বসু, শক্রয় সিংহ, আশুতোষ দাস, বীরেন বসু, শঙ্কর সান্যাল, বরেন ভৌমিক, নরেন ভৌমিক, অখিলেশ সান্যাল, দেবেন দেব, দেবানন্দ রায়, শিবকান্ত রায় প্রমুখের জেল হয়। পাটগ্রামের বিশিষ্ট কর্মী (কৃষক) কেশব দত্তকে ডাকাতির দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং সাত বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই সময় আন্দোলন গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, গয়ারকাটা, প্রভৃতি অঞ্চলে আইন অমান্য করে হাট, বাজার, হরতাল করতে গিয়ে অনেক কর্মী নির্যাতিত হয়েছেন এবং অনেকের জেল হয়েছে। এই সময় শহর থেকে অরুণা দাশগুপ্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মতি ঘোষ, হরলাল গ্রেপ্তার হলেন। ধূপগুড়ি থেকে যোগেশ্বর রায়, বিড়ল রায়, টুনিয়া রায়, রমাকান্ত রায়, হরিচরণ রায়, জাবুরা বৈরাগী, সত্যেন বাহ্নীয়া, উমেশ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জেলে আনা হয়। টুনিয়া রায়ের উপর পুলিশ সেদিন অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। এক বৎসর পরে গান্ধী আরউইন চুক্তি হলো, সকলেই ছাড়া পেলেন। একমাত্র কেশব দত্ত ও বীরেন দত্ত ছাড়া। ছাড়া পেয়ে কর্মীরা সব গ্রামে গেলেন—বাহন শশধর কর মহাশয়ের ট্যাক্সি। সেদিন চাক্র সান্যালের উদ্যোগে “কংগ্রেসের ইতিহাস”, “সংসার চলবে কেন”, “তোমাদের কাজ”, “তোমাদের রোগ”, “পাটের দাম”, প্রভৃতি ছোট ছোট প্রচার পত্র ব্যবহার করা হয়। এই জাতীয় জিনিষ গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সাড়া জাগালো। কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। গ্রামে প্রচারের পর সকলেই দোমহনী রেল স্টলের ছাত্রাবাসে আশ্রয় নিতেন। শিক্ষক কামদা মুখার্জী শুধু আশ্রয় দাতা নন, সহযোগী। মৌলালীর খর্গ নারায়ণ রায় ও পাটগ্রামের অন্নদা প্রসাদ সেদিন ঐ ছাত্রাবাসে থেকে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

১৯৩০ সনে কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব আসে শ্রীনাথ হোড় ও কবিরাজ সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের উপরে। গান্ধীজীর হরিজন উন্নয়নের আদর্শে এখানেও হরিজন বিদ্যালয় খোলা হয়। এর শুরু থেকে হেরম্ব বসু জড়িত। আর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আদর্শে বর্ধন প্রাঙ্গণে কবিরাজ সতীশ লাহিড়ীর উদ্যোগে যোগেন দত্তকে দিয়ে দুর্গাপূজার পৌরোহিত্য করানো হয়।

গান্ধীজী গোল টেবিল থেকে ফিরলেন। শুরু হলো ১৯৩০ সনে “ভাণ্ডি মার্চ”। এই শহরেও ধরপাকড় শুরু হলো। এনিকে কংগ্রেস কর্মীদের সভা শোভাযাত্রা, অপরাধিকে ইংরেজ শাসকের প্রতিনিধি ইংরেজ চা-করদের কৃষকায় মাফুসের উপর বর্ষোচিত অত্যাচার। ধীরেন বোস ও রবীন্দ্রনাথ কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহ করতে গেলেন। আর খগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, শশধর কর, চাকু চন্দ্র সান্মাল, ধীরাজ সেন, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, রবীন্দ্রনাথ শিকদার, নীরেন বাগচী, লক্ষ্মণ মৌলিক, বরেন ভৌমিক, অতুল দত্ত, দেবেন সরকার, শচীন নিয়োগী, বীরেন নিয়োগী, মনি নাগ, বোদা মহম্মদ ও বিভূতি চক্রবর্তী প্রমুখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। ভবানী চক্রবর্তীকে প্রচণ্ড মেরে পুলিশ উকীল পাড়ার রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায় আর অখিলেশ সান্মালকে লাটাগুড়ি খাপদ সঙ্কুল গভীর অরণো বেঁধে রাখে। এই সময় মহিলাদের মধ্যে গ্রেপ্তার হন হীরাপ্রভা সেন, ননীবালা ভৌমিক, সুনীতি নিয়োগী, স্কুমুগুরী সেন। জলপাইগুড়ি থানায় কৃষক কর্মী দেবানন্দ রায়, শিবকান্ত রায়, মুগেন রায়, ললিত রায় গ্রেপ্তার হন। বোদা থেকে ভোলা মজুমদার, প্রমোদ চক্রবর্তী, দেবীগঞ্জ থেকে গণেশ চক্রবর্তী। গয়্যার কাটার মতি ঘোষকে ডুয়ার্স থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। একমাত্র সুরেশ গুহ কোন রকমে রক্ষা পেয়েছিলেন। হরতাল উপলক্ষে হাটবাবু মোবারক আলীর চাকুরী গেল। গোপন অস্ত্র পাওয়ার অপরাধে তারক বোসের এগারো বৎসর জেল হলো। ধূপগুড়ি থানার গোপেশ্বর রায় ও বিড়ল রায়কে পুলিশ পায়ে দড়ি বেঁধে সারা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়। ডাউকীমারীর রমাকান্ত রায় গ্রেপ্তার হন। হরিচরণ সিংহ রায় ও রজনী পরামাণিককে পুলিশ গভীর জঙ্গলে বেঁধে রেখে আসে। গধেয়ার কুটারের জাবুয়া বৈরাগী ও শুকমোহন গ্রেপ্তার হন।

বানারহাটে উমেশ চৌধুরীকে ইংরেজ চা-কররা প্রকাশ্য রাজপথে প্রহার করে। ডুয়ার্সে তখন স্বৈরাঙ্গদের রাজত্ব। নলিনী মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেস অফিস করার অপরাধে রাম দাসের বাড়ী বাজেয়াপ্ত হয়।

ময়নাগুড়ি থানার ভটভট রায়ের জেল হয়। বড়তলির সাকালু রায়, শালবাড়ীর হাতী দত্ত রায়, রজনী রায় পুলিশের হাতে প্রহৃত হন। রাঘের হাটের তারিণী বাসুনীয়ার বাড়ী হাতী দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তার পুত্র সত্যেন বাসুনীয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। ময়নাগুড়িতে কংগ্রেস নেতা সরোজ লাহিড়ী ও লাটাগুড়ির খর্গ মোহন রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পাটগ্রামে প্রিয়নাথ গোস্বামী, বরদা ভৌমিক, যোগেন দাস, কেশব দত্ত সকলে কংগ্রেস কর্মী — তথা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যে কোন কারণেই এঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

১৯৩২ সনে জেলার উপর দিয়ে অত্যাচারের বন্যা বয়ে যায়। এই সময়ে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন, মেদিনীপুরের পেড়ী হত্যার আশামী ফণীন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত জলপাইগুড়ি জেলে। শহরের যুবকদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ হচ্ছে। এই সময় দেশে সম্মানবাদের কাজকর্ম চলছে। বীরেন দত্ত যুবকদের নেতা — রাজশাহী কলেজ থেকে তখন জলপাইগুড়িতে এসে বসেছেন। বড়রকম কাজকর্ম শুরু হবার আগেই শহরের সচেতন ছেলেদের প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করা হলো। বীরেন দত্ত, বীরেন চৌধুরী, কালিদাস রায়, লক্ষ্মণ মৌলিক, বীরেন দাশগুপ্ত, শচীন দত্ত, রমণী চন্দ, অজিত বসু, স্বপ্রকাশ দত্ত, বিজয় হোড়, রজত গুহ ঠাকুরতা, অজিত চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ (নসু) নিয়োগী, ভবানী চক্রবর্তী, অঘোর সরকার, নলিনী (হাবু) চক্রবর্তী, দীনেশ রায়, ভীষ্মদেব, শৈলেন নাগ, হারাদন চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ শিকদার, ভূপেন গাঙ্গুলী, নগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শশধর কর, বরেন ভৌমিক, বিনয় ঘোষ দত্তিদার, মনমোহন ঠাকুর, নীরেন বাগচী, অনিল বাগচী, বীরেন নাহা, নারদ দত্ত,

নরেশ চক্রবর্তী ও বিভূতি চক্রবর্তী, প্রমুখকে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘদিনের জেল দেওয়া হয়। জেলে এঁদের মার্কস বাদের অনুশীলন চলে। ছাড়া পেয়ে এঁদের সকলেই প্রায় কৃষক আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়েন। তখনও জেলায় কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়নি। এই সময় শহরের অনেক মহিলা কংগ্রেস ও সম্মেলনের কাজ করতে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে মহেন্দ্রবালা দেবী, বীণা চৌধুরী, সরযু সরকার, বাণী ভৌমিক, শ্রীযুক্তা মৌলিক, ও শ্রীযুক্তা ভাট্টা প্রমুখ। নেতৃত্ব করেন সুভাষিনী ঘোষ। সে দিনের উন্নত ছেলের কাছে সুভাষিনী ঘোষের নেতৃত্ব ও মাতৃস্নেহ পরম আশ্রয় ছিল।

১৯৩৪ সনে রায়কত পাড়ার নির্মল চক্রবর্তীকে পুলিশ পিস্তল সমেত গ্রেপ্তার করে ও সেই সঙ্গে শচীন বোসকেও। এঁদের দশ বৎসরের জেল হয়। শঙ্কর সাংঘালকে টিটাগড় ঘড়ঘন্ডে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও কোন প্রমাণ ছিল না। এঁদের উপরে অমাবৃত্তিক অত্যাচার হয়। এই সময় বিহারে ভূমিকম্প। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আতঁদের সাহায্যের জন্ত আবেদন করেন। জলপাইগুড়িতেও একটি ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি তারিণী প্রসাদ রায় ও সহঃ সভাপতি এ. এফ. রহমান। যুগ্ম-সম্পাদক খান বাহাদুর এ. এম. এল. রহমান ও চাকচন্দ্র সান্যাল। কংগ্রেস ফাণ্ডে দশ হাজার টাকা তোলা হলো। তখন কংগ্রেসের কাজে ভাঁটা পড়েছে। কংগ্রেসের ভিতরে তখন মতবৈধতা দেখা যাচ্ছে।

১৯৩৫ সনে দিনাজপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন হয়। জলপাইগুড়ি থেকে অনেকেই যান। নেতৃত্ব করেছিলেন জ্যোতিষ চন্দ্র সান্যাল মহাশয়, কিন্তু ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কমন্ট্রোল এণ্ডয়ার্ডের প্রতি কংগ্রেসের “না গ্রহণ না বর্জন” মূলক প্রস্তাব গ্রহণে জ্যোতিষ সাংঘাল মহাশয় তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন— এই আপোষ রফায় সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে, এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উপর আঘাত হানা হবে। এর ফলে বাঙলা বিভাগ অনিবার্য—একথা সেদিন সেই সভায় বলেছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্র বসুর নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। যুবকেরা অন্তরীণ থাকায় কংগ্রেসের কাজে একটু ভাঁটা পড়ে। একে একে অনেকে জেল থেকে বের হলেন। কিন্তু মতটা পাণ্টে গেছে। তবু কংগ্রেস আছে। তবে শহরে নয়। গ্রামে গ্রামে কৃষকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন। ১৯৩৯ সনে জলপাইগুড়িতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বাতাবরনে যে প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করল সেটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্মরণীয়। পাণ্ডাপাড়ায় প্রকাণ্ড প্রান্তর জুড়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের আকার, জনসমাগম, গান্ধীর্ষ দেখে মনে হয়েছিল— বোধ করি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস সম্মেলন।

এতে বাঙলা দেশের সব প্রান্তের নর-নারী শুধু যোগ দেয় নি, অংশগ্রহণ করেছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন চাকচন্দ্র সান্যাল, সাধারণ সম্পাদক—খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, স্বেচ্ছাসেবক অধিনায়ক—শশধর কর। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর পরিচালনা করেছিলেন—সুনীতি নিয়োগী, কোষাধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র বাগচী, সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু ও প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু। বিরাট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। প্রদর্শনীর অধিকর্তা ডাঃ ধীরাজ মোহন সেন। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন খবর আসে পটুভী সীতারামিয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র বসু বিপুল ভোটে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হর্ষধ্বনি ও আনন্দ উল্লাসের জন্ত সভা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। এই সভায় কৃষক আন্দোলনের নেতা ও কর্মী বন্ধিম মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় যোগদান করেন। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজারে

হাজারে কৃষক এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসে। প্রথমে নানা কারণে তাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। পরে সুভাষচন্দ্র বলেন “ঐ কৃষক ভাইদের ঢুকতে দিতে হবে।” তখন হাজার হাজার কৃষক ভিতরে ঢুকে চুপ করে বসে বক্তৃতা শোনেন।

মাঝে মাঝে তাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। কৃষকেরা দাবী করেন ইংরেজ সরকারের কাছে দাবী করা হোক যাতে পাটের দাম বেঁধে দেওয়া হয়। তাঁরা বলেন ইংরেজের স্বার্থে সরকার “রবিনসন বালির দাম বাধতে পারে—কিন্তু কৃষকদের স্বার্থে পাটের দাম কেন বাধা হবে না?” সেদিনের সেই সভা সর্বস্বরের মানুষের মুক্তি আন্দোলনের সভা।

দ্বিতীয় দিনে সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন। তাঁর সেই বক্তৃতা মুক্তি পথ নির্দেশ করে। তিনি বলেন— ১৯৩২ সনের শেষের দিকে বিশ্বযুদ্ধ অবধারিত। ইংরেজকে আঘাত হানার এই সুযোগ। ইংরেজের কাছে দাবী করা হোক ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে,—নচেৎ ভারতবাসী যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করবে না। “ইংরেজ ভারত ছাড়” ঐতিহাসিক ঘোষণা ঘোষিত হয়েছিল জলপাইগুড়ি থেকে। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে আপোষ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

১৯৩২ সনে জলপাইগুড়িতে বীরেন দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে—ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির যোগাযোগ কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন—শচীন দাশগুপ্ত, গুরুদাস রায়, নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পরিমল মিত্র, চুণীলাল বসু, মাধব দত্ত তখনও কৃষক আন্দোলন নিয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছাত্র আন্দোলন করেছেন। আবার কেউ কেউ গ্রামে গেছেন, কৃষক আন্দোলনকে জোরদার করতে। গুরুদাস রায়, দেবীদাস রায়, নরেশ চক্রবর্তী, বীরেন নিয়োগী ও মাধব দত্ত কৃষকের বন্ধু। কর্জাধানের তিনগুণ হ্রদ, দাদনের চারগুণ হ্রদ, হাজার ছুতোয় বাজে আদায়ের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাতে লড়াই শুরু হলো জমিদার, জোতদার, মহাজনের সঙ্গে। তাঁদের আন্দোলন “বাজে আদায় বেআইনি”। দেবীগঞ্জ, বোদা, পচাগড়-এ কমিউনিষ্ট পার্টির মিটিং বসত। “লাঙ্গল যার, জমি তার”, “জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর”, “কৃষকের হাতে জমি চাই”, “তেভাগ চাই” তাদের দাবী “নিজ ধান গোলায় তোলা” “ধানের উপর কবজা রাখো” ধ্বনি উঠছে আর হৃদয় দীঘিতে পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি শহরে ছাত্র আন্দোলন, “ভবেশ দারোগার মাথা চাই”।

এই সময় যুবকদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির আকর্ষণ বেড়ে যায়। মেডিকেল স্কুলের ছাত্র ও নাসদের মধ্যে এদের প্রভাব পড়ে। স্বধীন মৈত্র, অবনী তলাপাত্র প্রমুখকে এই সময় গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কৃষক আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তরুণরা তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কৃষক আন্দোলনে উৎসর্গ করেন। হর ঘোষ, বীরেন পাল, মনোরঞ্জন দাসগুপ্ত, গোবিন্দ কুণ্ডু, কৃষক আন্দোলনের সৈনিক। সেদিনের ময়না দিঘির মাধব দত্তের চালা চারু মজুমদার আজ নকশালবাড়ী আন্দোলনের নেতা। বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জে চারু মজুমদারের কৃষক আন্দোলনের শুরু। এই সময় বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মী যোগ দেন। বিভা দত্ত, কল্যাণী চন্দ, কল্লনা নিয়োগী, লীলা সেন, আশা রায় চৌধুরী, অমিয়া নন্দী শহরে প্রচারের কাজ করেন, প্রয়োজনবোধে গ্রামে যান। সুখময় দাসগুপ্ত, আবহুস সামাদ, নারায়ণ বিশ্বাস, নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, নিখিল রায় চৌধুরী, অনিমেষ রায়, মানময় দাশগুপ্ত, কাহ্ন দাসগুপ্ত, অরুণ সেন, পরেশ মিত্র, স্বদেশ সাহা, দিলীপ ঘোষ, শান্তি নিয়োগী, জলি সরকার, রামপ্রসাদ রায় চৌধুরী, আবুল হদা প্রমুখ সেদিন শহরে কমিউনিষ্ট পার্টির তরুণ কর্মী।

স্বভাষচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো। ১৯৩৯ সনেই জাপান ও জার্মানীর আক্রমণে অবস্থা কঠিন হলো। স্বভাষচন্দ্র ততদিনে মুক্তিফৌজ গড়ে তুলেছেন। কংগ্রেস ইংরেজের কাছে প্রস্তাব করলো—“ইংরেজ ভারত ছাড়ো”। ১৯৪২শে শুধু বাঙলা নয় ভারতবাসী “ইংরেজ ভারত ছাড়ো” আন্দোলন। সেদিনের আন্দোলনের একটি মাত্র ধ্বনি—“করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে”। মরতে ও মারতে কঠিন সঙ্কল্প। জেলায় জেলায় নেতারা আটক হলেন, জলপাইগুড়ি জেলায় সেদিন খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শশধর কর, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, চারুচন্দ্র সান্যাল, রবীন্দ্রনাথ সিকদার, নীরেন বাগচী, হীরেন সান্যাল, সাধন রায়, প্রশমন রায়, লক্ষণ মৌলিক, শচীন লাহিড়ী, প্রমুখ প্রায় তিনশত কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলো। প্রফুল্ল ত্রিপাঠী এখান থেকে পালিয়ে ছিলেন কিন্তু মেদিনীপুরে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু তাই বলে আন্দোলন থামে নি, যোদ্ধারাই নেতা। মিছিল করে সৈন্যরা আগিয়ে চলেছে। থানা পুড়ছে, কোর্ট পুড়ছে, রেল লাইন উপড়ে ফেলা হচ্ছে। ইংরেজের সঙ্গে কোন সহযোগিতা নয়। জেলায় জেলায় ইংরেজের দেওয়া খেতাব ছাড়ছেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আন্দোলনের সমর্থনে পদত্যাগ করছেন। জলপাইগুড়ি পৌর কমিশনার চারুচন্দ্র সান্যাল, অবনীধর গুহ নিয়োগী, প্রতিনিধান রায়, শ্রীনাথ হোড়, সফিকুল ইসলাম পৌরসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। গ্রাম শহরের মানুষ বৃকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে ইংরেজ তাড়াও। সেদিন জলপাইগুড়ির যুবকরাও উত্তপ্ত। যে কোন মুহূর্তে যে কোন কিছু ঘটতে পারে। ৯ই আগষ্ট বিরাট মিছিল, সম্মুখ সারিতে পতাকা নিয়ে তারা ব্যানার্জী ও উমা দাশগুপ্ত। অতবড় মিছিল ইতিপূর্বে জলপাইগুড়িতে দেখা যায়নি। সেদিনের সৈনিক জগন্নাথ বাগচী, মোহিত সান্যাল, পীযুষ ব্যানার্জী, অমলেশ সান্যাল, রবি চৌধুরী দেবব্রত মজুমদার, অনিল রায় (বুড়া), বিধান সিংহ, বাদল সরকার, রমাপদ ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন গুহ, রবীন বাম্পটি, অনিল রাহত, কুমারকৃষ্ণ ব্যানার্জী, নির্মলেন্দু সান্যাল, রথীন রায়, হারাধন চন্দ্র, অনিল গুহ নিয়োগী প্রমুখ। শহর মফঃস্বলের সব স্কুল বন্ধ, পরীক্ষা বন্ধ। আলিপুরহাটার, কুমারগ্রামের মানুষও কঠিন শপথ নিয়ে মিছিলে নেমেছে।

এদিকে নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের পূর্ব সীমান্তে। প্রতিদিন রেডিওতে স্বাভূমির মুক্তির জন্ত প্রাণ কোরবানীতে প্রস্তুত হতে নেতাজীর আহ্বান মানুষকে চঞ্চল করেছে। মানুষ আবেগে ফেটে পড়েছে। “করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে”, তারা পথ নির্দেশ চায়। কিন্তু অপর দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যারা এতদিন কৃষকের মুক্তির জন্ত আন্দোলন করেছে, যারা সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ চিহ্ন নিঃশেষ করতে চেয়েছে— তারা সেদিন প্রচার করলো এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করতে হবে। অর্থ দিতে হবে, সৈন্য দিতে হবে। তারা সেদিন নেতাজীর মুক্তি ফৌজকে পঞ্চম বাহিনী বলেছে। তারা বলেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে গেলে ফ্যাসিস্ট হিটলারকে সাহায্য করা হবে। তাদের বক্তব্য সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্রপক্ষ যেহেতু ইংরেজ কাজেই ইংরেজকে কোন প্রকারে বাধা দেওয়া যাবে না। এই জেলার গ্রাম শহরে জাতীয়তাবাদী মুক্তিকামী তরুণদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের ঘটে বিরোধ। কিন্তু তারা আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারেনি। ক্ষতি করেছেন—যারা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। কিন্তু এতে মুক্তিকামী সৈনিকরা হতাশ হয়নি। তখন নেতাজীর বাণী তাদের মনে জল জল করছে—

“Give me blood, I will give you freedom.” “আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেব”। “অগ্নায়ের সঙ্গে আপোষ করা পাপ।”

১২৪০এ এই শহরে হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়। এঁরা রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। কমুন্সাল এওয়ার্ডের “না গ্রহণ না বর্জন নীতি”তে অনেকেই কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারায়। মুসলিম তোষণ নীতিতে অনেক কংগ্রেসী সেদিন প্রতিবাদ করেন এবং হিন্দু মহাসভার সমর্থক হন। এবং প্রকাশ্যে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। যদিও নলিনীরঞ্জন ঘোষ, শ্রীনাথ হোড়, কবিরাজ সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় পূর্ব থেকে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১২৪২ সনে জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নলিনীরঞ্জন ঘোষ এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কুমুদিনী কান্ত চক্রবর্তী সম্পাদক, স্থানীয় আর্থ্য নাট্য সমাজ হলে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত মহারাষ্ট্র নেতা ডাঃ মুঞ্জে এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, শ্রীপদমরাজ চৈন প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ লাহিড়ীকে জলপাইগুড়ি-মৈমনসিংহ আসনে কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রার্থী মনোনীত করা হয় এবং এই আসনে তিনি জয়লাভ করেন।

১২৪৫ সনে ভাগলপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সেই সময় মৌলভী ফজলুল হক বঙ্গ দেশের মুখ্যমন্ত্রী ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অর্থ মন্ত্রী। বিহার সরকার কিন্তু এই সম্মেলনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। আর এই সম্মেলনে যোগদানের জন্ত নলিনীরঞ্জন ঘোষ ও কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কুড়িজন সত্যাগ্রহী আইন অমান্য করতে রওনা হন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মন্ত্রী হয়েও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে রওনা হন। পথে তাঁকে আটক করে ডাক বাংলোতে রাখা হয় এবং বাদ বাকী সত্যাগ্রহীদের বিহার সরকার নিজ খরচে ফেরৎ পাঠান। জলপাইগুড়ির সত্যাগ্রহীরা ফেরৎ আসতে রাজী না হওয়ায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল। এই সময় হিন্দু মহাসভার জেলার প্রধান কর্মী ছিলেন প্রাক্তন নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী যোগেশ দত্ত, বোদার প্রমোদারঞ্জন চক্রবর্তী, তেঁতুলিয়ার নীলমনি দাস, অনাথনাথ বক্সী ও বোদার রামবিহারী ঘোষ।

এই সময়ে হিন্দু মহাসভা যেমন জোর কদমে চলছে তেমন কিংবা তার চেয়েও জোর চলছে মুসলীম লীগ। নবাব মুসারফ হোসেন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানেরা এই শহরে প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক স্বচ্ছলতা, প্রচণ্ড দাপট, ডাক্তার, মোক্তার, উকীল ও চা-কর এক জোট। এক আওয়াজ “লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” “নরায়ণে তকদির” এদের রাগ ইংরেজের উপরে নয়, কংগ্রেসের উপরে। বক্তব্য কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান। একদা কংগ্রেসের তোষণ নীতি এদের বাড়িয়ে তুলেছে, ইন্ধন জুগিয়েছে ইংরেজ, শহরে এমন মুসলমান বাড়ী নেই, যে বাড়ী থেকে মুসলীম লীগের সভা নেই। ইতিমধ্যে শহরে কলেজ হয়েছে। কলেজী শিক্ষার আবহাওয়া শহরের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জনযুদ্ধপন্থী কমিউনিষ্ট বা ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, মুসলমানদের চটাবে না। এই সময় জলপাইগুড়িতে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা হয় কবিরাজ সতীশ লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায়। প্রধান সভাপতি, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, সম্পাদক শচীন লাহিড়ী। এই সময় খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শশধর বর, রবীন্দ্রনাথ সিকদার, লক্ষণ মৌলিক জেল থেকে বের হলেন। জেল থেকে বেরিয়ে শশধর বর হলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি, সম্পাদক সুশীল বসু। ১২৪৭ সনে সভাপতি অজিত চক্রবর্তী মহাশয়। ১২৪২ সনের পর থেকে শহর ও গ্রামাঞ্চলে যুবকরা নেতাজীর অহুগামী। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব যুবকদের মুখে মুখে, পাড়ায় পাড়ায় আজাদ হিন্দ দল গঠন, ঝাঁসী বাহিনী গঠন, ফরওয়ার্ড ব্লকের যুবকদের তখন দাঙ্গা দাওয়াত। একদিকে আরম্ভ স্বাধীনতার জন্ত

আন্দোলন অপর দিকে জাতীয়তাবাদ বিরোধী কমিউনিষ্ট পার্টি ও সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে লড়াই। কলেজের ছেলেরা ফরওয়ার্ড ব্লকের সভা হচ্ছে, সভা হচ্ছে স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা। সেদিন ছেলেমেয়েরা সমস্ত সঙ্গীর্ণতা ছাড়িয়ে উঠেছিল। জলপাইগুড়িতে আজাদ হিন্দ পাঠাগার খোলা হলো। অর্থ ও জিনিস দিয়ে সাহায্য করলেন সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, গোপালপুর হাউস, সুশীল মল্লিক। ডাঃ ভূপাল বসু দিলেন তিনশত টাকা। কবিরাজ সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, ডাঃ অবনীধর গুহনিয়োগী, ডাঃ চারু চন্দ্র সান্যাল এই পাঠাগারের সঙ্গে জড়িত হলেন। প্রধান উদ্যোক্তা মণি নাগ, নলিনী চক্রবর্তী, সুশীল বসু, শচীন লাহিড়ী, গুরুেশ্বর সান্যাল, রমাপদ ব্যানার্জী, শিশির মিত্র, রবীন রায়, মুকুলেশ সান্যাল, জীবন সিংহ, মনোরঞ্জন গুহ, সুরঞ্জিত সান্যাল, স্বকুমার ভট্টাচার্য। মণীন্দ্রমোহন রায় এই পাঠাগারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

এই পাঠাগারকে কেন্দ্র করে একটা চিন্তা গড়ে ওঠে। সমস্ত রাজনৈতিক সচেতন যুবক ও যুবতী এর সভা। কলেজের রাজনীতিকে যেমন নিয়ন্ত্রিত করেছে ফরওয়ার্ডব্লকের ছেলে-মেয়েরা, ঠিক তেমনি শহরের রাজনীতিকে ফরওয়ার্ডব্লক। রবীন্দ্রনাথ সিকদার ও খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সেদিন ফরওয়ার্ডব্লকের পৃষ্ঠপোষক। যোগেন মণ্ডল জলপাইগুড়িতে এলেন সভা করতে। ফরওয়ার্ডব্লকের ছেলে-মেয়েরা সেদিন তাঁকে সাম্প্রদায়িকতার জগ্ন লাক্ষিত করলো। ১৯৪৬ সনে দাঙ্গা বাঁধলো। ফরওয়ার্ডব্লকের ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় শাস্তি সেনা গড়ে তুললো। শাস্তি মিছিল বের করলো। দাঙ্গার সঙ্গে লড়লো। তাদের বক্তব্য দাঙ্গা নয়, বাঙলা ভাগ নয়, ভারত ভাগ নয়। “অথগু স্বরাজ”, “অল পাওয়ার টু দি ইণ্ডিয়ান পিপল”। সেদিনের ফরওয়ার্ডব্লক কর্মী নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, শচীন লাহিড়ী, অজিত চক্রবর্তী, মণি নাগ, রথীন রায়, অমরেন্দ্র কুণ্ডু, ডাঃ মোহিত সান্যাল, নির্মলেন্দু সান্যাল, রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুলেশ সান্যাল, বাদল সমাজদার, মানস সান্যাল, বাদল সান্যাল, অরুণা সান্যাল, রেবা সান্যাল, দীপ্তি রায়, গীতা গুহ, উমা দাশগুপ্ত, মিলু দত্ত, প্রতিভা চক্রবর্তী, প্রবোধ সরকার, নগেন সরকার, কুমুদ ঘোষ, সাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল বসু, প্রভাত দাশগুপ্ত, জগদীশ দাশগুপ্ত ও নিরঞ্জন দত্ত প্রমুখ। ঠিক সেই সময় বোম্বাইতে নো-বিদ্রোহ, ভিয়েতনাম দিবস, রসিদ আলি দিবস, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার — সমগ্র দেশে প্রচণ্ড আবেগ, প্রচণ্ড বিক্ষোভ, ইংরেজ ভারত ছাড়া আন্দোলন।

দুই মাস বাদে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এলেন। আলাপ-আলোচনা হলো। ভারত ভাগ স্বীকার করা হলো। অথগু স্বরাজের আন্দোলনের ভূমিতে বাঙলা, পাঞ্জাবকে ভাগ করে ভারত পাকিস্তান হলো। শতকরা ৭০ জন হিন্দু বসবাস সত্ত্বেও জেলা ভাগ হল। বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, পাটগ্রাম, তেঁতুলিয়া পাকিস্তানে গেল। ডোমারের ফরওয়ার্ডব্লকের সভায় আবদুল মালেকের একটা কথা — ‘একগাছে বাঁধা ছিল ছাগল, তাকে আর এক গাছে বেঁধে দেওয়া হ’লো।’ বোদায় ধোঁধো মহম্মদ তখন আজাদ হিন্দের টুপি পরে বুকে নেতাজীর ফটো ঝুলিয়ে বলে চলেছে — “অন্তায়ের সঙ্গে আপোষ করা পাপ।” “ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ”, “জয়হিন্দ”। খবর পাওয়া গেছে পাকিস্তানের আনসার বাহিনী চিরদিনের জগ্ন ধোঁধো মহম্মদের “জয়হিন্দ” ধ্বনিকে শুদ্ধ করে দিয়েছে। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট পাঁচটা থানা বাদ দিয়ে এই জেলার অফিস-কাহারিতে জাতীয় পতাকা উঠলো। স্বাধীনতা এলো — কিন্তু জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো কি?

স্বাধীনতা সংগ্রামে আলিপুরদুয়ার

শ্রীঅনিল গঙ্গোপাধ্যায়

(মহকুমার গোড়াপত্তন)

আলিপুরদুয়ার।

জলপাইগুড়ি জেলার মহকুমা আলিপুরদুয়ার।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ইংরেজ-ভূটান যুদ্ধের অবসানে ময়নাগুড়ি, ডালিমকোট ও আলিপুরদুয়ার এই তিনটি মহকুমা নিয়ে ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স জেলা গঠিত হয়। এ অঞ্চলের সিভিল অফিসার ডেনো সাহেবের পরে কর্ণেল হেদায়েৎ আলী সিভিল অফিসার নিযুক্ত হন। ইংরেজ-ভূটান যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ হয়ে লড়েছিলেন তিনি। কর্ণেল আলীর নামেই আলিপুর। আলিপুর থেকে মহকুমার উত্তর সীমান্ত ভূটান রাজ্যে প্রবেশের জন্ত রয়েছে অনেকগুলো 'পাস' বা গিরিপথ। সেই গিরিপথগুলোকে ইংরেজরা বলত 'ডোরস্' বা দুয়ার। 'আলিপুর'এর পরে 'দুয়ার' শব্দের প্রয়োগে মহকুমার নাম আলিপুরদুয়ার। 'কাটা' 'মাড়ি' 'গুড়ি' তিনে জলপাইগুড়ি। কুমারগ্রামদুয়ার, বন্ধাদুয়ার, ষমদুয়ার সব দুয়ার নিয়ে আলিপুরদুয়ার—অরণ্যসঙ্কুল এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ।

(বন কেটে বসত ও চা-বাগিচা)

বন কেটে শুরু হল বসতি।

তৈরী হতে লাগল চাষের জমি।

পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার কতিপয় ভাগ্যধর্মীও চলে এলেন ডুয়ার্সের এই স্থাপনসঙ্কুল অঞ্চলে। ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যা বাড়ল। বসতি শুরু হল। চা বাগিচা খোলা হল। কাঠের ব্যবসা চালু হল। রেল লাইন বসল। গাড়ী চলল। রেলের বাবুра এলেন। স্কুল খোলা হল; এলেন মাষ্টার মশাইরা। বিবাহ, সাদী, পূজা; পুরুত এলেন। হাট বসল, দোকানদারী চলল। ক্রমে মিস্ত্রী, করাতি, ধোপা, নাপিত, কুস্তকার। সব কিছু মিলে আলিপুরদুয়ারে এক নতুন সমাজ চেতনা।

(জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়াকাল পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে এসে ধারা বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁদের তুলনা করা যেতে পারে আমেরিকার প্রথম ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে। সে যুগে আলিপুরদুয়ারে বাংলা দেশের নানা জেলার নানা আগন্তুকদের নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল সমাজ জীবন। পূর্ববঙ্গের কৃষ্টিই চালু হয়ে গেল এখানে। সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয়ে রইল পূর্ববঙ্গের সংস্কারগুলো। বাসিন্দাদের অবচেতন মনের গোপন কক্ষে লুকিয়ে রইল জাতীয় চেতনা। পূর্ববঙ্গের চিন্তাধারা থেকে পাওয়া রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা।

একেতো খামমহল সাম্রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসন সে যুগে এ অঞ্চলে। ইংরেজের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি হয়েছে তো চৌদ্দ ঘণ্টার নোটিশে 'কুইট আলিপুরদুয়ার'। স্বৈরাচারী ইংরেজ চা-করদের অবৈধ অত্যাচার চলত চা বাগান অঞ্চলে। মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র সমারোহের বাসর ছিল ননরেগুলেটেড এরিয়া আলিপুরদুয়ারে। 'নীলদর্পণ' এর মত 'চা দর্পণ' এর পটভূমিকার কোন অভাব ছিল না এখানে। ১৯০৫ এর বাংলাদেশের অগ্নিযুগের সমসাময়িক যারা এখানে এসে ঘসতি শুরু করেছিলেন, স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা কোনরূপে উচ্চবাচ্য না করলেও তাঁদের অবচেতন মনের কেন্দ্রস্থলে মানবিক অধিকার ও জাতীয়তাবোধের ভাবধারা কখন যে দোলা দিয়ে গিয়েছে তা হয়তো তাঁরাও জানতেন না।

(প্রথম গণজাগরণ)

১৯২০ খৃষ্টাব্দ। সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ডেউ এসে দোলা দিল আলিপুরদুয়ারে। অবচেতন মনের সেই সুপ্ত ভাবধারা রূপ নিল সংগ্রামের পথে। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে জনকয়েক রাজবন্দীকে অন্তরীণ করে রাখা হয় আলিপুরদুয়ারে। তাঁদের মধ্যে ভারত বিখ্যাত দেশপ্রেমিক সতীন সেন অন্যতম। প্রথম দিকে সতীনবাবুকে কুমারগ্রামদুয়ারে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ইংরেজ সরকার পরে তাঁকে নিয়ে আসে আলিপুরদুয়ার শহরে। আলিপুরদুয়ার পুরাণো শহরের দুর্গাবাড়ীর কাছে হাটের কোণে কালজানি নদীর ধারে ছোট্ট একটা চালাঘরে থাকতেন সতীন সেন। তাঁকে কেন্দ্র করে যত বিপ্লবীদের আনাগোনা — সঙ্গে সঙ্গে চলত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন প্রচার।

আলিপুরদুয়ারে প্রথম মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। শ্রীসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশিবদয়াল পাল যথাক্রমে এই কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন। আলিপুরদুয়ার বড়বাজার রোড ও দুর্গাবাড়ী রোডের সংযোগস্থলে ছিল কংগ্রেস অফিস। ঐ সময়ে শিলবাড়ী ও কুমারগ্রামদুয়ারেও কংগ্রেস অফিস চালু করা হয়। কংগ্রেস অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের ডেউ বইতে লাগলো। সহর ও মফঃস্বলের লোকেরা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মেতে উঠল। জাতীয়তা বাদের সুপ্ত ভাবধারা কানায় কানায় ভরে উঠল সারা মহকুমায় — গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি। ভাটিবাড়ী, শালকুমার, কুমারগ্রামদুয়ার ও আলিপুরদুয়ার সহরে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী হলো। কংগ্রেসের সাংগঠনিক ও প্রচার অভিযান তখন এমন জোরালো ছিল যে গান্ধীজির নামে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দু'তিন হাজার লোক জড়ো হয়ে যেত।

(কংগ্রেসের বিচারালয়)

অসহযোগ আন্দোলনের ডেউ উদ্বেলিত আলিপুরদুয়ার। মহকুমা কংগ্রেসের প্রচার ও সাংগঠনিক কার্যাবলী ছাড়াও অপরাপর কতগুলো ব্যাপারেও কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল কংগ্রেস কমিটি। অসহযোগ দেশবাসীর ইংরেজের সঙ্গে; ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। সহযোগিতাব প্রশ্ন যখন নেই, তখন আইন-আদালতের ব্যাপারেও অসহযোগিতা চালিয়ে যেতে হবে। ইংরেজের আদালত 'বয়কট' আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছিল আলিপুরদুয়ারে। কালজানি নদীর পাড়ে এখন যেখানে "সরকারী ওয়ের হাউজ" সেখানে ছিল আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালত। মহকুমা কংগ্রেস প্যারালাল কোর্ট বসাল কংগ্রেস অফিসে। মফঃস্বলের লোকেরা বিচারের আশায় সমস্ত মামলা মোকদ্দমা নিয়ে আসতে লাগল কংগ্রেসের আদালতে। শ্রীযামিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযতীন্দ্র লাল গঙ্গো-

পাখাঘের উপর মহকুমা কংগ্রেস বিচারালয়ের ভার হস্ত ছিল। বলা বাহুল্য যাবতীয় মামলা মোকদ্দমা কংগ্রেস আদালতে আপোষ করে দেওয়া হতো। উভয় পক্ষ বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে হাতে হাত মিলাত ও গান্ধীজির নামে শপথ নিত — ‘আমরা ভাই ভাই এক।’ এদিকে তো ইংরেজের আদালত মক্কেল শূণ্য। মামলা শূণ্য একলাস। বার-লাইব্রেরীতে ও কোর্টে আইনজীবীরা বেকার। দু’টি কোর্টই জনমানব শূণ্য। নথি শূণ্য টেবিলে গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন পেস্কার। শূণ্য একলাসে বসে কলম চালায় ইংরেজ এস, ডি, ও। জবানবন্দী গ্রহণের ব্যাপারে নয়; ডেইলি কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট ‘টু’ তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার। আর বহুদূর থেকে ভেসে আসা হাজার হাজার কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের কণ্ঠ নিঃসৃত মন্ত্রির আনন্দের সুর সঙ্গীত—‘ব-ন-দে-মা-ত-র-ম্’ ধ্বনি মিলিয়ে ইংরেজ শাসকের মনে ভীতি বহুল চিত্র ফুটে উঠত। ১৯২০—২১এ পর পর কয়েক জন ইয়োরোপীয়ান আই, সি, এস, এস, ডি, ও, বদলী হলেন। এঁটে উঠতে পারছেন না কেউ মহকুমা কংগ্রেসের সঙ্গে।

অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বেড়ে চলছে দিন দিন। এস, ডি, ও, হয়ে এলেন এবার এক ইটালিয়ান সাহেব (যতদূর জানা যায় নাম তাঁর রামপিজেটি)। মামলা মোকদ্দমা বন্ধ হওয়ায় অনেকে পরামর্শ দিলেন—‘গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের কর মহকুমা কংগ্রেসের সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট আর কংগ্রেসী জজ্দের নামে; তবেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।’ এস, ডি, ও, হেসে বললেন—‘হোয়াট? ওয়ারেন্ট? হোয়াট? কেস্ আপোষ হইতেছে খুব ভাল হইতেছে, ভারতবাসী ভাই ভাই বনিতোছে, কংগ্রেস শান্তি করিতেছে’ ইত্যাদি। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে মহকুমার শেতাঙ্গ ব্রিটিশ চা-কররা এই ইটালিয়ান এস, ডি, ও, কে ক্ষমা করতে পারেনি। দিল্লীতে তারা এক আবেদনপত্র পাঠাল এস, ডি, ওর বিরুদ্ধে। ইটালিয়ান এস, ডি, ও, বদলী হয়ে গেল।

(“নো ট্যাক্স ক্যাম্পেইন্” এর প্রস্তুতি)

মহকুমা কংগ্রেসের নেতৃত্বে যেমন চলছে “কোর্ট বয়কট” তেমন সুরু হল “খাজনা বন্ধ আন্দোলন।” ‘ইংরেজ করিবে বিচার? নেভার নেভার স্মার।’ এদিকে নতুন প্লোগানের সুর ঘরে ঘরে মাঠে মাঠে ক্ষেত ধামারে—

“ইংরেজকে খাজনা দি-ব-না।

বিলাতী কাপড় পরব না॥

হাট বন্ধ কুল কুলি।

বন্দেমাতরম্ হোক বুলি॥

কুল কুলি হাটের প্রসঙ্গে পরে আসছি। যম্বা দেওয়ানীর কাহিনী বলার সময় কুলকুলি হাটের কথা বলা যাবে। চন্দ্রদীপ ও কুলদীপ-এর নাম এ অঞ্চলে অনেকেই আজ ভুলে গেছে। কিন্তু একদা এই দুই ইউ, পি, বাসী তরুণ আলিপুরদুয়ার মহকুমার ঘরে ঘরে সর্বজন সমাদৃত ছিল। পরনে খদ্দেরের সাত হাত ধুতি, গায়ে খদ্দেরের পাঞ্জাবী, মাথায় গান্ধী টুপি সর্বক্ষেণের জগু চন্দ্রদীপের। ঘুমাত কখন? খেত কখন? কেউ জানে না। সর্বক্ষেণ—চরৈবতি চরৈবতি। চন্দ্রদীপ চলছে ভল্কা অঞ্চলের সীমাহীন অরণ্যের মধ্য দিয়ে, বাঘ ভালুক হাতীকে উপেক্ষা করে। উপায় নেই বেলা দু’টায় কংগ্রেসের মিটিং ডাকা হয়েছে। যেতেই হবে। কুলদীপ চলছে রায় ডাক নদী সাঁতরে, আজই তাকে গোপনে কুমার গ্রামে পৌঁছতে হবে। এই দুই একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবকের অবদান এ অঞ্চলে অনেকখানি। ১৯২০ এর আলিপুরদুয়ারের গ্রাম যতটা পিছিয়ে ছিল রাজনৈতিক চেতনা ধারায়, ততটা এগিয়ে নিয়ে গেছে ইউ, পি, বাসী এই দুই তরুণ কংগ্রেস কর্মী। চন্দ্রদীপ গান্ধীপূজা চালু করেছিল দুয়ার্সের

গ্রামে গ্রামে। ভাল বক্তৃতা দিতে পারত চন্দ্রদীপ, যেমন হিন্দি, উর্দু, তেমন বাংলায়। শ্রীসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমগ্র মহকুমায় ইংরেজের খাজনা বন্ধ আন্দোলন এক তীব্র আকার ধারণ করে। তাঁর বাড়ীর দক্ষিণ অংশে আম কাঁঠালের একটা বাগানের মধ্যে ‘দক্ষিণের বাসা’ নামে পরিচিত চালা ঘরে চন্দ্রদীপ কুলদীপরা এসে মাঝে মাঝে থাকত। বিপ্লবীরাও এসে সেখানে আস্তানা নেয়। তাছাড়া গেকুয়া পরণে ছদ্মবেশী কিছু কিছু অগ্নিযুগের ফেরার দেশকর্মীও সেখানে থাকতেন। বিপ্লবী হলেও তাঁরা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের বহু সহায়তা করেছিলেন। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীকে কেন্দ্র করেই সে যুগে আলিপুরদুয়ারের কংগ্রেসী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এদেশীয় কবি নীলকণ্ঠ রায়ের একটি কবিতা থেকে বোঝা যায় :—

“রসিকবাবুর বাসার সামনে কংগ্রেসের মিটিং বান্ধা

ইংরেজ সাহেব হোচট্ খান চক্ষুতে খান ধাঁধা।”

আলিপুরদুয়ারে চন্দ্রদীপ কুলদীপের যুগে আর একজন সর্বভাগী কংগ্রেস কর্মীকে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা কংগ্রেসের আসর জমাতে দেখেছে। তিনি হচ্ছেন শ্রীনলিনীকান্ত পাকড়াশী। আমাদের জ্ঞান বয়সের সীমা অতিক্রম করার পর আমাদের স্মরণ ঘটছে তাঁর সান্নিধ্যে এসে কংগ্রেসের কাজ করার। এমন আসর মাতান কংগ্রেসী এ অঞ্চলে ‘একম্ এব অদ্বিতীয়ম্’। আমরা যখন কংগ্রেসী কর্মীর খাতায় নাম লেখাই তখন তিনি নেতা। দিন রাত কংগ্রেস। আমরা এ অঞ্চলে এমন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী আর দেখি নি। একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবী পাকড়াশী মশায় আজ বৃদ্ধ ও প্রায় স্ববির। কিন্তু এককালে তিনি পূর্ণ উন্মেষে ‘আমি ভাঙ্গিব পাষণ কারা’র গানই গেয়েছেন। নলিনীবাবু ছিলেন জনপ্রিয়, সর্বত্র সমাদৃত। সেই কংগ্রেস অবশ্য এখন আর নেই। পাকড়াশী মশায়ের নাম শুনে মফঃস্বলের লোকেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। ১৯২০ থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে তিনি ‘নলিনী ঠাকুর’ নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ এর পর তাঁর নামকরণ ঘটে — ‘তার কাটা ঠাকুর’। সে কাহিনী পরে বলব। তিনি হাটে, ঘাটে, মাঠে, খোলানে, তামাকের গুদামে, যে কোন স্থানে মুহূর্তের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করে হাজার লোক জমাতে পারতেন। মফঃস্বলের লোকেরা তাঁকে অসীম শ্রদ্ধা করত। ডব্বীপুরের ‘দাদাঠাকুর’ আর আলিপুরের ‘নলিনী ঠাকুর’ প্রায় এক।

মহকুমা কংগ্রেসের খাজনা বন্ধ আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল। ব্রিটিশ সরকারকে কেউ খাজনা দেবনা এই একমাত্র বুলি। হাটের খাজনা জমির খাজনা আদায়ের জন্ত তহশীলঅফিস :বাগ্র। খাজনা দাতারা সব খাজনা না দেবার বিষয়ে তেমনি উগ্র। সে যুগে হাটে গিয়ে জোতদারের খাজনা আদায়ের রীতি ছিল। সরকারী কর্মচারীরা হাটে গিয়ে শুধু শুনত কংগ্রেসের বক্তৃতা ‘নো ট্যাক্স’ খাজনা নাই।

‘শুনহে কংগ্রেসী ভাই—

ব্রিটিশ সরকারের আজ কোন খাজনা নাই।’

কুমারগ্রামদুয়ার অঞ্চলে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের তীব্রতা এমন ভাবে বৃদ্ধি পায় যে ইংরেজ সরকার সহসা বিচলিত হয়ে ওঠে। প্রায় শূন্য আলিপুরদুয়ারের রাজকোষ। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যেত ‘শূন্য খুতি হস্তে ট্যাক্স কালেক্টরদের’ হাট বা মফঃস্বল থেকে প্রত্যাবর্তন।

মঘাদেওয়ানীর নেতৃত্বে ‘নো ট্যাক্স ক্যাম্পেইন’ এর ধারা অন্যপথে রূপ নিল। খাজনা বন্ধ থেকে ‘হাট বন্ধ’ আন্দোলন শুরু হল। সে কাহিনীই এখন বলব। কুমারগ্রামদুয়ারের উত্তর প্রান্তে কুলকুলিরহাট নামে একটি

হাট আছে। সে যুগে ইয়োরোপীয় চা-করগণ কুলকুলি হাটে এসে হাটুরে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের উপর নানা জুলুম চালাত। চা বাগানের সন্নিকটস্থ হাট। শেতাজ চা-করদের আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনাও বেশী। কাজেই কুলকুলিহাটে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত। মহকুমা কংগ্রেসের নির্দেশ এল কুলকুলিহাট তুলে নিয়ে আনা হোক অনাত্র। বন্দেমাতরম ধ্বনি মুখরিত কুলকুলিহাট। ইংরেজ ও কংগ্রেসের মধ্যে রীতিমত রেশারেশি শুরু হল। হাটে পিকেটিং চলল। হাটের মধ্যে সভা। দোকানদার বিপনিকার ক্রেতারা কংগ্রেসের জয়ধ্বনি দিয়ে হাট তুলে নিয়ে এল কুমারগ্রামছারের তদানীন্তন জোতদার বিমলা চক্রবর্তীর জোতের মধ্যে। কুমারগ্রাম বন্দরের নিকটে। হাজার হাজার কংগ্রেসী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কুলকুলির ব্যাপারে। কংগ্রেসের সপক্ষে এই হাট বন্ধ ব্যাপারে মঘাদেওয়ানীর নেতৃত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সে যুগের খাস মহল রাজত্বের স্বৈরাচার অধ্যুষিত দুয়াসে মঘা রায় সেদিন যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, জনগণ যে ভাবে সাড়া দিয়েছিল, কংগ্রেসী আন্দোলন যে ভাবে সার্থকতা লাভ করেছিল তাতে করে বোঝা যায় কংগ্রেসের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই দুয়াসবাসীরা কংগ্রেস পতাকাতলে সমবেত হয়েছে।

হাট সরিয়ে নিয়ে এসে নতুন করে হাট বসান হল। কিন্তু গ্রেপ্তার হলেন মঘা দেওয়ানী। মঘা বাহকে বেঁধে নিয়ে আসা হল আলিপুরছারের। কেস দায়ের হল তাঁর বিরুদ্ধে। পুলিশ চার্জসীট দিয়েছে। 'ষ্টেট' বনাম 'মঘা দেওয়ানী' মোকদ্দমার বিচারের তারিখও ঠিক হল।

জমজমাট আলিপুরছার ফৌজদারী আদালত। সকাল থেকেই কোর্ট প্রাঙ্গণে লোকের ভীড় জমতে শুরু করেছে। ইংরেজ আই, সি, এস—এস, ডি, ওর আদালতে বিচার হবে। জনমতের চাপটা কোন দিকে যাবে শেতাজ এস, ডি, ও, হয়তো আগে ভাগেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। তাই মোকদ্দমাটি ট্যান্সফার করে দেওয়া হল তদানীন্তন বাঙ্গালী সেক্রেটারি অফিসারের কোর্টে।

বেলা ১০টার সময় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করল সকলে। দশ হাজার লোকের এক বিরাট জনতা শোভাযাত্রা করে “বন্দেমাতরম” “মঘা দেওয়ানীর মুক্তি চাই” ধ্বনি দিতে দিতে কোর্ট প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে আসছে। ব্যাপার দেখে তো এস, ডি, ও, হতভম্ব। বাংলাতে পলায়ন ঘটলো এস, ডি, ও সাহেবের। সারাদিন সারারাত রুদ্ধদ্বার গৃহে সাহেবের ঘেরাও অবস্থা। আরমড গার্ড পাহারা কোর্ট প্রাঙ্গণেও, এস, ডি, ওর বাংলায়। জনতা ঘিরে ফেলল কোর্ট প্রাঙ্গণ। পুরোভাগে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা হস্তে এক মফঃস্বলের নেতা। দুয়াসবীর মঘা রায় এজলাসের ডকে। কি চায় জনগণ? একমাত্র উত্তর—বিনা সর্তে অবিলম্বে মঘা দেওয়ানীর মুক্তি চাই। সেকী? আগে তারতো বিচার হবে, তার পরতো মুক্তির প্রশ্ন? মুক্তিতো নাও পেতে পারে; উত্তর—তা বুঝিনা আমরা। এই মুহূর্তে তার মুক্তি চাই।

প্রচণ্ড জনতার চাপে মঘা দেওয়ানীর অবিলম্বেই মুক্তিলাভ ঘটল। মোকদ্দমাটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হল ইংরেজ সরকার।

‘জনতার চাপে মঘা দেওয়ানীর মুক্তি’ আলিপুরছারের কংগ্রেসী আন্দোলনে নতুন পথের নিশানা দেখাল। ঘরে ঘরে গান্ধীজির নাম ও জাতীয় কংগ্রেসের মুক্তি সংগ্রামের কথা পৌছে গেল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, সহর থেকে সহরতলীতে, পাহাড় থেকে পাহাড়ীদের মধ্যে, রাভা, মদেশীয় মেচ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যত দুয়ারবাসী সবার কাছে পৌছে গেল কংগ্রেস, কংগ্রেসীদের মুক্তি সংগ্রামের পণ, আত্মোৎসর্গ, সংগ্রাম, একতা, শান্তি ও সাম্যের কথা।

আলিপুরদুয়ারের জনগণের 'নার্সেসটারে' এমন ভাবে নাড়া দিল '১৯২০' যে পরবর্তী যুগের যারা কর্মী তাদের কাছে দুয়ার ভূমি যেন তৈরী ক্ষেত্র। স্বাধীনতা লাভ হচ্ছে ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার। এই স্বাধিকারের বাণীই '১৯২০' এনে দিল এ অঞ্চলে। ক্ষেপে উঠল জনগণ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। জাতির মজ্জায় মজ্জায় তখন 'স্বাধীনতা' বীজের অঙ্কুর রোপিত হয়ে গেছে। জন্মগত অধিকারের সংস্কার তখন দুয়ারবাসীর রক্তে প্রবাহিত।

১৯২০ থেকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই বক্তৃতা প্রবাহের ধারায় আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেসী চাকলা প্রথর হয়ে উঠল। জলপাইগুড়ি সহরের শ্রীচাক্রচন্দ্র সান্যাল, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীশশধর কর প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আলিপুরদুয়ারে ঘন ঘন যাতায়াত চলত। সহরে, মফঃস্বলে রীতিমত ভাবে কংগ্রেসী প্রচার সভাসমিতিতে যোগ দিতেন তারা। জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে মহকুমা কংগ্রেসের যোগ সূত্র স্থাপিত হল। এবং জেলার নির্দেশ ও কর্মসূচীও প্রতিপালিত হতে লাগল এই মহকুমায়। আলিপুরদুয়ারের কংগ্রেসী আন্দোলন এর গতি পথে শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অত্যধিক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শ্রীশশধর কর ছিলেন আংশিক বৈপ্লবিক ভাবধারায় প্রভাবিত। শ্রীচাক্রচন্দ্র সান্যাল এ অঞ্চলে 'মেথডিকাল' কংগ্রেস নেতা নামে একদা বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। বহু সভাসমিতিতে তাঁকে এখানে ডাকা হত। তাঁর বক্তৃতায় আরগুমেন্ট ছিল, কার্যকলাপের 'মেথড' ছিল। ভাবাবেগহীন ভাবে বক্তৃতা দিয়ে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতেন তিনি হাজার লোকের জনতাকে। এছাড়া বাঙ্গালী বাজনার শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, ভাটি বাড়ীর শ্রীকীর্তীবেশ্বর ভট্টাচার্য্য এঁদেরও অবদান কম নয়।

(১৯৩০ ; প্রথম ছাত্র আন্দোলন)

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাল থেকে আলিপুরদুয়ারে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নবযুগ রচিত হয়। ১৯২০-২১ এ বহু দেশকর্মীর ইংরেজ বিচারে জেলবাস ঘটছিল, ১৯৩০ এর কিছু আগে থেকে বক্সা পাহাড়ে বক্সা ক্যান্টনমেন্টে রাজবন্দীদের রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের চট্টগ্রামের ঘটনার পর থেকে পাইকারী হারে বক্সা শিবিরে রাজবন্দীদের আটক রাখা হচ্ছিল। দেশপ্রেমিক ডেটেনিউদের নিয়ে আসা হত ট্রেনে। আলিপুরদুয়ার রেল স্টেশনের উপর দিয়ে বক্সাদুয়ার রেল স্টেশন। সেখান থেকে সম্ভরাবাড়ী। সম্ভরাবাড়ী থেকে ঘোড়ায় চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে চড়াই উৎরাইয়ের পথে বক্সা ক্যান্টনমেন্ট। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। দলবেঁধে আমরা রেল স্টেশনে যাওয়া শুরু করলাম। ক্রমে রেল স্টেশনে গিয়ে রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা হয়ে উঠল আমাদের এক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। রাজবন্দীরা আকারে প্রকারে ইঙ্গিতে ছাত্রদের জাতীয়তাবাদের প্রেরণা যোগাত। ঐ সময়ে বক্সা রাজবন্দী শিবিরে সর্বশ্রী ত্রৈলোক্য মহারাজ, অনিলবরণ রায়, ভূপতি মজুমদার, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, আসফউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের সঙ্গে ছাত্রসম্প্রদায়ের পরিচয় ঘটে। ট্রেন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাজবন্দীদের কামরা থেকে দিয়াশলাই বাস্ক নিষ্ক্ষেপ করা হত। খালি বাস্কের মধ্যে থাকত নানা গোপন সংবাদ, উপদেশ লিখিত কাগজে। স্কুলের ছাত্ররা এইভাবে অনুপ্রেরণা পেল রাজবন্দীদের কাছ থেকে। গড়ে তুলল তারা ছাত্র দল।

বক্সা রাজবন্দী শিবির দেখতে এলেন দেশপ্রিয় শ্রীযতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। দশ-বারো হাজার লোক রেল স্টেশনে এসেছিল তাঁকে দেখতে। তাঁর বক্তৃতা শুনতে।

এদিকে মহাত্মা গান্ধীর ডাঙি অভিযান।

লবণ আইন অমান্য। লবণ সত্যাগ্রহ চলেছে। নোনাজল নেই এখানে। তাই নারকেল গাছেব বাকল ও পাতা পুড়িয়ে ছাত্ররা লবণ তৈরী করে লবণ আইন ভঙ্গ করল।

১৯৩০-এর সেই সকল ছাত্রদের একটি অংশ ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

(১৯৪২-এর বহ্নিশিখা ; করেছে ইয়ে মরেঙ্গে)

গান্ধীজির ভারত ছাড় আন্দোলনের টেউও যথাকালে এসে লাগল আলিপুরদুয়ারে। '৪২'-এর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল ডুয়ারের প্রান্তরে প্রান্তরে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমোহন লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্দন, অরুণা আসফঅলী প্রমুখ সংগ্রামী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হল। শ্রীনরেন রায় চাগার মাধ্যমে বিপ্লবের মাল-মশলা সংগৃহীত হল। একটি সাইক্লোষ্টাইল মুদ্রণ যন্ত্র, ডিনামাইট, গান পাউডার, রেঞ্চ, সাঁড়াশি, তারকাটা যন্ত্রপাতি বর্শা, শাবল প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়ে গেল। মাটির তলে 'ম্যাগাজিন হাউস' তৈরী করে ওগুলোকে রেখে দেওয়া হল। সময়মত কাজে লাগান হবে। ৪২-এর আন্দোলনের নেতৃত্ব পীযুষ মুখোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। সংগ্রামের সর্বপ্রকার রসদতো পাওয়া গেল। সংগ্রামীরা কই? 'আছে আছে সংগ্রামীরা সব তৈরী হতেছে ঘরে ঘরে।' '৪২'-এর বিপ্লবে দেখেছি কি সহর কি মফঃস্বল সর্বত্রই এক স্বতঃফূর্ত্ত অভিব্যক্তি।

কমী রিক্রুটমেন্ট করা হয়ে গেছে। কে কে রিক্রুট হল কেউ জানছে না। কে কাকে রিক্রুট করল বলা হবে না। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল প্রত্যেকে ১০ জন করে সংগ্রামী যুবক রিক্রুট করবে।... মনে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন শুরু হল।

কিন্তু এরজন্যও তো 'ফিল্ড' তৈরী করতে হয়েছিল এ অঞ্চলে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে নতুন করে মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়। শ্রীপীযুষ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটারী। যথাক্রমে পরপর শ্রীরসিক লাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশিবদয়াল পাল, শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত এভাবেই চলল। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের অন্তর্দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এক অনাগত সম্ভাবনায় আমাদের মন ভরে গেল। মহকুমা কংগ্রেস তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের পরিপন্থী মনোভাব নিয়ে এগুচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের উপর আমাদের ভাগ্যের গতি কিছুটা নির্ভরশীল। ঐ সময়ে মহকুমা কংগ্রেসে এক নতুন কর্মসূচী গৃহীত হল। স্থানীয় এডওয়ার্ডস্ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরীটিকে কেন্দ্র করে বহু তরুণের সময় কাটছে। হাত করতে হবে পাবলিক লাইব্রেরী। ভোটাভুটি করে কংগ্রেস কমীরা লাইব্রেরী হাত করল। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল যত বাজে নভেল আর মোহন সিরিজ উপন্যাস। ভালভাল বই আমদানী করা হল। মেইন কেম্প, মুসোলিনীর জীবন চরিত, জাগ্রত এশিয়া, সুভাষ চন্দ্রের তরুণের স্বপ্ন, জাতীয়তাবাদী পুস্তকাদি, ম্যাগাজিন লাইব্রেরীতে আনা হতে লাগল। গড়ে উঠল একটি সুদী পাঠকসমাজ। কোন যুবকটি কি ধরণের বই পড়ে সংবাদ রাখা হত। ঐ সময়ে পাবলিক লাইব্রেরীতে একটি ডিবেটিং ক্লাবও আমরা চালু করেছিলাম। ৩৪টি বিষয়ের কথা আমার মনে পড়ে। যে যে বিষয়ে ডিবেট হয়েছিল :—যথা (ক) ডায়ালেকটিক মেটেরিয়ালিজম বনাম গান্ধীজির "সর্বোদয় সমাজ" (খ) "ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র" (গ) "হিংসা বনাম অহিংসা" (ঘ) "সীতারামিয়া বনাম সুভাষচন্দ্র" প্রভৃতি।

একদিন জোর ডিবেট চলছে। বিষয় ছিল “হিংসা বনাম অহিংস সংগ্রাম”। ডিবেট চলার সময় এক তরুণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তরুণটি কিছু বলতে চায় অহিংসার সপক্ষে। চমৎকার আরগুমেন্ট দিয়ে বক্তৃতা করল সে। মোহিত করল আমাদের। নাম তার সুনীল সরকার। জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের অধীনে আলিপুরদুয়ারে ভ্যাক্সিনেটরের চাকুরী করে। বেশ জানাশোনা রয়েছে যুবকটির। রিক্রুট হল সুনীলবাবু কংগ্রেসীদের দলে। টিকাদারের চাকুরী ছেড়ে দিল। কংগ্রেসের হোল-টাইম ওয়ার্কারের খাতায় নাম লেখাল।

ডিবেটিং ক্লাব ও লাইব্রেরীর তরুণ পাঠকদের মধ্য থেকে আগষ্ট আন্দোলনের কর্মী সংগ্রহ হয়ে গেল।

আগষ্ট আন্দোলনের পূর্ব থেকেই শ্রীপ্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠীর আলিপুরদুয়ারে যাতায়াত ছিল। জীবনের ২৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল জেলবাস ঘটেছে তাঁর। তখন ১৪৪ ধারা আলিপুরদুয়ারে। কুচবিহারের মাটিতে চলে প্রফুল্লবাবুর মিটিং।

বিয়াল্লিশের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে মেদিনীপুরে। ওদিকে আসামে জ্বলছে আগষ্টের আগুন। দুয়ার্সের জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা। তারা যেন বলতে চায় — ‘ভেঙে ফেল’, ‘পুড়িয়ে দাও’, ‘উপড়ে দাও’। অব্যাক্ত শ্লোগান চলছে তাদের অন্তরে অন্তরে — “জলদি ভারত ছাড় ইংরেজ এবার দেখাই মোদের তেজ।”

(‘৪২’-এর সংগ্রাম স্মরণ)

আলিপুরদুয়ারে ‘৪২’-এর আন্দোলনের ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশনের’ দিন স্থিরীকৃত ছিল ১২৪২ এর ২৬শে সেপ্টেম্বর। ঐ দিনই বিপ্লবীরা সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রোগ্রাম কার্যকরী করবে।

স্ববোধকুমার মিত্র-র বাড়ীতে রাত্রির গভীর অন্ধকারে সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে,’ ‘ডু অর ডাই’ ‘কর নয়তো মর’, ‘ইংরেজ ভারত ছাড়’ প্রমুখ ইস্তাহার ছাপা হচ্ছে। দিনের বেলা যন্ত্র ও ঐ সব ইস্তাহারগুলো লুকিয়ে রাখা হতো। দুয়ার্স ইউনিয়ন টি কোম্পানীর অফিসের সিলিং-এর উপর। রাত্রিতে ইস্তাহার বিলি হতো গোপনে। ছাপা ও বিলি চলছে। স্ববোধবাবুর বাসা খানাতল্লাসী হলো, কিছু পাওয়া গেল না। পীযুষ বাবুর গৃহ তল্লাসী হলো, কিছু পাওয়া গেল না। আমাদের বাড়ীর সামনে ও পেছনে ছদ্মবেশী দুই গুপ্তচর ভাড়াটিয়া সেজে আস্তানা গাড়ল। নলিনীবাবুর পেছনে ইংরেজের গেস্টাপোরা রীতিমত কর্তব্যপরায়ণ।

৪২ এর সংগ্রামীদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করে এক এক জনের উপর সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো। যথা :— (ক) মাদারীহাট থানা এলাকার জন্ম শ্রীস্ববোধকুমার মিত্র ও শ্রীহরিদাস চ্যাটার্জী

(খ) ফালাকাটা থানা এলাকার জন্ম শ্রীনলিনীকান্ত পাকড়াশী

(গ) কুমারগ্রামদুয়ার এলাকার জন্ম শ্রীসুনীল সরকার

(ঘ) কালচিনি এলাকার জন্ম (আংশিকভাবে) দত্তসিং সন্ন্যাসী ও পীযুষবাবু

(ঙ) আলিপুরদুয়ার সহরের জন্ম এক এক জনের উপর এক একটি ভার প্রদত্ত ছিল। যেমন পোষ্ট অফিস ও রেল স্টেশনে অগ্নিসংযোগ করবে শ্রী — অমুক।

আলিপুরদুয়ার থানায় পুলিশের চাকুরী করতেন যারা তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ এই আন্দোলনে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। থানার সমস্ত খবরাখবর আন্দোলনকারীরা অচিরেই পেয়ে যেত। আলিপুরদুয়ার জেলখানার ওয়ার্ডারদের মধ্যেও কেউ কেউ ‘৪২’ এর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংযোগ রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছিল

টেজারীর গাভ্রদের সঙ্গে। গোখাঁ গাভ্ররা গান্ধীজীর নামে প্রণাম জানিয়ে বলেছিল — “নেহি হুজুর — নিমক খাই ইংরেজের নিমকহারামী করব না।” দুর্দ্ব যোদ্ধা ছিল আলিপুরহুয়ার নিউ টাউনের ছট্টলাল। ৫০০ লোক নিয়ে রাস্তা কেটে ফেনার জল সে তৈরী ছিল। জগন্নাথ, শান্তি, দুলাল, আশীষ এরা ছিল এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ...

আলিপুরহুয়ারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। চার-পাঁচদিন আগে থেকেই ডাইরেক্ট অ্যাক্সন-এর নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে প্রচুর পরিমাণে মিসারিন, গান পাউডার, ডিনামাইট, বর্শা, শাবল, রেশ, তারকাটা যন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রামীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। হাতী ঠিক করা হয়েছে জোতদারদের কাছ থেকে চেয়ে। আলিপুরহুয়ার থেকে ফালাকাটা, মাদারীহাট, কালচিনি, কুমারগ্রামহুয়ার যাবার বড় বড় রাস্তায় প্রতি এক মাইল পর পর সংবাদবাহক ও সংবাদপ্রেরক মোতায়েন করা হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবাইকে ইংরেজের কাছে কেউ ধরা দিও না, পালাবে, আগুন দিয়ে সরে পড়বে, ভেঙ্গে চুরমার করে পালিয়ে যাবে, সব উপড়ে ফেলে আত্মগোপন করবে। খুন-খারাপী চলবে না, লুণ্ঠন চলবে না, শুধু ধ্বংস। ধ্বংস করে দিতে হবে ইংরেজ শাসকদের নার্ত সেটোরগুলো — যেমন রেল লাইন, পোষ্টাফিস, থানা প্রভৃতি।

২৬শে সেপ্টেম্বর, রাত ১২টার পর।

মহকুমা এস, ডি, ও, আলিপুরহুয়ার পোষ্ট অফিসে ব্যস্ত সমস্ত। টেলি সংযোগ বিচ্ছিন্ন সমগ্র মহকুমার। বিনিময় রজনী কাটছে জ্ঞানসিং কাহলন, এস, ডি, ও,র পোষ্টাপিসের গৃহে। ফালাকাটা, মাদারীহাট অঞ্চলের যাবতীয় টেলিগ্রাফ লাইনের তার কাটা হয়ে গেছে। টেলিগ্রাফ পোষ্টগুলো হাতী দিয়ে টেনে টেনে উপড়ে ফেলা হয়েছে — সংবাদ এলো। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি।

কুমারগ্রামহুয়ারের চিঠি।

দ্রুত সংবাদ নিয়ে এসেছে গুপ্ত সংবাদবাহক। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে কুমারগ্রামহুয়ারের অবদান তো কম নয়!

আজও সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি চলেছে। সুনীল সরকারের নেতৃত্বে ১০,০০০ সংগ্রামীর এক বিশাল জনতা, ১০,০০০ মশালধারী, আগুট বিপ্লবের সংগ্রামী কর্মীরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে কুমারগ্রামহুয়ার থানার উদ্দেশ্যে। সাঁড়াশী আক্রমণের ভঙ্গিতে নানা দলে দলে একে একে সমবেত তারা থানা প্রাঙ্গণে। স্লোগান দিচ্ছে তারা ‘করব নয়তো মরব’, ‘ইংরেজ ভারত ছাড়’, ‘ব্রিটিশ সরকার ধ্বংস হোক’। তীর, ধনুক, বল্লম, লাঠি, ডিনামাইট বহন করে এনেছে তারা। জেলা বোর্ডের সেই টিকাদার সুনীল সরকার সর্বাগ্রে। পেছনে তার শ্রেষ্ঠ অহুগামীরা — রমানাথ ঠাকুর, দেবেন দাস, ললিত রায়, গোপাল রায়, স্ববিত রায়, স্বর্ণমোহন পণ্ডিত, পোয়াতু দাস।

টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্ন। ইংরেজ সরকারের হেড অফিস আলিপুরহুয়ার কোর্ট থেকে সংবাদ এসে পৌছায়নি তখনো। থানার আর্মড গার্ডরা রাইফেল নিয়ে এসে তাক করে দাঁড়াল। গুলি ভরে নিল রাইফেল; কয়েকবার খট খট শব্দ হল মাত্র। অবিরাম গুরুম-গুরুম শব্দের জল্লা তারা ছিল প্রতীক্ষারত।... পোয়াতু দাস। ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ বীর পোয়াতু দাস এসে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দাঁড়াল — “করেন ক্যানে গুলি, মূই দেখিম্ ইংরেজের কয়টা গুলি আছে; বন্দুক কেন ছোড়েন না?” অর্ডার এসে এখনো পৌছায়নি গুলি ছোড়বার।

থানা পোড়াল না বিপ্লবীরা। থানা ঘেরাও করে রইল। ততক্ষণে এস, ডি, ও, র 'আর্মড ফোর্স' এসে গেছে। তারা কৌশলে ঘেরাও করে ফেলল নেতাদের। ৫০ জনের বিরুদ্ধে চার্জ সীট দিল পুলিশ। শাস্তি হ'ল। সুনীল সরকার পালাল। ধরা সে দিল না। সুবোধ মিত্র ও হরিদাস চ্যাটার্জি মাদারীহাটে গ্রেপ্তার হয়ে গেল। এদিকে নলিনীবাবুও ফেরার।

পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে বিপ্লবীদের। পীযুষ মুখার্জি উধাও। অগ্ন্যাগ্ন সংগ্রামীরাও যথারীতি নিজ নিজ কার্যে বহাল। কেউ কেউ ফেরার। আলিপুরজুয়ার সহরে চলছে রাইফেলধারী গার্ডদের দিন রাত টহল। রাত্রিতে কাফু। সারা সহরে ১৪৪ ধারা জারী। ইংরেজের ফেরার আশামী সুনীল সরকার। বেশ কিছু দিন পরে সুনীল সরকার সংবাদ পাঠাল — আত্মগোপন করে আর থাকা যাচ্ছে না। বাইরে যেতে চায় সে।

—কোথায়? —কোহিমায়।

বেশ কয়েক মাস পরের কথা। সুনীলবাবু হঠাৎ ফিরে এলেন। ব্রহ্মসীমান্তে টিলার উপর দাঁড়িয়ে দুর্বীনের সাহায্যে স্তম্ভাশঙ্করের 'নেহেরু ত্রিগেড', 'গান্ধীত্রিগেড' সব নাকি দেখে এসেছেন তিনি!

(বিয়াল্লিশোত্তর কংগ্রেসের ভূমিকা)

'৪২'এর বিদ্রোহ থামল। স্তিমিত হয়ে এল আগষ্ট আন্দোলনের বহিঃশিখা। কংগ্রেসের সংগঠন নতুন করে ঢেলে সাজান হল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে টাউন কংগ্রেস কমিটি গঠিত হল। সম্পাদকের ভার লেখকের উপর পড়ল। সহরের যুবশক্তিকে নানারূপ সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে টেনে আনার প্রচেষ্টা চলল। ঐ সময়ে পীযুষবাবুকে সভাপতি ও সুনীল সরকারকে সম্পাদক করে নতুন মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়। আমাদের মধ্যে তখন বেশ তোলপাড় চলছে—কংগ্রেস পার্টি না প্রাটফরম্। শেষ পর্যন্ত সুনীলবাবু প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন।

ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ দৌত্যের অবসান ঘটেছে বহুদিন। কেবিনেট মিশন ভারতে আসছে। এমনদিনের ঘটনা। দেশ বোধহয় এবার স্বাধীন হবে। সবার মুখে সর্বত্র এককথা। ...

(উপসংহার)

১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট আগতপ্রায়। র‍্যাডক্লিফ্ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হচ্ছে। মনের গোপন কোনে আনন্দ ও বেদনা একই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।... আজ আলিপুরজুয়ার মহকুমার স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী লিখতে বসে কত ছবিই না মনের কোনে ভেসে উঠছে! বিগত দিনের সেই সকল স্মৃতিমধুর দিনগুলো কি আজ ভোলা যায়? সেদিনের কংগ্রেস ছিল প্রাটফরম্। সেই প্রাটফরম্ থেকে কত স্বজনইতো সরে গিয়েছে। তাঁদের সেদিনের একনিষ্ঠতা, আত্মোৎসর্গ, কর্তব্যপরায়ণতা ও দেশপ্রেমিকতা এ অঞ্চলের ইতিহাসে আজও অক্ষয় অমর হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরদের মধ্যে আজ অনেকেই বিগত হয়েছেন। তাঁদের অমর আত্মার প্রতি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজ লেখনী বন্ধ করছি। বন্দেমাতরম্*।

[যাদের কাছ থেকে কাহিনীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে]

শ্রীরসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকান্ত পাকড়াশী, শ্রীপীযুষকান্তি মুখার্জি, শ্রীযতীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল সরকার, শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল, শ্রীযামিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং (স্যাণ্ডার্স রিপোর্ট ও Mitra's Hand Book of Jalpaiguri Dist.)]

*লেখক নিজেও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন — সম্পাদকমণ্ডলী

জ্ঞানদায়ক পুস্তক।

বঙ্গদেশের লিখিত পুস্তক।

দশম পরিচ্ছেদ

“TAMING OF THE SHREW”

অশান্ত তিস্তার কথা।

জলপাইগুড়ি জিলার নদীর গতিপথ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ-ব্যবস্থা

শ্রী কে. এল. মিত্র

নদীর গতিপথ, প্লাবন :—উত্তরবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়ি সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম জিলা। ইহার আয়তন ২৪১৭ বর্গ মাইল। গলিত তুষার দ্বারা পুষ্ট বহু নদীর বাহুপাশে আবদ্ধ এই জিলা। তিস্তা, তোরষা, জলঢাকা, রায়ডাক, কালজানি, গদাধর, সন্ধ্যা এই জিলার প্রধান নদী। বর্ষার সময় ইহারা প্রচুর পরিমাণে জলধারা বহিয়া আনে এবং শীতকালে ক্ষীণকায় আকার ধারণ করে। হুউচ্চ পর্বত শ্রেণীর মধ্যে ইহাদের জন্ম এইজন্ম ইহাদের গতিবেগ প্রচণ্ড। পার্বত্য এলাকা ছাড়াইয়া সমতলে প্রবেশ করিয়া ইহারা যে শুধু পলিমাটি বহন করিয়া আনে তাহা নয়, ছোট, বড়, মাঝারী নানা আকারের পাথর ও বৃক্ষ ইহাদের সহিত নামিয়া আসে।

পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করিয়া সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিবার মুখ হইতে ইহাদের প্রস্থ বর্দ্ধিত হয়, স্ততরাং গতিবেগ শ্লথ হইয়া আসে। ফলে জল ধারায় বাহিত সেই পাথর, বালুকারাশি ও পলিমাটি জমা হইয়া নদীগর্ভ ভরাট করিয়া তুলিতেছে। শীতকালে নদীর জল শুকাইয়া যায়। এই জল নদীর গতিপথকে অব্যাহত রাখিতে পারে না। স্ততরাং তাহাদের গতিপথ ও নদীর খাত সীমিত হইয়া যায়। নদীগর্ভ ভরাট হইয়া যাইবার ফলে পরবর্তী বর্ষাকালে নদীপথে বন্যার জলের স্থান সঙ্কুলান হয় না ফলে বাধ্য হইয়া নদী ছ'কুল ছাপাইয়া উঠে, ও নূতন পথ তৈয়ারী করিয়া লয়। ভূমিক্ষয় ও প্লাবনের মাধ্যমে অনেক স্থান জুড়িয়া শুরু হয় প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা।

উত্তরবঙ্গের নদীর প্লাবন দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী। স্ততরাং ক্ষতির পরিমাণ সাময়িক। এই জিলার নদীগুলির গতিবেগের প্রখরতার দরুণ অনেক সময় দেখা যায় যে, সামান্য বাধা পাইয়া ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্ন খাত ছাড়িয়া উচ্চ স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়। উচ্চস্থান দিয়া নিজেদের গতিপথ তৈয়ারী করিয়া হয় মূল শাখার সহিত ইহারা আবার মিলিত হয় নতুবা সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত হয়।

বন্যানিয়ন্ত্রণ :—স্বাধীনতার পূর্ব পর্য্যন্ত সরকার উত্তরবঙ্গের প্লাবন রোধের নিমিত্ত উল্লেখযোগ্য কিছু করেন নাই। তবে ইহা সত্য যে, কোন কোন চা-বাগান কর্তৃপক্ষ তাহাদের স্বীয় স্বার্থে কিছু বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়াছেন।

স্বাধীনতার পরে সরকার এই প্রাবনের ক্ষমক্ষতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সরকার একনিষ্ঠ-ভাবে প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৫০, ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে পর পর কতকগুলি ভয়ঙ্কর প্রাবন ঘটিবার পরে সরকার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, যাহার ফলে পরিকল্পনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে যথা : জলপাইগুড়ি শহর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা, বার্নেশ দোমহনী বাধ, হেলা পাকড়ী বাধ, মেখলিগঞ্জ বাধ, সিধাবাড়ী বাধ, ধরাই কুড়ি বাধ, কাদদিনী বাধ, ও আরও অনেক পরিকল্পনা এই জেলায় বাস্তব রূপ লইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর, অসংখ্য যাত্রী ও বিপুল দ্রব্যসম্ভার ভারাক্রান্ত রাজপথ, রেলপথ, চা-বাগান, মূল্যবান বনজ সম্পদ ও কৃষি উপযোগী ভূমি লইয়া মোট ৬০৪ বর্গ মাইল এলাকাকে বন্যার করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের শেষে ছোট চিত্র দেওয়া হইল যাহা হইতে বন্যানিয়ন্ত্রণে বাধের কার্যকারিতার ভূমিকা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। অবিভ্রান্ত বারিপাত প্রতিরোধ করিবার কোনরূপ সূত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সে ক্ষেত্রে একমাত্র পথ হইল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাঙ্গা জমি ও বসতি এলাকা হইতে বন্যার জল নামাইয়া দেওয়া যায় তাহার স্থায়ী ব্যবস্থা করা, জল নিকাশের সরেস ব্যবস্থা ব্যতীত বন্যার প্রচণ্ডতা হইতে অব্যাহতি পাইবার কোনরূপ উপায় নাই।

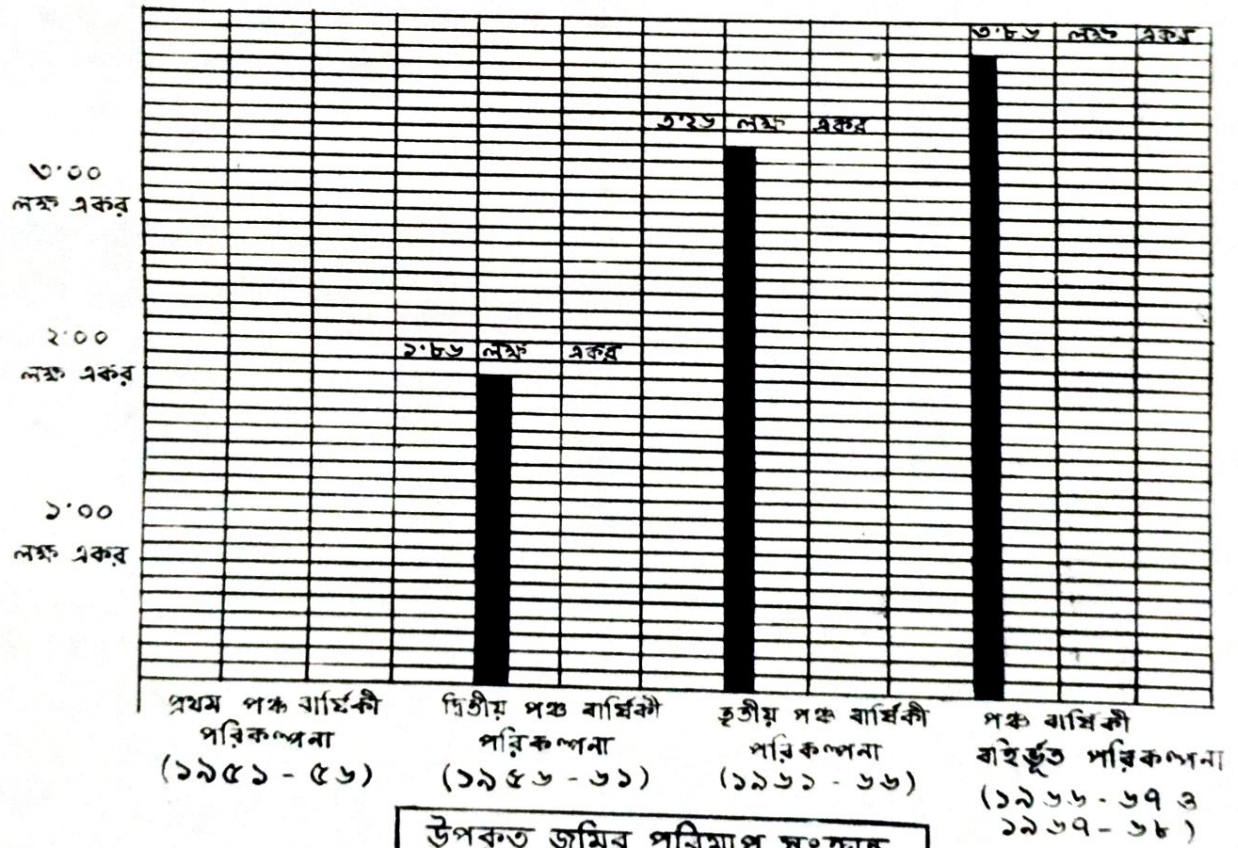
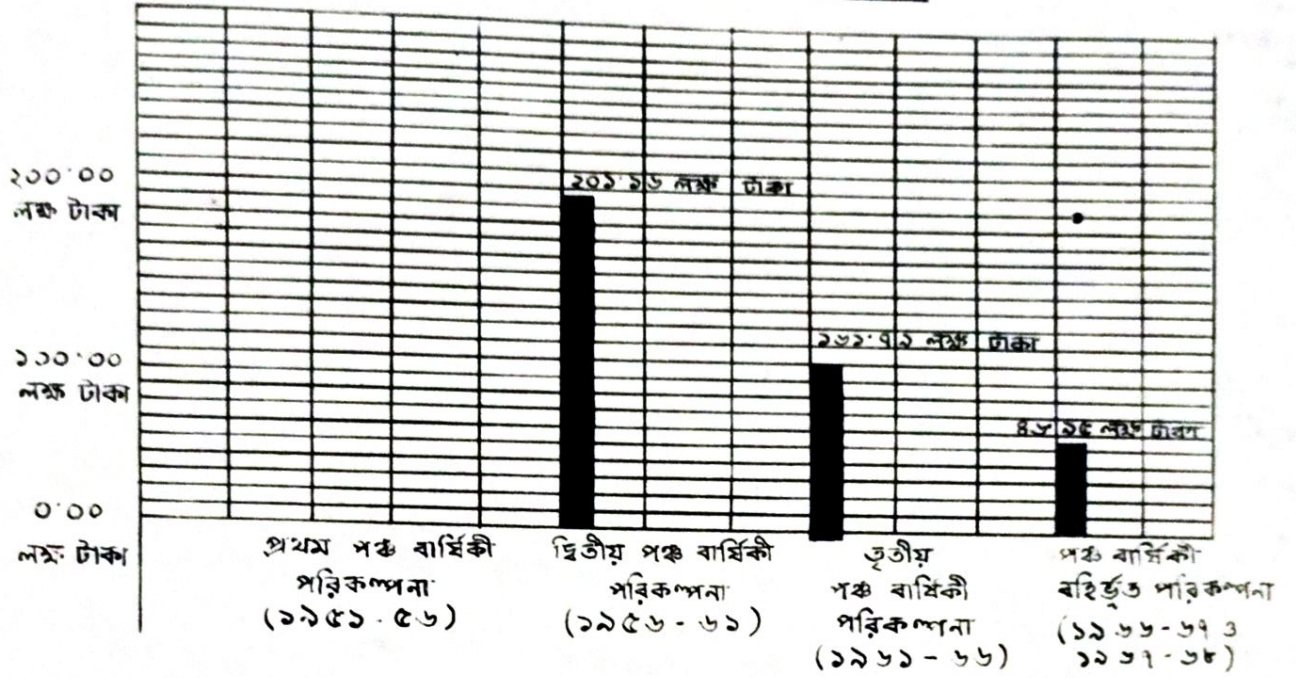
এ কথা সত্য যে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বন্যার ফলে অশেষ দুর্গতি হয়। তবে সর্বক্ষেত্রে বন্যাই নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতির কারণ নয়। বরঞ্চ, মাঝারি ও মৃদু ধরণের স্বল্পস্থায়ী বন্যায় উপকার হইয়া থাকে। বন্যার জল পলিমাটি বহন করিয়া আনিয়া চাষের ক্ষেত ঢাকিয়া দেয়, আবর্জনা ও জঞ্জাল সরাইয়া লোকালয় পরিষ্কার করে; নদীতে ও খালে নালায় সদা জাগিয়া উঠা চড়া স্রোতের তোড়ে চুরমার করিয়া দেয়। তাহার ফলে কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। তবে মাত্র মৃদু ও মাঝারি ধরণের বন্যা হইতেই এই সফল সম্ভব। অতএব সম্পূর্ণরূপে বন্যা প্রতিরোধের পরিবর্তে তাহার প্রচণ্ডতা নিবারণ করাই সামগ্রিক কল্যাণের পরিপোষক।

সেচ-ব্যবস্থা :—এই জিলার উত্তরে পর্বত সংলগ্ন স্থানগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই বেশী যেমন ১৭৫ হইতে ২০০", আবার দক্ষিণদিকের স্থানগুলিতে বর্ষার সময় বারিপাতের পরিমাণ প্রায় স্বাভাবিক যেমন গড়ে ১০০" ইঞ্চি। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সমস্ত জেলার বারিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের উর্দ্ধে। অনেকের মতে এই জিলায় খারিফ মরশুমে সেচ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। এই জিলায় চাষ ব্যবস্থা অনিশ্চয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। বারিপাত সমভাবে বণ্টন না হওয়ার দরুণ কখনও কোন কোন স্থানে প্রয়োজন অনুপাতে বেশী বা কম জল চাষের জন্য পাওয়া যায়। প্রবন্ধের শেষে চিত্র দেওয়া হইল উহাতে জলপাইগুড়ি শহরে জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বারিপাতের বণ্টন দেখানো হইয়াছে। আবার সাময়িক বারিপাতের পরিমাণ বেশী হইলেও ইহা সেচের প্রয়োজনে লাগে না। এই জিলার ভূমিতে বালুকার ভাগ বেশী থাকার দরুণ জল ধারণের ক্ষমতা খুবই কম; অতএব চাষ ব্যবস্থা এমত অবস্থায় শুধুমাত্র বারিপাতের উপর নির্ভরযোগ্য নয়, সেচ ব্যবস্থা এ জিলাতেও অপরিহার্য। স্বাধীনতার সাথে সাথে সরকার অনেক ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা এবং একটি মাঝারি ধরণের পরিকল্পনা এই জেলায় বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন।

এই জিলায় এখন পর্যন্ত মোট ৫১,০০০ একর জমি সেচনক্ষম হইয়াছে।

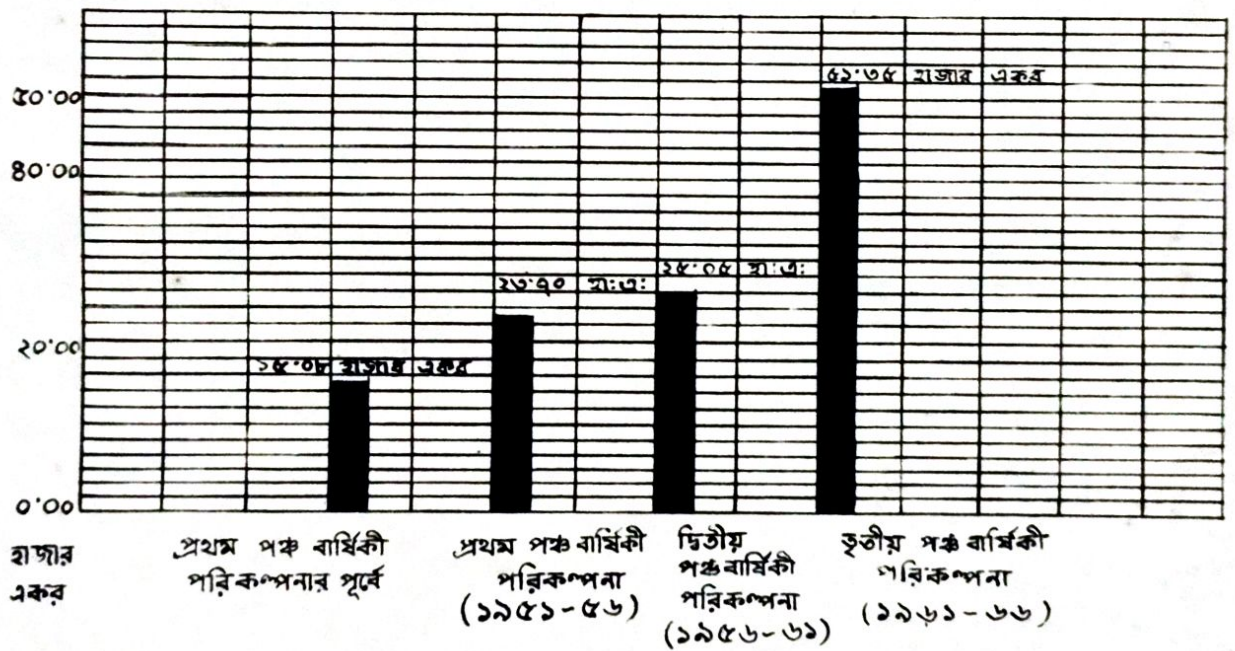
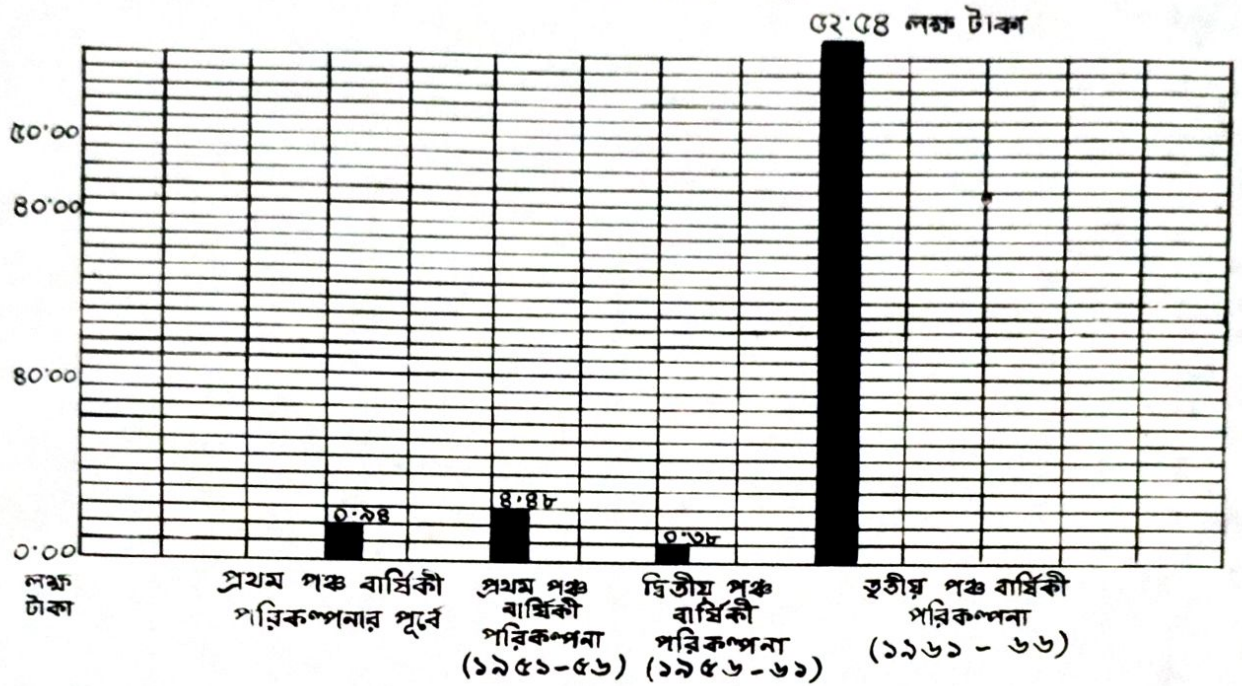
প্রবন্ধের শেষে ছোট চিত্র দেওয়া হইল যাহা হইতে এই জিলার সেচ-ব্যবস্থার অগ্রগতি সন্ধান অবহিত হওয়া যাইবে।

ব্যয় বরাদ্দ সংক্রান্ত চিত্র



উপবৃত্ত জমির পরিমাপ সংক্রান্ত চিত্র

সেচ পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ-এ
সেচনক্ষম জমির চিত্র



খাল খনন দ্বারা সেচ-ব্যবস্থা ছাড়াও গভীর কূপ খনন দ্বারা সেচ-ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে। অগ্নাশ্র জিলার জায় এই জিলাতে জলাধারে জল সঞ্চয় করিয়া সেচ-ব্যবস্থা করা ঠিক উপযোগী হয়না কারণ খরার সময় মাটির নীচে জল আরও নীচে নামিয়া যায় ফলে উপরের সঞ্চিত জলরাশি অতি সহজেই নীচে নামিয়া যায়। অবশ্য ইহার জন্ত এ জিলার ভূ-পৃষ্ঠের গঠন প্রণালীই মূলতঃ দায়ী। এই জিলার মুস্তিকায় বালুকারাশির পরিমাণ বেশী বলিয়া জলধারণের ক্ষমতা খুব কম। সাধারণতঃ নদীর মুখে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করিয়া সেই জলকে খাল দ্বারা কৃষি ভূমিতে প্রেরণের দ্বারা সেচ-ব্যবস্থা এই জেলায় অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে। যদিও এ ব্যবস্থার দ্বারা নদীর গতিপথ পরিবর্তন প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। রবিশস্ত্রের জন্ত প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। এ জেলার বৃহৎ নদীগুলি হইতে রবিশস্য কালীন জলের চাহিদা মিটাইবার জন্ত জলাধারের মাধ্যমে বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনার রূপান্তর অপরিহার্য।

তিস্তা করতোয়ার রূপ-রেখা

শ্রীচারুচন্দ্র সাহা

সংযুক্ত তিস্তা-করতোয়া নদী এক কালে এনেছিল উত্তর বাংলার সমৃদ্ধি, হঠাৎ পাগল হয়ে এনে ফেলেছে দুঃখের পসরা। একে স্তম্ভভাবে চালাবার সব চেষ্টাই যেন বিফল হতে চলেছে।

এই তিস্তা-করতোয়া ছিল উত্তর বাংলার প্রধান জলপথ। শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছিল সারা বাংলায়, হিমালয় থেকে সাগর অবধি। এই নদী দেখেছে বহু জাতির উত্থান পতন, বহু ধর্মের জয়যাত্রা ও বিলুপ্তি। বহু বিজ্ঞতা এসেছে এই নদী দিয়ে, বহু ধর্মযাজক ও পরিব্রাজক এসেছে। বহু ডাকাত এরই জলে তাদের লুণ্ঠের ব্যবসা চালিয়েছে। বহু খুন-জখম হয়েছে এরই জলে। দক্ষিণ দেশ থেকে বহু ব্যাপারী এসেছে ব্যবসা করতে। এই নদী দিয়ে এনেছে তাদের সম্ভার। এই নদীর পলি শস্য-শ্যামলা করেছে উত্তর বাংলা দেশকে, আবার এরই বন্যা ধ্বংস করেছে বহু জনপদ। তবুও এই দুঃস্থ তিস্তা-করতোয়া উত্তর বাংলার অতি প্রিয়।

তিস্তা নদী চলেছে জলপাইগুড়ি সহরের পূর্ব দিক দিয়ে। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স ও বৈকুণ্ঠপুরের ভেতর দিয়ে। এই নদীটি কিন্তু বনেন্দী ঘরের। শুনতে পাওয়া যায় প্রায় এক কোটি বছর আগে হিমালয় পাহাড় এখন যেখানে আছে সেখানে ছিল এক সমুদ্র। তার নাম ছিল টেথিস সাগর। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, কোশী ও গঙ্গা ছিল এই প্রাচীন সাগরের সাথে যুক্ত। অনেকে বলেন তিস্তা নদীও এদের মতো এ্যানটিসিডেন্ট নদী। এই গবেষণা ধোপে টিকবে কিনা জানি না। তবে হিমালয় মাথা উঁচু করবার পর এই সব নদীর উৎস আলাদা হয়ে গেছে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ঋক্-বেদে এই নদীটিকে বলা হয়েছে 'সদানীর'। বরফের পাহাড় থেকে উঠেছে, সারা বছরই জল থাকতো, তাই নাম হল 'সদানীর'। নামটি 'সদা চঞ্চল' হলেই ভাল হত। ঋক্ বেদেই আছে কোশলের রাজা তাঁর প্রধান পুরোহিতকে সাথে নিয়ে বৈদিক হিন্দু ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন। এই 'সদানীর' তখন প্রাগ্‌জ্যোতীষপুরের পশ্চিম সীমানা। এখানে পনি জাতির সাথে যুদ্ধে কোশলরাজ হেরে গিয়ে পিছু হটলেন। যাবার সময় এদের অস্থর নাম দিয়ে গেলেন, বোধ হয় রেগে গিয়েই। এর পরে শতপথ ব্রাহ্মণে, স্বন্দ পুরাণে এই 'সদানীর' নামটি পাওয়া যায়। পুরাণের সময়ে এই নদীর নাম হলো 'করতোয়া'। তাই এখানে দেখি করতোয়া মাহাত্ম্য। মহাভারতের বনপর্বে এই করতোয়া হয়েছে পুণ্যতোয়া। মৌর্য লিপিতে দেখা যায় পৌণ্ড্র দেশের মহাস্থান গড় (এখন বগুড়ায়) পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরে ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকেরা করতোয়া অতিক্রম করে প্রাগ্‌জ্যোতীষে গিয়েছিলেন। প্রায় তিন হাজার বছর আগে বোদো জাতি এই নদীর নাম দেয় 'তি-স্তা' বা 'দি-স্তা'। বোদো ভাষায় 'তি' ও 'দি' শব্দের অর্থ জল। মনে হয় 'সদানীরের' বোদো অস্থবাদ। কোচেরা এদেশে অর্থাৎ প্রাগ্‌জ্যোতীষের কামপীঠে আসবার পর সমতলের তিস্তা-করতোয়ার নাম হলো 'কোর্তো', কিন্তু পাহাড়ের ওপরের অংশটির নাম তিস্তাই থেকে গেল। পাহাড়ের ওপরে এই তিস্তার আরও অনেক নাম হয়েছে। সেগুলি পরে বলা হবে। ভারতের প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠের ভ্রামরী পীঠটি এই তিস্তা - করতোয়ার তীরে। কেউ বলেন শিবকে উত্তরে পাহাড়ের মাথায়, কেউ বলেন চিলাহাটির বোদেশ্বরী। সঠিক স্থানটি এখনও অজ্ঞাত।

বনেদী ঘর যখন ভাঙ্গে, সব আলাদা হয়ে যায়। কেউ খুব বড় হয়, কেউ মাঝামাঝি থাকে, কেউ গরীব হয়ে যায়, কেউ বা একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু আদি ঘরটি অনেক সময়েই কোন রকমে বেঁচে থাকে তার প্রাচীন গৌরবের সাক্ষী হয়ে। নদীর বেলাতেও ঠিক এমনি ধারা হয়। কিন্তু পদ্মা এত বড় হয়েও শীর্ণ ভাগীরথীর মর্যাদা পেল না, যমুনা বড় হয়েও দুর্বল আদি ব্রহ্মপুত্রের আসন পেল না, নোতুন তিস্তা বিরাট হয়েও মৃতপ্রায় করতোয়ার 'পুণ্যতোয়া' পেল না।

এই বনেদী তিস্তা-করতোয়ার জীবন স্মৃতি আলোচনা বরা যাক। বহু যুগ গত হয়েছে। সিকিম-তিব্বত সঙ্কমে চোলা পর্বতের সুন্দর তুষারাবৃত চমলহরি শৃঙ্গ সমুদ্র থেকে ১৮,০০০ ফুট উঁচুতে দুটি বরফের ঝরণা পাঠিয়ে দিয়েছিল। এরা বহু পাহাড়ী পথ ঘুরে ১৪,২০০ ফুটে নেমে এসে মিশে গেল ছালামো হ্রদে। এই পাহাড় দুটির নাম হচ্ছে লাচেন-ছু পশ্চিম দিকে ও লাচিং-ছু পূর্ব দিকের ঝরণা। তিব্বতী ভাষায় 'ছু' মানে ছোট ঝরণা। ছালামো হ্রদটি দেখতে খুবই সুন্দর, চুংখাং জনপদের কাছেই। এই হ্রদ থেকে ছোট্ট তিস্তা নদীটি পাহাড় কেটে পথ করে নেমে আসতে লাগলো। এখানে ছোট্ট আর একটি ঝরণা 'দি-ছু' এর সাথে মিশে গেল। সিকিম কালিমপোং সীমান্তে 'রংপো-ছু' এসে মিশলো। তারপর তিস্তা বাজারের কাছে 'রঙ্গীত' এর সাথে দেখা। এখন তিস্তা অনেক বড় হয়েছে। ছুংখারের উঁচু পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বেগে চলেছে। পথে আরও বন্ধু জুটলো — রিলে, রিয়াং ও কালিঝোড়া। তারপর শিবক-গোলা গিরিবর্জ দিয়ে নেমে পড়লো পাহাড় থেকে সমতলে, বর্তমান ডুয়াসগামী রেল সেতুটির নীচেই। এখানে শিবক-ঝোড়া নদীটি তিস্তার সাথে জুটে গেল। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পথে গ্রামবাসীরা তিস্তাকে তাদের পছন্দ মত নাম দিয়েছে, যেমন স্যাং-ছু, রং-নি-উং, রঙ্গ, দিস্তা, তিস্-তা, সর্বশেষে নীচে এসে ত্রিশ্রো-তা।

সমতলে নেমে এসে তিস্তা ও করতোয়া মিলে একটি নদী হয়ে গেল। ১৮৫২ সনে বুকানন হ্যামিলটন বলেন মহানন্দা ও তিস্তার মাঝামাঝি কোন এক পাহাড় থেকে প্রাচীন করতোয়া জন্মেছে। চলেছে তিস্তা কেটে। দিনাজপুরের ভেতরে আত্ৰাই নদীর সাথে যোগ হয়ে, গোবিন্দগঞ্জের ভেতর দিয়ে বগুড়া জেলায় এসেছে। এখানে যমুনেশ্বরী এসে মিশেছে। ১৭৭২ সনে রেগেল ও ১২৪২ সনে এস, পি, চ্যাটার্জীর মতে বর্তমানে শিবক পাহাড়ের ওপরে কোন লুপ্ত নদীর সন্ধান পাওয়া যায় নি। মনে হয় বুকানন সাহেব তিস্তা ও করতোয়ার উৎস সঠিকভাবে নিজে দেখেন নি।

ফারমিন্জার ১৭৭০ - ১৭৭২ সনের বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডের প্রথম খণ্ডে বলেন তিস্তা বা ত্রিশ্রোতা বা রাংপু ১৬৮২ সনের আগে দিনাজপুরে আত্ৰাই নদীর সাথে মিলে গঙ্গা বা পদ্মায় পড়তো। তিনি বলেন গঙ্গার মতো তিস্তাও মহাদেবের জটাজুট ভেদ করে নেমে এসেছে এমনি মনে হয়। কালিকাপুরাণে বলে পার্বতীর স্তন থেকে তিস্তার উৎপত্তি। কল্পনা যেমনই হোক না কেন, শিবকের কাছে দাঁড়ালে মনে হয় হিমালয় তাঁর অঙ্গলীর ভেতর দিয়ে তিস্তাকে ঢেলে দিচ্ছেন সমতলে। তাই বোধহয় এখান থেকে নাম হলো 'করতোয়া'। জগদীশবাবুর কথায় বলতে ইচ্ছা করে 'করতোয়া তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? আসিয়াছি মহাদেবের জটা হইতে।'

১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে (বর্তমান গঙ্গারামপুরের নিকটে) সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন তিব্বত জয় করতে। উত্তর-পূর্বে চলতে চলতে বাগমতী নদীর তীরে অবদ্বন্দ্ব সহরে এসে পৌঁছলেন। এই নদীটি ছিল গঙ্গার তিন গুণ চওড়া। এদেশে বাস করতো মেচ, কোচ ও খার উপজাতি। আলি মেচ তাঁদের সাথে করে নিয়ে গেল একেবারে হিমালয়ের নীচে। এখানে বাগমতী নদীর ওপরে কুড়িটি

পাথরের পাথর ওপর ছিল একটি পাথরের সেতু। ব্রহ্মানের মতে অবর্দ্ধন সহর হচ্ছে গোবিন্দগঞ্জের ভেতরে বর্দ্ধনকোট আর বাগমতী নদী হচ্ছে করতোয়া। এ নিয়ে পণ্ডিতদের ভেতরে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। যা হোক, এসব বিবরণ থেকে মনে হয় ১৭৮৭ সনের বিরাট বন্যার পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া একই নদী ছিল। ১৭৭২ সনে বেণেলের মাপে দেখা যায় তিস্তা-করতোয়ার এক ভাগ ভিন্ন পথ ধরে গোবিন্দগঞ্জের কাছে এসে আবার মূল নদীতেই মিশে গেছে। এই যুক্ত নদী নীচে আত্রাই নামে চলতে থাকে। তাই অনেকে মনে করেন আত্রাই হচ্ছে তিস্তা-করতোয়ার নীচের ধারা। আবার দেখা যায় অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় (অধুনা পাকিস্তানে) দেবীগঞ্জের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে সোনাহার গ্রামের কাছে তিস্তা-করতোয়া থেকে এক শাখা পূর্বদিকে রংপুর জেলার সৈয়দপুরের কাছে দারওয়ানী হাটের পাশ দিয়ে সন্তপুষ্করিণী গ্রামের ভেতর দিয়ে বগুড়া জেলায় এসেছে। এখান থেকে সাহেবগঞ্জের কাছে গঙ্গায় মিশেছে। আর এক শাখা পুনর্ভবা সোনাহারের দক্ষিণে করতোয়া থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে বর্তমান দিনাজপুরের চোংটি বা মল্লিকাদহের ভেতর দিয়ে পূর্বে গঙ্গায় এখন মহানন্দায় মিশেছে। এখনও এই সব নদীর শুকনো ধারা দেখতে পাওয়া যায়।

আর একদল ভৌগোলিক বলেন, অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার বোদা থানার কাছে যেয়ে করতোয়া দু'ভাগ হয়ে যায়। একটার নাম বুড়ি তিস্তা। এটি রোহণপুর থানা এলাকায় আবার দু'ভাগ হয়েছে। এর একটির নাম পুনর্ভবা। এটি দিনাজপুরের ভেতর দিয়ে যেয়ে মহানন্দায় মিশেছে। এর আর একটির নাম আত্রাই। এটি দিনাজপুর ও রংপুর জেলার ভেতর দিয়ে পড়েছে চলন বিলে। সেখান থেকে বিরাট হরাসাগরের ভেতর দিয়ে পাবনা জেলায় বেড়া থানার ভেতরে যমুনা-ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। হয়তো এই শাখার জন্তু তিস্তার নাম হয়েছে ত্রি-শ্রোতা।

১৯৪৩ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে দেখা যায়, জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে চলেছে তিস্তা। তারপর তিন ভাগ হয়ে গেল। পুনর্ভবা, করতোয়া, আত্রাই। পুনর্ভবা পড়লো মহানন্দায়। আত্রাই চলন বিল হয়ে পড়লো করতোয়ায়, তারপর শাখা-প্রশাখার জাল বুনে বড়োল নদীর সাথে মিশে যমুনার মাধ্যমে জাফরগঞ্জের কাছে পদ্মায় মিশে গেল।

করতোয়া অতি পুরোণো নদী, চলেছে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও কামরূপের প্রান্ত দিয়ে। মহাস্থানগড় করতোয়ার পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অঞ্চলে, বগুড়া জেলায়। বগুড়ার দক্ষিণে হালালিয়া নদী মিশলো করতোয়ায়। যুক্ত নদীর নাম হল ফুলঝর। পাবনার চাঁদাইকোণা গ্রামের কাছে ইছামতী এসে মিশলো। উল্লাপাড়া, নাকালিয়া হয়ে এল হরাসাগরে (বিরাট বিল)। তারপর পাবনা জেলার বেড়া থানায় যমুনা-ব্রহ্মপুত্রে শেষ হল। আত্রাই নদী চলন বিল হয়ে বড়োল নদীর মাধ্যমে পদ্মায় মিশলো।

৬৩০ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ বলেন তিস্তা নদীর তিনটি শাখা। পূর্বে করতোয়া, মধ্য আত্রাই ও পশ্চিমে পুনর্ভবা। আত্রাই মিশেছে গঙ্গায়।

১৫৫০ সনে জেও-ত-বইবস ও কাঁতেই-ত-ভিনেল নামে দুইজন ফরাসী পরিব্রাজক বলেন বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত একটিমাত্র বড় নদী। এর নাম 'কাঙর'। চলেছে কামতা রাজ্যের ভেতর দিয়ে। বোধহয় এটাই করতোয়া।

১৬০৮ সনে বাহারিস্থান ঘাইবী বইতে মির্জা নাথন বলেন পাবনা জেলায় করতোয়া প্রায় শুকিয়ে গেছে। রংপুরের ঘোড়াঘাট সহরটি করতোয়ার দক্ষিণ পারে। রংপুর জেলায় তিস্তা নদী চলেছে আত্রাই নদীর ভেতর দিয়ে।

১৬৬০ সনে থান্-ডেন্-ত্রক নামে এক জার্মান পরিব্রাজক বলেন আত্রাই ও করতোয়া নদী খুব গভীর। ১৬৬৬ সনে টেভনিয়র বলেন হিমালয় থেকে গঙ্গা পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে একটি বড় নদী আছে তার নাম 'ক্যাটিভাব'—ইহাই কি করতোয়া? পুরোণো রেণেলের মানচিত্রে দেখি ১৭৭৭-৭৮ সনে তিস্তা পৃথক হয়ে গেল করতোয়া থেকে আর তিস্তার এক শাখা একটা মরা নদীর ভেতর দিয়ে ফুলছড়ির কাছে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে।

১৮১০ সনেও করতোয়া ছিল বিরাট নদী।

১৭৭২ সনে বোল্ট যে মানচিত্র প্রকাশ করেছেন, এতে দেখা যায়:—তিস্তার এক ভাগ পড়েছে গঙ্গায়, আর একভাগ ব্রহ্মপুত্রে। মহানন্দা তিস্তা থেকে উঠে গঙ্গায় মিশেছে। করতোয়া, মহানন্দা থেকে উঠে তিস্তা কেটে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। পুনর্ভবা, তিস্তা থেকে উঠে তিস্তাতেই মিশেছে। ধরলা, তিস্তা থেকে উঠে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। ঘর্ঘরা, রংপুর জেলার কোন এক জায়গা থেকে উঠে চলন বিল হয়ে করতোয়ায় মিশেছে। আত্রাই, করতোয়া থেকে উঠে গঙ্গায় পড়েছে। টাঙ্গন, করতোয়া থেকে উঠে গঙ্গায় মিশেছে। নাগর, মহানন্দা থেকে উঠে মহানন্দাতেই মিশেছে।

১২০২ সনের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের প্রথম খণ্ডে দেখা যায়, পূর্বকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনার ভেতরে ব্যবধান ছিল একশত পঞ্চাশ মাইল আর এরই ভেতর দিয়ে করতোয়ার বহু শাখা প্রশাখা সমূহে পড়তো। নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ছিল তখন করতোয়া ও সাগরের মোহনার ওপরে। পাহাড় থেকে সমতলে আসবার পর তিস্তা-করতোয়া ছিল ৭০০ থেকে ৮০০ ফুট চওড়া। ঘাঘট বা ঘর্ঘরা ও মানস ছিল প্রধান উপনদী। ১৭৮৭ সনের বন্যায় তিস্তা প্রবেশ করলো ঘাঘটে আর নতুন পথ কেটে নতুন ব্রহ্মপুত্রে মিশে গেল। এর প্রায় আশী বছর বাদে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ৪০ মাইল পশ্চিমে ঘুরে বুড়ি তিস্তার ভেতর দিয়ে যে তিস্তা চলেছিল তার একটা বড় অংশ সোজা দক্ষিণ-পূবে ঘুরে কোচবিহার ও রংপুরের ভেতরে নতুন পথ তৈরী করে ব্রহ্মপুত্রে মিশে গেল। ১৮৭৬ সনে হাণ্টার ও ১৮০২ সনে বুকানন হামিলটন এই কথাই বলেছেন। তখন মাদারগঞ্জ-হলদিবাড়ির বুড়ী তিস্তাই ছিল প্রধান তিস্তা।

বুকানন বলেন জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পশ্চিম দিয়ে করতোয়া চলেছে প্রায় ৪৫ মাইল আমবাড়ি-ফালাকাটা ও ভজনপুরের ভেতর দিয়ে। তারপর কোচবিহার রাজ্যে ঘোড়ামারা নদীটি এর সাথে জুটে যায়। এখান থেকে বারো মাইল পর্যন্ত করতোয়া নদী ঘোরামারা নামেই চলে। শালভাঙ্গায় এসে করতোয়া নামটি ফিরে পায়। দেবীগঞ্জের কাছে বুড়ি তিস্তা এর সাথে মেশে। এরপর থেকে আত্রাই নামে চলতে থাকে। ১৭৮৭ সনের বন্যায় বুড়িতিস্তাকে ছেড়ে তিস্তা আবার তার পুরোণো পথে পূর্বদিকে ফিরে যায়। বুড়ি শুকিয়ে গেল। ঘোরামারার সাথে করতোয়ার বিচ্ছেদ হয়ে গেল। দিনাজপুরে ছোট একটা ধাপ নদীর ভেতর দিয়ে করতোয়া আত্রাইএর সাথে মিশে গেল। তিস্তা-করতোয়া থেকে কোর্তো নামে এক শাখা পূর্বদিকে চলছিল। ১৭৮৭ সনে বন্যার পর এই নদীটি প্রায় কুড়ি মাইল মাটির নীচে চলে যেয়ে দারগুয়ানী হাটের দক্ষিণে মাটি ফুঁড়ে একটুখানি বেরিয়ে পড়লো। (ভজনপুর থেকে দক্ষিণের সব জমি এখন পাকিস্তানভুক্ত।)

হাটার সাহেব লিখছেন (ষ্টাটিস্টিকাল একাউন্ট অফ দিনাজপুর ১৮৭৬—পৃ: ৩১২-৩৬৫) দিনাজপুর জেলার কাছেই নাগর নদী মহানন্দায় মিশেছে। টাঙ্গন নদী জলপাইগুড়ির উত্তর সীমানা থেকে উঠে মালদা সহরের দক্ষিণে মহানন্দায় মিশেছে। পুনর্ভবা নদী দিনাজপুরের ঠাকুরগঞ্জ এলাকায় ব্রাহ্মপুকুর বিল থেকে উঠে রোহণপুরের কাছে মহানন্দায় মিশেছে। ১৮৭৭-৭৮ সনের আগে করতোয়া নদী আত্রাইএর ভেতর দিয়ে বড়োল নদীর সাথে মিশে গঙ্গায় পড়েছে। এরই এক শাখার নাম কোর্তো। এটি পড়েছে ব্রহ্মপুত্রে। তিস্তার এক শাখা আছে, তার নাম যমুনা। ১৭৮৭ সনের পর তিস্তা তার গতিপথ পরিবর্তন করার ফলে আত্রাই, পুনর্ভবা, যমুনা ও করতোয়ার জল খুব কমে গেল, স্থানে স্থানে শুকিয়েও গেল।

হাটার, (ষ্টাটিস্টিকাল একাউন্ট অফ রংপুর, ১৮৭৬ সাল; পৃ: ১৫৬-৫৭) রংপুরের কথা লিখতে য়ে লিখছেন, তিস্তা অনবরতই গতিপথ পরিবর্তন করেছে। পূর্বে চলতো আত্রাই দিয়ে। ১৭৮৭ সনের পরে এর সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘাঘট, মানস প্রভৃতির সাথে জুটে গেল। ১৭৭০ সনের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে যত লোক মারা গিয়েছিল ১৭৭৮ সনের বন্যায় এর চেয়ে অনেক বেশী মানুষ ও সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছিল। ২৬শে মার্চ থেকে প্রবল বর্ষা নেমে এল, এক নাগাড়ে চললো জুলাই মাস পর্যন্ত। আবার পয়লা আগষ্ট থেকে বর্ষা শুরু হল। ২৭শে আগষ্ট হঠাৎ তিস্তা কোচবিহার ও রংপুরের ভেতর দিয়ে নতুন পথ কেটে ব্রহ্মপুত্রে মিশে গেল। কত লোক, গরু প্রভৃতি মরে গেল, কত বাড়ি তলিয়ে গেল তার হিসেব কে করে। (পৃ: ২২৩-২২৮)।

বগুড়া জেলার কথায় হাটার ১৮৭৬ সনেই লিখছেন, কোনকালে করতোয়া নদীটি নদীয়া জেলার হরিণঘাটায় সাগরে পড়তো এটা বলা শক্ত। তবে জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার পুরোণো নদীপথগুলি দেখে মনে হয় এককালে এ দিক দিয়ে বিরাট এক নদী বয়ে যেত। এখন করতোয়া, হালালিয়া নদীর সাথে মিশে ফুলঝুর নামে চলেছে। ১৭৮১ সনে ব্রহ্মপুত্র দেওয়ানগঞ্জ থানা থেকে সারিকান্দীর পূর্বদিকে প্রায় আঠারো মাইল বেকে গেছে। করতোয়া ও মৈমনসিং জেলার ভেতরে মধুপুর নামে যে বিরাট জঙ্গল ছিল সেটার চিহ্নমাত্র নেই। কোনই ও যমুনা নদীদের পাতাই নাই। এই ফাঁকে নাগর নদী করতোয়ার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিল। ১৮২০ সনে আবার বন্যা। করতোয়া মিশে গেল বাঙ্গালী নদীর সাথে। নাম হল কাটাখালি। পুরোনো করতোয়া শুকিয়ে গেল। ১৭৮৭ সনের আগে মৈমনসিংহ জামালগঞ্জ ও সেরপুরের ভেতর দিয়ে যে আদি ব্রহ্মপুত্র ছিল তার সাথেই যোগাযোগ চলছিল। ১৭৮৭ সনের বন্যায় ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমে বেকে নতুন পথ করে গিল।

কোচবিহারের কথা বলতে হরেন চৌধুরী বলেন, তিস্তা চলেছে তিন পথে। একটি বড় হলদি-বাড়ীর পশ্চিম দিয়ে, আর একটি বিবিগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জের দিকে, আর একটি মেখলিগঞ্জের দিকে। তিস্তা এখন চলেছে দাদাই নদী দিয়ে। প্রথম দুটি ধারা প্রায় শুকিয়ে গেছে। তৃতীয়টি দাদাই হয়ে ঘাঘট বা ঘর্ঘরা দিয়ে চলেছে। ১৭৭২ সনে ফকিরগঞ্জ অর্থাৎ জলপাইগুড়ি সহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে মাদারগঞ্জের কাছে তিস্তার একটি শাখা কাশিয়াবাড়ি, বড় হলদিবাড়ী হয়ে পশ্চিম দিকে তারপর দক্ষিণে বেকে দেবীগঞ্জের কাছে করতোয়ায় মিশেছে। এখান থেকে যুক্ত করতোয়া মিশেছে আত্রাইতে। এখানে পুনর্ভবা নামে এক শাখা পশ্চিম-দক্ষিণে গেছে। কাশিয়াবাড়ি ও দৈপাতাতে (এখন ছিট মহল) ফেরীর বাবস্থা ছিল। ১৮৪০ সনেও তিস্তা চলতো দাদাই নদী দিয়ে।

এইসব ছাড়া ছাড়া বিবরণ একসাথে করলে মনে হয় হিমালয়ের ওপরে তিস্তা ও করতোয়া একই নদী, চলেছে তিস্তা নামে। পাহাড় থেকে নেমে এই নদী চলেছে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ও খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে মাদারগঞ্জ পর্যন্ত। সেখান থেকে বড়ি তিস্তা নামে এক শাখা প্রথমে পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণে চলে গেছে। তারপর তিস্তা ঘুরলো পূর্ব দিকে। করলা নদী জলপাইগুড়ি সহরের ভেতর দিয়ে এসে সহরের দক্ষিণ প্রান্তে তিস্তায় মিশলো। মাদারগঞ্জের উল্টোদিকে কয়া নদী তিস্তায় মিশলো। কয়া এককালে বড় নদী ছিল। বিরাট জোরপাকুরী বন্দর ছিল এর ওপরে। এই বন্দরে ভুটানের সাথে আদান প্রদান চলতো। কয়া এখন মৃতপ্রায়, বন্দরটিরও একই দশা। আর একটু দক্ষিণে ভেরভেরী, বর্তমান নাম সেনিয়াজান। এর পরে তিস্তা এল রংপুর জেলায়। ডিমলার কাছে দাদাই নদীতে প্রবেশ করলো। এখান থেকে এল ঘর্ঘরা শাখা হিসেবে। তিস্তা চললো রংপুরের ধাপ হয়ে মাহিগঞ্জে, তারপর সাহুলপুর। এককালে এই সাহুলপুরের পেতলের ঘটি জলপাইগুড়ি বাজারে খুব বিক্রি হতো। বর্তমান বাকালী অর্থাৎ কাটাশারির কাছে ঘাঘট নদী তিস্তা থেকে উঠে, বামনী বা বাগাও নামে এক শাখা ছেড়ে, আবার তিস্তাতেই মিশে গেল। শেষকালে তিস্তা ঢাকা জেলার ফিরিঙ্গী বাজারের কাছে ব্রহ্মপুত্রে মিশে গেল। ১৭৭৮ সনের পরে রংপুর ও মৈমনসিং-এর সঙ্গমে তিস্তামুখ ঘাটে তিস্তা মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের সাথে।

১২৬৪ সনে এ, মিত্র—জলপাইগুড়ি হাওবুকে লিখেছেন:—১২৫০ সনের বন্যার পর তিস্তার অনেক জল বড়ি তিস্তা দিয়ে চলেছে। কয়া নদী প্রায় মরে গেছে। দাদাই, ঘাঘট ও ব্রাহ্মণী নদী তিস্তার ভেতরে। সেনিয়াজান উপনদী হিসেবে তিস্তায় মিশেছে।

আগের সব বিবরণের নির্ঘণ্ট করলে দেখা যাচ্ছে:—

১। পাহাড়ের ওপর তিস্তা-করতোয়া একই নদী।

২। ১৭৮৭ সনের পূর্বে তিস্তা-করতোয়া এক সাথে প্রথমে গঙ্গায় তারপর সমুদ্রে পড়তো।

তিস্তার গতিপথ পরিবর্তনের সাথে সাথে উত্তর বাংলায় এক বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। মনে হয় ১৭৮৭ সনে বন্যার সাথে বিরাট ভূকম্পনও হয়েছিল অথবা পাহাড়ে ভয়াবহ ধ্বস নেমেছিল যার ফলে শিবকের উত্তরে ও দক্ষিণে পাহাড়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। শিবকে তিস্তা রেলপুলের দক্ষিণে চুমুকডাঙ্গী মৌজার জমি সমতল, তার পরেই হঠাৎ মাটিটি অনেকখানি উঁচু হয়ে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলকে স্থান দিয়েছে। ফলে:—

৩। প্রথমেই মহানন্দার সাথে বিচ্ছেদ ঘটলো।

৪। শিবকের নীচে পাহাড় উঁচু হয়ে গেল। পাহাড়ী তিস্তার সব জল পুবে ঢলে পড়লো। দাদাই ও ঘর্ঘরা দিয়ে তিস্তার জল চলতে শুরু করলো।

৫। করতোয়ার উৎস বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের পাহাড়ে উঠে গেল। তিস্তার সাথে আর যোগ রইল না।

৬। নতুন তিস্তা মণ্ডলঘাট ও হলদিবাড়ির ভেতর দিয়ে কাশিয়াবাড়িতে বড়ি-তিস্তা নামে তালুক চিলাহাটি, উপেন চৌকী, কোট ভাজনী তালুকের ভেতর দিয়ে দক্ষিণে দেবীগঞ্জের কাছে করতোয়ায় মিশে গেল। কয়েক বছর বাদে বড়ি-তিস্তা অন্য পথে যাওয়ায় এই ধারাটিও শুকিয়ে গেল।

৭। ১২৫০ এর বন্যায় বড়ি তিস্তা সোজা পশ্চিমে জলপাইগুড়ি জেলার ১২নং ইউনিয়নে পাক্সা-ঘুমুনা নদীতে মিশে করতোয়ায় পড়লো।

৮। গঙ্গার তিনগুণ চওড়া তিস্তা-করতোয়া শুকিয়ে গেল। মাঝে উঠলো বিরটি চর। করতোয়া ও সাউ নামে দুটি ধারা বেঁচে থাকলো। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যেতে এই দুই নদীর ব্যবধান প্রায় তিন মাইল দেখা যায়।

৯। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে করতোয়ার উৎস থেকে দুই মাইল পূর্বে করলা নদীর উৎস। সম্ভবতঃ এই নদীটিও তিস্তা থেকে উঠে জলপাইগুড়ি সহরের দক্ষিণ প্রান্তে আবার তিস্তাতেই পড়তো। এটিরও উৎস তিস্তার সাথে যোগ রইল না।

১০। ১৭৮৮-৮৯ সনে বাকালীর অপর দিকে বুড়ি তিস্তার মুখে বালির চড়া উঠলো। তিস্তার জল এখানে ধাক্কা খেয়ে পূর্বদিকে কোচবিহার রাজ্যে ঘাঘট নদীতে এসে গেল। কিছু নীচে তিস্তার এক শাখা মরা-তিস্তা নামে কোচবিহারের পারমেখলীগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ীর প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গোমনাতী গ্রাম হয়ে রংপুর জলঢাকা থানার প্রায় আট মাইল পূর্বে আবার তিস্তাতেই মিশে গেল। বর্ষা বাদে অন্যসময়ে তিস্তার সাথে যোগাযোগ থাকে না।

১১। পুনর্ভবা নদী করতোয়া ছাড়লো। ছোট একটি নদী ধাপার মাধ্যমে মহানন্দায় পড়লো। নাগর, টাঙ্গন স্বাধীন হয়ে গেল।

১২। করতোয়ার পূর্ব শাখা করতোয়া ছাড়লো। দেবীগঞ্জ থেকে ভবানীগঞ্জ, বেলাইচণ্ডী, দারওয়ানী পর্যন্ত প্রায় কুড়ি মাইল মাটির নীচে চলে গেল। শ্যামপুর ও রংপুর রেল স্টেশনের মাঝামাঝি এক জায়গা দিয়ে ছোট ধারায় এগিয়ে যেয়ে সন্তপুকুরিণী গ্রামের কাছে বেশ জল দেখা গেল। তারপর যুবনেশ্বরী, হালালিয়া, ইছামতীর সাথে মিলে ব্রহ্মপুত্রে পড়লো।

১৩। করতোয়ার মধ্যের ধারা বুড়ি তিস্তার মাধ্যমে কিছু পরিপুষ্ট থাকলো। এটি আত্মাই নামে দিনাজপুর, বালুরঘাট, রাজসাহী, পাবনা হয়ে হরাসাগরে করতোয়ার সাথে যোগ হল। তারপর যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রে মিশলো। এখনও নাটোরের ভেতরে শুকপ্রায় নারদ নদীটি পুরোণে করতোয়ার সাথে গঙ্গার মিলনের সাক্ষী হয়ে আছে।

১৪। ১৮২৭ ও ১৮৬৮-৭০ সনে তিস্তা আরও অনেক পূর্বে সরে গেল। অনবরত গতিপথ বদলানোর ফলে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, বগুড়া, পাবনা জেলায় বহু বালির চর, জলা ও বুড়া, বুড়ি তিস্তার সাথে দেখা হয়। নতুন তিস্তার পুরোণে বন্ধু প্রায় সবাই তাকে ছেড়ে গেল। আবার নতুন বন্ধু জুটলো। জলপাইগুড়ি জেলায় পূর্ব দিক থেকে লিস, ঘিস, চেল, নেওরা, ধরলা ও পশ্চিমে করলা তাদের জল তিস্তায় ঢেলে দিল। তিস্তা তার সব শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে বর্ষায় নদীর বাড়তি জল অল্প পথে যেতে পারলো না। সব জল তিস্তা গর্ভেই ভীড় জমালো। পলি ও বালি জমে তিস্তার খাদ ধীরে ধীরে ভরে উঠতে শুরু হল। ফলে সামান্য বর্ষাতেই বন্যা।

নতুন তিস্তা ক্রমেই পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে। ১৮২৭ সনের বন্যায় তিস্তার খাল অগভীর হওয়ায় জলপাইগুড়ি বার্নেশ ঘাটের ভেতরে ষ্টিমার ফেরিটি বন্ধ হয়ে গেল। ১৯২২-২৩ সনের বন্যায় পূর্ব দিকে বার্নেশ জংসন রেল স্টেশন, বার্নেশ বাজার সব ভেঙ্গে গেল। প্রায় কুড়ি বছর আগে দোমহনীর কাছে ধাক্কা মেরে ছোট ধরলার ভেতরে তিস্তার জল এসে গেল। বিরটি বাঁধ দিয়ে তিস্তার জল ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ফলে পশ্চিম পাড়ে মাদারগঞ্জ ও মণ্ডল ঘাটের অনেক জমি ভেঙ্গে গেল। এখনও যাচ্ছে। বুড়ি তিস্তার মুখ উঁচু হয়ে যাওয়ায় জল ঘুরে যেয়ে পূর্বদিকে বাকালী,

ধর্মপুর, পদ্মতী প্রভৃতি গ্রামের অনেকখানি ভেঙ্গে ফেললো। ১২৪৮, ১২৫০, ১২৫২ ও ১২৫৪ সনের বন্যায় জল-পাইগুড়ি ও কোচবিহারের অনেক জমি ভেঙ্গে গেল। বুড়ি তিস্তা আবার চালু হয়েছে। তিস্তা নদী সহরের কাছে প্রায় তিন মাইল চওড়া হয়ে গেছে। প্রাচীন করতোয়ার মতো মাঝখান দিয়ে উঁচু চর উঠছে। হয়তো তিস্তার গতি আবার বদলে যেতে পারে।

জলপাইগুড়ি সহরকে বাঁচাতে সহরের পূর্ব দিগে উত্তরদিকে প্রায় ১২ মাইল লম্বা এক বিরাট বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সহরটি তিস্তার বন্যা থেকে বেঁচেছে কিন্তু এই বাঁধের আরও উত্তরে ককককা নদীর ভেতর দিগে তিস্তার জল এসে ঘাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তিস্তার গভীরতা আরও কমে যাচ্ছে। বর্ষায় তিস্তার জল করলা নদীতে এসে যাচ্ছে। করলার বাড়তি জল সহরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ পশ্চিমে বাঁধের ওপারে মণ্ডলঘাটের জমি ভেঙ্গে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী রেল লাইনের কাছে তিস্তা এসে গেল। আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে।

১২৬৮ সনের ২রা থেকে ৪ঠা অক্টোবরের ভেতরে বৃষ্টি হল প্রায় ৪৪" অর্থাৎ একর প্রতি ৪৪০০ টন ওজনের জল পড়লো। সেকি বৃষ্টি! অনবরত মুঘলধারায়। এক ৪ঠা তারিখেই দারজিলিং জেলায়—যার ভেতর দিগে তিস্তার পার্বত্য ধারা আসছে—বৃষ্টি পড়লো প্রায় ২৬ ইঞ্চি। আরও ওপরে সিকিমে বোধ হয় আরও বেশী বৃষ্টি হয়েছিল। গত ৮০ বছরের ভেতরে এত অল্প সময়ে এত বেশী বৃষ্টি কখনই হয় নি। তিস্তা নদী দিগে নেমে এল ছয় লক্ষ কিউসেক অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে সত্তর হাজার মণ জল ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে নেমে এল। এ বাদে জলে এল পলি ও অগণিত কাঠ ৫০ থেকে ১০০ টন ওজনের। ১২৫০ সনে নেমেছিল প্রায় আড়াই লক্ষ কিউসেক জল। এতেই ঘটেছিল মহা অনর্থ। ১২৬৮ সনের বন্যার জল ও কাঠের প্রচণ্ড ধাক্কা কালিমপোং এর নীচে তিস্তার ওপরে এ্যাণ্ডারসন কংক্রিট পুলটি একেবারে উন্টে গেল সাথে সাথে পুলের পশ্চিমে তিস্তা বাজারের প্রায় অর্ধেকটা তিস্তার ভেতরে ডুবে গেল। পাহাড়ের ধ্বংস শিলিগুড়ি-কালিমপোং পথের বহু জায়গায় ভেঙ্গে চলাচল বিপর্যস্ত করে দিল। শিবোকেবর কাছে তিস্তাটি ১৫০০ ফুট চওড়া। এখানে রেলপুল হয়েছিল মাত্র ৮৫০ ফুট লম্বা। ১২৫০ এর বন্যায় পাহাড় ভেঙ্গে পুলের পূর্বদিকে প্রায় ৪০০ ফুট জমি ভেসে গেল আর নদীর একটি শাখা পূর্ব দিকে আপালচাঁদ-চ্যাংমারীর দিকে চলে গেল। এই জল নীচে দোমহনীর বাঁধে ধাক্কা খেয়ে জলপাইগুড়ি সহরের দক্ষিণে মণ্ডলঘাট অঞ্চলের অনেক জমি ভেঙ্গে নিয়ে গেল। আরও দক্ষিণে পূর্বে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ও পশ্চিমে পার-মেখলিগঞ্জ ও ভাওয়ালগঞ্জের অনেক জমি ভেঙ্গে গেল। বুড়ি তিস্তা আরও বড় হয়ে গেল। ১২৫০-এর বন্যায় শিবোকেবর উত্তর পশ্চিমের পাহাড় ভেঙ্গে শিলিগুড়ি-গেলখোলা ছোট রেল লাইনটির মৃত্যু হল। এই বন্যার পরে পুলের দুটি স্প্যান জুড়ে দিয়ে পুলটি করা হল ১১০০ ফুট লম্বা আর অবশিষ্ট ৪০০ ফুট বালি ও পাথর দিয়ে বন্ধ করা হল।

১২৬৮ সনে জলের বেগে এই ৪০০ ফুটতো ভেঙ্গেই গেল, তা বাদে আরও ২০০ ফুট ভেঙ্গে তিস্তার মুখ হল ২০০০ ফুট। ১২৫০ এর বন্যায় তিস্তার যে ধারাটি আপালচাঁদ-চ্যাংমারীর দিকে গিয়েছিল সেটা দিয়ে প্রবল বেগে জল চললো। কাঠামবাড়ির কাছে বাঁধ ভাঙলো। সাতটি বড় গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে জল চলে গেল চেল নদীতে। এর নীচের ধারা ধরলানদী ফেঁপে উঠলো। দোমহনীর প্রায় চার মাইল উত্তরে এই জল পাড় ছাপিয়ে ছুটলো দক্ষিণ পূর্বে ময়নাগুড়ির দিকে। ধরলার বাড়তি জল নীচের তিস্তাকে আরও ফাঁপিয়ে তুললো। প্রবল জলের স্রোতে দোমহনীর দক্ষিণ পূর্বের বাঁধ ভাঙলো, বহু গৃহ ও মানুষ নিশ্চিহ্ন হল, দোমহনী রেল স্টেশনের ঘর বাড়ি ভাঙলো, জল

চললো রেল লাইন বাঁধের পাশ দিয়ে ময়নাগুড়ির দিকে। এই দুই ধারা মিশলো ময়নাগুড়ির নিকটে ময়নাগুড়ি—লাটাগুড়ি পথের ওপরে রেলের ভারী কংক্রিট পুলের কাছে। এই যুক্ত ধাক্কায় কংক্রিট পুলটি উপড়ে গেল। জল এখান থেকে ছুঁতাগ হয়ে একভাগ মিশলো আরও পূবে জটধা নদীতে। ফলে তিন মাইল দক্ষিণে জলেশ্বর মন্দিরে ঘাবার রাস্তায় একটি পুল ছিল তার দুদিক ভেঙ্গে গেল। আর এক ধাপ মোজা দক্ষিণে বার্বেশ হয়ে কয়া নদীতে মিশলো। এই জল জোরপাকুরী, বাকালী, পদমতি ভাসিয়ে মেথলীগঞ্জ সहर ডুবিয়ে দিল।

তিস্তার পশ্চিমে দোমহনীর অপর পাড়ে বাঁধ ভাঙলো কয়েক জায়গায়। জল ছুটলো দক্ষিণ দিকে। জালিয়া-পাড়া, প্রধানপাড়া, পাহাড়পুর প্রভৃতি তছনছ করে এসে পড়লো সহরের মাঝে করলা নদীতে। রাত দুটায়, যখন সব ঘুমিয়ে, এই জলস্রোত প্রবলবেগে এসে পড়লো সহরে। ঘর, বাড়ি, মানুষ, পশু, মালপত্রের কত যে নিখোঁজ হল তার ইয়ত্তা নাই। যেন এক মহাপ্রলয় ঘটে গেল।

সহরের ভেতরে করলা নদীর ওপরের চারটি পুল একেবারে ধ্বংস হল। এই জল ছুটলো দক্ষিণ-পশ্চিমে — গদাধর, পাক্কা, যমুনা নদীগুলির ভেতর দিয়ে পড়লো করতোয়ায়। পথে সব ভেঙ্গে চুরে গেল। মণ্ডলঘাটের জমি ভেঙ্গে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী রেলপথের কাছে এসে গেল তিস্তা। বুড়ি তিস্তায় যৌবন ফিরে এল।

১৯৬৯ সনে আবার বন্যা। এবার সহর ও তার উত্তরে সব বাঁচলো, দোমহনী টিকে গেল। মারা গেল সহরতলীর দক্ষিণ দিক। তিস্তার জল ছোট নদী খুরখুরীতে এল। রেল পুল ভাঙলো, কাদোবাড়ি থেকে মণ্ডলঘাট পর্যন্ত সব জমি ও পশু শেষ হল, মানুষ মরলো অল্প। খুরখুরীর জল পড়লো পাক্কা নদীতে। পাক্কা প্রকাণ্ড হয়ে গেল। এই জল পড়লো যমুনায়। সব মিলে করতোয়ায়।

পলি ও বালি পড়ে সব জমি নষ্ট হয়ে গেল। এই পলিতে ভয়ানক ক্ষার তাই গাছ সব মরে গেল।

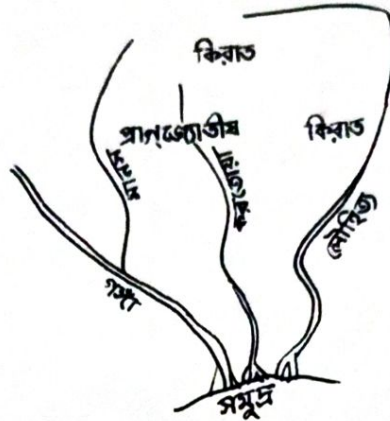
এই উপলক্ষে ‘তিস্তা গান’ এর কথা কিছু বলতে হয়। বর্ষাকালে তিস্তার জলের ভেতর থেকে কামানের গর্জনের মত শব্দ হয়। মাঝখানে কয়েক বছর শোনা যায় নি। আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কয়েক বছর। গতবারও শুনতে পাওয়া গেছে। এই শব্দের কারণ এখনও অজ্ঞাত। বরিশালের নদীতেও এমনি ‘বরিশাল গান’ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

তিস্তা বুড়ির কথা বলতেই হবে। সব নদীরই একটা করে দেবতা আছে। তাঁরই নির্দেশে নদীটি চলে, এই ধারণা। তাই এদেশে খুব নিষ্ঠার সাথে তিস্তা বুড়ির পূজা হতো। এদেশের লোকেরা বলে তিস্তা বুড়ির পূজা প্রায় বন্ধ হয়ে ঘাবার ফলে দেবীর ক্রোধ হয়েছে। তাই বছর বছর এত বন্যা।

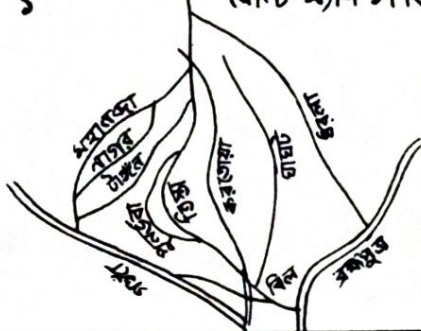
অবাধ্য তিস্তাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হচ্ছে। সফল হলে অশেষ কল্যাণ হবে সন্দেহ নেই। যে সব পুরোণো বন্ধু তিস্তার ষোঁথ সংসার ছেড়ে গেছে তারা প্রায় সবাই পাকিস্তানবাসী হয়ে গেল। তাই ব্যাপারটি বড়ই ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

প্রায় ৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা ব্যারেজের এক পরিকল্পনা হচ্ছে। ১৯৪৬-৪৭ সনে ইংরেজের তৈরী এমনি একটা পরিকল্পনা সরকারের অস্বীকারের অপেক্ষায় ছিল। দেশ ভাগ হওয়াতে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। পরিকল্পনা ছিল তিস্তা-করতোয়ার সব পরিবারটির ভেতর আবার যোগাযোগ ঘটিয়ে সারা উত্তর বাংলায় স্থানীয় সেচ ব্যবস্থা করা। এখন এই পরিবারের প্রায় সবাই সম্পূর্ণ বা আংশিক পাকিস্তানবাসী। ভয় হয় এটি কাজে লাগাতে গেলে টাকাটাই জলে যাবে। জল-বিদ্রোহের জঘন্য বিকল্প ব্যবস্থা ভাববার সময় এসেছে।

বৈদিক যুগে করতোয়া রাধাকুমুদ মুখার্জী



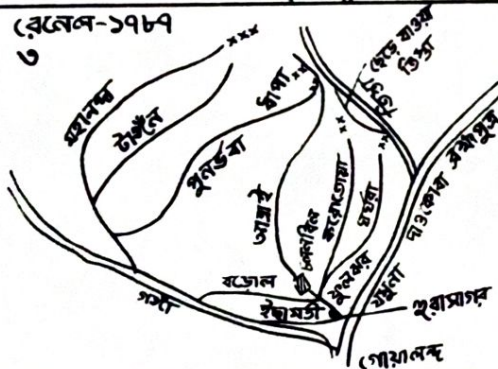
১ বালি মণ্ডল ১৭৭২



২ বেনে-১৭৭৯

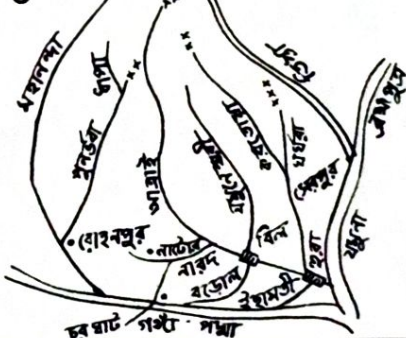


৩ বেনে-১৭৮৭

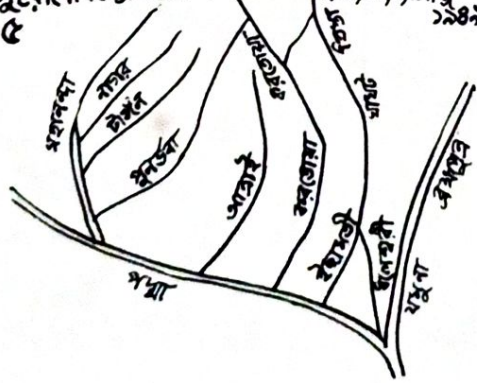


৪

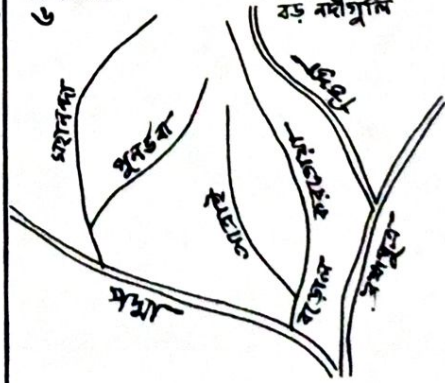
ইন্ডিয়ান গেজেট (১৯০২)



৫ পুরোনো তিষ্ঠা করতোয়া

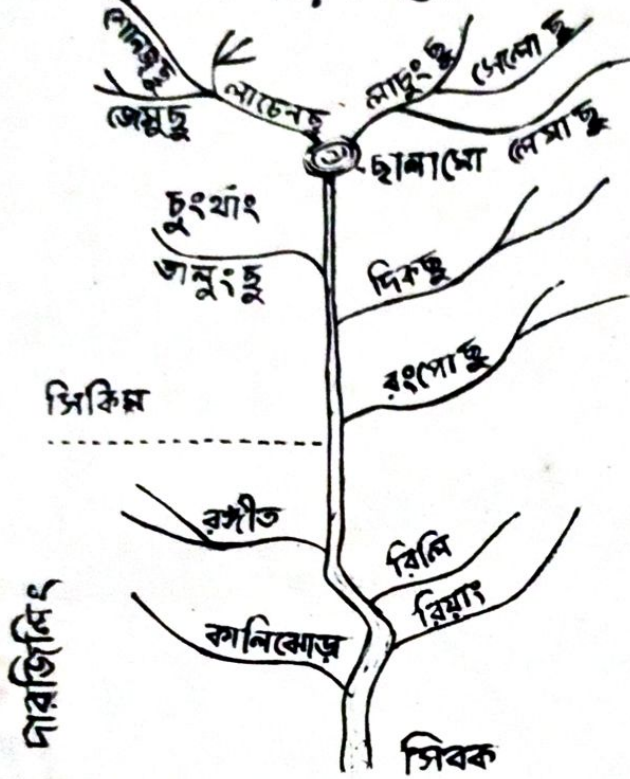


৬ এম.পি. চ্যাটার্জি

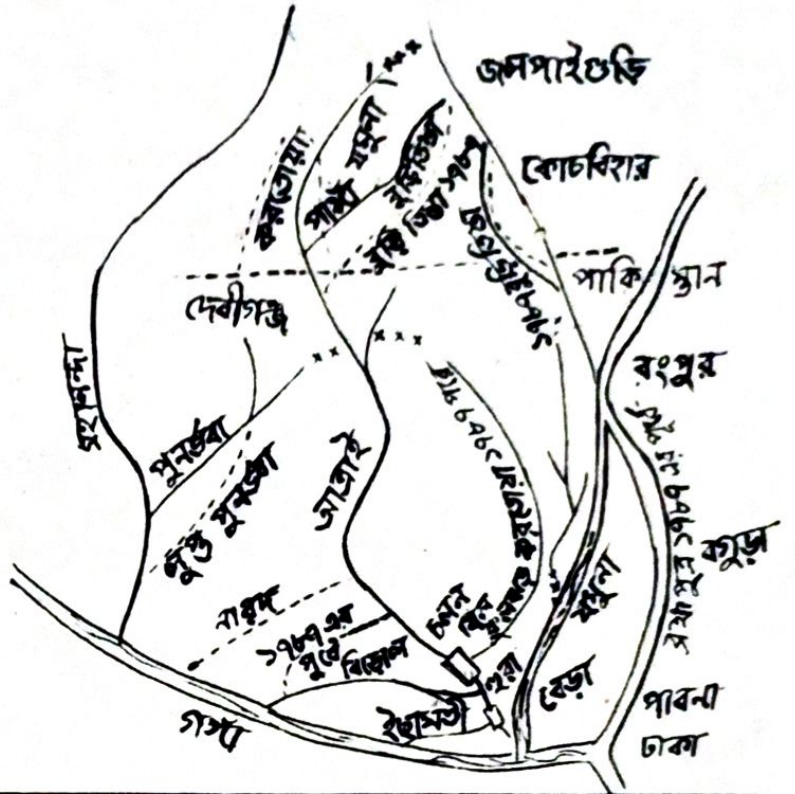


১৭৮৭-৮৮ এর পরে বড় নদীগুলি

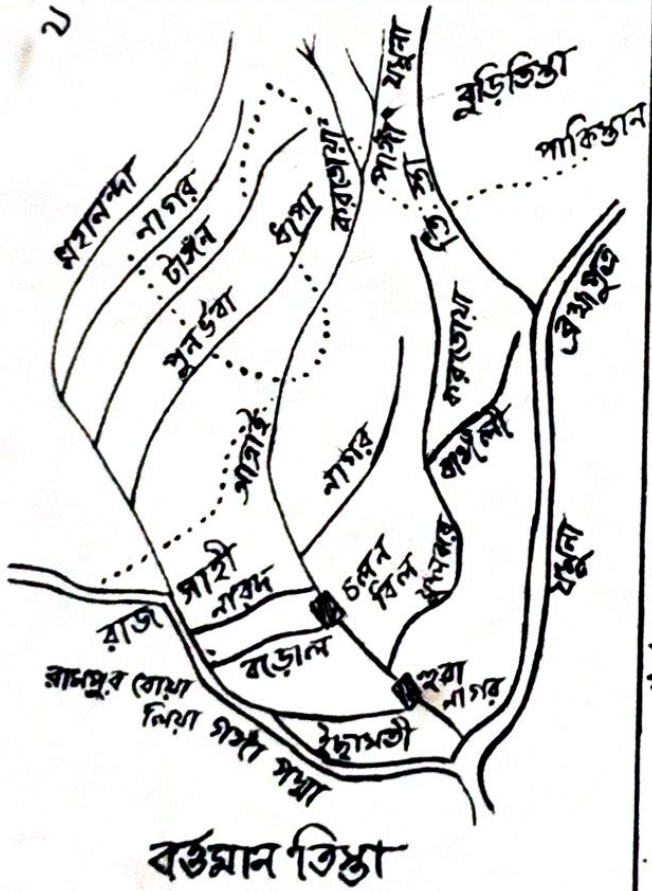
৭ পাশাড়ে তিষ্ঠা



৮ মনতমে তিষ্ঠা



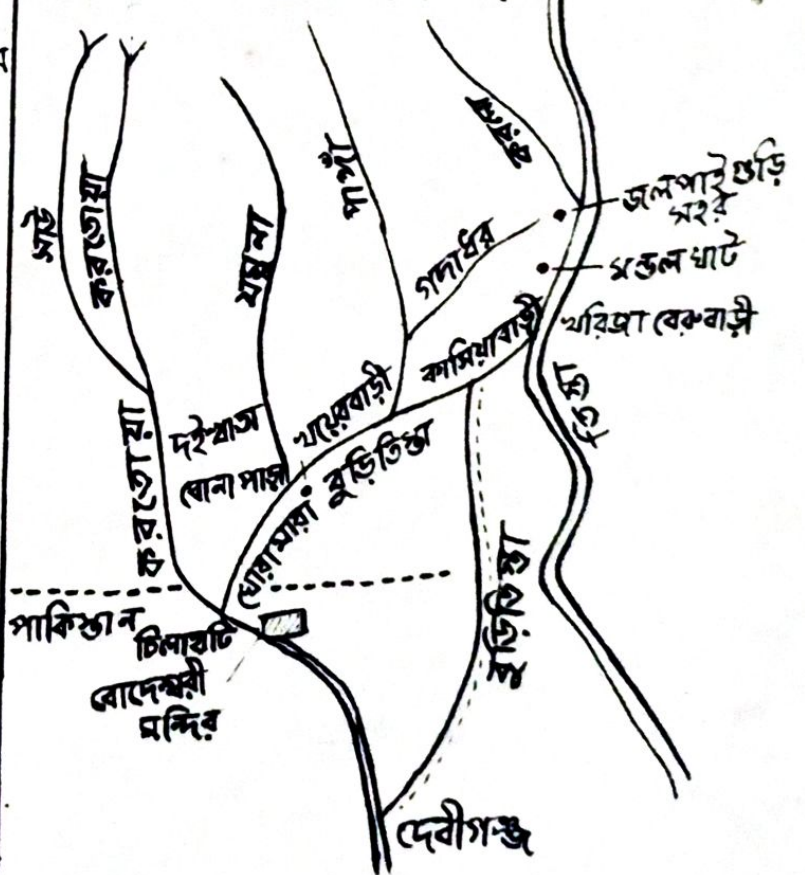
২



বর্তমান তিষ্ঠা

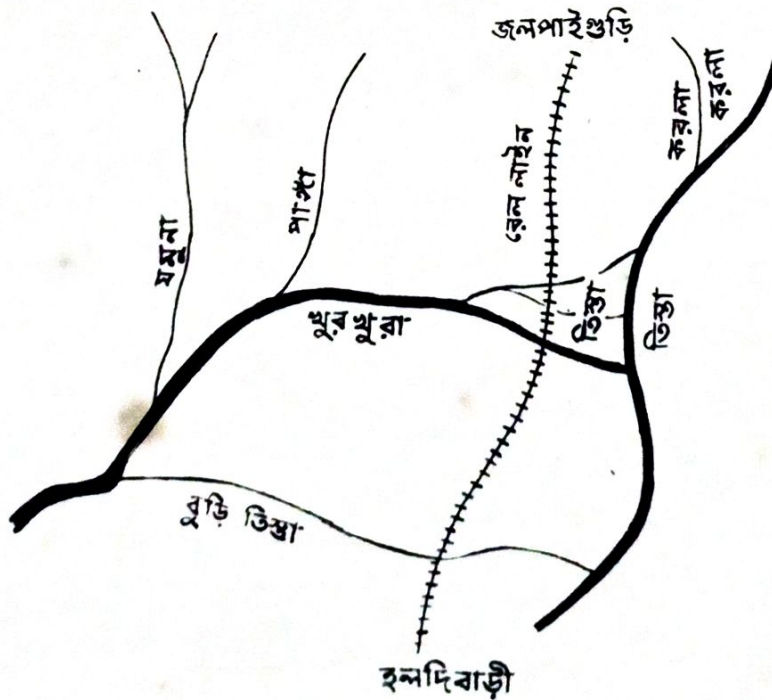
১০

১২৫০ এর পরে





১৯৬৯ সনের বন্যার পরে



ব্রহ্মপুত্রকে গঙ্গার সাথে মিলিয়ে দেবার জন্য একটি খাল কাটার প্রস্তাব হয়েছে। আসাম ও জলপাইগুড়ির নদীগুলি দেখলে এটাও অবাস্তব বলে মনে হয়। সমতলে বর্তমান তিস্তাকেই আয়ত্রে রাখা বিপজ্জনক হবে।

জলপাইগুড়ি সহরবাসী করলার বাড়তি জলের বন্যায় অস্থির হয়েছে, কাজকর্মের ব্যাঘাত হচ্ছে, ঠাণ্ডা উঠে কাগজপত্র নষ্ট হচ্ছে, দালানগুলির আয়ু কমে যাচ্ছে। একটি প্রস্তাব এসেছে, করলা নদীর ভেতরে দুই দিকে ব্রেবোর্ণ পুল থেকে ককরুকার মুখ পর্যন্ত বাঁধ দিয়ে করলার পরিসর কমিয়ে দেওয়া হোক। এতে কোন জমি অধিকার করতে হবে না। পরিসর কমলে শ্রোতের বেগ বেশী হবে, নদী গভীরতর হবে আর সম্ভবত তিস্তার মুখ খুলে যাবে। তিস্তার জল করলার ভেতরে আসবে না। না হয় তিস্তার পশ্চিম পাড়ে একটা বাঁধ দিতে হবে। এটা করলে সহরের জল নিকাশের নালীগুলি অগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা এটা ভেবে দেখতে পারেন।

মৃতপ্রায় করতোয়ার জলকে কাজে লাগাতে প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ি ফালাকাটা অঞ্চলে একটা বাঁধ দেওয়া শেষ হয়েছে ১৯৬৫ সনের ১লা জুলাই মাসে। এখান থেকে খাল কেটে প্রায় ২৩ হাজার একর জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে যাতে সেচ প্রাপ্ত জমিতে ফসল ভাল হয়। এদিকে প্রায় বছরে ১২০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। কাজেই বর্ষায় সেচ জলের দরকার নেই। শীতকালে নদীতে জল থাকে না, সেচ খালগুলি শুকনো। কাজেই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। তিস্তার সাথে এর কিছু যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারলে সারা বছর জল পাওয়া সম্ভব হবে। বিশেষজ্ঞরা এটাও ভেবে দেখতে পারেন।

একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস

একাদশ পরিচ্ছেদ

‘জলপাই গুড়িতে রেলপথের প্রসার’

জলপাইগুড়ি জিলার রেলপথের ইতিহাস

ত্রিহিমাংশ চক্রবর্তী

সূচনা

১৮৩৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী সিকিমের রাজা ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড বেটিককে দার্জিলিং উপহার দিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেব কর্মচারীরাও অস্থখে পড়লে দার্জিলিংএ থামত হাওয়া বদল করতে। সেই থেকেই শুরু হল দার্জিলিংএর দ্রুততালে উন্নতি।

১৮২১ সনে আসামের জঙ্গলে চা গাছ দেখা গেল। ১৮৩৪ সনে গভর্নর জেনারেল বেটিক এক কমিটি বসালেন চা গাছ চাষের আর চা পান বিস্তারের জন্ত কার্যকরী পরামর্শ পাবার জন্ত। কমিটিব সুপারিশ অনুসারে সরকার নিজের খরচায় উত্তর আসাম, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অঞ্চলে চা বাগান তৈরী করল। ১৮৩৫ সনে দার্জিলিং হাতে পেয়ে সরকার সেখানেও চা গাছ পুঁতে ফেলল। ১৮৩৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হল আসাম চা কোম্পানী। সেই থেকেই চা শিল্পে বেসরকারী অর্থলগ্নীর সূত্রপাত। ১৮৭৪ সনের মধ্যে দার্জিলিংএ প্রায় উনিশ হাজার একরোঁর মত জায়গা জুড়ে ১১৩টা চা বাগান বসে গেছে।

এদিকে তিস্তানদীর পূর্বপার থেকে আরো পূর্বে সঙ্কোশ নদী পর্যন্ত জায়গাটি ভূটানের কাছ থেকে ১৮৬৫ সনে সিনচুলী সন্ধির ফলে ভারত সরকারের হাতে পাকাপাকিভাবে এসে গেছে।

১৮৬৯ সনে ১লা জানুয়ারী রংপুর জিলার জলপাইগুড়ি মহকুমার সাথে এই অঞ্চলটি যুক্ত হয়ে জলপাইগুড়ি জিলার পত্তন হল।

১৮৭৪ সনে জলপাইগুড়ি জিলাতেও চা বাগান বসল গুইজলডোবাতে। এরও অনেক আগে ১৭৭৩ সনে কুচবিহার রাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। ভূটিয়াদের আক্রমণ থেকে কুচবিহারকে রক্ষা করার ভার বর্তেছিল প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ও পরে ভারত সরকারের উপর। তাছাড়া নেপাল, সিকিম, ভূটান রাজ্যগুলিকেও সামলানো দরকার, নইলে এরা কখন কোনদিক দিয়ে কি করে বসে।

এসব কারণে উত্তরবঙ্গে রেলপথ চালু করা খুবই দরকার হয়ে পড়ল। বাণিজ্যিক বা সামরিক কারণ ছাড়া কেবল উত্তরবঙ্গ কেন পৃথিবীর কোথাও রেলপথ হয়নি। ১৮২৪—২৬ সনে বর্মার সঙ্গে যুদ্ধের সময়েই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল যে নদীপথে সৈন্য ও রসদ যোগান দেওয়া যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনাকেই স্থানান্তিত করে। বর্মী যুদ্ধে দেখা গেল যে পূর্ব বাংলার নদীনালা দিয়ে সৈন্য ও রসদ ঘটায় আড়াই মাইলের বেশী গতি নেয় না। এই গদাই লক্ষ্যরী চালকে দ্রুত করার জন্তই পত্তন হল ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের। যে দুটি উত্তরবঙ্গের দ্বার খুলল—তার একটি হল এই ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে। অপরটি হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে। আর যে রেলপথ উত্তরবঙ্গের ভিতরে ঢুকল তার নাম হল নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে

১৮৫৩ সনে ভারতে প্রথম রেল চলা শুরু হল।

১৮৫৪ সনে প্রথম কোলিয়ারী স্থাপিত হল বাংলাদেশের রাণীগঞ্জে। বাংলাদেশে তাই প্রথম রেল চলল ১৮৫৫ সনে ওরা ফেঞ্চয়ারী হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত। এই রেলপথ ক্রমশঃ উত্তর দিকে এগিয়ে চলল চা শিল্পের তাগিদে। ১৮৫৯ সনে এই রেলপথ রাজমহল পর্যন্ত আর ১৮৬০ সনের প্রথমদিকে বিহারের সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে এল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৬০ সনেই উত্তর-বঙ্গে রেলপথের প্রথম দরজা খুলল। সাহেবগঞ্জে গঙ্গা পেরিয়ে এপারে কারাগোলাঘাট। সেখান থেকে বাদশাহী রাস্তা বিহারের পূর্ণিয়া, কিষাণগঞ্জ ও অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জিলার তেঁতুলিয়া হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রসারিত। ভাল রাস্তা। এ রাস্তা দিয়েই কোম্পানীর সৈন্ত সামন্ত উত্তরবঙ্গে আসত। এখনও পাকিস্থানের তেঁতুলিয়াতে সৈন্ত ব্যারাকের ধ্বংসাবশেষ আছে।

ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে

১৮৫৭ সনে ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী গঠিত হল। তার পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৮ সনে ভারত সরকারের সঙ্গে কোম্পানীর কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত রেললাইন খোলার চুক্তি হল। ১৮৬২ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর শিয়ালদা স্টেশন থেকে যাত্রা করে রাণাঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যখন ট্রেনটি দাঁড়াল তখন উত্তরবঙ্গের লোকেরা ধারণা করেনি যে আর পনেরো বছরের মধ্যেই তাদের বাড়ী থেকে ট্রেনের বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পাবে। ১৮৬২ সনের ১৫ই নভেম্বর রাণাঘাট লাইনের ট্রেন পথে পোড়াদহ স্টেশন হয়ে বৃষ্টিয়া গিয়ে দাঁড়াল। এটাই হল ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের গোয়ালন্দ লাইন। পোড়াদহ স্টেশনটি হল পদ্মার দক্ষিণে উত্তরবঙ্গের প্রবেশমুখে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৬২ সনে উত্তরবঙ্গের রেলপথের দ্বিতীয় দরজা খোলে।

নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে

ভগীরথের গঙ্গা আনার মত উত্তরবঙ্গে রেল লাইন আনার ভাগীরথী কাজটি করল নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে। ১৮৭০ সনেই এই রেলপথ খোলার পরিকল্পনা তৈরী হয়ে যায় এবং সেই বছরেই জমি মাপজোকের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। আরো একটা মজার কথা এই যে তখন উত্তরবঙ্গে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল এবং রেলে মাটি কাটার কাজ রিলিফ হিসেবে গণ্য করেই এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এখন যেমন টেপ্ট রিলিফ-এ ছোটখাটো রাস্তাঘাট তৈরী হয়। নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে প্রথমে পোড়াদহ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত মিটার গেজ লাইন বসাল। পরে মিটার গেজ লাইন তুলে দিয়ে ব্রড গেজ লাইন পাতল। এই রেলপথের ক্রমবিকাশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে।

থেকে	পর্যন্ত	কোন গেজের লাইন	খোলার বছর	মন্তব্য
আত্রাই	জলপাইগুড়ি	মিটারগেজ	২৮শে আগষ্ট ১৮৭৭ সন	
পোড়াদহ	ভেড়ামারাঘাট	"	১২শে জানুয়ারী ১৮৭৮ সন	
সারাঘাট	আত্রাই	"	"	
জলপাইগুড়ি	শিলিগুড়ি	"	১০ই জুন ১৮৭৮ সন।	
পোড়াদহ	দামুকদিয়া ঘাট	ব্রডগেজ	৮ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ সন	
দামুকদিয়া ঘাট	সান্তাহার	"	১২১৫ সন	
সান্তাহার	পার্বতীপুর	"	১লা জুলাই ১২২৪ সন	
পার্বতীপুর	শিলিগুড়ি	"	১লা অক্টোবর ১২২৬ সন	

বাংলাদেশের লে: গভর্নর স্যার অ্যাসলি ইডেন এই লাইনের উদ্বোধন করেন। এর ফলে কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত সরাসরি রেল সংযোগ হল। তবে মাঝে পদ্মানদী আগের মতই ফেরীতে পার হতে হত। এই অবস্থার অবসান হল ১৯১৫ সনের ৪ঠা মার্চ তারিখে।

পোড়াদহ থেকে ব্রডগেজ লাইন হওয়ার ফলে মিটারগেজের ভেড়ামারাঘাট ছেড়ে দিয়ে ব্রডগেজের নতুনঘাট হল—দামুকদিয়া ঘাট। ১৯১৫ সনের ৪ঠা মার্চের আগে পর্যন্ত পদ্মানদী ফেরীতে পার হতে হত। ১৯১৫ সনের ৪ঠা মার্চ পদ্মা নদীর উপর ৫,২০০ ফুট লম্বা সেতু তৈরী হল। খরচ হল চার কোটি টাকার মত। ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সেতুটির উদ্বোধন করেন এবং তাঁর নামানুসারে সেতুটির নাম হল হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। দেশ বিভাগের ফলে এই সেতুটি পূর্ব পাকিস্থানে পড়েছে।

এই রেলপথের রাজা ছিল দার্জিলিং মেইল। রাত্রে শিয়ালদা ছেড়ে পরদিন খুব ভোরে শিলিগুড়ি এসে যেত। শিলিগুড়ির আগে জলপাইগুড়িতে রাতশেষে একটু থামত। দার্জিলিং মেইল-এ থাকত কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে তৈরী ২টি বগী—প্রত্যেকটি ৬৮ ফুট লম্বা। প্রথম শ্রেণীর ৫২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬৩, ইন্টার ক্লাশের ১০৪ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১৫৮ জন যাত্রীর স্থান থাকত। দার্জিলিং মেইল তৈরী করতে খরচ হয়েছিল ২,৪৫,০০০ টাকা।

ঘণ্টায় ৫০ মাইল দৌড়ে দার্জিলিং মেইল-ই তখন ভারতবর্ষে সব চাইতে দ্রুতগামী ট্রেনের মর্যাদা পেয়েছিল।

১৯৪৭ সনে দেশ ভাগাভাগি হবার পর আমরা যখন স্বাধীন হলাম তখন শিয়ালদা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত এই ব্রডগেজ লাইনটির লেজ আর মাথা পড়ল পশ্চিম বাংলায় আর দেহের বাকী অংশটা পড়ল পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যে। চিলাহাটি এই লাইনে পাকিস্থানের শেষ স্টেশন, তারপরেই পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জিলায় অবস্থিত হলদিবাড়ী স্টেশন। হলদিবাড়ী থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। উত্তর বাংলার যে অংশ পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হল তার মধ্যে এই ৪০ মাইল লম্বা ব্রডগেজ লাইন ছাড়া আর কোন ব্রডগেজ লাইন রইল না। কিন্তু এই ব্রডগেজ লাইনটি তুলে ফেলা হল ১৯৫০ সনে। তার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হল মিটার গেজ লাইন। ভাগ্যের পরিহাস

আর কাকে বলে! একদিন যে মিটারগেজ লাইন ব্রডগেজে প্রমোশন পেয়েছিল তাকে আবার নামিয়ে দেওয়া হল মিটার গেজে। জলপাইগুড়ি স্টেশনেরও অদলবদল হল। স্থখ-দুঃখ, উত্থান পতনের পথে এগিয়ে চলে মানুষ, জাতি আর দেশ। রেলওয়ের জীবনেও বোধ করি এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। তাই উত্তরবঙ্গে মালদহ জিলার খেজুরিয়াঘাট থেকে ব্রডগেজ লাইন যখন জলপাইগুড়ি জিলায় ঢুকল তখন আবার মিটারগেজ লাইনটিকে ব্রডগেজে প্রমোশন দেওয়া হল।

দার্জিলিং - হিমালয়ান রেলওয়ে

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবার রেলপথ তৈরী হবার আগে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে হত হয় বর্তমানের হিলকার্ট রোড অথবা পান্জাবাড়ী-কাশিয়ং রোড হয়ে। হিলকার্ট রোড সারা বছর খোলা রাখতে খরচ হত বছরে ১৫ লক্ষ টাকা। কাজেই কম ব্যয়সাপেক্ষ রেলপথ খোলার প্রস্তাব হল।

আগেই বলেছি যে ১৮৭৮ সনে ১০ই জুন মিটারগেজ লাইন শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সেই বছরেই কলকাতার মেসার্স টম মিচেল এণ্ড র‍্যামসে-কে দার্জিলিং পর্যন্ত ট্রামওয়ে তৈরীর ঠিকেদারী দেওয়া হল। ১৮৭৯ সনেই দার্জিলিং যাবার ন্যারোগেজ লাইন বসাবার কাজ আরম্ভ হল। ১৮৮০ সনের মার্চ মাসে রেল লাইন তিনধরিয়া পর্যন্ত উঠে গেল। লর্ড লিটনই প্রথম ভাইসরয় যিনি দার্জিলিং দেখলেন। তিনি শিলিগুড়ি থেকে তিনধরিয়া পর্যন্ত এই ছোট লাইনের ছোট ট্রেনেই এলেন। তাঁর দার্জিলিং আগমন উপলক্ষ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জামালপুর ওয়ার্কসপে তৈরী ছোট ইঞ্জিনকে (নাম দেওয়া হয়েছিল “Tiny”) কাজে লাগান হল। ছোট লাইনের এই ছোট ইঞ্জিন কিন্তু বড়লাটকে তাঁর অনুচরবর্গ ও মালপত্র সমেত পুরো রাস্তা টানতে পারল না। মাল টেনে তুলতে অনেক কুলীকে হাত লাগাতে হয়েছিল। ১৮৮০ সনের শেষাংশেই এই রেল লাইন কাশিয়াং এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮১ সনের ৪ঠা জুলাই তারিখে দার্জিলিং পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল। ট্রামওয়ের নাম পরিবর্তন হয়ে হল—দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে—সংক্ষেপে ডি, এইচ, আর, এবং এর ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হল মেসার্স গিলাগার্স আরবুথনট্ এণ্ড কোম্পানী। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং এর দূরত্ব দাঁড়াল ৫১ মাইল। এই ন্যারোগেজ লাইনটি শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ১৮৬৯ সনে তৈরী হিলকার্ট রোডের হাত ধরেই চলেছে। ১৯১৪ সনে এই রেল লাইনের ওয়ার্কসপ তৈরী হল তিনধরিয়াতে। তার আগে যাবতীয় কাজ হত জামালপুর ওয়ার্কসপে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের আর একটি শাখা শিলিগুড়ি থেকে বিহারের কিষাণগঞ্জ পর্যন্ত টেনে দেওয়া হল। এই কাজটি হুগ্ প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শুরু হবার কিছু আগে। এই শাখা রেলপথটির দৈর্ঘ্য হল প্রায় ৭০ মাইল। লাইনটি হল ন্যারোগেজের। ১৯৫০ সনে আসাম লিঙ্ক এই ন্যারোগেজের শাখাটিকে মিটার গেজে প্রমোশন দিয়ে নিজেদের করে নিল। আসাম লিঙ্কের পূর্বদিকে আরো বিস্তারের কথা বেঙ্গল ডুয়াস রেলওয়ের আলোচনায় বলা যাবে।

ডি, এইচ, আর, এর তৃতীয় শাখাটি প্রসারিত হল শিলিগুড়ি থেকে শিবোক হয়ে তিস্তা নদীর পশ্চিম পার দিয়ে গিয়ালিখোলা পর্যন্ত। দূরত্ব হল মাত্র ৩০ মাইল। ১৯১৫ সনে এই ন্যারোগেজ লাইনটি পাতা হল আর ১৯৫০ সনে এই লাইনটির পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলা হল।

বেঙ্গল - ডুয়ার্স রেলওয়ে

বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে বা সংক্ষেপে বি, ডি, আর, জলপাইগুড়ি জিলার ঘরের ছেলে। জলপাইগুড়ি জিলার ভিতর আর যে সব রেলপথ আছে তারা সবাই বাইরের। যাতায়াতের পথে খানিক দেখা দিয়েই চলে যাচ্ছে। কিন্তু বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে তা নয়। এর জন্ম ও বিস্তার এই জিলার মধোই সীমাবদ্ধ বলা চলে। কেবলমাত্র একটি শাখা বাড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণ-পূর্বদিকে লালমনিরহাট পর্য্যন্ত।

১৮৬২ সনে যখন পশ্চিম-ডুয়ার্স অঞ্চলকে রংপুর জিলার জলপাইগুড়ি মহকুমার সঙ্গে যুক্ত করে জলপাইগুড়ি জিলার পত্তন হল সেই সময়ে পশ্চিম ডুয়ার্সে ছিল বড় বড় গভীর অরণ্য, অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে লম্বা লম্বা ঘাসে ভিত্তি প্রান্তর, লম্বা ঘাসের চাইতে আরো লম্বা বাঁশবন ও অজস্র শিমুল গাছ। প্রাণীর মধ্যে নগণ্য যা ছিল সে হল মানুষ। বাঘ ও হাতীর লেখাজোখা ছিলনা। আর ছিল ভূটান পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য বোড়া আর নদী। আগেই বলেছি যে এহেন নতুন আফ্রিকায় ১৮৭৪ সনে প্রথম চা বাগান বসে গেছে। ক্রমে তাদের সংখ্যা বেড়েই চলল। এদিকে আশেপাশের জিলাগুলি থেকে বহু লোক ছুটে এল জমির লোভে। তারা এসে জঙ্গল কেটে, ঘাস পুড়িয়ে, বাঘ-হাতীকে তাড়িয়ে চাষাবাদ শুরু করে দিল। একদিকে চাষাবাদ আর অন্যদিকে চা বাগানের দ্রুত বিস্তার—এই দুয়ে মিলে জমির চেহারা ১৮৯০ সনেই প্রায় বর্তমান আলিপুরদুয়ারের চেহারায় রূপান্তরিত করে ফেলল। এর জন্ম সৃষ্টি হল বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে। যদি কেবলমাত্র চা শিল্পের তাগিদে কোথাও রেলপথ খুলে থাকে তবে তা হল এই বি, ডি, আর।

এই রেলপথ তৈরীর জন্য ১৮৯১ সনে ভারত সরকার ও অক্টোভিয়াস ষ্টীলের সঙ্গে এক চুক্তি হল। তাতে ঠিক হল যে জলপাইগুড়ি সহরের উল্টোদিকে তিস্তানদীর পূর্ব পারে অবস্থিত বার্গেশ থেকে ডামডিম পর্য্যন্ত ও পথে লাটাগুড়ি থেকে জলঢাকা নদীর পশ্চিম পারে রামশাইহাট পর্য্যন্ত রেলপথ তৈরী হবে। এতে আরো ঠিক হল যে ভবিষ্যতে রামশাইহাট থেকে পূর্বদিকে লাইনের প্রসার করা হবে জলঢাকা নদীর উপর সেতু তৈরী করে। পশ্চিম ডুয়ার্সে রেলপথ খোলার তাগিদ এতই প্রবল ছিল যে চুক্তিপত্রে কয়েকটি মজার ধারা বসানো হল অক্টোভিয়াস ষ্টীল কোম্পানীর অঙ্কুলে। যেমন রেলপথ তৈরী করার জন্য সরকার বিনা পয়সায় জমি দেবে, রেল লাইনের স্লিপার তৈরী করার জন্য সরকার বিনামূল্যে সংরক্ষিত বনের কাঠ দেবে, জলপাইগুড়ি শহর থেকে বার্গেশঘাট যাতায়াতকারী ফেরী সার্ভিসটি তাদের হাতে দেওয়া হবে। সব চাইতে মজার ধারা হল যে কোম্পানীর যদি লম্বা টাকার শতকরা পাঁচ টাকা লাভ না হয় তবে সরকার সরকারী টাকায় সেই ক্ষতি পূরিয়ে দেবে। এই চুক্তি হবার পর রেলপথ তৈরীর জন্য বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে কোম্পানীর সৃষ্টি হল এবং রেল লাইন বসাবার কাজ শুরু হয়ে গেল।

পর পৃষ্ঠার তালিকায় এই রেলপথের বিস্তার দেখান হল।

মন্তব্য

এই বছরেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে বেদান্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন।

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের ফলে এই শাখাটির বড় অংশই পাকিস্থানে পড়ে গেল। বর্তমানে কুচবিহার জিলার মেখলীগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত ভারতীয় এলাকার শেষ স্টেশন চ্যাংড়াবান্ধা পর্যন্ত ট্রেন চলে। এর পরই হল পূর্ব পাকিস্থানের বুড়িমারী রেল স্টেশন।

বার্ণেশ স্টেশন হল জংশন। ১৯১০ সনে তিস্তা-নদীর ভাঙনের ফলে বার্নেশ ষাট নদীর গর্ভে চলে গেল। আর সেই সঙ্গে লাইনটিও উঠে গেল।

এই বছরেই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু।

মাল স্টেশন মাল জংশন হল।

বর্তমানে এই লাইনে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

উপরের তালিকা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ১৯০৩ সনে পূর্বদিকের সম্প্রসারণ আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি জলঢাকা নদীর উপর সেতু তৈরীর বিরাট খরচের কথা চিন্তা করে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের আলোচনাকালে বলেছি যে আসাম লিঙ্ক ডি, এইচ, আর, এর কিয়দংশ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ন্যারোগেজ লাইনটিকে মিটারগেজ করে নিয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে বাগরাকোট পর্যন্ত কোন রেল লাইন ছিল না। আসাম লিঙ্ক এবারে শিলিগুড়ি থেকে বাগরাকোট পর্যন্ত মিটারগেজ লাইন পেতে দিল পথে তিস্তা নদীর উপর সেতু তৈরী করে। আসাম লিঙ্ক এবার বি, ডি, আর, এর ধনে পোন্দরী শুরু করল। বাগরাকোট থেকে মাদারীহাট পর্যন্ত লাইনটিকে বেমালুম আত্মসাৎ করে নিল। তোর্ধানদী পেরিয়ে পূর্বদিকে আসাম লিঙ্কের বিস্তৃতি কুচবিহার স্টেট রেলওয়ের আলোচনায় বুঝা যাবে।

এতসব যোগ-বিয়োগের পর হাতে থাকল কেবল চ্যাংড়াবান্ধা থেকে মাল পর্যন্ত মিটারগেজ লাইনটি পুরোপুরি বি, ডি, আর, এর সাক্ষী হিসেবে।

কুচবিহার ষ্টেট রেলওয়ে

কুচবিহারের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব অনুভূত হচ্ছিল বহুদিন থেকে। তাই কুচবিহারকে রেলপথে কাউনিয়া ও ধুবড়ী লাইনের শেষ স্টেশন রংপুর জিলার মোগলহাটের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা ১৮৮৩ সনের জালুয়ারী মাসে হাতে নেওয়া হল। সেই সময়েই ন্যারোগেজ লাইন তৈরী করার হিসাবপত্র প্রস্তুত করে সরকারের কাছে পাঠান হল মঞ্জুরী পাবার জন্য। কিন্তু মঞ্জুরী পাবার আগেই রেলপথ বসাবার জন্য বাধ তৈরী ও মাটি কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল। বেশ কিছুটা কাজ এগিয়ে যাবার পর সরকার বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের এজেন্ট ফানিভালের কাছে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর মতামত চাইল। বেঙ্গল-সেন্ট্রাল রেলওয়ে কলকাতা ও রাণাঘাটের সঙ্গে খুলনার যোগাযোগ করত। ১৮৮৪ সনে তাঁর রিপোর্ট পেয়ে সরকার এই পরিকল্পনা বাতিল করে দিল। তবে ঠিক হল যে মিটারগেজ লাইন বসানো হবে। এই উদ্দেশ্যে মাপজোকের কাজও হল কিছু কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনাটি পুনর্বিবেচনার পর অনিদিষ্ট কালের জন্য হিমঘরে আশ্রয় নিল। কুচবিহার ষ্টেট রেলওয়ে তৈরীর পথে বিলম্ব ঘটান ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ধুবড়ী - কাউনিয়া লাইন রাখা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা। ১৮৯০ সনে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে লেখালেখি করে জানা গেল যে কাউনিয়া থেকে মোগলহাট লাইন তুলে দেবার কোন ইচ্ছে সরকারের নেই বরং এটাকে মিটারগেজে পরিণত করতে চায়। এই আশ্বাস পাবার পর ১৮৯১-৯২ সনে স্থির হল যে তোর্ষা নদীর দক্ষিণ পার থেকে শুরু করে প্রথমে দেওয়ানহাট ও পরে গীতালদহ পর্যন্ত ন্যারোগেজ লাইন পাতা হবে। এই লাইনের ক্রম বিস্তৃতি নিম্নের তালিকায় বর্ণিত হল।

থেকে	পর্যন্ত	কোন গেজের লাইন	খোলার বছর	মন্তব্য
তোর্ষানদীর পশ্চিম পার	গীতালদহ ঘাট	ন্যারোগেজ	১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩	১৮৯৩ সনে এই লাইনে মাল চলাচল শুরু হয়। ১৮৯৪ সনে ১লা মার্চ যাত্রী চলাচল আরম্ভ হল।
মোগলহাট	গীতালদহ	"	১৮৯৪ সন	
তোর্ষানদীর পূর্ব পার	কুচবিহার	"	১৮৯৭-৯৮ সন	তোর্ষানদীর উপর সেতু তৈরী হয় ১৯০০ সনে। তার আগে নদী ফেরীতে পার হতে হত।
কুচবিহার	আলিপুর- দুয়ার	"	১৯০০ সন	পথে কালজানি নদীর উপর সেতু তৈরী হল ৬৬,৫১২ টাকা। এই রেলপথ তৈরী করতে খরচ হল ১৩ লক্ষ টাকার উপর। এর মধ্যে ৮ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়েছিল চাকলাজাত সম্পত্তি বন্ধক রেখে।
আলিপুর দুয়ার	রাজাভাত খাওয়া	"	১৯০১ সন	১৯১০ সনে ন্যারোগেজ লাইনটিকে মিটারগেজে পরিবর্তিত করা হল এবং এই রেলওয়েকে ইষ্টার্ন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল।
রাজাভাত খাওয়া	জয়ন্তী	"	"	
"	হাসিমারা	মিটারগেজ	১৯১৪ সন	
কালচিনি	দালসিং পাড়া	"	"	১৯৫০ সনে আসাম লিঙ্ক হবার পর এই রেলপথ পরিত্যক্ত হয়।

আসাম লিঙ্ক রেলওয়ে

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের আগে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে আসামের রেল যোগাযোগ ছিল ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে দিয়ে। কলকাতা থেকে পার্বতীপুর আসতে হত। সেখান থেকে লালমনিরহাট, মোগলহাট, গীতালদহ, ভুরুঙ্গামারী, পাটেশ্বরী, সোনাহাট হয়ে আসামের গোলকগঞ্জ জংশনে যাওয়া যেত। তারপর গোলকগঞ্জ জংশন থেকে ধুবড়ীর একটি শাখা রেল লাইন ছিল। আর উত্তরদিক দিয়ে পূবে রেলপথ বিস্তৃত ছিল আসামের নানা জায়গায়। আগেই বলেছি যে দেশ ভাগাভাগির ফলে ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের লেঙ্গ ও মাথা ছাড়া বাকী অংশ পূর্ব পাকিস্থানে পড়ে গেল। লালমনিরহাট ও মোগলহাট পড়ল পূর্ব পাকিস্থানের রংপুর জেলায়। গীতালদহ ও গোলকগঞ্জ জংশনের মাঝে তিনটি স্টেশন ভুরুঙ্গামারী, পাটেশ্বরী ও সোনাহাট—পূর্ব পাকিস্থানে পড়ে গেল। ফলে আসামের সঙ্গে রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আসামের সঙ্গে ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা করার কথা ভারত সরকার চিন্তা করলেন। ১৯৪৭ সনের নভেম্বর মাসেই সরকার এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হল আসাম রেলওয়ে লিঙ্ক প্রজেক্ট। খুব তাড়াতাড়ি জরিপের কাজ শেষ করা হল ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। তিস্তা ও তোরা নদী দুটির উপর সেতু নির্মাণের স্থানও ঠিক হয়ে গেল। ১৯৪৮ সনে ২৭শে জানুয়ারী এই রেলওয়ে তৈরী করার আদেশ দিলেন ভারত সরকার। কি ভাবে কলকাতার সঙ্গে আসামের যোগসাধন করা হল তা নীচের তালিকায় দেখান হল।

থেকে	পর্য্যন্ত	কোন গেজের লাইন	কোন রেলওয়ের লাইন	মন্তব্য
কলকাতা	সকরীগলি ঘাট	ব্রডগেজ	ই, আই, আর	সকরীগলিঘাট থেকে ফেরীতে গঙ্গানদী পার হয়ে উত্তর পারে মনিহারীঘাটে আসা হত।
মনিহারী ঘাট	কিষাণগঞ্জ	মিটারগেজ	"	এই লাইন দেশ ভাগের আগেই ছিল। সুতরাং আসাম লিঙ্ক কলকাতা থেকে কিষাণগঞ্জ পর্য্যন্ত নতুন কিছুই করল না।
কিষাণগঞ্জ	শিলিগুড়ি	"	ডি, এইচ, আর	আসাম লিঙ্ক ডি, এইচ, আর, এর এই ন্যরোগেজ লাইনটিকে মিটারগেজে প্রমোশন দিয়ে নিজে করল। এই প্রথম আসাম লিঙ্ক নিজে নতুন কিছু করল।
শিলিগুড়ি	বাগরাকোট	"	নতুন লাইন	শিলিগুড়িতে আসাম লিঙ্ক শিবাকের কাছে তিস্তা-নদীর উপর সেতু করল।
বাগরাকোট	মান্দারীহাট	"	বি, ডি, আর	আসাম লিঙ্ক তোরা নদীর উপর সেতু তৈরী করল। কুচবিহার স্টেট রেলওয়ের হাসিমারা স্টেশন ভেঙে নতুন বড় স্টেশন তৈরী হল নাম দেওয়া হল নিউ হাসিমারা।
মান্দারীহাট	হাসিমারা	"	নতুন লাইন	
হাসিমারা	আলিপুর- দুয়ার জংশন	"	কুচবিহার স্টেট রেলওয়ে	আসাম লিঙ্ক আলিপুরদুয়ারে নতুন স্টেশন তৈরী করল। নাম দিল আলিপুরদুয়ার জংশন। এটি হল কুচবিহার স্টেট রেলওয়ের দমনপুর ও আলিপুর-দুয়ার কোট স্টেশন দুটির মাঝখানে।
আলিপুর দুয়ার জংশন	ককিরাগ্রাম জংশন	"	নতুন লাইন	পশ্চিম বাংলা ও আসামের মাঝে সঙ্কোশনদীর উপর স্থায়ী সেতু তৈরী হল ১৯৫০ সনে ১২ই মে। এই লাইনে পশ্চিম বাংলার শেষ স্টেশন হল জোরাই। সঙ্কোশের ওপারে আসামের প্রথম স্টেশন হল শ্রীরামপুর।

আসাম লিঙ্কের সঙ্গে তাল রেখে শিলিগুড়ি থেকে হলদিবাড়ী স্টেশন পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইনটি তুলে দিয়ে মিটার গেজ লাইন বসান হল। ব্রডগেজে শেষ ট্রেন চলে গেল ১৯৫০ সনে ২০শে জানুয়ারী বিকেলে। তারপর এই অঞ্চল কয়েকদিন রেলপথে সংযোগহীন হয়ে রইল। ২৩শে জানুয়ারী প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চলল মিটারগেজে শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত। তারপর ২৬শে জানুয়ারী আসাম লিঙ্ক চালু হবার দিনে শিলিগুড়ি থেকে হলদিবাড়ী পর্যন্ত ট্রেন চলল মিটার গেজে।

ব্রডগেজ রেলওয়ে

দেশ বিভাগের পর কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য জায়গা ও আসামের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্বক হল ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী আসাম লিঙ্ক রেলপথে। পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে মাত্র কলকাতা থেকে সক্রীগলি ঘাট পর্যন্ত ই, আই, আর,-এর ব্রডগেজ লাইন ছাড়া আসাম লিঙ্ক সবটা পথই যাচ্ছে মিটারগেজ লাইনে। মিটারগেজ রেলপথে গতি ব্রডগেজের তুলনায় অনেক কম এমনকি যাত্রী ও মালবহনের ক্ষমতাও অনেকাংশে কম। সেজন্য গতিকে আরো দ্রুত করার জন্য তৈরী হল ব্রডগেজ লাইন। ব্রডগেজ লাইনের অভাব অস্বত্ব হল বিশেষ করে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় ১৯৬২ সনে, যখন প্রয়োজন দেখা দিল অতি দ্রুত সীমান্তে সৈন্য ও রণসম্ভার পাঠাবার। ব্রডগেজ রেলপথ প্রায় সবটা পথই এল আসাম লিঙ্কের পথে গঙ্গার দক্ষিণতীর পর্যন্ত। তবে এবারে সক্রীগলিঘাটে না গিয়ে ব্রডগেজ দাঁড়াল এসে আরো কিছু পূবে মুর্শিদাবাদ জিলায় ফরাক্কাতো। ফরাক্কা ঘাটে ষ্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে মালদহ জিলায় খেজুরিয়া ঘাট। বর্তমানে গঙ্গানদীর উপর ফরাক্কা বাঁধের কাজ চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে নিকট ভবিষ্যতে এর কাজ সমাধা হয়ে যাবে। তখন আর ষ্টিমারে গঙ্গা পার হতে হবেনা। সরাসরি ট্রেন চলে আসবে মালদহ জিলায় রেলসেতুর উপর দিয়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আসাম লিঙ্কে গঙ্গার দুপারের ঘাটই পড়ে বিহারে কিন্তু ব্রডগেজে গঙ্গার দুটো ঘাটই হচ্ছে পশ্চিম বাংলায়। খেজুরিয়াঘাট থেকে ব্রডগেজ লাইন মালদহ হয়ে কুমদপুর দিয়ে বারসোই জংশনে পৌঁছে। সুতরাং ব্রডগেজ লাইনের কাটিহার যাবার দরকার হলনা। কুমদপুর থেকে প্রায় সোজা উত্তরে বারসোই চলে এল ব্রডগেজ। তারপর ব্রডগেজ ঢুকল জলপাইগুড়ি জিলায় নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে। সেখান থেকে নিউ জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী লাইনে বেলাকোবার পর রাণীনগর হয়ে জলপাইগুড়ি শহরের উত্তর দিক দিয়ে তিস্তানদীর উপর সেতু পেরিয়ে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা হয়ে ঢুকল কুচবিহার জিলায়। কুচবিহার স্টেট রেলওয়ের কুচবিহার ও বাণেশ্বর স্টেশন দুটির মাঝে তৈরী হল নিউ কুচবিহার রেলস্টেশন। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি জিলায় একটি মহকুমা শহর) এল কালজানি নদীর উপর নতুন সেতু তৈরী করে। আলিপুরদুয়ারে ব্রডগেজের নতুন স্টেশন হল— নিউ আলিপুরদুয়ার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আলিপুরদুয়ারেই চারটে রেলস্টেশন রয়েছে — কুচবিহার স্টেট রেলওয়ের ২টি, আসাম লিঙ্কের ১টি এবং ব্রডগেজের ১টি। নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ব্রডগেজ লাইন আসাম লিঙ্কের পাশাপাশি চলল ফকিরাগ্রাম জংশন পর্যন্ত পথে সঙ্কোশ নদী পেরিয়ে নতুন সেতু দিয়ে। আসাম লিঙ্ক যেমন প্রায় সবটা পথই গেছে পরের ধনে পোদারী করে ব্রডগেজ কিন্তু ততটা নয়। কলকাতা থেকে ফরাক্কা বাদ দিয়ে বাকী পথটা নিজেই তৈরী করেছে এবং রেলসেতুও করেছে প্রধান প্রধান নদীর উপর যেমন — মহানন্দা, তিস্তা, তোষা, কালজানি ও সঙ্কোশ। ব্রডগেজ লাইন বসাবার জন্য জলপাইগুড়ি জিলায় জায়গা নেওয়া হয়েছে ২৩৮৪ একর এবং তার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। এই রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু হয় ১৯৬৭ সনে ১লা জানুয়ারী।

শতাব্দীর

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

‘জনকল্যাণে জিলাবাসী’

প্রাক-আধুনিক আন্দোলন কাল

শতবর্ষের জনকল্যাণ

শ্রীসরোজিৎ বাগচী

নৈসর্গিক, অ-নৈসর্গিক বিপদ, মহামারী, ইত্যাদি সমাজকে যখন বিব্রত ও বিধ্বস্ত করে, সাধারণ মানুষ যখন আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ে — তখন কল্যাণমূলক পরিকল্পনা নিয়ে কিছু সংখ্যক সমাজদরদী মানুষ আসে এগিয়ে। এঁরাই সমাজকল্যাণ কর্মী। এখানে মানবচরিত্রের দুটো দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ধ্বংস এবং সৃষ্টি দুটো কাজ ঠিক পাশাপাশি চলে। একদল যখন আঘাত হানে অপর দল তখন আসে সেবার মনোভাব নিয়ে, কষ্টের লাঘব করতে।

ঠিক এই মনোভাব নিয়ে যঁারা একদিন নিজে বেঁচে অপরকে বাঁচাবার তাগিদে জলপাইগুড়ি জেলা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরাই সমাজের কল্যাণের জন্ত, বিভিন্ন সময় এককভাবে আবার কখনও দলবদ্ধভাবে, আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৬৮ সালের ১লা জানুয়ারীতে জেলা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকার তে। তাঁর কর্মচারীদের সুস্থ রাখবার জন্ত একজন ডাক্তার নিয়ে একটি হাসপাতাল চালু করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে সেবা করবে কে? একে একে শহরে এসে জমা হলেন—কয়েকজন কবিরাজ, এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এঁরা এসেছিলেন বাঁচবার তাগিদে। কিন্তু সমাজের সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়েন।

এই জেলার সমাজকল্যাণমূলক কাজকে সময়ের দিক দিয়ে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্রাক স্বাধীনতা আন্দোলন কাল (২) স্বাধীনতা আন্দোলন কাল (৩) স্বাধীনতা-উত্তর কাল।

কাজের দিক দিয়ে আবার তিন অংশে ভাগ করা যেতে পারে —

ক। শিশু কল্যাণ। খ। নারী কল্যাণ। গ। আদিবাসী কল্যাণ।

সমাজমঙ্গলের মধ্যে যদিও সর্বশ্রেণীর কথা বোঝায় — তবুও যখন পৃথক পৃথক সেবা প্রতিষ্ঠান পৃথক পৃথক ভাবে কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসেন এবং পার্থক্যের সৃষ্টি করেন তখন পৃথকভাবে বিচার করাই যুক্তিযুক্ত।

প্রাক-স্বাধীনতা আন্দোলন কাল

সেকালে রাজারা বা নবাবরা প্রজাদের সুখসুবিধা ও স্বাস্থ্যের জন্ত নানা প্রকার কল্যাণমূলক কাজ নিজ নিজ রাজত্বে করে প্রজাদের আশীর্বাদ কুড়িয়ে পুণ্যার্জন করতেন। প্রতি পরগণা এবং মৌজায় ধর্মগোলা স্থাপন করে (রিজার্ভ ষ্টোর), ধান সংরক্ষণ, দীঘি প্রতিষ্ঠা, মন্দির ও মসজিদ স্থাপন করে সাধারণ মানুষকে ধর্মভাবাপন্ন এবং শান্তিপ্ৰিয় করে তোলবার চেষ্টা করতেন। তা' ছাড়া অভাবে, দুর্ভিক্ষে সাহায্য দেওয়া, খাজনা মকুব করা ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজের ধারক ও বাহক ছিলেন রাজারা। ১৭০২ সালে বৈকুণ্ঠপুরে রাজা সর্গদেব রায়কত তখন রাজা — প্রজাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে তাদের জলাভাব দূর করবার জন্ত এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত রাজবাড়ীর

জুহুং দীঘি, শিবমন্দির ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিংবদন্তী যে রাজবাড়ীর বর্তমান কালীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'দেবী চৌধুরাণী' খ্যাত ভবানী পাঠক। এ অঞ্চল তখন বাহারবন্দ পরগণার অধীন ছিল।

সবদেব রায়কত রাজবাড়ীর পাশে জলাশয় কেটেই নিরন্তর হলেন না — তিনি তাঁর রাজত্বে প্রজাদের কল্যাণের জন্ত অনেকগুলো দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন যেমন — জোড়দীঘি, ফাটাপুকুর দীঘি, জলেশ দীঘি এবং কুন্দর দীঘি।

সেই সঙ্গে তিনি আর একটি কল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হন — মনসা ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেলা বসাবার ব্যবস্থা করেন। রাজবাড়ীর এই বিহরির মেলা এবং দুর্গাপূজার নবমীর মেলা জলপাইগুড়ি জেলার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে দেড়শো বছর আগে যখন পথঘাট ছিল না — প্রজা সংখ্যা যখন নথাগ্রে গোণা যেত — তিস্তা এবং করলা নদীতে যখন নৌকো চলাচল করে মাহুঘের সঙ্গে মাহুঘের যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল — তখন এই মেলার মূল্য ছিল প্রজাদের কাছে অনেক। নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও তুপ্পা ও তুমুলা জিনিস প্রজারা সংগ্রহ করে রাখত। তাছাড়া, আচার-আচরণ, আনন্দোৎসব প্রজাদের কল্যাণ আনত। লোক শিক্ষার প্রচার এই মেলার মাধ্যমে হোত।

কেবল রাজবাড়ীতেই এই মেলা সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন পূজাপার্বণ উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মেলার প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমন রাজগঞ্জে জটেশ্বরের মেলা, মহারাজের মেলা — রংধামালী, দুর্গাপূজা উপলক্ষে বানেজার মেলা, শোভারহাটের মেলা, সন্ন্যাসীহাট মেলা, পাহাড়পুর দীঘন মেলা ইত্যাদি। গৌরীহাট ও বেক্র-বাড়ীর মেলা — দর্পদেবের আমলে প্রথম শুরু হয়।

তাছাড়া আর একটি প্রাচীন মেলা বহুদিন ধরে চলে আসছিল তা জলেশ্বরের মেলা — একমাস এই মেলা চালু থাকে।

সেই যুগে অতিথি নারায়ণরূপে সেবা পেতেন। সেজন্ত প্রত্যেক মন্দিরে অতিথি সেবার ব্যবস্থা ছিল। তখন হোটেল অথবা ধর্মশালার প্রচলন ছিল না। দূরদেশাগত পথিক এসে রাজার অতিথিশালায় আশ্রয় নিয়ে বৈকুণ্ঠনাথের প্রসাদ গ্রহণ করে রাজাকে আশীর্বাদ করে বৈকুণ্ঠনাথকে প্রণাম জানিয়ে ঘনজঙ্ঘলপূর্ণ রাস্তায় মনোবল স্থল করে রওনা হোত। মন্দির প্রতিষ্ঠার মূলে রাজাদের অতিথিসেবা সর্বত্র কল্যাণমূলক ও ধর্ম-পালনের স্বাক্ষর। সমাজ ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দ্বাদশ রায়কত দর্পদেব পুরী থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ে এসে এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। সমাজকল্যাণের চিন্তা নিরলোভী সমাজের হিতকামী, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ত্যাগী ব্রাহ্মণদের উপর হস্ত ছিল। সমাজের হিতার্থে এই ব্রাহ্মণরা যেমন সদুপদেশ দিতেন তেমনি প্রজা-কল্যাণের কাজে রাজা জমিদারদের উৎসাহিত করতেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় পূজার্চনার মাধ্যমে সাধারণ মাহুঘকেও সমাজ কল্যাণে রাজা অথবা জমিদারদের সঙ্গে সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করত।

১৮৬৮ সালে জেলা শহর পত্তন হবার পর সরকারী কর্মচারী হিসাবে যারা আসেন তাঁদের মধ্যে ৩গোপালচন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিশনার সাহেবের মহাফেজখানার মহাফেজ ছিলেন ৩গোপালচন্দ্র ঘোষ। পরে ওকালতী পাশ করে — জলপাইগুড়ি সহরেই আইনবাবসা শুরু করেন। তিস্তায় নৌকা এবং ষ্টিমারযোগে বহু নবাগত এসে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করত। তখনকার দিনে বাগচী বাড়ি ও সাম্রাণ বাড়ি ছিল সহরের বিনে পয়সার হোটেল, অব্যাহত দ্বার। রহিম বক্স পেশ্কার সাহেবের বাসায় (বর্তমান নবাব বাড়ি) যে কোন

মুসলমান এলেই থাকা ও খাওয়ার সুযোগ পেতেন। অতিথি নারায়ণ হিসাবে সবাই সেবা পেত এই সব বাড়ীতে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ডাঃ রাজকুমার সেন, ডাঃ তারানাথ চ্যাটার্জি, রজনী কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, নিমাই সেন কবিরাজ। পরবর্তী কালে এসে যোগ দেন ডাঃ কালীকমল সেন এবং অতুল ভক্তার বা সাহেব ভক্তার। এঁরা চিকিৎসার মাধ্যমে জনসেবা করতেন। তখন জনহিতকার প্রতিষ্ঠান বলতে ট্রেডিং ব্যাঙ্কের কাছে একটি সরকারী হাসপাতাল ছিল মাত্র এবং সেখানে একজন পাশকরা এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিল। তখনও মিউনিসিপ্যালিটি অথবা জেলা বোর্ডের সৃষ্টি হয় নি।

• ১৮৮৬ সালে মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম জলপাইগুড়ি শহরে পত্তন হয়। সহরবাসীর সাধারণ জীবনকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে প্রথম একজন হুইসেন্স ইন্সপেক্টর (বর্তমান স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের সমপর্যায়) নিয়োগ করে—সহর বাসীদের পৌর সভার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করবার চেষ্টা করা হয়। ১৮৮৭ সালে কসাইখানা সহরের মাঝখান থেকে সরিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ নয়াবস্তীতে সরিয়ে দেওয়া হয়। পৌরসভার হুইসেন্স ইন্সপেক্টরের নির্দেশে কসাইখানা সরাতে হয়।

এই সালেই জেলাবোর্ডের পত্তন হয়। জেলাবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সর্বত্র খাবার জল ডিসইনফেকশনের ব্যবস্থা করা হয়। জেলাভিত্তিক কল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যেই সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় জেলাবোর্ডের পত্তন। ১৮৮৮ সালে পৌরসভা আর একটি কল্যাণমূলক কাজে হাত দেয়। আবদ্ধ জল নিকাশের জন্য পৌরসভা সহরে ড্রেনেজ সিস্টেমের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

জেলা সহর পত্তন হলেও তখন অধিকাংশ ঘরবাড়ী ছিল খড়ের। সেজন্য প্রায়ই আগুন লাগত। সরকার ফায়ার সার্ভিস চালু করেন। ফায়ার সার্ভিস বলতে আজকের মত দমকল বাহিনী নয়। সব সরকারী অফিসের পাশে অথবা বারান্দার নিদিষ্ট স্থানে FIRE লেখা লাল রংয়ের বালি অথবা জলভর্তি বালতি একটা লোহার বার অথবা কাঠের রডের সঙ্গে ঝোলান হত। আগুন লাগলে কি করে এই বালতির দ্বারা আগুন দ্রুত নিভান যায় তার শিক্ষাও দেওয়া হয়। এখনও গ্রামাঞ্চলে যেখানে দমকল বাহিনী নেই, অথবা গ্রামের টেশনে, এই ধরনের FIRE লেখা বালতি দেখা যায়।

জনসাধারণকে এবং জেলাবাসীকে পরিষ্কৃত জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রথম জটমস টিউবওয়েল জনসাধারণের চাঁদায় চালু করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, এই ব্যবস্থা কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।

পর পর দু-তিন বছর বসন্ত রোগ মহামারী আকারে দেখা দেওয়ায় জনসাধারণের চাপে পৌরসভা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন বাংলা টিকা, শীতলাপুজা এবং হোমিওপ্যাথিই একমাত্র ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া তুকতাক, ঝাড়ফুক ইত্যাদি।

১৮৮৯ সালে পৌরসভা প্রথম বসন্তরোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এখন মাত্রুম রোগ এবং তার প্রকৃতি বিষয়ে অনেক সচেতন। তখন কিন্তু মাত্রুমের মন ছিল কুসংস্কারে ভরা। শিশুদের টিকা দেওয়া বিষয়ে যেমন আতঙ্ক ছিল তেমনি রোগ প্রতিরোধের জন্য ভুতুড়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করত। বিজ্ঞানকে তারা ব্লেক্স শিক্ষা দীক্ষা বলে মনে করত। সেই কল্যাণমূলক কাজকে স্বীকৃতি দেবার জন্য সরকারকে আইন প্রয়োগ করতে হয়।

চারিদিকে ম্যালেরিয়া, কালাজর, ব্র্যাকওয়াটার ফিভার, আমাশা ইত্যাদি রোগের প্রকোপে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখনও এই অঞ্চলের মানুষ শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর। সেইসময়ে কিছুসংখ্যক শিক্ষিতের আবেদন নিবেদনে জেলা বোর্ড সারা জেলায় কিছু নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে জেলাবাসীকে চিকিৎসার সহজ সুযোগ করে দেন। 'নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল'—সাধারণ মানুষ জেলা বোর্ডের এই দাতব্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করে। জেলা বোর্ড এই ভাবে সারা জেলায় জেলাবাসীর স্বাস্থ্যের জ্ঞান কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮২১ সালে প্রথম ডাক্তারখানা চালু হয়।

১৮২২ সাল। প্রবল ভূমিকম্পে এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্ষয় ক্ষতির সংবাদ আসে। জেলাবোর্ড একজন হেলথ অফিসারসহ একদল কর্মিকে ত্রাণকার্যের জ্ঞান পাঠিয়ে সকলের ধন্বাদাহ হয়। তাছাড়াও সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তির, যেমন যোগেশচন্দ্র ঘোষ, তারিণী প্রসাদ রায়, তারাপদ বিশ্বাস, জয়চন্দ্র সান্মাল ইত্যাদি অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সহরবাসীর কাছ থেকে টাকা পয়সা, জামা কাপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন। এই ভূমিকম্পে সবচাইতে বেশী অসুবিধা হয়েছিল পানীয় জলের। জেলাবোর্ড হেলথ অফিসারের মাধ্যমে পরিস্কৃত পানীয় জলের যেমন ব্যবস্থা করেছিলেন তেমনি সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা করেন।

এই বছরেই এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সহরের জনসাধারণ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে খাদ্য পাঠিয়ে সাহায্য করেন।

ঠিক সজ্জবদ্ধ প্রচেষ্টা বিশেষভাবে দেখা যায় না। তবে পৌরসভা ও জেলা বোর্ডের মাধ্যমে যে সব কল্যাণমূলক কাজ হয়েছে তাতে জনসাধারণ সহায়তা করেছেন।

১২০০ সালে—৬শশীকুমার নিয়োগী, শশীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ বিশ্বাস, ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক, সুরেশ্বর সান্মাল, তারিণীপ্রসাদ রায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি একটি স্থায়ী সংগঠনের কথা চিন্তা করে আর্থ্যনাট্য সমাজ স্থাপন করেন এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জগদীন্দ্র দেব রায়কত তাঁর নিজস্ব পাঠাগারটি এই সমাজকে দান করেন এবং তারাপ্রসাদ বিশ্বাস রুঘু জাপান যুদ্ধের চিত্রসহ মূল্যবান একটি পর্দা দান করে প্রেরণা যোগান।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির প্রেরণায় স্বাধীনতাকামী দেশভক্ত বিপ্লবীদল গড়ে উঠতে থাকে।

স্বাধীনতা আন্দোলন কালে

১২০২ সালে বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জলপাইগুড়িতেও একদল বিপ্লবী গড়ে ওঠে। দেশের স্বাধীনতা অর্জন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও জনচিত্তকে জয় করবার জ্ঞান জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতেন। বেশীর ভাগ কাজই ছিল রোগীর সেবা, আর সমাজে যে দু-চার জন দুঃস্থ পরিবার সহরে থাকতেন তাঁদের সাহায্য করা।

১২০৫ সাল — বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন — দেশের মূলে আঘাত দিয়ে দেশচেতনা ও সজ্জশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করায়। সারা দেশে সংগঠন গড়ে ওঠে। সজ্জশক্তি যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ শক্তি এর পরিচয় সবাই পান। তারক চক্রবর্তী, সীতানাথ প্রামাণিক, মধুসূদন দাশগুপ্ত, ননী রায়, মাধব সান্মাল, জয়চন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদি মিলে একটি সেবা সমিতি গঠন করেন।

মাহুঘ যখন দেশ স্বল্পে সচেতন হয়ে উঠল তখনই সমাজের দিকে তার দৃষ্টি এসে পড়লো — সতি, এ সমাজতো আমাদের সমাজ। এই সমাজ সেবাই প্রকৃত দেশ সেবা। এই সেবা সমিতির কাজ ছিল — রোগীর পরিচর্যা করা, দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য দেওয়া, আগুন নিভান, মাহুঘের বিপদে-আপদে আত্মনিয়োগ করা। এঁদের মধ্যে মাধবচন্দ্র সান্ধ্যাল ছিলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। পরবর্তীকালে এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন — শরৎ সেন, কিশোরীমোহন মৌলিক প্রভৃতি আরও কয়েকজন। আর একটি সেবামূলক কাজ এঁরা করতেন, মড়া পোড়াবার কাজ। যদিও প্রত্যেক মৃতের পরিবারের আত্মীয়স্বজনই এ কাজে অগ্রণী হতেন তবুও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এই সেবা সমিতি দায়িত্ব বহন করত। যোগেশচন্দ্র ঘোষ, জগদীন্দ্র দেব রায়কত প্রভৃতি এই সেবা সমিতিতে সাহায্য করতেন। আগেই বলেছি এই সময়ে আর্য নাট্য সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দেশের ভাবধারায় শিক্ষা দেবার জ্ঞান এই সমাজগৃহেই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কেবল লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল না। শিক্ষা, কাজ ও সেবার মাধ্যমে কর্মী গড়াই ছিল এঁদের অন্ততম উদ্দেশ্য। সমাজ ক্রমশঃ সহরবাসীর চিন্তাবিনোদন ও সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠানের জ্ঞান ব্যবহৃত হতে থাকায় সেবা সমিতি লুপ্ত হয়ে যায়।

১৯১২ সালে বিভক্ত বাংলা পুনঃ সংযোজিত হলে স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাঁটা পড়ল। কিন্তু তরুণ ও যুবকদের মধ্যে সমাজ সেবার যে জোয়ার এসেছিল তার গতি রুদ্ধ হল না। তাছাড়া সারা বাংলাদেশ তখন স্বামী বিবেকানন্দের সেবধর্মে উদ্ভুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর বাণী বাঙ্গালী তরুণ তরুণীর প্রাণে নতুন আবেগ সঞ্চার করে। পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট সেবা সমিতি, ক্লাব গড়ে ওঠে। পরার্থে জীবন দান শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

এ সময় রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। আন্দোলন যত গভীর হতে থাকে তরুণ ও যুবকরা ততবেশী সমাজকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসে। স্বাধীনতা আন্দোলন তরুণদের প্রাণে দেশ সেবার প্রেরণা জুগিয়েছে। নিষ্ঠাবান নেতার অধীনে কর্মীরা নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে সমাজ সেবায় এগিয়ে এসেছে।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী ভারতে এসে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের যে নতুন রূপদান করেন তাতে কেবল সহর নয়—গ্রাম বাংলা ও দেশ স্বল্পে লোকে সচেতন হয়ে ওঠে। তরুণ কর্মীরা দেশ সেবা ও সমাজ সেবার নতুন নির্দেশের জ্ঞান অপেক্ষা করতে থাকে। আন্দোলনের ইতিহাস নতুন পথে চলে এগিয়ে।

১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গের, সান্তাহার, বগুড়া, রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় হাজার হাজার লোক গৃহহারা সর্বহারা হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে এবং শ্রীহৃদাষচন্দ্র বসুর পরিচালনায় সারা বাংলায় বন্যা ত্রাণ সমিতি গড়ে ওঠে।

জলপাইগুড়িও পিছিয়ে থাকে না। কংগ্রেস থেকে একটি ত্রাণ সমিতি গঠন করা হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্ধ্যাল। শ্রীখগেন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে একদল কর্মী যেমন মাখন সান্ধ্যাল, সীতানাথ প্রামাণিক, নীরেন বাগচী, নগেন সান্যাল, অবনী গোস্বামী, যতীন রায় ইত্যাদি আক্কেলপুর গিয়ে ত্রাণ কেন্দ্র স্থাপন করে আন্তের সেবা শুরু করেন।

কংগ্রেস সেবাদল কেবল বন্যা পীড়িত অধিবাসীদের জ্ঞান দল পাঠিয়েই নিরস্ত হলেন না, তাঁরা জলপাইগুড়ি সহর ও জেলায় নতুনভাবে সেবার কাজ শুরু করেন। বেড প্যান, ইউরিনাল, হট ওয়াটার ব্যাগ, আইস্

বাগ, অয়েল ক্লথ ও রোগী পরিচর্যার অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে নতুন একটি কংগ্রেস সেবা দল তৈরী করেন। কারণ তখন হাসপাতাল একটি ছোট প্রতিষ্ঠান। সেখানে সাধারণ লোক যেমন যেতে চাইত না তেমনি সেই হাসপাতালে সবরকম সুযোগও ছিল না। তাছাড়া এই সেবা সমিতি জাতিধর্ম নির্বিশেষে হাসপাতাল ও জেলখানার বেওয়ারিশ মৃতদেহের সংস্কারও করত। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজকুমার নিয়োগী, সম্পাদক ডাঃ চারুচন্দ্র সাগুর্লি, কোষাধ্যক্ষ শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তাছাড়া ছিলেন মধুসূদন দাশগুপ্ত, ননী রায়, ভবরঞ্জন গাঙ্গুলী, মণীন্দ্রনাথ রায়, অবনী গোস্বামী, প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত, যতীন রায়, মোহিনী ভৌমিক, প্রিয়নাথ গোস্বামী। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান চালু থাকে। তারপর ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময়ে বানেশ রেলওয়ে জংশনে কমলা সমিতি নামে একটি সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতির ভাণ্ডার থেকে ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আদিবাসীদের সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করা হয়। মধুরানাথ দত্ত এই ভাণ্ডার পরিচালনা করতেন। এই সময়ে ১৯২৩ কি ২৪ সালে যোগেশ চন্দ্র ঘোষ বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সহ-সভাপতি হয়ে কয়েকটি বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন সমাজে এই ধরনের কল্যাণমূলক কাজ নিন্দার ছিল।

১৯২৮ সালে স্বামী বিমলানন্দ বেলুড় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠার আশায় জলপাইগুড়ি আসেন। তিনি যোগেশ চন্দ্র ঘোষের স্ত্রী হুভাষিনী ঘোষ, শচীন মুখার্জী এবং ননী রায়ের প্রচেষ্টায় জনাব এনামেল হোসেনের বাড়ীর সন্নিকটে কদমতলায় ছোট্ট ঘরে প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীজীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন—ডাঃ অবনীধর গুহ নিয়োগী, ডাঃ শৈলেশ ভৌমিক এবং ডাঃ সুধীর বসু। ক্রমশঃ এই প্রতিষ্ঠান নানাপ্রকার জনহিতকর কাজ—বিশেষ করে শিশুদের দুগ্ধ বিতরণ, এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং রোগীর পরিচর্যার ভারও গ্রহণ করেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দাগা পরিবার জমি দেওয়ায় এই প্রতিষ্ঠান রেসকোর্স অঞ্চলে নিজস্ব গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে সেবার কাজ শুরু করে। এই সময় অন্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে কোন সহৃদয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর সাহায্যে একটি মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে।

১৯৩০ সালে জলপাইগুড়িতে ড্যাকসন মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হওয়ায় হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। সেই কারণে অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়।

১৯৩০ সালে বার্গেশ-দোমহনী অঞ্চলে প্রবল বন্যায় বার্গেশ রেলওয়ে স্টেশন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে তিস্তাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কংগ্রেস সেবা প্রতিষ্ঠান তখনও টিমে তেতালায় চলছিল—তার সঙ্গে সঙ্কট ত্রাণ সমিতি একত্রে যুক্ত হয়ে আত্মমর্যবোধের সেবায় এগিয়ে যায়। কংগ্রেসই তখন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বলে জেলার সর্বত্র, গ্রামে গ্রামে নিজস্ব প্রচারের মাধ্যমে নানাভাবে জনগণের সেবার কাজ করে যেতে থাকেন এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে নানাপ্রকার উন্নয়নমূলক প্রচার কাজ জেলা বোর্ডের সহায়তায় চালাতো।

১৯৩৪ সালে প্রবল ভূমিকম্পে বিহারের কয়েকটি জেলা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সেই সর্বস্বান্ত ভূমিকম্প পীড়িত বিহারবাসীদের সাহায্যের জন্য একটি ত্রাণ সমিতি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন তারিণী প্রসাদ রায়, সহ-সভাপতি এ, এফ, রহমান এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ও এ, এম, এল, রহমান। পনের হাজার টাকা সংগ্রহ করে এই কমিটি রাজেন্দ্র প্রসাদজীর কাছে পাঠিয়ে দেন।

লবণ আইন ভঙ্গের সময় থেকে হরিজন উন্নয়নে মহাত্মাজীর প্রেরণা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই সহরে কংগ্রেস তার সমাজ উন্নয়নমূলক আদর্শের কার্যসূচী হিসাবে হরিজনদের উন্নতির জন্ত কাজ শুরু করে। বিশেষ করে কবিরাজ শ্রী সতীশচন্দ্র লাহিড়ী সে সময়ে সমাজের মূর্তিমান প্রতিবাদ হিসাবে বর্ধন প্রাঙ্গণে যেমন সার্বজনীন দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন তেমনি হরিজন বস্তীর মধ্যে নিজের বাড়ী তৈরী করে হরিজনদের উন্নতির জন্ত কাজ শুরু করেন, তৎকালীন সমাজের কুসংস্কার ও মানবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। পৌরসভা ও কংগ্রেস তাদের মধ্যে শিক্ষা, আচার-আচরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করে কবিরাজ মশায়কে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছিল তেমনি মহাত্মাজীব নীতিও পালন করেছিল।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত জেলা, সহরে ও গ্রামে পাঠাগার স্থাপন ও হরিজন উন্নয়ন ছাড়া অন্য কাজ বিশেষ অগ্রসর না হলেও এই সময়ে নারী কল্যাণ কাজে অনেক মহিলা এগিয়ে আসেন। নারী কল্যাণ অধ্যায়ে এ বিষয়ে পৃথকভাবে লেখা হবে।

ময়নাগুড়ি তখন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বললেও অতৃপ্তি হয় না। ডাঃ সরোজ লাহিড়ী এবং রাহত পরিবারের কয়েকজন কর্মী ময়নাগুড়ির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। পাঠাগার স্থাপন, বিদ্যালয় স্থাপন, এবং অন্যান্য কল্যাণ-মূলক কাজে অগ্রণী হন।

গয়েরকাটায় মতি ঘোষ, হরলালবাবু, সুরেশ গুহ, মোবারক আলী, তারক সরকার — বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেন এবং সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন এবং সেবা ও ত্রাণ কাজ চালান।

ধুপগুড়িতে গোপেশ্বর রায়, বিজন রায়, শুকমোহন রায়, হরিচরণ ইত্যাদি যেমন রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তেমনি সাধারণ গ্রামোন্নয়নেও আত্মনিয়োগ করেন।

ডাউকীমারীতে রমাকান্ত রায়, রজনী প্রামাণিক, **গাধেয়ারবুটিয়েতে** জব্বা বৈরাগী ; **দোমহনীতে** কামদা মুখার্জী, উপেন চক্রবর্তী, অবনী সরকার, সফোয়া রায় ; **বাণারহাটে** উমেশ চৌধুরী, নলিনী মুখার্জী ; **জল্লেশে** ভট্ ভট্ রায় ও কয়েকজন তরুণ কর্মী ; **বড়তলীর** সাকালু রায় ; **শালবাড়ীর** হাতি দত্ত রায়, রজনী রায় ; **রথের হাটের** তারিণী বাহুনীয়া, সত্যেন রায় ; **লাটাগুড়ির** খজ্রমোহন ও দেবমোহন রায় ; **মালে**—লক্ষীকান্ত দাস ও মাখন ঘোষ এবং **পাটগ্রামে**—প্রিয়নাথ গোস্বামী, বরদা ভৌমিক, যোগেন দাস এবং কেশব দত্ত সমাজ উন্নয়ন কাজে এগিয়ে আসেন। এই কেশব দত্ত চ্যান্ডাবাঁধাতে ক্যাম্প করে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন করে যেতেন তেমনি তরুণ কর্মীদের সমাজ সেবার কাজে উৎসাহিত করতেন। ওই অঞ্চলে উন্নয়নে কেশব দত্তের দান অনেকখানি। পরবর্তীকালে মাল উন্নয়নে ডাঃ নারায়ণ চ্যাটার্জিও এগিয়ে আসেন। ছিলেন **ভিতরগড়ে** দেবানন্দ রায়, শিবকান্ত রায় এবং ললিত রায় **বোদাতে** ভোলা মজুমদার, প্রমোদ চক্রবর্তী ; **দেবীগঞ্জে**—গণেশ চক্রবর্তী এবং **আলিপুরছয়ারে**—শ্রীমলিনী পাকড়াশী, মদন সিং বড়ুয়া। রসিক গাঙ্গুলীর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলে কল্যাণ-মূলক কাজের পরিকল্পনা করে কাজ করতে থাকেন। তবে সর্বক্ষেত্রেই জেলা সহরের কর্মীদের প্রাধান্যই ছিল বেশী। তাঁদের নির্দেশেই এঁরা কাজ করতেন। জেলা সহরে বিশেষভাবে কল্যাণমূলক কাজে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন বীরেন দত্ত, বীরেন চৌধুরী, কালিদাস রায়, লক্ষণ মৌলিক, বীরেন দাশগুপ্ত, শচীন দত্ত, রমনী চন্দ, অজিত বোস, স্বপ্রকাশ দত্ত, বিজয় হোড়, রজত গুহ ঠাকুরতা, অজিত চক্রবর্তী, অরুণ চক্রবর্তী, নহু নিয়োগী, ভবানীদাস

চক্রবর্তী, অঘোর সরকার, নলিনী চক্রবর্তী, দীনেশ রায়, ভীষ্মদেব, শৈলেন নাগ, হারাধন চক্রবর্তী, রবি শিকদার, ভূপেন গাঙ্গুলী, খগেন দাশগুপ্ত, শশধর কর, বরেন ভৌমিক, নরেন ভৌমিক, বিনয় ঘোষ দস্তিদার, মদন মোহন ঠাকুর, নীরেন বাগচি, অনিল বাগচি, নারদ দত্ত, নরেশ চক্রবর্তী, বিভূতি চক্রবর্তী ইত্যাদি আরও অনেকে।

যদিও তাঁরা সকলে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে কাজ করছিলেন, সমাজকল্যাণেও এঁদের দান অনস্বীকার্য, এঁদের সঙ্গে ছিলেন তারিণী প্রসাদ রায় এবং এ, এফ, রহমান।

১৯৪০ সালে প্রফুল্ল ত্রিপাঠী স্থানীয় কংগ্রেসে যুক্ত হয়ে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জার্মান বাটিকা বাহিনীর অগ্রগতি, হুভার চন্দ্র বসুর রহস্যজনক অন্তর্ধান, মহাত্মাজী 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন, ইংরেজকে দিশেহারা করে তোলে। সরকার সমস্ত তরুণ ও প্রধান কর্মীদের জেলে আটকে রাখে এবং বাংলার বুকে চালের অভাব ঘটিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্যে টেনে আনে। রংপুর জেলার নীলফামারী, ভোমার এবং দেবীগঞ্জ অঞ্চল থেকে ক্ষুধায় কাতর হাজার হাজার চাষী স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে দুটো ভাতের আশায় এসে সহরের বিভিন্ন জায়গায় এবং স্টেশনে জমা হতে থাকে। কিছু কর্মী এবং মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি এঁদের জন্য ভাটিয়া বিল্ডিং এবং পাটগোলায় লঙ্গরখানা খুলে নিয়মিত খাবার ব্যবস্থা চালু করেন। চালের দর যতই বাড়তে থাকে ক্ষুধাতের সংখ্যা লঙ্গরখানাতে ততই বাড়তে থাকে। সহরের মানুষও ক্ষুধার জ্বালায় লঙ্গরখানায় ভিড় করা শুরু করে। বাজারে চাল নেই।

১৯৪৩ সালে বর্ধন প্রাঙ্গণে এক সভায় তারিণী প্রসাদ রায়কে সভাপতি করে জলপাইগুড়ি রিলিফ কমিটি গঠন করা হয়। এতে অন্যান্য যারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ ধীরাজ মোহন সেন, ডাঃ অবনীধর গুহ নিয়োগী, শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, ডাঃ চারু চন্দ্র সান্যাল, ডাঃ শৈলেশ চন্দ্র ভৌমিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য বিষয়ে দায়িত্ব ভারতীয় চিকিৎসক সমিতি জলপাইগুড়ি শাখার সদস্যরা ডাঃ হরেন হোড়, ডাঃ স্বকুমার সেন, ডাঃ নন্দ ঘোষ, অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রহণ করেন। এই সময় কালোবাজারীরা তৎপর হয়ে ওঠে। মাল আটকে রেখে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফা লুটতে থাকে। সহরে খাদ্যবস্তুর উন্নতির জন্য সেই বছরের শেষের দিকে গণ-খাদ্য-কল্যাণ সমিতি গঠন করা হয়। স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ মহালনবীশ এর সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ সম্পাদক হিসাবে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই ফুড কমিটি সহরে চাল, চিনি, কেরোসিন তেল ও কাপড়ের স্বল্প বস্তুনের ব্যবস্থা করেন। এই কেন্দ্রীয় ফুড কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ওয়ার্ড কমিটিও গড়ে তোলা হয়। সর্বশ্রী প্রতুল ঘটক, বীরেন বসু, পবিত্র চক্রবর্তী, নিখিল ঘটক, সন্তোষ পাল ইত্যাদি আরও অনেকে এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকারের খাদ্য নিয়মাদিকারিকের সঙ্গে পারমিট প্রথা চালু করে সহরবাসী ও গ্রামবাসীকে অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেন। এই সময় জেলার বিভিন্ন বন্দর ও গ্রামেও ফুড কমিটি গড়ে ওঠে।

১৯৪৬ সালে — ইংরাজ সরকার ভারত ছাড়তে হবে — তা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। কলিকাতা এবং নোয়াখালীতে দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। মানুষের মনে নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। নোয়াখালী থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে যেমন কলকাতায় জড় হতে থাকে তেমনি কিছু সংখ্যক

দুর্গত মানুষ এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এসে জমা হতে থাকে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। ভারত কি এবার সত্যি সত্যি স্বাধীন হবে? সত্য সত্যি কি ইংরেজ এদেশ ছেড়ে যাবে? নেতারা তখন আশা আনন্দ নিয়ে দিন গুণছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বাংলাদেশ তখন ক্ষত-বিক্ষত। সেই ডামাডোলার মধ্যে ইংরেজ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। বাংলা ভাগ হোল। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান। তখনও ১৯৪৬ সালের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বীভৎস দৃশ্য বাংলার ঘরে ঘরে। তখনও বাংলার মনে সংঘর্ষের ক্ষত—তাই তারা শঙ্কিত হয়ে উঠল। পার্থিব জীবনের শেষ সম্মল ভিটেমাটি ছেড়ে আশ্রয়ের আশায় ভারতে ভীড় জমাতে শুরু করল। জলপাইগুড়ি জেলা এবং সহর আশ্রয়প্রার্থীতে ভরে উঠল।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে

ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভারতের নবগঠিত সরকার কেবল দায়িত্ব নিয়েছে। ঠিক এই সময়ে মানুষ যখন চরম দুর্গতির মুখে তখন জলপাইগুড়ির ফুড কমিটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। নাম হোল গণ-কল্যাণ সমিতি। শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই কল্যাণ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং শ্রীকুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী এবং শ্রীনিখিলচন্দ্র ঘটক যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। দুঃস্থ আশ্রয়প্রার্থীর সেবায় এই সমিতি আসে এগিয়ে। ভাটিয়া বিল্ডিং, রেল স্টোর এবং ওয়ালিয়র রহমানের বাড়ীতে আশ্রয় শিবির খুলে ত্রাণ কার্য চালান হয়।

এইখানেই ভারতীয় রেড ক্রস সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার একজন অর্গানাইজার শ্রীঅজিত কুমার ভৌমিক এখানে এসে সেবার কাজ শুরু করেন। শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে সভাপতি করে এবং ডাঃ ধীরাজমোহন সেন, শ্রীবিপুলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তীকে সদস্য করে ত্রাণের কাজ শুরু করেন। অপরদিকে মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটির শ্রীগণেশপ্রসাদ আগরওয়াল, বাবুলাল শর্মা, মাতুরাম সিং, রামচন্দ্র ঢেংগা ইত্যাদি সেবা দল গঠন করে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করেন।

জেলার বিভিন্ন জায়গায় যেমন—ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা, বীরপাড়া, বানারহাট, লাটাগুড়ি, জটেশ্বর, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, মাল, দলাবাড়ী, নাথুয়া সর্বত্র আশ্রয় প্রার্থীতে ভরে ওঠে। আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনে সেবা কেন্দ্র খুলে স্থানীয় অধিবাসী, রেডক্রস সোসাইটি এবং মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি সেবাকেন্দ্র খুলে সেখানে দীর্ঘদিন দুঃস্থ আশ্রয় প্রার্থীদের নানাভাবে সেবা করা ছাড়াও দ্রুত স্থল পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করে দেন। আলিপুরদুয়ারের শ্রীপীযুষ মুখার্জি, শ্রীঅনিল গাঙ্গুলী, শ্রীশান্তিরঞ্জন ঘটক ইত্যাদি অনেকে দিবারাত্র পরিশ্রম করে আশ্রয় প্রার্থীদের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেন।

ঠিক এই সময়ে ১২ই এবং ১৩ই জুন ১৯৫০ সালে ভয়াবহ বন্যায় জলপাইগুড়ি সহরের নীচ অঞ্চলতো ডুবেই যায় অনেক উঁচু জায়গা থেকেও মানুষ সরাতে হয়। মণ্ডলঘাট, রেসকোর্স ইত্যাদি অঞ্চল থেকেও দুর্গত পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে হয়। সরকারী ব্যবস্থা অপ্রতুল। এই ধরনের বন্যা সহরবাসী অথবা জেলাবাসী কেউ কোনদিন কল্পনা করেননি। পর পর কয়েক বছর বন্যার প্রকোপে পড়ে বন্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রস্তুতি এখন হয়েছে। এই দুর্গত মানুষের মধ্যে গণ কল্যাণ সমিতি, রেডক্রস সমিতি, মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটি যুক্তভাবে ত্রাণকার্য চালান।

১৯৫২ সনের বন্যা ওদলাবাড়ী, মাল, চুয়াপাড়া, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ইত্যাদির জনজীবনকে বিধ্বস্ত করে দেয়। এই বছর ভারতীয় রেডক্রস সমিতির জলপাইগুড়ি শাখা পথঘাট বিধ্বস্ত হওয়ায় দুর্গম জায়গায়

আবহু দুর্গতদের হেলিকপ্টার যোগে আহাধ্যবস্ত্র, কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে জনসাধারণের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। এই বছর থেকেই ভারতীয় রেডক্রস সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব ডাঃ অবনীধর গুহ নিয়োগী গ্রহণ করেন। বিপদে বিভ্রান্ত না হয়ে স্বেচ্ছা পরিকল্পনা নিয়ে যিনি কাজ করতে পারবেন বলে বিবেচিত হন তাঁর উপরেই কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়। ডাঃ নিয়োগী সেইজন্য সকলের প্রশংসাহী।

১৯৫৪ সালে আবার বন্যা দেখা দেয়। এবং সহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিশেষভাবে বিধ্বস্ত হয়। এই সময় ডাঃ রেবতী লাহিড়ীর সভাপতিত্বে People's Relief Committee গঠিত হয়। কমিটির কর্মিগণ ঘরে ঘরে খাবার, ঔষধপত্র এবং বস্ত্র বিতরণ করেন। এই ত্রাণকার্যে চা-বাগানগুলি থেকেও প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়—চা-কর সমিতির মাধ্যমে এবং শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়ের উদ্যোগে। জলপাইগুড়ি সহরকে রক্ষার জন্য দুপাশে বাঁধের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বন্যাভ্রাণের প্রস্তুতি নিয়ে বেসরকারী সেবাদল কাজ করেছে। এখনও সহরের নীচ অঞ্চল ৩৪ মাস জলে ডুবে থাকে। তবে তার রূপ অত ভয়ঙ্কর নয়।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের স্বেচ্ছা ব্যবস্থা করতে সরকার তখনও হিমসিম খাচ্ছেন ঠিক এই সময়ে ১৯৬২ সালে আসামের বঙ্গাল খেদা আন্দোলনে প্রায় ৫০৬০ হাজার দুর্দশাগ্রস্ত অত্যাচারিত মানুষ স্বা-পুত্রের হাত ধরে আশ্রয়ের আশায় জলপাইগুড়ি জেলায় এসে উপস্থিত হয়।

ত্রাণকার্যের জন্য ভারতীয় রেডক্রস সমিতির জলপাইগুড়ি শাখা, মাডোয়ারী রিলিফ কমিটি এবং স্থানীয় সেবাদল তৎপর হয়ে ওঠেন। ফালাকাটা, আংড়াভাষা, মাধবডাঙ্গা-ময়নাগুড়ি, মাল, জয়ন্তী, আলিপুরহাট ইত্যাদি জায়গায় আশ্রয় শিবির খুলে যথাসাধ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। অনেক জায়গায় কংগ্রেস সেবাদল সরকারের সাহায্যে ত্রাণকার্য চালান। তাছাড়া জলপাইগুড়ি রেডক্রস সমিতি দীর্ঘ মেয়াদী সেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে একটি ইউনিট স্থাপন করেন। অবশ্য এদের পুনর্বাসন ও স্বেচ্ছা ত্রাণকার্যের জন্য সরকারী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বর্তমানে বেসরকারী সেবা সমিতির দায়িত্ব রেডক্রস ও সরকার গ্রহণ করায় এইসব প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যায়।

নারীকল্যাণ

যদিও সমাজকল্যাণে নারী ও পুরুষের পৃথক কোন সত্তা নেই তবুও মহিলাদের নেতৃত্বে যে সব কল্যাণমূলক কাজ এই জেলায় হয়েছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯০৫-১৯০৬ সালের কথা। ৬কামিনী রায়ের স্ত্রী, জলপাইগুড়ি সহরের লক্ষ প্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী শ্রীপ্রীতিনিধান রায়ের মাতা প্রথম নারীদের মধ্যে কল্যাণমূলক কাজের প্রেরণা জোগান। এই সঙ্গে আর একজন মহিলার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন ৬হুভাষিণী ঘোষ। চা-শিল্পপতি শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের মাতা। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বেগম সফুরা খাতুনেন নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন ডাঃ লুৎফর রহমান সাহেবের স্ত্রী। হুভাষিণী ঘোষের সঙ্গে আর যে কয়জন মহিলা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন শ্রীবিজ্ঞানী দেবী, হেমপ্রভা চন্দ এবং ডাঃ রাজকুমার সেনের স্ত্রী।

সুভাষিনী ঘোষের প্রচেষ্টাতেই প্রথম কংগ্রেস মহিলা সমিতি গঠিত হয়। ১৯৩১ সালে শ্রীবিজ্ঞানী দেবীর পরিচালনায় উমাগতি বিদ্যালয়ে মহিলাদের শিল্প শিক্ষালয় খোলা হয়। তাঁতের কাজ শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও সেবার কাজ শিক্ষা দেওয়া হোত। সে সময় শিক্ষিতা ধাত্রীর বিশেষ অভাব ছিল।

শ্রীঅরুণা দাশগুপ্তা ও শ্রীসুনীতি বাল্য চন্দ এবং অন্যান্য কয়েকজন মহিলা নারী ও শিশু শিক্ষার উন্নতিতে নিজেদের নিয়োগ করেন—তখন সমাজে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা ছিল বিরল। শ্রীসুনীতি বাল্য চন্দ পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজ উন্নয়নমূলক সেবার কাজ চালিয়েছেন। তাছাড়া নিঃ ভারত মহিলা সমিতির সদস্য হিসাবে কল্যাণমূলক কাজে নারীদের এগিয়ে আসবার জন্য প্রচার চালান।

১৯৪২ সালে নতুন ভাবধারা নিয়ে গঠিত হয়—“মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি”। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মহিলা সমিতি ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একত্রে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নিরন্ন নারী-পুরুষ ও শিশুদের সেবা করে।

এই মহিলা সমিতির উদ্যোগেই প্রথম মহিলা পরিচালিত দুটি পাঠাগার স্থাপিত হয়। অদ্বাবধি একটি পাঠাগার উকিলপাড়ায় কাজ করে চলেছে। এই সব কাজের অগ্রণী কর্মী শ্রীকল্যাণী দাশগুপ্তা মহিলা কর্মীদের প্রেরণাদাতৃ। তিনি প্রত্যেকটি কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে এসে মহিলাদের কর্ম প্রেরণা দিয়েছেন।

১৯৫৫ সালে সমাজকল্যাণ পর্ষদ জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নারী ও শিশুকল্যাণে ব্রতী হয়ে কয়েকটি কেন্দ্র চালু করেন। শ্রীসুনীতি চন্দ এই কেন্দ্রীয় কমিটির জেলা-ভিত্তিক সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি কেন্দ্রে নারীকল্যাণের ও সমাজকল্যাণের কাজ হয়—যথা (১) খালপাড়া (২) বেলাকোবা (৩) পাণিঝোরা (৪) মগরাডাঙ্গা (৫) মালীভিটা।

এই সব কেন্দ্রে প্রসবের পূর্বে ও পরে মায়েদের প্রতি যে যত্ন নেওয়া দরকার সে বিষয়ে গ্রাম্যনারীদের শিক্ষা দেওয়া এবং কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্ত উৎসাহিত করা হয়। তা ছাড়া ম্যাজিক ল্যাটার্ণযোগে, সিনেমা যোগে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, পাঠাগার সংগঠনের মাধ্যমে সহর, দেশ ও বিদেশের চিত্র দেখিয়ে রোগ প্রতিরোধ, পরিকার পরিচ্ছন্নতা, শিশু পরিচর্যার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ পর্ষদ প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন।

১৯৬০ সালে জলপাইগুড়ি থানার অধীনস্থ সব কয়টি কেন্দ্র রাজগঞ্জ থানার অধীনে আনা হয়। সেই কেন্দ্রগুলি এখনও চালু আছে। সর্বসম্মত মোট ১০টি কেন্দ্রের বর্তমান সভাপতি শ্রীমম্মা ব্যানার্জি এবং স্থানীয় আর্টজন মহিলা সভাপতিকে সাহায্য করছেন। নারীশিক্ষা প্রসারই এই কেন্দ্রগুলির প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য। এই সময় আর একজন মহিলা কর্মী এদের সঙ্গে যোগ দেন তিনি হচ্ছেন শ্রীকিরণ রায়।

কংগ্রেস সেবিকা দলের অন্ততম সদস্য্য শ্রীসন্ধ্যা কর নারী কল্যাণ কাজে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে আছেন। গ্রামীণ মহিলাদের প্রেরণা যোগাতে হাতে কলমে কাজ শেখাতে তাঁর দান অনস্বীকার্য। ১৯৬৬ সালে শ্রীকল্যাণী দাশগুপ্তা ও অন্যান্য কয়েকজন মহিলা কর্মীর প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি সহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে ১২টি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খুলে সুনাম অর্জন করেন।

শহরে নারীকল্যাণমূলক বহুকাজ একক অথবা সংযুক্ত ভাবে হয়েছে। একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে। নিখিল ভারত মহিলা সমিতির শাখা হিসাবে জলপাইগুড়ি মহিলা সমিতি ১৯৪৩-৪৪ সালে

প্রতিদিন আনুমানিক দু'হাজার দুভিক্ষ প্রপীড়িত নারীপুরুষ ও শিশুদের খাইয়েছেন। এই ব্যবস্থা দু'বছরের উপর চালু রাখতে সক্ষম হ'ন। শ্রীমতী চন্দ সদর বালিকা বিদ্যালয়ের অগ্রাঙ্ক কয়েকজন মহিলা শিক্ষিকার সাহায্যে এই সেবার কাজ চালান।

১৯৫৪ সালে নিঃ ভাঃ মহিলা সমিতির বার্ষিক সম্মেলন এই সহরেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলা প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে জলপাইগুড়ি জেলা মহিলা সমিতির সেবার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শিশুকল্যাণ

প্রকৃত অর্থে ১৯৫৪ সালের আগে পর্যন্ত শিশুদের জন্ম পৃথক কল্যাণমূলক কোন পরিকল্পনা কেউ গ্রহণ করেন নি। নারী ও শিশুকল্যাণ অথবা সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে শিশুদের জন্য কিছু কিছু কাজ করা হয়েছে। শিশুর সন্তোকে পৃথকভাবে সুরোক্ষ দেবার পরিকল্পনা নিয়ে এই সহরে প্রথম “ডানপিটেদের আসর”ই কাজ শুরু করে। অবশ্য ১৯৩৭-৩৮ সালে শিশুদের শিক্ষার জন্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে শিশুনিকেতনের পত্তন করেন শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের স্ত্রী শ্রীঅরুণা দাশগুপ্তা। এখানে খেলাধুলার মাধ্যমে পড়াশুনার ব্যবস্থাই প্রধান ছিল। ১৯৪৩ সালে শ্রীকানাই চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সব পেয়েছি আসরের একটি শাখা এই সহরে খোলা হয়। বেশীদিন স্থায়ী হয়না, তবে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন শিশুদের খেলাধুলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো দেখাবার ব্যবস্থা করে।

১৯৪৪ সালে শ্রীপ্রদ্যুৎ গুপ্ত শিশু নিকেতন থেকে রেজিয়ে এসে ‘শিশুমহল’ বলে আর একটি শিশুদের শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়কে এই শিশু শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। শিশুদের শিক্ষা ছাড়া অল্প কোন পরিকল্পনা এই সব প্রতিষ্ঠানের পূর্বেও ছিল না এখনও নেই। ১৯৫৪ সালে লেখকের প্রচেষ্টায় শিশুদের কল্যাণের নানাপ্রকার পরিকল্পনা নিয়ে ‘ডানপিটেদের আসরের’ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম বছরেই এই প্রতিষ্ঠান শিশুদের সম্পাদনায় ও রচনায় সমৃদ্ধ মাসিক ‘ডানপিটেদের আসর’ পত্রিকা বের করে নতুন সাড়া জাগান। ১৯৫৫ সাল থেকে এই আসর — নানা প্রকার শিশুকল্যাণ পরিকল্পনা সহরবাসীর সম্মুখে তুলে ধরে — যেমন শিশুদের সাহায্যে স্বস্থ পরিবেশ সৃষ্টি, তাদের প্রতিভা বিকাশের সহজ সুযোগ দেওয়া, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করা, সমাজ ও রাষ্ট্রবোধে শিশুকাল থেকে উদ্বুদ্ধ করা। তা’ছাড়া, বুক ব্যাক্সের মাধ্যমে বইয়ের লেনদেন করা, পাঠাগার স্থাপন করে, পাঠের স্পৃহা বৃদ্ধি করা, হরিজনদের উন্নয়নের জন্য প্রতিদিন ক্লাস গ্রহণ করা, শিশুদের মানসিক উন্নতির জন্য শিবির সংগঠন, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দুধ ও পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা, শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করে শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, দুঃস্থ শিশুদের দুর্গাপূজা ও ১৪ই নভেম্বর শিশুদিবসে বিনামূল্যে জামা কাপড় বিতরণ করা, হরিজন ও অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজগত ধনী, দরিদ্র, উন্নত, অন্নভরতের বৈষম্য শিশুকাল থেকে দূর করবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫৬ সালে ডানপিটেদের আসর উত্তরবঙ্গের এই মফঃসল সহরে আন্তর্জাতিক শিশুচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। এই প্রদর্শনী ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে সাতদিন ধরে চালু থাকে। এই ধরনের প্রদর্শনী এই অঞ্চলে সেই প্রথম। সেই সঙ্গে সিনেমা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ছিল। শেষদিন চিত্রাঙ্কণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

১৯৬২ সনে ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে এই আসর আন্তর্জাতিক পুস্তক ও পুতুলের প্রদর্শনী করে। ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। ১৯৬৫ সালে ১৪ই নভেম্বর জেলা গ্রন্থাগার হলে

নেহরুর জীবনালেখ্যের প্রদর্শনী করে সকলের প্রশংসা অর্জন করে। শিশুশিক্ষা বিষয়ে এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে আসর কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে অনেকগুলো প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করেছেন।

ডানপিটেদের আসর বিভিন্ন বিষয়ে চ্যারিটি 'শো' করে অর্থ সংগ্রহ করেছে। শ্রীমদুলদেব রায়কতের পরিচালনায় ময়নাগুড়ি টি বি ক্লিনিকের জন্য ছয়শো টাকা নাটকানুষ্ঠানের দ্বারা সংগৃহীত হয়।

ছোটদের আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে অথবা কোন ক্লাব অথবা পাঠাগারের শাখা হিসাবে কিছু কিছু কল্যাণমূলক কাজ করেই বন্ধ হয়ে গেছে। এরা কোনদিনই স্থায়ী গঠনমূলক কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে নি। কেবল জলপাইগুড়ি ইয়ংম্যান এসোসিয়েশন 'শান্তি উদ্যান' তৈরী করে শিশুদের খেলাধুলা ও বৈকালিক আনন্দ ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা করেছে। বছরে একবার শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করে।

কয়েকবছর হোল মহামায়া পাড়ায় এক স্বামীজীর উদ্যোগে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আবাসিক শিশুদের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আশ্রম পরিচালনার জন্তু শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কিছু জমি দান করেছেন এবং শ্রীকুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তীর উপর আশ্রম পর্যবেক্ষণের ভার পড়ে। এঁরা শিশুদের শিক্ষা ছাড়াও দুধ বিতরণ করেন। অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পাড়ায় পাড়ায় শিশুকল্যাণের কাজ করে — পাণ্ডাপাড়ায় মাঝে সব পেয়েছির আসর গঠিত হয়েছিল এবং দেশবন্ধু পাড়ায় শৈলেন মৈত্রের উদ্যোগে আর একটি গঠিত হয়। উভয় আসরই কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। তা' ছাড়া মহরীপাড়ায় "মিলে মিশে", দেশবন্ধু নগরে শ্রীকেন্দ্রার আচার্যের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কালচারাল এসোসিয়েশনের শিশুবিভাগ প্রতি বছর শিশু ও কিশোর কল্যাণের কাজ ছাড়াও নানাপ্রকার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। দেশবন্ধু পাড়ায় — মিলন সঙ্ঘ, ভ্রাতৃসঙ্ঘ, রায়কত পাড়ায় ইয়ং ম্যানস্ এসোসিয়েশনের জুনিয়র বিভাগ, অরবিন্দ অঞ্চল পাঠাগারের শিশুবিভাগ নিজ নিজ পাড়ায় বা অঞ্চলে কাজ করে চলেছে।

সম্প্রতি "কিশোর বাহিনী" শিশু ও কিশোর কল্যাণের স্বীকৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে। নব প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এখনও অজ্ঞাত।

১৯৫৪ সালের বস্তার পর ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ফ্লাড রিলিফ ফাণ্ডের টাকাতে এই জেলার অনাথ শিশুদের জন্তু পাঁচটি আশ্রম জলপাইগুড়ি সহর, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা ও চিকলিগুড়িতে খোলা হয়। শ্রীমজাভা রায় এই কেন্দ্রগুলির সভাপতি এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ শিকদার ও শ্রীঅমিয় সেন যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। এখানে দুঃস্থ অনাথ শিশুদের খাওয়া-থাকা ছাড়াও লেখাপড়া ও হাতের কাজের শিক্ষা দেওয়া হোত।

১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের সমাজকল্যাণ দপ্তর এই আশ্রমগুলোর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে দুটি মাত্র আশ্রম চালু রাখেন। জলপাইগুড়ি শহরে রায়কত পাড়ায় মেয়েদের জন্তু একটি আশ্রম; অপরটি ফালাকাটায় ছেলেদের একটি আশ্রম। শ্রীরবীন্দ্রনাথ শিকদার বর্তমানে এই আশ্রম দুইটি পরিচালনা করেন। চিকলিগুড়ি আশ্রমটি "সেভ দি চাইল্ড" নাম গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ শিশু পরিষদকে দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

১৯৬৬ সালে জলপাইগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ পরিষদের শাখা স্থাপিত হয়। শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ সভাপতি এবং শ্রীকুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই প্রতিষ্ঠান বহু কয়ল দুঃস্থ ও শিশুদের মধ্যে বিতরণ করেছেন।

আদিবাসী কল্যাণ

ইংরেজ রাজত্বে বিভিন্ন মিশনারীরা সারা ভারতের আদিবাসীদের উন্নতির জন্ত (এই সেবার পেছনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও) ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করে আসছেন — তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অনগ্রসর অল্পমত সম্প্রদায়ের দিকে কেউ যখন দৃষ্টি দেয় নি তখন এই মিশনারী পাদ্রীরা এদের শিক্ষার দায়িত্ব নেন এবং মাহুষ করে তোলেন। জলপাইগুড়ি জেলাতেও খ্রীষ্টান মিশনারীরা আদিবাসীদের উন্নতির জন্ত প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন — যেমন ডেঙ্গুয়াঝাড়, ফালাকাটা, শামুকতলা, দমনপুর, নাগরাকাটা প্রভৃতি অঞ্চলে।

এই কল্যাণ কাজের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও এই খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দান অনস্বীকার্য। অর্থের পরিমাপে তাঁদের অবদানের হিসাব করা যায় না। তাঁদের আন্তরিকতা কৃতজ্ঞতাচিন্তে স্বীকার করতে হয়। মাহুষ হিসাবে আদিবাসীদের বাঁচবার যে অধিকার আছে — সে স্বীকৃতি খ্রীষ্টান পাদ্রীরাই দিচ্ছেন।

বেসরকারী কাজের বিশেষ কোন ইতিহাস নেই! তবে মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কল্যাণ কাজের মাধ্যমে এই সব আদিবাসীদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে। বিভিন্ন চা বাগানে শ্রমিকদের জন্ত নানাপ্রকার কল্যাণমূলক কাজ, বাগান কর্তৃপক্ষ করেন। বেসরকারী অথবা কোন কাজের ইতিহাস নেই বললেই চলে।

আদিবাসী কল্যাণ কাজ এখন ভারত তথা পশ্চিম বাংলা সরকার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে করে যাচ্ছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

‘খেলোয়াড় জলপাইগুড়ি’

খেলার মাঠে

ত্রিভিভেন মহলানবীশ

গত একশো বছরের ইতিহাস হাতে নিয়ে নেমেছি খেলার মাঠে। এবার খেলতে নয় — অতীতের পায়ে ছাপ খুঁজতে আর চিনতে। দ্রুত কালের প্রবাহে মুছে গেছে কত, আবছা হয়ে উঠছে কত, হারিয়ে গেছে কত কীর্তি, চলে গেছে কত কীর্তিমান। স্মৃতি বুকে ধরে রয়েছে শুধু খেলার মাঠটি। বেঁচে আছে যে ক'জন তাদের স্মৃতিও আজ বিস্মৃতির সীমানায়। যা কিছু কুড়িয়ে পেলাম এ তারই স্মৃতি চয়ন। জাতির যৌবন ও প্রাণশক্তির পরিচয় পেতে হলে খেলার মাঠে আসতেই হবে।

১৮৬৯ — ১৯০০ সন

খেলাধুলার কথাই বলবো। আগে বলবো অল্পস্বল্প জলপাইগুড়ির সেকালের কথা। শ্রোতৃমণ্ডল তিস্তার পশ্চিম কূলে জঙ্গলাকীর্ণ সমতল ভূমি। তারই বুক চিরে চলেছে দক্ষিণবাহী করলা, মিশেছে তিস্তায়। পূর্ব অংশকে দু'ভাগ করে ধরধরা মিশেছে করলায় — মাঝামাঝি জায়গায়। মনোরম ছবির মতো স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য। নগণ্য গ্রাম হলো সন্থর, এলো সরকারী দপ্তর, এলো ইংরেজ শাসক, পত্তন হলো জলপাইগুড়ি জেলা ও সন্থর ১৮৬৯ সনে। বসতি অল্প। হাকিম পাড়ায় থাকেন হাকিমেরা; কোর্ট, কাহারী এ পাড়ায়। উকিল পাড়ায় থাকেন উকিলেরা, রায়কত পাড়ায় রাজগণ ও তাঁদের আমলারা। বাবুপাড়ায় বাবুর দল অর্থাৎ কেরানীর দল। তারই দক্ষিণে সেনানিবাস বা ক্যান্টনমেন্ট। সৈন্তেরা চলে গেল অতীত। ১৮৭৬ সনে প্রথম স্কুল — সরকারী জিলা স্কুল। ইংরেজী আমলে শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা। এলো রেলগাড়ী ১৮৭৭ সনে। সাহেবেরা চলতো ঘোড়ায়। উকিলবাবুরা পাক্কীতে বা নৌকায়। ঘরবাড়ি সব খড়ের বা কাঠের চালা। গড়া চলছে, হচ্ছে সংস্কার। ১৮৭৮ সনে বড় ডাকঘরটি হ'ল প্রথম পাকা বাড়ি। মিউনিসিপ্যালিটি হ'ল এই সন্থরে ১৮৮৫ সনে। এই বছরই জন্মালো ভারতীয় কংগ্রেস বোম্বাইতে। এই সময়ে তৈরী হ'ল করলা নদীর ওপরে দু'টি পুল আর একটা ধরধরা নদীর ওপর। যানবাহনের উন্নতি হ'ল — ঘোড়া টানা গাড়ীও এলো। সমাজ হ'ল দু'টি, সাদার আর কালোর।

খেলাধুলার কথাই আবার ফিরে আসছি। এটি সহজাত প্রবৃত্তি বা আবেগ। শিশুর প্রথম খেলা মায়ের কোলে হাত-পা ছুঁড়ে। একটু বড় হলেই আঙ্গিনায়। আর একটু বয়েস বাড়লেই পাড়ার মাঠে বা খোলা জায়গায়। আধুনিকতার ছোয়াচ এসেছে স্কুলে। এসেছে কলেজে পড়া ছেলেদের কাছ থেকে — মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে পাড়ায় পাড়ায়। ইংরেজী আমল। প্রচার হলো ইংরেজের যুদ্ধ জয়ের গল্প, শৌর্য-বীর্যের কাহিনী। খেলাধুলার কথা বালকচিত্তে এনে দিল নতুন উন্মাদনা — স্বপ্ন দেখলো নতুন খেলার। গড়ে উঠলো ভিক্টোরিয়া ক্লাব, ষ্টার ক্লাব, ডায়মণ্ড জুবিলী ক্লাব। এমনি অনেক নতুন নতুন ক্লাব দেখা দিল পাড়ায় পাড়ায়। উকিলপাড়ায় হলো উকিলপাড়া ক্লাব, রায়কত পাড়ায় রায়কতপাড়া ক্লাব প্রভৃতি। পাড়া কৌলিগ জেগে উঠলো ভিন্ন ভিন্ন

ক্লাবে। শুরু হলো ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস ও ব্যাডমিন্টন। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন খেলা। খেলায় মেতেছে ছোটরা, বড়দেরও ছোঁয়াচ লেগেছে। বড়রা পুঁথি পড়ে খেলার কৌশল অনেক বেশী শিখে এগিয়েছে অনেক দূর। দেশ-বিদেশের খেলার কথা পড়েছে যুবক দল। খেলা দিয়েছে নতুন মর্যাদার আসন। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বিক্ষিপ্ত প্রতিভার মিলন, দরকার হয়েছে খেলার সুব্যবস্থার ও খেলার ভাল মাঠের। খেলোয়াড়ের দল সম্ভব হলো, উৎসাহী নবীন ও প্রবীণেরা এসে জুটলেন। ৬জগদীন্দ্র দেব রায়কত বয়সে প্রবীণ হলেও মনে ও কাজে নবীন। খেলা শিখেছেন বিদেশে। বিলাত ঘুরে এসেছেন। তিনি উৎসাহ দিলেন এদের। সবাই মিলে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে আদায় করলেন একটি খেলার মাঠ। তখন ইংরেজ শাসকের সহর প্রতিভূর দল টাটকা এসেছে কলেজ থেকে। খেলাধূল্য এদেরও খুব উৎসাহ। প্রতিষ্ঠা হলো “জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব” ১৮৯৮ সনে। এখানেই প্রথম প্রতিভার মিলন ক্ষেত্র। বড়দের খেলা দেখে, নবীনেরাও উজ্জল সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসছে। উৎসাহী সমর্থকের দল রয়েছেন এদের পেছনে। এই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানটি আজও বেঁচে আছে যৌবনের প্রাণস্পন্দন নিয়ে।

পূর্ত বিভাগের ৩০০২ একর জমি খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ১৮৯৭ সালে, এই টাউন ক্লাবটির জন্ম। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ইংরেজ সরকারও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। কাজেই অভাব হয়নি সহযোগিতার ও সহায়ত্বের। হলেন জেলার ডেপুটি কমিশনার সাহেব পদাধিকার বলে এই ক্লাবের স্থায়ী সভাপতি। এখনও সেই প্রথাটি চলে আসছে। তখনও এই ক্লাবটি ছিল বড় খেলার মাঠ — আজও তাই আছে। সেই আমলে এই ক্লাবটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন স্বর্গীয় রায় হরিমোহন চন্দ বাহাদুর, বিভাগীয় কমিশনারের পি. এ ; ৬রায় প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, সরকারী উকিল প্রমুখেরা। এই ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিলেন এমন অনেকে পরবর্তী জীবনে অধিকার করেছেন উচ্চপদ, কর্মজীবনে অর্জন করেছেন যশ, মান ও সর্বভারতীয় স্বীকৃতি। তাঁদের অনেকে চলে গেছেন বিস্মৃতির অন্তরালে। ৬উপেন্দ্রনাথ রায়ের সৌজন্মে ১৮৯৯ সনে একত্রিশ জনের একটি ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়েছে, যেটা বড় করে টাউন ক্লাবে রাখা হয়েছে, তা থেকে বিস্মৃতির কুয়াশার ভেতরে এক একটি হারিয়ে যাওয়া মাণিকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সবাইকে চেনা যাবে কিনা এখনও বলতে পারি না। খুঁজে পাওয়া গেছে ৬জগদীন্দ্র দেব রায়কত (তরু রায়কতের পিতামহ), ৬হেম চন্দ্র সেন (দলের অধিনায়ক), ৬অন্নদাচরণ সেন (পুত্র দ্বাজু সেন), ৬যোগেশ চন্দ্র ঘোষ (পুত্র বীরেন ঘোষ), ৬রজনী কুমার বসু (পুত্র নিধু বসু), ৬সুরেশ সেনগুপ্ত (পুত্র সুরত সেনগুপ্ত), ৬সুরেশ চক্রবর্তী, ৬চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কণ্ঠা তারা ব্যানার্জী), এঁদের।

টাউন ক্লাবের অধিনায়কত্বে ছিলেন ৬হেমচন্দ্র সেন, প্রথম অবস্থা থেকেই। তিনি যেমন ছিলেন কৃতী খেলোয়াড় তেমনি চমৎকার সংগঠক। তাঁরই উৎসাহে ক্লাবে ক্লাবে, পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা শুরু হয় খেলার মাধ্যমে। এই সময়ে বহু পুরোণো খেলা ‘হা-ডু-ডু’ ও ‘দাঁড়িয়া বান্ধা’ খেলারও প্রতিযোগিতা হতো ও এরও খুবই আকর্ষণ ছিল। এই খেলারও সমর্থক সংখ্যা কম ছিল না। এ খেলায় পয়সা খরচের উৎপাত ছিল না। কাজেই ধনী, দরিদ্র সবাই এ খেলায় যোগ দিতে পারতো।

ভূটানের দরজা পশ্চিম দ্বার তখনও অন্ধকার ঘনবনানীর অন্তরালে। ভয়াবহ শ্বাপদকুলের নিরাপদ আড্ডা। ১৮৭৪ সনে এখানে হানা দিয়েছিল সাহেব চা-করেরা। জঙ্গল কেটে খুললো চা বাগান। এর পর থেকে সাহেব

ও বাঙ্গালী উভয়েই অভিযান শুরু করলো বনানী ধ্বংসের কাজে ও চা বাগান খুলতে। তৈরী হলো বেঙ্গল ডুমাস রেলওয়ে। দোমহনীতে বিরাট দপ্তর ও কারখানা। আলিপুর জঙ্গলে হলো এই জেলার এক মহকুমা। বাইরের লোক অনেক এল। কিন্তু প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ায় ভুগে খেলার উৎসাহ থাকলো না।

সাহেব চা-করের দল সহরে একটি ক্লাব করে এই সহরে নানা রকমের খেলা দেখাতে শুরু করলেন। তিস্তার পশ্চিম পাড়ে রেস কোর্সে সশস্ত্র পুলিশ ছাউনী। সাদা চা-কর ও পুলিশে প্রায়ই ফুটবল খেলা চলতো। টাউন ক্লাব ও পুলিশ ক্লাবেও প্রতিযোগিতা ফুটবল খেলা হতো। এরই রেশ তিস্তা নদীর ওপারে পৌঁছে গেল। ওদিকেও খেলার সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ঠিক এমনি সময়ে উনবিংশ শতাব্দী বিদায় নিয়ে বিংশকে আহ্বান জানানো—দিয়ে গেল গত শতাব্দীর স্মৃতি আর উদ্দীপনা।

১৯০১—১৯২০

খেলার আদর বেড়েছে। এখন শুরু হল জেলায় জেলায় প্রতিযোগিতা খেলা। দর্শক ও পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যাও অনেক বেশী হয়েছে। ১৯০২ সনে এলো খেলতে রংপুর জেলার এক টিম। এর পরেই দিনাজপুর। খুব নামকরা জোরদার টিম। হুরু, গোপী, প্রফুল্ল, তারেশ, সামাদ প্রভৃতির নাম সারা বাংলায়। এঁরা সব দিনাজপুর টিমের। জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবে তখন হেম সেন, মন্মথ তলাপাত্র, রমণী মিত্র, নীরোদ চ্যাটার্জি, যোগেন সমাদ্দার, উপেন কুমার, গিরিশ সেন প্রভৃতি ছিলেন খুব নামজাদা খেলোয়াড়। দিনাজপুরের কাছে টাউন ক্লাবের পরাজয় হলো কিন্তু খেলা হয়েছিল খুব আকর্ষণীয়।

উৎসাহ এসে গেল সহরের পাড়ায় পাড়ায়। সবাই খুব উৎসাহে খেলার অহুশীলনে লেগে গেল। ভিক্টোরিয়া ক্লাব হল হাকিম পাড়ায়। ‘ট্রোজেন’ বিলাতি ফুটবল এল। খেলোয়াড় গিরিশ সেন (পরে রায়বাহাদুর), সুরেশ সেন (পরে দায়রা জজ), যতীন মুখার্জি (পরে দায়রা জজ), গিরিশ মজুমদার, নৃপেন ব্যানার্জি, বিপুল ব্যানার্জি প্রভৃতি। এখনও বেঁচে আছেন বিপুলবাবু বহুকালের স্মৃতিটুকু নিয়ে আর সেটি দিলেন আজকের যুবকদের হাতে।

‘রায়কত পাড়া ক্লাব’, রায়কত পাড়ায়, জগদীন্দ্র দেবের বিরাট বহিঃপ্রাক্ষণে। মাঠটি ছোট কিন্তু এখান থেকে এসেছে এই জেলার বড় বড় খেলোয়াড়। কুমুদেন্দ্রদেব রায়কত, নলিনেন্দ্রদেব রায়কত, করুণা ব্যানার্জি, যতীন সমাদ্দার, উপেন কুমার, কেদার দত্ত প্রভৃতি ছিলেন নামজাদা খেলোয়াড়।

‘উকিল পাড়া ক্লাব,’ উকিল পাড়ায়। সেকালে মহম্মদ সোনাউল্লাহ বাড়ির দক্ষিণে ছিল বিরাট মাঠ। সেখানে চলতো খেলা। গণেশ সান্নাল, জ্যোতিষ সান্নাল, ভবতোষ সান্নাল, চণ্ডিদাস চক্রবর্তী, যাদব ঘটক, সতীশ দাসগুপ্ত, দীপেন বিশ্বাস, রমণী মিত্র প্রভৃতি খেলোয়াড়। মন্মথ ঘোষ ছিলেন ক্লাবের বড় পাণ্ডা।

ষ্টার ক্লাব ছিল শিবাজী মাঠে। এখন এই মাঠে হয়েছে অনেক বাড়ি, শিশুমহল ও আই, টি, পি, এর বাড়ি। ডায়মণ্ড জুবিলি ক্লাব ছিল এখন যেখানে জে, ওয়াই, এম, এর ফুটবল মাঠ। টাউন, ষ্টার ও জুবিলি ক্লাবগুলির ভেতরে হতো দারুণ প্রতিযোগিতা।

তখনকার দিনে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন মন্মথ তলাপাত্র, প্রমথ তলাপাত্র, বিরিকি গুপ্ত, অমূল্য মুখার্জি, গিরিজা চৌধুরী, কুশীনাথ দাম, সত্যেন রায়, বিভূতি ঘোষাল, ভোলা বসাক, মোহিনী সান্যাল, মণিলাল রায়, যোগেন সমাদ্দার প্রভৃতি।

বুটপায়ে সাহেব এন, বি, এন, আর এর দল আর খালি পায়ে ভারতীয় দলের খেলা ছিল এক বাৎসরিক উদ্দীপনাময় উৎসব। মাঠে বিরাট ভীড়, হৈ চৈ। সাহেবদের দেখে প্রথম বুট পায়ে খেলা শুরু করলেন সুরেন চন্দ। সেকালের খুব নাম করা সেন্টার ফরওয়ার্ড।

এইবার টাউন ক্লাবে যোগ দিলেন প্রমথ তলাপাত্র, কুমুদ সেন (পরে রায়বাহাদুর), আদাস সত্তার (পরে খান বাহাদুর), গিরিশ মজুমদার, কাদের বক্স, হুসুল হোসেন, মোজাফর হোসেন, নলিনী রাহত, মতি সেন, মহেশ রায় সত্যেন বসু, মহম্মদ জমিরুদ্দিন, করুণা ব্যানার্জি (পরে রায় সাহেব) প্রভৃতি। এঁরা আজ কেউ বেঁচে নাই। তখনকার নবীনদের দলে অঘোর রায় চৌধুরী খেলায় সারা উত্তর বাংলায় বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনি আজও বেঁচে আছেন।

ক্রিকেট খেলা চালু হয়েছে জিলা স্কুলে। তখন মাঝে মাঝে খেলতেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর দল, আর খেলতেন সাহেবেরা। স্কুলেরও কৃতী কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক যোগ দিতেন এই খেলায়। জিলা স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক পালোয়ান সতীশ ঘোষ ছিলেন ভাল খেলোয়াড়। এই খেলায় জগদীন্দ্রদেব রায়কতের খুব নাম ছিল। তখনকার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ভেতরে নাম করেছিলেন গঙ্গা বাগচি, দুর্গাদাস চক্রবর্তী, শরৎ সান্যাল (বাড়ু), সতীশ ঘটক, স্বরেশ মুখার্জি, যোগেশ ব্যানার্জি, উপেন কর্মকার, গিরিশ সান্যাল, অক্ষয় ব্যানার্জি প্রভৃতি।

টেনিস খেলা তখনও খুব চালু হয় নি। খেলা হতো রায়কত সাহেবের মাঠে। রায়কত সাহেবের দুই পুত্র কুমুদেন্দ্র ও নলিনেন্দ্র খুব ভাল খেলতেন। পাকা খেলোয়াড় রায়কত সাহেব তাঁদের এই খেলা শেখাতেন। হাকিম পাড়াতেও হয়েছিল একটি ক্লাব। টেনিস ও ক্রিকেট বড্ড পোশাকী খেলা। সাধারণের নাগালের বাইরে।

১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম জোয়ার এল বাংলা দেশে। যুবক সম্প্রদায় ক্ষেপে গেলেন। দেহটা মজবুত না করলে ইংরেজের সাথে লড়াই করা যাবে না। তাই সারা বাংলায় দেখা দিল ব্যায়ামাগার। সেই ঢেউ এসে লাগলো এই ছোট সহরে। ১৯০১ সনে বর্তমানে গুরুজাংঝোরা আপিসের পেছনে খোলা হল এক ব্যায়ামাগার নাম ইউনিয়ন ক্লাব। সাথে থাকলো এক লাইব্রেরী, মানসিক উৎকর্ষের জন্ত। ব্যায়ামাগারে কুস্তি, প্যারেলালবার প্রভৃতি দেহ চর্চার ব্যবস্থা ছিল আর প্রায়ই বক্তৃতা হতো নানা বিষয়ে ও নৈতিক উন্নতির জন্ত। দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার সব রকম ব্যবস্থা ছিল। শশীকুমার নিয়োগী, অন্নদা চরণ সেন, ত্রৈলোক্য নাথ মৌলিক, তারিণী প্রসাদ রায় প্রভৃতি ছিলেন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ও কর্মী।

সাহেব চা-করেরা প্রতিবছর সহরে এসে পেলো, হকি, ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস খেলতেন, ঘোড়দৌড় হতো, বন্দুক চালান, বর্শা নিয়ে খেলা, প্যারেড প্রভৃতি করতেন, মকফাইটও হতো। এই থেকে প্রেরণা পেল আমাদের যুবকেরাও। তারা লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, প্যারেড, মকফাইট শুরু করে দিল। বলতে কি 'মক্-হকি', খেলাও শুরু হয়ে গেল। হকিষ্টিক পাওয়া যেত না, বাঁশ দিয়ে হকিষ্টিক তৈরী হতো।

ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগলো ১৯১১ সনে। আন্দোলনও ঘুমিয়ে পড়লো। আবার ভেগে উঠলো ফুটবল। রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ কুমদিনী বন্দোপাধ্যায় একটি রাইং কাপ চালু করলেন ১৯১০ সনে। এই কাপের নাম 'কুমদিনী কাপ'। সরকার থেকে এই কাপ পরিচালনার ভার নেওয়া হল। রাজসাহী বিভাগের সব সরকারী স্কুলের ভেতরে হবে প্রতিযোগিতা। সব স্কুলে ফুটবলের চর্চা বেড়ে গেল। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল ফুটবল টিম হয়ে

উঠলো সব চেয়ে সেরা। ১৯১৩, ১৯১৪ ও ১৯১৫ পর পর তিন বছর জলপাইগুড়ি স্কুল এই কাপটি জয় করল। এর পরেও কয়েক বার জয় করেছে।

১৯১৬ সনে আলিপুরছায়ায় একটি ও ১৯১৭ সনে এই সহরে ফণীন্দ্রদেব নামে আর একটি বে-সরকারী স্কুল হল। ১৯২০ সন থেকে এরাও কুমদিনী কাপ প্রতিযোগিতার অধিকার পায়। এই সনে ফাইনালে উঠলো জলপাইগুড়ি জেলা ও ফণীন্দ্র দেব স্কুল। বিরাট উত্তেজনা। ফণীন্দ্র দেবের ক্যাপ্টেন রমেশ মজুমদার (সবার গদা দা, বর্তমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর)। ফণীন্দ্র দেব স্কুলের জয় স্থনিশ্চিত। উৎসাহের প্রচুর আয়োজন। শেষ মুহূর্তে ফণীন্দ্র দেব এক গোলে হেরে গেল। অদৃষ্টের পরিহাস—ফণীন্দ্র দেব টিম অনেক বেশী জোরদার ছিল।

রংপুর জেলায় চলছে গোবিন্দলাল চ্যালেঞ্জ শিল্ড। দিনাজপুরে নরনারায়ণ শিল্ড। ১৯১১ সনে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার মিঃ লিজের নামে এলো এই জেলায় প্রথম বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট। ভিন্ন ভিন্ন জেলা থেকে আসছে টিম। টাউন ক্লাবে জমজমাট মরসুম। টুর্নামেন্ট পরিচালনা করলেন বিপুল ব্যানার্জি।

উচ্চ সম্ভাবনা নিয়ে খেলতে নেমেছেন ক্ষিতীশ দত্ত, ললিত দত্ত, গোপাল বসু, ক্ষীরোদেন্দ্র রায়কত, মহেন্দ্র ঘটক, সরোজ রায়কত, সুরেশ রায় প্রমুখ। এঁদের অনেক আজ জীবিত নাই। পরে ললিত দত্ত কলকাতায় এরিয়ান্স টিম হয়ে 'এ' ডিভিসন লীগ খেলেন প্রথমে এই জেলা থেকে (ইনি জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার হয়ে কাছ থেকে অবসর নেন)।

১৯২১-১৯৩০

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এল স্বাধীনতার নবজাগরণ। অসহযোগ আন্দোলন। এলেন এই সহরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেন, সরোজিনী নাইডু, আসফআলী, সুভাষ বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। সর্বশেষে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। সর্বত্র আন্দোলন, পুলিশের টহল। খেলায় মন্দা পড়লো। যুবকের দল স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অল্পমন্দার পরে আবার ভেগে উঠলো ফুটবলের নেশা। এবার নতুন মুখ রমেশ মজুমদার, সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়, সুধীর কমল রায়, শৈলেশ চন্দ্র নিয়োগী, ইন্দুভূষণ গুহ, কামিনী রাহত, রমেন্দ্র নাথ বসু, বীরেন্দ্র নাথ বসু, তালেব আলি খান প্রভৃতি এলেন খেলার মাঠে। খেলার ব্যয় চালানো সম্ভব হল না তাই লীজ কাপ খেলা বন্ধ হল ১৯২৫ সনে। কিন্তু ১৯২৬ সন থেকে শুরু হল সোনাউল্লা শিল্ড। এবার বিলাত থেকে সত্ত প্রত্যাগত ডাঃ এ, এম, এল, রহমান হাতে নিলেন খেলার ভার। এই বছর শিল্ড বিজয়ী হলেন অধুনা পাকিস্তানে সৈয়দপুরের লোকো স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথ্যাত খেলোয়াড় শরৎ সিং এই দলের হয়ে খেলেছিলেন। ১৯২৮ সনে শিল্ড বিজয়ী হলেন বর্তমান পাকিস্তানের পাবনা ফুটবল ক্লাব। এ দলের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন শৈলেন কুণ্ডু, সতু সাত্তাল।

এই সময়ে টাউন ক্লাবে যোগ দিলেন সন্তোষ ব্যানার্জি, আশু সরকার, ফণী গুহ, অতুল রায়, বাসুদেব সরকার ফজলার রহমান প্রভৃতি। টাউন ক্লাব আবার জমজমাট হয়ে উঠলো। কিন্তু মাঠ একটি, খেলোয়াড় অনেক বেশী, ভাল ভাবে অনুশীলন করার সুযোগ অনেকেই পেতেন না। ধীরেন ভৌমিক প্রভৃতি কলেজের নাম করা খেলোয়াড়েরা এলেন টাউন ক্লাবে। নির্মল ঘোষ (কণু গুহঠাকুরতার মামা) খুব ভাল খেলতেন। পরে কলকাতার এরিয়ান্স ক্লাবের অধিনায়ক হন ও সেই বছর এরিয়ান্স আই, এফ, এ, শিল্ড জয় করে।

লালমনিরহাটে (এখন পাকিস্তানে) ১৯২৮ সনে টাউন ক্লাব শিল্প জয় করে। সেই সময় টাউন ক্লাবে খেলেছিলেন সন্তোষ ব্যানার্জি, স্বধীর রায়, অতুল রায়, ফণী গুহ, নৃপেন মৌলিক, ফজলার রহমান, বাহুদেব সরকার, নিধু বোস প্রভৃতি। এদিকে বি, ডি, রেলের কর্মীর দল স্বয়ং বাবুর উদ্যোগে দোমহনীতে গড়ে তুললো এক শক্তিশালী ফুটবল টিম ১৯২১-২২ সনে। ১৯২৩শে প্রতিষ্ঠা হল আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাবের। তখন হরিপদ মিশ্র ছিলেন এই ক্লাবের নামী খেলোয়াড়।

১৯২৬-২৭ সনে মাখন সেনগুপ্তের উদ্যোগে আবার রায়কত পাড়া ফুটবল ক্লাব জেগে উঠলো। তখন নবীন খেলোয়াড়দের ভেতরে ছিলেন জীবনগতি রায়, তেজেশ ঘোষ আর লেখক স্বয়ং। ১৯২৮ সনে লেখক চলে যান টাউন ক্লাবে। সোনাউল্লা শিল্প খেলা শেষ হবার পর ছোট ছোট ক্লাবগুলিদের দিয়ে 'সিন্ড-এ-সাইড' ফুটবল প্রতিযোগিতা করান হতো যাতে এদের ভাল অহুশীলন হয়।

এই সময়ে টেনিস খেলারও প্রসার বাড়লো। অক্ষয় কুমার ব্যানার্জির চেষ্টায় ডিস্টিঙ্ক্ট বোর্ড চত্বরে একটা পাকা টেনিস কোর্ট তৈরী হল। আর্থানাট সমাজের মাঠে প্রথমে কলেজের ছেলেরা ছুটির সময়ে খেলতেন। সত্যেন বিশ্বাস, নগেন কর্মকার, নিকু সেন প্রভৃতি ছিলেন উদ্যোক্তা। পরে আরও অনেকে খেলতেন। এখানেও একটা পাকা টেনিস কোর্ট তৈরী হয়েছিল। এই সাথে ব্যাডমিন্টন খেলা সহর ছেয়ে ফেললো। খরচ কম, জায়গা কম দরকার হয়, মাঠের তদ্বির নাই কত সুবিধে।

সহরে হয়েছিল অনেকগুলি ব্যায়ামাগার। শরীর চর্চা হত। বহু যুবক আসতো ব্যায়াম করতে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেগুলি ভেঙ্গে দিলেন।

১৯৩১-১৯৪৬

১৯৩০শে খোলা হল জ্যাকসন মেডিকেল স্কুল এই সহরে। নিজস্ব খেলার মাঠ হল ১৯৩১শে। শক্তিশালী টিম হল। ফুটবল, হকিতে টাউন ক্লাবের ভ্রমণক প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৪৫ থেকে হল জে, সি, এম, ডিস্টিঙ্ক্ট স্পোর্টস এসো-সিয়েশন। সহরের নির্ভীক দেশপ্রেমিক চা-শিল্পপতি যোগেশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি রক্ষার জন্তু তাঁর দুই কুতি সম্মান দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ও বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের যুক্ত প্রচেষ্টায় এই সংস্থাটি গড়ে উঠলো। এই প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ফুটবল বাদেও, দৌড়, সাঁতার, বল ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া প্রভৃতি সবই হতো ও এখনও হয়। সাঁতারের কৌশল দেখাতে এলেন বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ, বাণী ঘোষ ও আরতী সাহা। যোগেশ মেমোরিয়াল খেলায় খেলাধুলার আর একটি নতুন রাস্তা খুলে গেল।

১৯৩২ সনে লক্ষণ মৌলিকের চেষ্টায় শুরু হল এক ব্যায়ামাগার। এর নাম আদর্শ ব্যায়ামাগার। বহু ঝড় ঝাপটার ভেতর দিয়ে আজও বেঁচে আছে। ডাঃ রহমানের পরে ১৯৩৩-৩৪ সনে বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ টাউন ক্লাব ও সোনাউল্লা শিল্প পরিচালনার ভার নিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সনে মাঠের উত্তর দিকে ক্লাব টেন্ট তৈরী হল। এই সময়ে কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড় দুলাল গুহ ঠাকুরতা চাকরী নিয়ে এলেন এখানে। ফুটবল খেলায় উৎসাহ বাড়লো। মিঃ এস, কে, দে এলেন ডেপুটি কমিশনার হয়ে। নিজেও খেলতেন, খেলায় উৎসাহ ছিল খুব। সরকারী কর্মচারীদের ভেতর থেকে টিম তৈরী করে খেলতে যেতেন ডুয়ার্সে ও জেলার বাইরেও। সে সময়ে প্রাণেন্দু দাস ও মোজাম্মেল হক ভাল খেলার দৌলতে সরকারী চাকরী পেলেন। ১৯৩৫ সনে টাকার বাজার মন্দা থাকলেও অনন্ত বোস (খয়েরবাড়ি চা কোম্পানীর সেক্রেটারী) এর নেতৃত্বে দিল্লীতে খেলতে গেলাম।

টাকার অভাবে সোনাউল্লা শিল্ড হল অচল। কৃতী খেলোয়াড় সরোজেন্দ্র দেব রায়কত, শিল্ড ও টাউন ক্লাবের পরিচালনার ভার হাতে নিলেন। ছ'বছর বাদে অবসর নিলেন। ১৯৩৬ সনে টাউন ক্লাবের দল গেল লক্ষ্মী সহরে খেলতে সন্তোষ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে। ১৯৩৭ সনেও গিয়েছিলাম। এখন তিনি ভার নিলেন সোনাউল্লা শিল্ড ও টাউন ক্লাবের।

১৯৩৯ সনে টাউন ক্লাব জয় করলো—(১) সোনাউল্লা শিল্ড, (২) সৈয়দপুর শিল্ড, (৩) শিলিগুড়ি শিল্ড।

১৯৪২ সনে মহেশ্বর ঘটক প্রমুখের উদ্যোগে হল জে, ওয়াই, এম, এ ক্লাব। করলা নদীর বাধের ধারে সুন্দর পরিবেশে মাঠটি; আছে সুন্দর গৃহ, ইনডোর গেম খেলার ব্যবস্থা ও সঙ্গে একটি পাঠাগার। এরই সাথে একটি শিশু উদ্যান ও শিশুদের খেলার ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা। এই ক্লাবের সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার ইন্টার স্টেট এবং জুনিয়র এশিয়ান সকার টুর্নামেন্টে খুব নাম করেছে।

রাহত পরিবারের আহুকূল্য হয়েছে এফ, ইউ, সি ক্লাব। রমেন রাহত প্রমুখের অর্থাহুকূল্য ও উদ্যমে এই ক্লাবের চারদিকে ঘেরা সুন্দর মাঠ, কভার্ড ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ক্লাব টেন্ট আছে। ইনডোর গেমস্ এরও ব্যবস্থা আছে। এই ক্লাবের ভবেন বসুনীয়া কলকাতায় খেলায় খুব সুনাম করেছেন।

শ্রামল গাঙ্গুলী প্রমুখের চেষ্টায় হয়েছে জে, ওয়াই, সি, সি ক্লাব। এরও নিজস্ব খেলার মাঠ আছে।

ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে খেলা শুরু হয়েছে; অনেক খেলার মাঠ—ম্যাচ, টুর্নামেন্ট লেগে আছে প্রায় সারা বছর। খেলায় শ্রমিকদের উৎসাহ খুব।

আলিপুরছারের কয়েকটি ক্লাব ও খেলার মাঠ হয়েছে।

১৯৩৪ সন। কোচবিহারের মহারাজা রাজ্য পরিচালনার শিক্ষানবীশ হিসাবে এই সহরে। একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হল মেডিকেল স্কুল মাঠে। মহারাজা একাদশ বনাম স্টেট ব্যানার্জি একাদশ খেলা। স্টেট ব্যানার্জি ফাষ্ট বোলার হিসাবে টেস্ট খেলায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর দলে সব সেরা খেলোয়াড়। মহারাজা একাদশে প্রায় সবই এ জেলার। এই খেলা থেকে এল ক্রিকেটে উৎসাহ। মাখন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে চললো অহুশীলন। তখন উৎসাহী খেলোয়াড় ছিলেন মাখন মুখার্জি, সুধীশ বসু, জ্যোতি মৌলিক, হিমাংশু সেন, তিনা চক্রবর্তী প্রমুখ।

টেনিস খেলা আবার ফিরে এল। আর্থ্যানাটু সমাজ প্রাক্কনে ব্যবস্থা হল প্রতিযোগিতার। অনেক টিম এল খেলতে। ফণী গুহ, রমেন বসু, অনন্ত বসু, মহেন্দ্র ঘটক প্রভৃতি ভাল খেলতেন। কিন্তু সন্তোষ ব্যানার্জি ও সরোজেন্দ্র রায়কত জুটি ছিল অপরাধেয়।

১৯৪০ সনে নবাব মুসারফ হোসেন তাঁর বেগম সাহেবার নামে দিলেন বেগম ফয়জুন্নেছা শীল্ড। সোনাউল্লা শীল্ড হল রানার্স-আপদের জন্য। কয়েক বছর এই শীল্ড খেলা চললো।

কলকাতার আই, এফ, এ, -তে হল সাময়িক ভাঙ্গন। জয় হল বি, এফ, এ-র। এই দলের মহামেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল ও কালিঘাট এই সময়ে জলপাইগুড়িতে প্রদর্শনী ফুটবল খেলেন। এর পরে এরিয়ান্স, মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল টিম এখানে কয়েকবার খেলেছেন।

জলপাইগুড়ি টিম দু'বার আই, এফ, এ, শীল্ড খেলেছে। এই খেলায় মোজাম্মেল হক, মনিলাল ঘটক, রুণু গুহঠাকুরতা খুব নাম করেছিলেন। পরে এঁরা কলাকাতার এক একটি টিমের হয়ে 'এ' ডিভিসন লীগ খেলেছিলেন।

মোজাম্মেল হক দুই-তিন বছর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ব্যাকে খেলেছিলেন। মনিলাল ঘটক ইষ্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক হিসেবে দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন। রুণু গুহঠাকুরতা মোহনবাগানের রাইট ইনে খেলেছেন। ইনি বিদেশে অলিম্পিক খেলাতেও খেলেছেন। খেলোয়াড় হিসাবে এঁরা জলপাইগুড়ির কেন সমগ্র বাংলার মুখ উজ্জল করেছেন। এঁদের ছিল খেলায় নিষ্ঠা, মনে দৃঢ়তা ও প্রত্যাহা অনুশীলন। তাই ক্রীড়াজগতে এত উন্নতি করতে পেরেছিলেন। আই, এফ, এর 'এ' ডিভিসন লীগে খেলেছেন এখানকার ধীরেন ভৌমিক, বাসুদেব সরকার, মনটু মৌলিক, নীতি ঘটক প্রভৃতি। রতন দত্ত খেলেছেন আসামে। মুকু ঘোষ এখন খেলেছেন কলকাতার রাজস্থান ক্লাবে।

১৯৪৭ — ১৯৬৮

১৯৪৭ সনে এই জেলায় হ'ল ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশন। চললো আস্তঃ জেলা ও, এন, মেমোরিয়াল টুর্নামেন্ট। ২৪ পরগণা, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, কোচবিহার প্রভৃতি থেকে টিম এল খেলতে। এই খেলায় ফাইনাল হলো জলপাইগুড়ি ও ২৪ পরগণার ভেতরে। বিজয়ী হলো ২৪ পরগণা।

১৯৪৭ এ বেগম ফয়জুন্নেছা শীল্ড খেলা বন্ধ হ'ল। সুরু হ'ল প্রসন্নদেব রায়কত মেমোরিয়াল শীল্ড। প্রসন্নদেব বৈকুণ্ঠপুর অর্থাৎ জলপাইগুড়ির শেষ জমিদার। ১৯৪৮ থেকে এই শীল্ডের খেলা। এবার টাউন ক্লাবের পরিচালক অতুলচন্দ্র রায়। ১৯৫০ এর বন্যায় মাঠটি খারাপ হয়ে গেল। ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশন আরও পোক্ত হয়েছে। অনেক ক্লাব যোগ দিয়েছে। পরিচালক হলেন অতুলচন্দ্র রায়। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় ও বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ থাকলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও পদাধিকার বলে জেলা সমাহর্তা সভাপতি। প্রধানতঃ সত্যেন বসু ও বীরেন বাবুর উৎসাহে ও চেষ্টায় জলপাইগুড়ি জেলায় খেলার এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বাংলা বিভাগের পর অনেক নতুন লোক এসেছে। ক্লাব আরও অনেক হয়েছে, যেমন শক্তিসজ্জ, মিলন সজ্জ, রায়কতপাড়া ক্লাব, ইউনাইটেড ক্লাব, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি।

১৯৫৩ সনে এই সহরের অমিতেশ পাল, উড়িষ্কার কটকে নানা প্রকার খেলায় আস্তঃ রাজ্য স্পোর্টস মিট এ প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ গৌরব অর্জন করেন।

এখন এই সহরে অনেক স্কুল ও কলেজ হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, জুনিয়র পলিটেকনিক, ফার্মাসী ট্রেনিং সেন্টার প্রভৃতি হয়েছে। খেলায় আরও উৎসাহ হবে, আরও ভাল খেলোয়াড় তৈরী হবে আশা হচ্ছে।

১৯৫৬ সনে প্রবন্ধ লেখকের হাতে এল ক্লাব ও শিল্ড পরিচালনার দায়িত্ব। ১৯৫৬ সনের শীল্ড ফাইনালে ইউনিভারসিটি-ল কলেজ ও কোচবিহার টিমের খেলা। লোকে লোকারণ্য, বহু মহিলাও এসেছেন খেলা দেখতে। 'ল' কলেজ বিজয়ী হলেন।

এবার দেখা গেল দর্শকদের ভয়ানক অসুবিধা ও কষ্ট। সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়, বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ও চাকচন্দ্র সান্যাল সরকারের কাছে আবেদন করলেন। ১৯৫৭ সনে মাঠের সংলগ্ন আরও ০.২২ একর জমি পাওয়া গেল। স্টেডিয়াম গঠনের পরিকল্পনা হল। ডেপুটি কমিশনার এন, সি, মুখার্জি ও কে, জি, বসুর উৎসাহে ও সত্যেন্দ্র প্রসাদ

রায় ও বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৫৯ সনে কেন্দ্রীয় সরকার ষ্টেডিয়াম তৈরীর মঞ্জুরী দিলেন। ১৯৬১ সনের ১৫ই এপ্রিল তখনকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবির ষ্টেডিয়ামের উদ্বোধন করে গেলেন। সরকারী ও বেসরকারী অর্থে এই ষ্টেডিয়াম তৈরী হল। মাত্র ১৪০০ দর্শক এই ষ্টেডিয়ামে বসতে পারে। মাঠটি টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে।

১৯৫৭ সনে টাউন ক্লাব জয় করলো আসামের বরদলই শীল্ড, প্রসন্নদেব শীল্ড। আন্তঃ জেলা ফুটবল খেলায় ডি, এস, এ, বিজয়ী হল পর পর ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সনে।

১৯৬৬ সনে পরিচালক হয়েছেন নারু রায়। ডি, এস, এ-র সম্পাদক ছিলেন অতুল রায়, তারপর শৈলেন চক্রবর্তী, এখন রবি বিশ্বাস।

১৯৬৬ সন থেকে শুরু হয়েছে সন্তোষ কুমার ব্যানার্জি মেমোরিয়াল শীল্ড।

অন্যদিকে জলপাইগুড়ির ভোলা সরকার ১৯৬২ সনে এশিয়ান গেম টুর্নামেন্টে বক্সিং-এ ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছেন।

এখন ব্যায়ামাগারের পেছনে পুলিশ লেগে থাকে না। আশীষ রাহতের চেষ্টায় হয়েছে শাস্তি ব্যায়ামাগার; চেল্টু সান্যালের চেষ্টায় বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার, অস্তি বিশ্বাসের চেষ্টায় প্রগতি ব্যায়ামাগার গড়তি।

অনেক প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক আজ বেঁচে নাই, কিন্তু তাঁদের কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে, প্রেরণা দিচ্ছে ভবিষ্যৎ সমাজকে।

খেলার ছোট বড় ক্লাব মিলে বর্তমান সংখ্যা হয়েছে ২০০। ডি, এস, এ-র সাথে যুক্ত হয়েছে মাত্র ৩৩টি ক্লাব। শহরে ও শহরের বাইরে টুর্নামেন্ট চলছে ১৫টি। খেলা পরিচালনার জন্য এসোসিয়েশন হয়েছে। ইউথ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সাথে যুক্ত আছে ২৪টি প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৭ সনে ডিস্ট্রিক্ট অফিসর ফর ফিজিক্যাল এডুকেশন এণ্ড ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার নামে একটি পদ সৃষ্টি হয়েছে। যুব-স্বাস্থ্য উন্নতির দিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি পড়েছে।

কিন্তু সংখ্যাধিকার বাজারে কোয়ালিটির অভাব দেখা দিয়েছে। নিষ্ঠার অভাবও সর্বক্ষেত্রে। তাই মনে হয় উচ্চমানের খেলা ও উচ্চমানের খেলোয়াড়ের অভাব হচ্ছে। প্রার্থনা করি এই দুর্দিনের অবসান হবে। অফুরন্ত নিষ্ঠা নিয়ে খেলার মাঠে নামুক এ কালের তরুণেরা; উৎসাহ আবার জেগে উঠুক তাদের ভেতরে, ফিরে আসুক তাদের চোখে আশার স্বপ্ন। তাহলে জলপাইগুড়ির খেলার মাঠ তার গৌরবময় ঐতিহ্যে ফিরে আসবে।

A Century of
Public Health Service in the land of Kala-Ajar
and Black Water Fever

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

‘শত বৎসরে জিলার জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন’

A Century of Public Health Service in the land of Kala-Azar and Black Water Fever

(1870 — 1970)

Sri M. N. NANDY

The picture of medical service in the days of the formation of the Jalpaiguri district and even several decades after it is hopelessly dismal.

There was practically no medical treatment available to the people in the early days of the district.

Before the tea gardens were established, the British rulers had only one interest in the district—a border area as a result of annexation of some portion from Bhutan. Their interest was only military. Hence a medical service for the people was not something for which the ruling class could at all bother. Naturally, progress of the health service was lamentably slow.

Forest resources and the prospect of tea plantation in this virgin soil attracted foreign and local capital, and interests other than military gradually developed in the area.

Labour recruitment from other parts of the country, particularly from Adibashi community, changed the social and population set-up of the area.

Medical service started growing in different sectors, public and private, at a snail's pace.

An account of the climatic conditions and the prevalent diseases 100 years back is given below.

In the Jalpaiguri district the rainy season started earlier than in southern Bengal. The prevailing wind was east-ward. Thunderstorm was very frequent in March, April and May. During cold weather months there would be very heavy dewfall, and formation of fog as well as of mist was of daily occurrence. Average temperature was 76° F or so. In 1870 the medical officer in charge of troops stationed at Buxa reported, "There are properly only two seasons—a cold and bracing season during which no rain falls, extending from October to the middle of April and a rainy season beginning in the middle of April and continuing to the end of September, average temperature being 73°9'F."

The principal epidemic disease of the district was the Malarial fever, both remittent and intermittent, with all their complications and sequelae. They were most prominent about the beginning and end of the rains in the months of March and April and in September and October. The remittent fever of the terai was of very severe and exhausting type. Kala-azar and the dreaded Black water fever took a heavy toll of lives every year.

"The Mech who inhabited this tract, which runs along the foot of the hills do not appear to suffer much from the fever, notwithstanding the malarious character of the locality, but

Europeans and natives of other parts readily succumb. Spleen affection, enlargement of liver, anæmia, anasarca—all of malarious origin—are common throughout Jalpaiguri. Among bowel complaints diarrhœa and dysentery are the most common. They are prevalent during the beginning of cold weather.” (Extract from the Govt. statistics, 1876.)

In 1870 the Medical officer of Buxa Fort reports :—

“Scurvy is very prevalent which is due to the dearth of vegetables in the Buxa area and soldiers are mostly affected. Goitre locally known as Bawa is very common in the district. Leprosy is not very common but cases of Elephantiasis are quite frequent. Rheumatic affections are very common.”

The Civil Surgeon, Jalpaiguri, reports in 1870 that no fact regarding the effect of Jungle clearing, Drainage, increased Cultivation, or other sanitary arrangements upon the general health of the people has been brought to his knowledge.

“Cholera is the only epidemic disease which makes its appearance every year in an epidemic form. In 1865 it raged throughout the district. A gang of prisoners from Rangpur, who were brought to build the barrack for troops, suffered heavily and most of them died. In 1869 April, a well marked invasion of epidemic cholera occurred in the east and west parts of the district. In 1872 another epidemic of cholera broke out and lasted from April to November.” (Extract from District Statistical report, 1876.)

No figures of death from cholera are available but in the Jail record it is stated that out of a daily average of 61·25 prisoners 20 deaths occurred within 35 days.

Vital Statistics

(Extract from Statistical Report of Jalpaiguri, 1876.)

“Since 1872 a system of mortuary registration for certain selected urban and rural areas has been introduced throughout Bengal. In Jalpaiguri District, the selected urban area is that of Jalpaiguri town and certain outlying villages, with a population of 6281. In 1873 the number of deaths within this area amounted to 157, or 24·99 per thousand.”

Charitable Dispensaries :

There were only three dispensaries in the whole of the district and this represented the total attempt of the Government. Charitable institutions and private individuals combined their efforts towards the health service of the people. No doctors were available other than those attached to these dispensaries to treat people. A few Ayurvedic physicians were there who treated a few of the patients but Ojhas were there in good numbers who professed to cure patients through exorcism or by means of Mantras.

This condition of the health service continued till 1910. Between 1910 and 1920 very slow progress took place. (*vide* District Gazetteer, Jalpaiguri District 1911—1912 to 1920 1921.) Vital statistics and other accounts are appended in Appendices A to G.

Between 1920 and 1930 slight improvement occurred. (*vide* District Gazetteer, Jalpaiguri District 1921-22 to 1930-1931.) Vital statistics and other accounts are appended in Appendices A to G.

Other statistical records of the years 1939, 1947, 1954, 1960 have been compiled from the Annual report on the state of health in West Bengal.

Interesting features are there in the records which merit serious attention, particularly the comparative disease position as compared with that of other districts.

A few words about the medical service in the tea gardens need be said. Before the introduction of Plantation Act, some 20 years back, the condition was deplorable. The labourer's dwelling house was shared by the members of the family and the pigs that they had. Sanitary arrangement was absent, so to say, and unqualified people were mostly employed as medical officers and the treatment offered was naturally very poor. As per Plantation Act, one qualified doctor for each group of 1750 labourers was to be employed and housing condition was also to be improved, but very few tea gardens have completed the constructions as yet, and in cases where constructions have been raised, they are not very satisfactory. Doctors' pay is not uniform with I. T. P. A., D. B. I. T. A and other tea associations and recruitment of doctors is not quick and adequate. Service condition is also bad. They are under the control of managers with no medical knowledge, whose paramount interest is to reduce the medical expenditure. This has made the position of doctors really precarious.

Jackson Medical School contributed towards raising the standard of medical treatment but the meagre number of beds attached did not help much.

In conclusion, it may be pointed out that there has been steady improvement in the sphere of medical service in the district since its formation. Even a cursory glance at the appended charts is enough to bring home the heart - warming facts about the reduced death rate, the increase in the number of hospitals and dispensaries and the rise in the number of beds in the hospitals.

APPENDIX — A

Charitable Dispensaries and Hospitals and how they are Financed :

Year	Number of Hospitals & Dispensaries	State Managed	State & Local Fund	Local Fund	Union Fund	Private
1872	3		3			
1910-20	13	1	4	8		
1921-30	16		9	7		
1947	24	2	8		8	6
1954	20	2	7		8	3
1960	36	21	9		6	

APPENDIX — B

*Total Number of Hospitals and Dispensaries , Number of Hospitals with
Total Number of Beds :*

Year	Total Number of Hospitals and Dispensaries	Number of Hospitals with Beds	Total Number of Beds	Beds in Jalpaiguri Sadar Hospital
1872	3	3	12	8
1910-20	13	4	76	58
1921-30	16	4	117	101
1947	24	4	136	101
1954	20		270	201
1960	36	9	456	201

APPENDIX — C

Finance Involved in the Jalpaiguri District Hospitals & Dispensaries.

Year	Govt. grant	Local Fund & Municipality	Dist. Board & Local Board	Private	Patients	Hospital Committee	Other Sources
1872	£ 402-12S			£ 202-0			
1910	Rs. 11,145	Rs. 2834	Rs. 18,770	Rs. 8365		Rs. 3990	
1931	Rs. 4, 525	Rs. 4,752	Rs. 33,707	Rs. 1326 (Europeans) Rs. 19,659 (Indians)		Rs. 6,002	
1947	Rs. 86, 615	Rs. 74,382	—	—	Rs. 18,239	Rs. 29,246	Rs. 4,455
1954	Rs. 47, 937	Rs. 39,278	—	—	Rs. 5,779	Rs. 4,530	
1960	Rs. 6,89,962	Rs. 17,528	—	—	Rs. 25,624	Rs. 6,403	Rs. 1,542

Appendix—D <i>Birth & Death, percent of Population</i>			Appendix—E <i>Vaccination percent of Population</i>	Appendix—F <i>Total outdoor & Indoor Patients Treated in Jalpaiguri</i>		
Year	Birth	Death		Year	Indoor	Out door (With new and repeat cases)
1872		2.49%	No Vaccination System was introduced	1870	222	7,110
1911-20	3.5%	3.6%	2.25%	1921	1,129	85,588
1921-30	3.23%	2.86%	3.39%	1930	1,559	98,097
1939	3.68%	2.4%	5.45%	1947	2,897	1,36,360
1947	3.3%	2.55%	22%	1954	3,899	1,10,497
1954	2.9%	1.33%	11%	1960	8,500	3,20,378
1960	2.63%	0.85%	25%			

APPENDIX—G

Position of Jalpaiguri compared with that of other districts in respect of Percentage of Death from some specific Diseases.

Year	Fever including malaria	Pulmonary T.B.	Pneumonia	Bronchitis	Dysentery	Leprosy	Peptic ulcer	Anaemia	Cirrhosis Liver
1924	3rd	5th			5th				
1939	13th	4th			5th				
1947	9th		Highest		5th				
1954	8th		2nd Highest		4th				
1960	6th	Highest	Highest	5th	Highest	2nd Highest	Highest with 4 other districts	Highest	2nd Highest

জলপাইগুড়ির প্রতীতি

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

“পাষাণের কথা”

খন্ডিন

প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ির প্রত্নকীর্তি

শ্রীসমীর ভট্টাচার্য ও শ্রীমন্দিরা ভট্টাচার্য

জলপাইগুড়ি জেলার শতবর্ষ পূর্ণ হলো। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকের দৃষ্টি এই শতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস এখনো অল্পমান সাপেক্ষ কারণ একদা—সমুদ্র এই অঞ্চলে এ পর্যন্ত কোনো নিয়মসিদ্ধ উৎখান হয়নি। পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রভূমি নামে প্রাচীন সাহিত্য ও লিপিমাল্য এই অঞ্চলের উল্লেখ তো আছেই তাছাড়াও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রত্নকীর্তিও এর প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। জলপাইগুড়ির বিশাল বিশাল দীঘি, ভগ্ন মন্দির, মূর্তি ও বৃহৎ টিবিগুলো দেখলে এবং তাদের অবস্থান বিচার করলে মনে হয় মুসলমান আক্রমণের পূর্বে উত্তরবঙ্গের এই বিস্তীর্ণ এলাকা এক বৃহৎ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কালক্রমে, হয়তো মুসলমান আক্রমণের জন্য এই অঞ্চল এক সময়ে জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং তারই ফলে হয়তো তিস্তার অপর পারে শক্তিমান রাজার পক্ষচ্ছায়ায় কুচবিহার রাজ্যের সমৃদ্ধি। অথবা একথাও অনুমান করা যেতে পারে যে একদিকে তালুমা ও করতোয়া মধ্যবর্তী অঞ্চল ও অপরদিকে ত্রিশোতা-জলঢাকা উপত্যকা অঞ্চলে এক সময়ে এক বা একাধিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী উচ্চবর্ণের নরপতি রাজত্ব করতেন; কিন্তু স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে একাত্মতার অভাবে বা তাদের অক্রমণে এই রাজত্বের পতন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও নির্মাণকলাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তবে এ সমস্তই তত্ত্বচিন্তা। এর থেকে ইতিহাসকে আবিষ্কার করতে হ'লে প্রয়োজন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখান। এবং তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই প্রবন্ধ। যদি আকৃষ্ট হয়ে সরকার অথবা বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলে উৎখানে আগ্রহী হন তাহলে আশা করা যায় একদিন উত্তরবঙ্গের পুরাতন ইতিহাসের অবগুণ্ঠন মোচন হবে।

মন্দির

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহর থেকে প্রায় চার মাইল দক্ষিণপূর্বে শোভা পাচ্ছে উত্তরবঙ্গের সুবিখ্যাত জলেশ মন্দির। পাকা সড়ক চলে গেছে মন্দির চত্বর পর্যন্ত। বহুদূর থেকে দেখা যায় মন্দিরের গম্বুজাকৃতি চূড়া। প্রথম দর্শনে মসজিদ বলে ভ্রম হতে পারে। স্থাপত্য নিদর্শনে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র বলা যায়।

জটদা নদীর তীরে একটি বিরাট টিবির উপরে স্থাপিত নব নির্মিত এই মন্দির এক শুদ্ধপ্রায় পরিখাঘারা বেষ্টিত। মূল মন্দিরের উপর বৃহদাকৃতি গম্বুজ ছাড়াও আরও চারটি গম্বুজ এই চতুষ্কোণ মন্দিরের শোভাবর্ধন করছে। পূর্বমুখী এই মন্দিরের গর্ভগৃহটি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় ১০ ফুট নীচে। সিঁড়ি দিয়ে নামলে শিবলিঙ্গের সাক্ষাৎ মেলে। গর্ভগৃহের ঘেঝে থেকে গম্বুজতল পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ১২৭ ফুট। গর্ভগৃহটি (২২ ফুট × ২২ ফুট) চতুষ্কোণ। মূল মন্দিরটির স্থাপত্য উত্তর ভারতের যে কোনো মসজিদের ন্যায়। তারই ব্যাখ্যা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লোকশ্রুতি অনুসারে কুচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে গড়তলি জলেশ থেকে উদ্ধার করেন বর্তমান জলেশের শিবলিঙ্গকে এবং দেবাদিদেবকে স্থাপন করবার জন্তু দিল্লী থেকে মুসলমান স্থপতি আনিয়ে তিনি মন্দির নির্মাণ শুরু করান (১৬৬৫ খ্রীঃ)। কিন্তু মন্দির শেষ করেন তাঁরই প্রপৌত্র। নতুন মন্দিরটি এই মন্দিরের অঙ্কুরে নির্মিত। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টার ভাট্‌স-এর মতে মূল মন্দিরটির

প্রাচীনত্ব দ্বাদশ শতাব্দীর বেশী নয়। মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণে বিশাল দীঘি আর পূর্ব দক্ষিণে বাহুদেবের মন্দির। কষ্টিপাথরের এই বিষ্ণুমূর্তিতে দশম/একাদশ শতকের পাল ভাস্কর্যশৈলীর চরিত্র লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। শৈব মন্দিরে এই বিষ্ণুমূর্তি স্বভাবতই নানা রকম কল্পনা ও সন্দেহের সূচনা করে। শোনা যায় মূর্তিটি নাকি মন্দির সংলগ্ন দীঘি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মূল মন্দিরের উত্তরে একটা লম্বা টিনের ঘর। সেখানে শালগ্রাম শিলার সঙ্গে যে দুটি প্রস্তরখণ্ডের পূজা হয় তা' যে কোন আগ্রহী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শোনা যায় মন্দিরের স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ ঐ দুই পাথরের মাঝখানে ছিলেন এবং কালক্রমে দুপাশের পাথর খসে গেলে শিবলিঙ্গ প্রকাশিত হয়। আকৃতিগত সাদৃশ্যে এই প্রস্তরখণ্ড দুটিকে কোন জীবদেহের প্রস্তরীভূত অংশ বলে মনে হয়। জীবতাত্ত্বিক বলতে পারেন এই ধারণা কতদূর সত্য। এই প্রসঙ্গ স্মরণ রাখা কতব্য মূল মন্দিরের লিঙ্গমূর্তিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাধারণ শিবলিঙ্গের সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই। অঙ্ককার গর্তগৃহে জলে ঢাকা লিঙ্গটি স্পর্শ করলে বোঝা যায় এর আকৃতি অনেকটা হস্তমুষ্টির উপরিভাগের স্তায়, মাথাটা সমান ভাবে ঢেউতোলা—মনে হতে পারে কোনো স্থাপত্যের অংশবিশেষ।

মন্দিরকে ডানদিকে রেখে একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে এক চালাঘরের মধ্যে রাখা দুটি বিশালকায় মূর্তি। একটি বেলপাথরে তৈরী অশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত দণ্ডায়মান গণেশ মূর্তি আর অত্রটি কালোপাথরের সম্পূর্ণ ভগ্নমূর্তি। পদ্মা-সনে আসীন মূর্তিটির শুধু দুটি পায়ের আভাষমাত্র পাওয়া যায়। তবে পায়ের উপর কাপড়ের ভাঁজ দেখলে পাল-শৈলীর কথা মনে পড়ে।

যোগিনীতন্ত্রে জল্লেশ নামে যে রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় কিম্বদন্তী অনুসারে তিনিই জল্লেশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের নামকরণ হয় তাঁহারই নামানুসারে। কিন্তু কালক্রমে এই মন্দির লোকস্মৃতি থেকে বিলীন হয়। এবং সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বপ্রাদিষ্ট মহারাজ প্রাণনারায়ণ একে পুনরুদ্ধার করেন। এই পনেরশো বছরের বিস্মৃতি অবশ্যই একটু আশ্চর্যজনক। ফলে একথা অনুমান করা কি একেবারেই অসম্ভব যে জল্লেশ থেকে মাত্র তিন মাইল দূরের পূর্বদহর-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটিই বোধহয় মহারাজ জল্লেশ প্রতিষ্ঠিত পুরাতন মন্দির? অবশ্য পূর্বদহর-এর আরাধ্য দেবতা কে ছিলেন এখন আর কেউই নিশ্চিতরূপে বলতে পারে না; এবং মন্দিরের বর্তমান ধ্বংসাবশেষ দেখে তার উপর এতোটা প্রাচীনত্ব আরোপ করা একটু কষ্টকল্পনাও বটে।

পূর্বদহর

ময়নাগুড়ি থেকে প্রায় মাইল সাতেক পূর্বে (National Highway No. 31) জলঢাকা নদীর আগে হুছলুডাঙ্গা। সেখান থেকে মাইল তিনেক কাঁচা সড়ক ধরে এগিয়ে গেলে পূর্বদহর-এর মন্দির। মন্দিরের কিছু আগে মৃতপ্রায় চুক্চুকা নদী। মন্দিরের পূর্বদিকে বিশাল পদ্মদীঘি, বর্তমানে কাদা ও পানায় ভর্তি। যে বিশাল টিবির উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত তার চারিদিক থেকে ভাঙাচোরা ইট দাঁত বের করে আছে। সমস্ত এলাকাতেই এই ইটের ছড়াছড়ি।

কাটা পাথরে তৈরী মন্দির মাটি থেকে সোজা উঠে গেছে। কিন্তু উপরিভাগ কয়েকবছর আগে ইট দিয়ে গাঁথা হয়েছে। আশে পাশে পড়ে আছে অসংখ্য কারুকার্যখচিত প্রস্তরখণ্ড। কিছু কিছু পাথরের অলংকরণ দেখলে রেখ-দেউলের সম্ভাবনার কথা মনে আনে। অতিশয় সরল মন্দিরের নক্সা। ক্ষুদ্র অলিন্দের পরেই গর্তগৃহ, প্রায় ৫৬ ফুট নীচে। গর্তগৃহের দেয়ালে অলংকরণের চিহ্নমাত্রও নেই। পশ্চিমদিকে মন্দিরের প্রবেশ

দ্বার। দুই বিশালকায় দ্বারপালের একটি এখনও ভগ্নদশায় দণ্ডায়মান, অষ্টটির পদযুগলের চিহ্ন নেই। গর্ভ-
গৃহের বহির্গাত্রে তিনদিকে তিনটি বিশাল কুলুঙ্গি — বোঝা যায় এককালে সেখানে মূর্তি শোভা পেত।
তাছাড়াও মন্দিরগাত্রে এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু লুপ্তসৌন্দর্য মূর্তি বিদ্যমান, যথা, নৃত্যরত গণেশ, নানা ভঙ্গিমায়
নারীমূর্তি, ভূমিস্পর্শমুদ্রায় আসীন এক পুরুষ — বুদ্ধ হওয়া আশ্চর্য নয়। কালের নির্দয় হস্তস্পর্শে অধিকাংশ মূর্তিই
হতসৌন্দর্য কিন্তু অবশিষ্ট শিল্পশোভা আমাদের অভিভূত করে।

মন্দিরে এখনও বিভিন্নকালে ব্যবহারের চিহ্ন বিদ্যমান। পাশেই আছে টালির মত পাতলা ইটের তৈরী
খিলানযুক্ত একটি ঘর। প্রাঙ্গণে সমতল থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামলে ঘরের ঠিক মাঝখানে গর্ভযুক্ত গোলাকৃতি
এক পাথর মাটিতে প্রোথিত দেখা যায়। সেটিরও পূজা হয় এখন। এই প্রসঙ্গে পদ্মদীঘিতে প্রাপ্ত বিষ্ণুপট্টটিরও
(৫৩" x ৫৩") উল্লেখ করে বলা যায় একাদশ / দ্বাদশ শতকেও এই মন্দির ব্যবহৃত হয়েছে। বিষ্ণুপট্টটির একদিকে
অগ্ন্যগ্ন অলংকরণসহ ভূমিস্পর্শমুদ্রায় চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও অপরদিকে এই দেবতারই দশাবতারের প্রতিকল্প পদ্মকৃতিতে
অঙ্কিত। শিল্পসৌকর্ষে বিষ্ণুপট্টটি অতিশয় দীন।

বর্তমানে জনৈক উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ গর্ভগৃহে একখণ্ড প্রস্তর স্থাপন করে শিবমাহাত্ম্য প্রচার করেন।

বটেশ্বর

ময়নাগুড়ি হয়ে জলেশ যেতে পথে পড়ে মাধবডাঙ্গার বটেশ্বর মন্দির। মন্দির না বলে ধ্বংসস্তুপ বলাই
উচিত। কারণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ও ভগ্ন অলিন্দের দেওয়াল ভিন্ন মন্দিরের আর কিছুই অবশিষ্ট
নেই। জটদা নদীর পশ্চিমপাড়ের এই মন্দির জলেশ ও পূর্বদহরের মন্দিরদ্বয়ের সঙ্গে এক ত্রিকোণ সৃষ্টি
করেছে।

অত্যন্ত জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হ'লেও এই মন্দিরের বাহ্যাবজিত নক্সাটি সহজবোধ্য। সামনে ক্ষুদ্র অলিন্দের তিনটি
প্রবেশপথ এবং চতুর্ভুজ পথটি চলে গেছে গর্ভগৃহে। গর্ভগৃহের স্থান অধিকার করে আছে এক বিরাট মূর্তিকাস্তূপ; কিন্তু
সবই আজ মাটির তলায়—তার উপরে মহাকালের সাক্ষী হিসাবে দণ্ডায়মান এক বিরাট বট। তার থেকেই
হয়তো মন্দিরের স্থানীয় নামকরণ বটেশ্বর। বোঝার কোন উপায় নেই মন্দিরের আরাধ্য দেবতা কে ছিলেন।

এই মন্দিরের গায়েই এক বাঁশঝাড়ে পাওয়া গেছে কীর্তিমুখ খচিত এক দ্বারশীর্ষ(?)। মনে হয় মন্দিরেরই
অংশ। পাশেই অর্ধপ্রোথিত দুটি স্তম্ভ দেখা যায়, শীর্ষে মালাকৃতি অলংকরণ।

সোদর খই

যে মন্দিরমালা জলপাইগুড়ি জেলার প্রভাসমুদ্রের সাক্ষী, ময়নাগুড়ি থানার সোদর খই-এর মন্দিরও তার
অন্তর্গত। নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনের উত্তর পশ্চিমে দিগন্তবিস্তারী ধানক্ষেতের মধ্যে ঈষৎ উঁচু একটুকরো
ভঙ্গলাকীর্ণ স্থান, চারিদিকে ছড়ান ছোট বড় নানা আকারের ইঁটের টুকরো। গ্রামের নাম ব্যাংকান্দি। কৌতূহলীর
দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাঝখানের প্রস্তর নির্মিত মন্দিরটি। ছোট মন্দির, লোকে বলে সোদর খই। গর্ভগৃহের তিনটি
দেওয়াল এখনো অভগ্ন। কিন্তু সম্পূর্ণ মন্দিরটাই পাতাল প্রবেশের উদ্যোগ করেছে।

আকারে এবং পরিকল্পনায় এই মন্দির পূর্বদহরের প্রতিকল্প। অনাড়ম্বর ভূমিনক্সা। অবশ্যই স্তূপ উৎখনন
ছাড়া আজ আর বুঝবার উপায় নেই মন্দিরের বহির্গাত্রে কোনো অলংকরণ ছিল কিনা। গর্ভগৃহের দেয়ালে

আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি কুলুজি ছিল। বর্তমানে পাঁচটি অবশিষ্ট আছে। ঠিক মাঝখানে একটি চতুর্কোণ প্রস্তরখণ্ডের মাঝে এক ছোট্ট হুড়ক। বাস প্রায় ৬ ইঞ্চি। পাতা পড়ে বুঁজে গেলেও প্রায় ২২ ফুট গর্ত এখনো অবশিষ্ট আছে। স্থানীয় প্রবাদ, এই গর্তে জল ঢাললে জলেশে শিবের মাথায় পৌঁছায়। শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র মহাশয় তাঁর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের Jalpaiguri Handbook-এ এই মন্দিরকে শিব-মন্দির বলে উল্লেখ করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রমাণ পেয়েছেন। কিন্তু সে প্রমাণ আজ অস্থিহিত। তাছাড়া একই পুস্তকে শ্রীযুক্ত মিত্র কিছু দূরে কাঠুয়া নামক স্থানে অবস্থিত যে প্রস্তর গঠিত জলাধারের উল্লেখ করেছেন সেটিরও মনে হয় অল্প কোন ব্যবহার ছিল। হয়তো একটি পাথর কুঁদে তৈরী এই ত্রিকোণ বস্তুটি কোন এক সময়ে এক মন্দিরের শীর্ষদেশে বিরাজ করত। পাশেই একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ঘরের ভিত্তিভূমি রয়েছে। একখণ্ড পাথরের তৈরী,—ভূমি ও দেয়ালের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। প্রচলিত ধারণা এটি একটি ধোপার পাট।

জলপাইগুড়ির প্রত্নকীর্তির কথা বলতে গেলে কতকগুলো টিবি'র উল্লেখ না করলে ইতিহাসকে অবহেলা করা হবে। এই টিবিগুলো সারা জেলার বিভিন্নস্থানে ছড়ানো, কোনটা সম্পর্কে স্থানীয় প্রবাদ বর্তমান আবার কোনটা লোকস্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে গেছে।

জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি সড়কের ধারে মোহিতনগরে বিশাল জোড়দীঘি—কাকচক্ষু জল সারাবছর টলটল করে। পাশেই সহোদরা রাণী দীঘি, অবিশ্যি সারা জেলাতেই ছড়ানো আছে এই রকম বিশাল বিশাল দীঘিকা, বোধহয় সেচ-কার্যের জন্ত। এই রাণীদীঘির পশ্চিমপাড়ে দেখা যায় দুটো গোলাকৃতি টিবি। যেটা একটু উঁচু, তার ওপরটা কেটে সমতল করা হয়েছে এবং সেখানে ছড়ানো রয়েছে কয়েকটা বৃহৎ কারুমণ্ডিত প্রস্তর খণ্ড—কোন মন্দিরের অংশ নিশ্চয়ই। চারিদিকের মাটির বং লাল, এখানকার ইটের জন্ত। অপেক্ষাকৃত ছোট টিবিটাতেও শাবলের আঘাত পড়েছে এবং একদিন হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যদি না সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি এদিকে পড়ে। সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই টিপি থেকে বেলে পাথরের কিছু অংশ সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের মতে এগুলি পাল যুগের। আর কোন কাজ হয় নাই।

হলদীবাড়ীর পথে ধাপগঞ্জ হাটের আগে রাস্তার ডানদিকে আছে একটা উঁচু টিবি। কোন এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এক ছোট্ট মন্দির করে দিয়েছেন এখানে—হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে প্রদীপ দেয়। স্থানটির প্রাচীনত্ব 'ধান মাহাআত্মা' প্রমাণিত। তাছাড়া টিবির যে কোন জায়গায় কোদাল চালালেই প্রাচীন পাতলা ইট দেখা যায়। এমন কি বর্তমান রাস্তার উল্টোদিকেও এই ইঁটের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। শোনা যায় নতুন রাস্তা তৈরীর সময় 'জাগ্রত দেবতা' ঠিকাদারকে স্বপ্নাদেশ দেওয়াতেই টিবিটা রক্ষা পায়। এ পর্যন্ত নীচের সমতলে চাষ দেওয়া ছাড়া কোন খনন কার্য হয়নি। এই স্থানকে 'ধাপচণ্ডী' বলা হয়।

খারিজা বেকবাড়ী পার হয়ে বোনাপাড়া গ্রাম। এখানেও আছে পাশাপাশি দুই বিশাল উঁচু পাড়ওলা দীঘি — বড় সিংগুট ও ছোট সিংগুট অথবা সিংরোট। এই ছোট সিংগুটের ধারে উঁচু টিবি। সেখানে কতগুলো মূর্তির কালো পাথরের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের পূজা হয় বর্তমানে। শোনা যায় আরও ছিল, কে বা কারা নিয়ে গেছে। জলপাইগুড়ির বিধ্বংসী বজ্রাতেও কিছু কিছু হারিয়ে গেছে। মাটির তলায় হয়তো লুকিয়ে আছে প্রাচীন মন্দির। সামনের একটা জংলা জমিকে লোকেরা বলে কাছারিবাড়ী—তাদের মতে দেবতার। কাছেই রাণীর দীঘি — কিন্তু কোনো বাধানো ঘাট নেই। বড় সিংগুটে নাকি একসময় ঘাট ছিল, কিন্তু এখন কোনো ইঁটের চিহ্ন নেই।

গড় মেন্দাবাড়ী

চিলাপাতার এক গভীর অরণ্যাবৃত অঞ্চলে অবস্থিত এক ধ্বংসাবশেষ প্রথমে এই শতকের তৃতীয় দশকে আধুনিক মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। একধারে বয়ে চলেছে বানিয়া নদী। পশ্চিম বাংলার প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এখানে যে আংশিক খনন কার্য চালিয়েছেন তাতে এক আশ্চর্য দুর্গের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারিদিকে পরিখাবেষ্টিত সুদৃঢ় ইটের প্রাচীর। চতুর্দিকে চারটি প্রবেশদ্বার। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের প্রাচীরে উন্মুক্ত দুটি খিলান। “দুর্গের পশ্চিমপ্রাচীরে নিমিত দুটি বৃক্জের গঠন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ এ দুটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সারিবদ্ধ কুলুঙ্গি ও সংশ্লিষ্ট নালী অথবা চিম্নি।” [অরণ্যছায়ায় দুর্গে—পরেণ চন্দ্র দাশগুপ্ত। পৃ: ৪২] কোনো বৃক্জের খাতু গলাবার ব্যবস্থা স্বরূপ ঐগুলি ব্যবহার করা হতো। নানা সময়ের নির্মাণকার্যের স্বাক্ষর সমস্ত ধ্বংসস্থাপে বিদ্যমান। ইটের মাপ নানা রকমের— $১৮'' \times ১২'' - ২''$, $৭\frac{১}{২}'' \times ৮'' - ১\frac{১}{২}''$ ইত্যাদি। নানা আকারের প্রস্তরখণ্ডও ব্যবহার করা হয়েছে। সব থেকে আশ্চর্যজনক একটি নালী—উত্তর দিকে প্রবেশ করে পূর্ব দেওয়াল দিয়ে বেরিয়ে বানিয়া নদীতে পড়েছে। এই জলপথের আগাগোড়া ইট ও প্রস্তর নিমিত। তলদেশ ও দেওয়াল সমস্তই পরিচ্ছন্নভাবে বাধানো। কারিগরী শিল্পের এক আশ্চর্য নিদর্শন এই ইংরাজি ‘L’ অক্ষরসদৃশ নালী। এটা কি দুর্গের অভ্যন্তরে নৌ-ঘাট (?) অথবা জল নিষ্কাশনের সুপরিকল্পিত পথ? এই প্রশ্নে কোটিলোর অর্থশাস্ত্রে বনদুর্গের বিবরণে পরিখা প্রণালী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। “মূল বা তলদেশ ইহারা চতুরশ্র বা সম্যক বদ্ধ থাকিবে এবং পাষণ দ্বারা রচিত থাকিবে; অথবা ইহাদের পার্শ্বগুলি পাষণ বা ইষ্টক দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে; ইহারা নীচে জলোদয়দেশ পর্যন্ত খাত হইবে, অথবা, (নদী প্রভৃতি হইতে) আগন্তুক জল দ্বারা পূর্ণ থাকিবে……” [অর্থশাস্ত্র, অহু: রাধাগোবিন্দ বসাক, কলিকাতা, ২১শ প্রকরণ দুর্গবিধান ২।৩]।

মেন্দাবাড়ির এই দুর্গ নলরাজার গড় নামে পরিচিত। এর সময় নিরূপণ করা নিয়ে গভীর আলোচনার উদ্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাদের আংশিক খননকার্যের ভিত্তিতে এটিকে গুপ্তপর্বের স্থাপত্য নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এই দুর্গের প্রতি এতোটা প্রাচীনত্ব আরোপ করা বোধহয় ঠিক নয়।

দুর্গ প্রাকারের পূর্ব ও পশ্চিমে, সম্ভবতঃ গ্রহরীর জন্ত, দুটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ রয়েছে। তাহাড়া দুর্গাভ্যন্তরে আছে কয়েকটি জলাশয় ও উঁচু টিবি। পূর্বপ্রাকারের বাইরে একটি বেলপাথরে তৈরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও বিদ্যমান। আর আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড। [দ্র: Nalrajar Garh, P. C. Dasgupta, Director of Archaeology, West Bengal, 1968].

জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্নকীর্তির একটি সুষ্ঠু আলেখ্য রচনায ভিতরগড়ের উল্লেখ অনিবার্য যদিও এর বৃহৎ বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গ বিভাগপূর্বের সমস্ত গেজেটিয়ারেই কিম্বদন্তীর রাজা পৃথুর এই রাজধানীর উল্লেখ রয়েছে। Gruning সম্পাদিত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের Eastern Bengal & Assam Gazetteer-এ এই গড়ের একটি নকশাও দেওয়া আছে। এই নকশার সঙ্গে নলরাজার গড়ের বেশ মিল দেখা যায়। এই গড়ের যেটুকু অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত সেখানে একটু উঁচু টিবি ছাড়া অল্প কিছু দেখা যায় না। গড়ালবাড়ির কাছেও এর খানিকটা অংশ ভারতে ঢুকে এসেছে। এই সমগ্র অঞ্চলটাই প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে আকর্ষণীয়, খননকার্য চালাবার মতো উচ্চভূমি সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে।

Fowling Fowling

মূর্তি

মূর্তি : জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে নানা দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্তিগুলির সঠিককাল নিরূপণ প্রায় অসম্ভব বলা চলে, কারণ বৈচিত্র্যমণ্ডিত এই মূর্তিগুলি বর্তমানে স্বস্থানচ্যুত ও মূর্তিতে উৎকীর্ণ লিপিরও পাঠ্যাকার সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র গঠনবৈশিষ্ট্য ও শিল্পরীতি বিশ্লেষণ করেই কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

বেলাকোবা অঞ্চলের খালপাড়া গ্রামে পুতুল নাচ দেখান ভেলা রায়। খালের ধারে চাষ করতে গিয়ে কষ্টি পাথরের এক অপূর্ব গণেশমূর্তি আবিষ্কার করলেন তিনি। ছোট্ট মূর্তি (৮" x ৩½") কিন্তু অপূর্ব শিল্পগুণমণ্ডিত। আভঙ্গ—দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ গণেশ, ছোট্ট চালিতে উড়ন্ত গন্ধর্ব আর পাদপীঠে ক্ষুদ্র মূষিক। পালপর্বের শিল্পকীর্তি বলে মনে হয়।

জয়পুর চা-বাগানের কালীমন্দিরে বর্তমানে যে অনতিবৃহৎ মনসামূর্তি বিরাজ করছে সেটি, শোনা যায়, স্থানীয় এক কৃষকের পাওয়া। পূজায় অপারগ কৃষক দেবীকে পরিত্যাগ করলে বাগানের উৎসাহী কর্মীবৃন্দ তাকে বর্তমান মন্দিরে স্থাপন করেন। ললিতাসনে উপবিষ্টা দেবীর দক্ষিণপদ পূর্ণকুণ্ডের উপর স্থাপিত। বাম কর ছুঁয়ে আছে ক্রোড়াসীন এক শিশু সর্পকে। মস্তকে ছত্রাকার ফণা মেলে রয়েছে এক বিশালকায় সপ্তশীর্ষ সাপ। চালচিত্রে দেবীর দক্ষিণে অদ্ভুত ভঙ্গিতে উপবিষ্ট ব্রহ্মা এবং বামে বিষ্ণু (?)। একটু নীচে দুইদিকে দুই সহচরী। চালির উর্ধ্বাংশ ক্রমে সরু হয়ে এক তীক্ষ্ণ বিন্দুতে মিলিয়ে গেছে। দেবীর মুখমণ্ডলে সামান্য ক্রুরভাব লক্ষ্য করা যায়। দেহভঙ্গিমায় অনাবশ্যক কাঠিন্য ও ইহগত স্থূলতার লক্ষণ। পালযুগের শেষ পর্বের তক্ষণশিল্প বলে অনুমান করা যায়।

এছাড়াও বাগানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর মুখে শোনা গেল যে এক সময়ে নালাকাটার জন্ত মূর্তিকা অপসারণের ফলে বাগানের দুই নম্বর ব্লকে কয়েকটি পাথরের খচিত অংশ পাওয়া যায়। কিন্তু চা গাছের ক্ষতির সম্ভাবনায় সেগুলিকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি।

জয়পুর চা বাগানকে ডাইনে রেখে রংধামালীর দিকে খানিকটা অগ্রসর হলে ডানদিকের যে কাঁচা রাস্তা 'সাহেব গীর্জার' দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার কোণের পাড়ায় নৃপেন রায়ের বাড়ীতে রক্ষিত আছে প্রস্তর গঠিত এক ক্ষুদ্র (৫" x ৩") দেবী মূর্তি। প্রথম দর্শনে মূর্তিটিকে মনসা বলেই মনে হয়। ক্রোড়ে সর্প ও মাথায় সপ্তশীর্ষ-বিশিষ্ট ফণা মেলা নাগ। কিন্তু চালির একদিকে যে বুদ্ধমূর্তিটি উৎকীর্ণ তাতেই সন্দেহ নিরসন হয়। ইনি বৌদ্ধদেবী কল্পনার জাঙ্গুলী—হিন্দুদেবী মনসার সঙ্গে যার তফাৎ অতি সামান্য।

ময়নাগুড়ি নিউ রেলস্টেশনের পূর্বে পেটকাটি দেবীর মন্দির। সোদর খই এর মন্দির থেকে মাইলখানেক দূরে। বিশাল কংকালসার উপবিষ্টা চণ্ডীমূর্তির অস্থিচর্মসার দেহ সরল গ্রামবাসীর মনে চিলে-নিয়ে যাওয়া আহত পেটের কল্পনার খাণ্ড যুগিয়েছে। সকলেই একবাক্যে বলে পেটকাটি। বর্তমানে পেটকাটি দেবী একটি চালাঘরে বাস করেন। কিন্তু ঘরের চতুর্দিকে ছড়ান ইঁটের টুকরো দেখলে বোঝা যায় একদা দেবীর একটু উন্নত ধরনের বাসস্থান ছিল। [দ্র: Rajbansis of North Bengal, Charu Chandra Sanyal, Asiatic Society of Bengal]

জলপাইগুড়ির ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপাল বসুর গৃহে একটি বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে। শোনা যায় মূর্তিটি চাউলহাটি থেকে সংগৃহীত। অতিরিক্ত কারুকাঠময় এই মূর্তি পালযুগের শেষ পর্বের বলে মনে

হয়। মূর্তিটির পাদপীঠে একসারি লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। এই লিপি উদ্ধার করলে হয়তো যুগ মীমাংসা সহজ হবে।

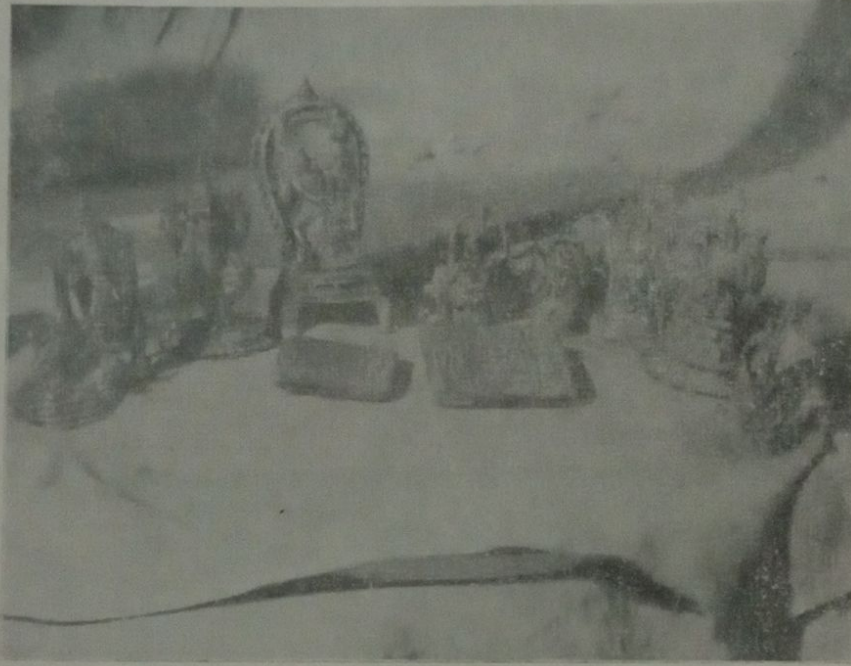
ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় বিভিন্নস্থান ও সময়ে সংগৃহীত কিছু মূর্তি আছে — বিষ্ণু, সূর্য, পেটকাটি, এমনকি একটি বৌদ্ধসূপও দেখা যায়। যাঁর চেষ্টায় এই সংগ্রহশালাটি গঠিত সেই গোপাল বসুর মতে, বিষ্ণুমূর্তিটি জলপাইগুড়ি জেলার জোড়পাকড়ি নামক গ্রাম থেকে সংগৃহীত। অবশ্য এই সংগ্রহশালার বর্তমান অব্যবস্থাজনিত বিশৃঙ্খলার জন্য কিছুই আর নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। উক্তর বন্ধের এই অবহেলিত সংগ্রহটি কোন যাদুঘর বা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেলে সমস্ত সংরক্ষণের সম্ভাবনা থাকত।

জলপাইগুড়ি থেকে আট মাইল দূরে জহিরি তালমায় কিছুদিন আগে দুটি অক্ষত মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রথমটি কষ্টিপাথরের সূর্যমূর্তি (১'২২" X ৭") ও অপরটি কষ্টিপাথরের এক পুরুষমূর্তি। সূর্য মূর্তির একদিকে দণ্ডি, অন্যদিকে পিঙ্গল। চালচিত্রে সূর্যদেবের পায়ের দুপাশে ছায়া ও সংজ্ঞা এবং একটু নীচে উষা ও প্রত্যাষা। পায়ের উপরে সারথি অরুণ ও পাদপীঠে সপ্তাশ্ব। মূর্তিটির ভাস্কর্য মোটেই উচ্চশ্রেণীর নয়। পালরাজত্বের অবক্ষয়ের যুগে রচিত। ভাস্কর্যের বিচারে দ্বিতীয় মূর্তিটি অননুসাধারণ। চালচিত্র বিহীন এই নর মূর্তির মস্তক অর্ধ মুণ্ডিত। পিছনে শিখার আভাষ স্পষ্ট। শিল্পসৌকর্যে প্রাণবন্ত এই মূর্তি যেন শাপগ্রস্ত এক বিষ্মত নরপতি। মূর্তিটির উচ্চতা ৩২"। পাদপীঠে দুই ক্ষুদ্রাকৃতি কিস্করী চামর হস্তে দণ্ডায়মান। শিল্পগুণ মণ্ডিত এই পদ্মপাণি মূর্তিটি পালপর্বের শিল্পোৎকর্ষের যুগে রচিত বলে অনুমান করা যায়।



জহিরির কীৰ্ত্তনীয়াপাড়ার যে অংশে এই মূর্তি দুটি পাওয়া গেছে সেখান থেকে অসংখ্য ইঁটও বার করা হয়েছে (৮'x৬'-২")।

জহিরি গ্রামেরই এক কৃষকের গৃহে রয়েছে ধাতুনিমিত্ত অপূৰ্ব এক মূর্তি সংগ্রহ। অতি পুরাতন এই মূর্তিগুলি অজ্ঞ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে পাওয়া যায় এক ভগ্নপ্রায় তামার বাস্কে। প্রতি মূর্তিরই উচ্চতা ১২" থেকে ৪" ইঞ্চির মধ্যে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিল্পোৎকর্ষ লক্ষ্যণীয়।



(ক) পদ্মাসীন উমা-মহেশ্বরের মূর্তিটি সর্ববৃহৎ। দেবাদিদেবের বাম জাহ্নব উপর উপবিষ্ট। পার্বতী এবং দক্ষিণপদ পদ্মকোরকের উপর স্থাপিত। পাদপীঠে ক্ষুদ্রাকৃতি বৃষ ও সিংহ (?)। (খ) তারপরেই উল্লেখযোগ্য দুটি বিষ্ণুমূর্তি। দুটিতেই চালচিত্র অনুপস্থিত। গোলাকৃতি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর আসীন বিষ্ণুর চতুর্হস্তে রীতিবদ্ধ বিশেষ চিহ্ন। পদমূলে ক্ষুদ্রাকৃতি গরুড় জোড়হাতে উপবিষ্ট। অপেক্ষাকৃত বড় মূর্তিটির আসনে তিনটি অক্ষর উৎকীর্ণ। (গ) এই মূর্তি সমষ্টির মধ্যে চতুর্হস্ত গণেশ মূর্তিটিই অপেক্ষাকৃত অক্ষত। কূর্মাকৃতি আসনে রাজভদ্রিতে আসীন গণপতি, পদতলে ক্ষুদ্র বাহন। মস্তকের পশ্চাদর্ভাগে দেবলক্ষণ মহিমবলয়। (ঘ) একটি মূর্তি অগ্নিদেবের বলে অনুমান করা যায়। শ্মশ্রুমণ্ডিত এই দেবমূর্তি এক গোলাকৃতি বস্তুকে দুই হাতে আপন ক্রোড়ে ধারণ করে আছেন। (ঙ) একমাত্র দণ্ডায়মান দেবমূর্তিটি সূর্য্যদেবের। দুই হস্তে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পদ্মমূলে দুটি ক্ষয়প্রাপ্ত অশ্বমুখ লক্ষ্য করা যায়। চালচিত্রে দুই সহচর—দণ্ডি ও পিঙ্গল। (চ) শেষ পুরুষ মূর্তিটির পরিচয় তর্কসাপেক্ষ, কারণ, পরিচয়বাহক দেবচিহ্নের অনুপস্থিতি। তবে দেহভঙ্গিমা ও গঠনশৈলীর বিচারে পদ্মহস্তে অবলোকিতেশ্বর লোকনাথের আসীন মূর্তি বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোনরকম বৌদ্ধলক্ষণ এই মূর্তিতে অনুপস্থিত। (ছ) এই মূর্তিসমগ্রে নারীমূর্তি মাত্র তিনটি। একটিতে, দ্বিভূজ পদ্মাসনা দেবী ক্রোড়স্থ হাতে একটি পদ্মকলি ধারণ করে আছেন। তাঁর আসনের একদিকে পক্ষীজাতীয় বাহন ও অন্যদিকে মংস্ত্রাকৃতি

এক পরিচয় লুপ্ত বস্তু। চালচিত্রে প্রচুর অলংকরণ। অপর দুটি মূর্তিই অভিন্ন। অলংকারবিহীন চালি; কুমারকৃতি আসনে ললিতাসনা দেবীমূর্তি। বামকোণে একটি শিশু ও দক্ষিণে, নিচে সবৎসা গাভী। অপেক্ষাকৃত বড় মূর্তিটির আসনের পশ্চাদভাগে তিনটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে। কোন লিপিরই পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, একই গৃহে দুটি বিষ্ণুপট্টও সম্বন্ধরক্ষিত। দুটিতেই কালের চিহ্ন বিদ্যমান। এই পট্টের সঙ্গে মিল দেখা যায় শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায় উল্লিখিত (বাক্যালীর ইতিহাস, শ্রীনীহার রঞ্জন রায়, কলিকাতা, ১৩৫৬) বগুড়ার সেরপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুপট্টটির সঙ্গে। জহিরিতে প্রাপ্ত দুটি পট্টরই একদিকে চতুর্হস্ত বিষ্ণুর আসীন মূর্তিসহ অন্যান্য অলংকরণ এবং একটির বিপরীত দিকে বিষ্ণুর দশাবতার। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পট্টটির বিপরীত পাশে শুধুমাত্র একটি বিস্তারদল পদ্ম উৎকীর্ণ রয়েছে।

যে সমস্ত মূর্তি, মন্দির ইত্যাদি এই প্রবন্ধে উল্লিখিত তার বাইরে নিশ্চয়ই এখনো আরো বহু প্রত্নকীর্তি এই জেলায় ছড়িয়ে আছে। যা' অল্লিখিত তা' অবহেলিত নয়, তাদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। সাধারণ পরিক্রমা হিসাবে এই প্রবন্ধ সূচিত। এর থেকে কোন ইতিহাস আবিষ্কার করা বা কোন বিশ্বৃত সূত্রের সংযোগ স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব। এই পরিক্রমা শুধুমাত্র উৎসাহী ও তৃত্যাদিক ও জনসাধারণের আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে এবং এর উদ্দেশ্যও তাই। বিভিন্ন বিষয়ে যারা এই প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্তা শান্তি নন্দীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তিনি ছাড়াও সংশ্রী মন্থনাথ নন্দী, নির্মল চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ সাহা, অধ্যাপক রেবতীমোহন লাহিড়ী ও জীবন লাহিড়ী আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

চিত্র সূচী

- ১। জহিরি-তালমায় পাওয়া অজ্ঞাত নরপতি।
- ২। জহিরিতে প্রাপ্ত ধাতব মূর্তি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

“অতীতের পৃষ্ঠা হইতে”

হুমায়ূন সাংবাদিক
অলোপাইওডি

মেজীতের পূৰ্ণা হইতে

স্থানীয় সংবাদপত্রে ডলেপাইণ্ডি

[এই পৃষ্ঠাগুলি 'জনমত' (১ম সংখ্যা), 'ত্রিশ্রোতা', 'Barendra' (১ম সংখ্যা) ও মুক্তিবাণী
পত্রিকার বহু পুরাতন সংখ্যার ফটোষ্ট্যাট্ কপির অফ্‌সেট ছাপা।]

বিষয় সূচী ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
নির্বাচন প্রসঙ্গ	১
সম্পাদক	২
সংরক্ষণ নীতি	৩
কংগ্রেস অভিভাষণ	৪
দেশ বিদেশের কথা	৫
বাটোয়ারা পত্র ও দ্বায়ের কথা	৬
মৌসলেকমু জগৎ স্থানীয় সংবাদ	৭

জনমতের গ্রাহক হইবার রেট ।

সহরে—	সহরের বাহিরে—
বার্ষিক ১।০	বার্ষিক ২।
স্থানাসিক ৬০	স্থানাসিক ১।০

২৯শে পৌষ, সোমবার।



অবতরণিকা।

উত্তর প্রাণী থেকে মানুষ্য পাথক্য ও জ্ঞান্য এই যাহগাটতেই সব চেয়ে বেশী যে সে তাব অন্তরেব শ্রু ও লবু সব অন্তর্ভুক্তিকৈ ভাবে এবং ভাস্য যথেষ্ট পরিমাণে কটয়ে তুলতে পারে এবং আপনাদের মধ্যে সচ্ছন্দরূপে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। তাতে করেই তাদের সজ বন্ধ হয়ে উন্নতি লাভ করবার সুযোগ এত বেশী হয়েছে। সমগ্র মানব সমাজে যে সকল সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের যত বেশী সুযোগ ঘটেছে উন্নতিও তাদের তত বেশী হয়েছে। খৃষ্টান জগতের আবিষ্কারগুলির ফলে যখন দিকে দিকে রেল ও টেলিগ্রাফের লাইন বিস্তার পেতে লাগল তখন আমাদের মস্ত বড় পৃথিবী ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসতে লাগল এবং জগতের যত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন সভ্যতা যত যত একত্রিত হতে করে সমগ্র ভাবে বাজ হু কবিল, তাদের সমগ্রতার মধ্যে ক্রমশঃ ঠোকা কুক হয়ে প্রত্যেকটাই এক এক পরিমাণে ভেঙ্গেচুরে নুতন করে গড়ে উঠতে লাগল। এই যে ভাঙ্গা গড়া, এইটেই হচ্ছে বিশ্ব-মানবতার মূল ভিত্তি এবং এই বিশ্ব-মানবতাই হচ্ছে চলন্ত যুগের চরম অভিব্যক্তি। এই যে ভাঙ্গা গড়ার পাল চলছে এথেকে কোনও জাতি বা কোনও দেশ বাদ পরতে পারে না এমন কি সনাতন ভারতবর্ষ বা অচলায়তন চীনও না, এই গাজনের নাচে সবাইকে পাঠ নিতে হবে এবং অনেকটা পরিমাণে ভেঙ্গে চুরে নুতন করে গড়ে উঠতে হবে। এটা শুধু জন কয়েক ব্রাহ্মণ বা মোল্লা বা পাদ্রির সাহায্যে হবে না। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সবাইকে মিলে একত্রে এই মহাকাঙ্ক্ষার ভার নিতে হবে। যারা আসবেন না তারা যে জাতই হন না কেন তাদের চণ্ডাল হয়ে থাকতে হবে, এটা জেনে রাখাই ভাল। এই যে চলন্ত যুগটা এসেছে, এটা দীন, দরিদ্র, পতিতদের জন্য একটা সুসমাচার বহন করে এনেছে,

এবং এসে সকলে দুয়ারের সামনে দাঁড়িয়েছে। যে দুয়ারটা সে খোল পাচ্ছে না তাতে এমন জোরে দাঁ দিচ্ছে যে সে তখনই খুলে যাচ্ছে। নবীন চাঁড়ালের তরারে এসে বলছে, ভাই নবীন, তুমিও মানুষ, ভয় কি ভাই তোমাকেও তো ভগবান আছেন। সে কথা শ্রবণে সে তার তেমনি শক্তিত প্রাণে ভট্টাঙ্গ মহাশয়ের উঠানে গিয়ে এক পাশে একখানি ছেঁড়া মাতার আর বসতে চাচ্ছে না, বসে তার জেগে উঠেছে। এই যে সু-সমাচার এসেছে এটাকে চণ্ডাল বেশী থেকে ধনী প্রাসাদ পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার ভার দেশবানীকেই নিতে হবে এবং এই জেলার জন্ত প্রচারের ভার টুকু নিতে আমরা সাহসী হয়েছি। আমাদের আর একটা কাজ হবে এই যে আমাদের অক্লান্ত ভ্রাতা ভগিনী বাদেব ভাবার দীনতা তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বেন্দনার ভাষকে প্রকাশ করতে দেয়নি, তাদের ক্ষমতার প্রতি প্রাকোচে বেন্দনা যত দুখে আছে সব তাদের উন্নত ও শিক্ষিত ভাই ভগিনীদের কাছে জানিয়ে দেওয়া। তারা আমাদের আপন্য না হলে, এবং আমাদের তারা আপন্যর বলে বিশ্বাস না করে, সরাঞ্জই বল আর যাই বল কিছুই হবে না। একটা চলতি বচন আছে, সাধু যাহার হচ্ছে, ভগবান তাহার সহায়। আশা করি এই জেলাবাসী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নর-নারীগণশা আমাদের সাধু প্রচেষ্টায় সহায় হবেন।

ভারতে সংস্কার নীতি

প্রথম প্রস্তাব।

আমাদের দেশ ব্যাপ্তিক সম্পদে বিশেষভাবে ধনী। নানা প্রকারের কৃষি, খনিজ ও বনজ দ্রব্য এতদেব জন্মায় এবং অতি অল্প চেষ্টায়ই আরও অনেক জিনিষ জন্মান যায়। অথচ আমাদের ব্যবহার্য পুণ্য সামগ্র্য জিনিষই দেশে পুস্তত হয়। সামগ্র্য হুচ, অলপিন থেকে হুক করিয়া শিশ, গোতল, কাগজ, কলম, কাপড় চোপড় বস্ত্র জিনিষ আমরা সর্বত্র ব্যবহার করি তার পনের জানা জিনিষই বিদেশে তৈরী। ইনডাস্ট্রিয়াল কমিশন এখন যাক্ষা লইতেছিল ভারতবর্ষে তইটা পরস্পর বিরোধী দুখ সবার সমুখে ফুটায় উঠিতেছিল এক প্রকৃতিমন্ত অনন্ত সম্পদশালী ভারত আর সামান্ততম অভাব মোচনে পরমুখাপেক্ষী ভারত।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে অনেক কাঁচা মাল কামরা বিদেশে পাঠাই, যার আমদানী করি সেই থেকে তৈরী জিনিষ। কাঁচা চামড়া পাঠাই আর আমদানী করি ট্যান করা চামড় জুতা প্রভৃতি।

অনেক জিনিষ আমরা বেশ তৈরী করিতে পারি কিন্তু সেই সব শিল্পে অভিজ্ঞ বাবসারী ও দক্ষ

শ্রমিকের অভাবে যথেষ্ট লাভ নক করিতে পারি না এবং বস্তুটা উৎপন্ন করি পেটা মোটেই দেশের প্রচোজনের পক্ষে যথেষ্ট না। আমরা প্রচুর চিনি আমদানী করি অথচ ইক্ষু, বীট প্রভৃতি বস্ত্রাতির উপযুক্ত ভূমির আমাদের অধার নাই। সামগ্র্য কয়েকটা চিনির কারখানাও আছে।

আরও অনেক জিনিষ আমরা বিদেশ থেকে আনি যেগুলো তৈরী বায় নাথ্য তইলেও দেশে তৈরী হওয়াই উচিত। যেমন বুদ্ধের সরঞ্জাম প্রভৃতি।

উক্ত তিন প্রকারের জিনিষ ছাড়া যে সব জিনিষ আমরা বিদেশ থেকে আনি অর্থাৎ যে সব জিনিষ তৈরীর সুবিধা আমাদের দেশে মাই কিছা জন্মান অতি সুবাস সাধ্য (অথচ দেশের জীবন মরণ সমগ্রাব জিনিষ না) সেগুলো সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষিদ্ধ। অনেক ধনিজ দ্রব্য এ দেশে পাওয়া যায় না সেগুলো আমদানী করিতেই হইবে। অনেক কৃষিজ পদার্থ আছে যেগুলো ভারত অনেক চেষ্টায় এ দেশে জন্মান যার কিছু অসম্ভব পরচেষ্টা; সেগুলো আমদানী করাই সমস্ত।

সমস্ত হে, কি উপায়ে এই সব জিনিষ এদেশে তৈরী করার ব্যবস্থা করা যায়। এই তিন প্রকারের মধ্যে যেখানে শ্রমীর আলোচনা নিষিদ্ধ কারণ সেগুলো এত বেশী দরকারী যে বরষ বরষ পড়ুক দেশে প্রস্তুত কারতেই হইবে। আরও পরচেষ্টা হইবে সরকারের ততলি থেকে অর্থাৎ দেশের প্রতিদ্বন্দ্বের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বরষ যোগ্য যে দেশের সব লোক টাঙ্গ দিয়া। তাহাতে যদি বরষ কিছু দিন বেশী পড়ে এমন কিছু অসুবিধা হয় না।

এখানে একটা কথার উত্থাপন দরকার। কেউ কউ বলিতে চান এই তৃতীয় শ্রমীর কথা সর্বত্র ব্যবহার্য সমস্ত জিনিষই বসিতে হইবে। যথা বস্ত্র, জুতা, ছুত, কাঁচ পুড়তি। তাহা যদি বস্ত্রের কারিগর লক্ষ্য যার ভাবে ফলে এত দৈর্ঘ্য বে-বাহ-বানিজ্য প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়াই সব চেয়ে ভাল। কারণ যত বরষই হউক সর্বত্র প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ দেশে প্রস্তুত করিতে হইবে এত নীতি অনুসরণ করিলে আমদানীর উপযুক্ত জিনিষের কোঠার ক্রমশঃ লাড়ায়। আমদানী না হইলে রপ্তানীও এক হইবে। সেটা কখনই লাভজনক হইতে পারে না।

আমাদের দেশে যাহারা সংরক্ষণ মতাবলম্বী তাহারা শুধু সেই সব শিল্পেরই উন্নতি চান যেগুলি পরে আবায় বানিজ্য প্রতিযোগিতার টিকিয়া থাকিতে পারিবে। সেই জন্ত শিল্প সংরক্ষণই আমাদের বিশেষ আলোচ্য। তাহাদের মত যে সমস্তভাবে অনুসন্ধান করিয়া বস্ত্র বোঝা যায় যে কোন শিল্প নিদিষ্টকালের জন্য সংরক্ষিত থাকিলে পরে স্বাধীন ভাবে লাভজনক হইতে পারে, শুধু সেগুলির কিছু কালের জন্য সংরক্ষণ কর্তব্য।

কাজেই আমাদের প্রথম হই রকম শিল্পের প্রতিষ্ঠান ও উন্নতি সাধনের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে। দুই ক্ষেত্রেই আমাদের প্রধান অন্তরায় দক্ষশ্রমিক ও অভিজ্ঞ বাবসারীর অভাব। প্রত্যেক নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠানেই বহুদিন পর্যন্ত না ব্যবসারী ও শ্রমিক দক্ষ হয় ততদিন যে শিল্প লাভজনক হইতে পারে না। এ অভাব মোচনের উপায় ক?

(ক্রমশঃ)

জলপাইগুড়ীর সংবাদ ।

চাক্ষুর লোভের হার ।

মোসলেম জগৎ ।

সারা মোসলেম জগতে যেন একটা বিশৃঙ্খলার সারা পাওয়া যাচ্ছে, গাজি মোস্তাফা কামালের রণ কৌশল ও রাজনৈতিক কৌটিল্য তুরস্কের চতুর্দিক গৌরব অনেকটা পরিমাণে ফিরিয়ে এনেছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এনেছে একটা দেশব্যাপী অসন্তোষ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। তুরস্কের কালেক্ট জিলেন সমস্ত তুর্কি মুসলমান জগতের ধর্ম-শুদ্ধ ও তাহাদের ধর্ম-শক্তি ও রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র। জগতের সমস্ত তুর্কি-মুসলমান-গণ তাঁর পার্থিব ও অপার্থিব দুই ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাই ছিল নাকি তাদের ধর্ম জগতের আশা ও কল্প জগতের প্রেরণা। কালেক্ট যখন পার্থিব ক্ষমতা অনেকটা হারিয়ে ফেলেন তখন মিশর প্রভৃতি মুসলমান দেশের রাজাগণ তাঁর সম্মান বজায় রাখবার জন্য সিংহাসনে বসবার সময় তাঁর কাছে থেকে একটা মামুলি ফরমান নিতেন। গাজি মোস্তাফা কামেল কালেক্ট লুপ্ত অ-কারের মতন করে ফেলেছেন। তাতে নাকি গোড়ার দল বড় চকল হয়ে উঠেছেন। আফগান মন্ত্রী সেখান থেকে রাগ করে চলে এসেছেন। আর্গাঁ গাঁ ও আমীর আলী মোসলমানের পথ থেকে গাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এক লম্বা চিঠি লিখেছেন, এবং সেই চিঠি প্রকাশ করার জন্য তুরস্কের কয়েক জন গবরের কাগজের সম্পাদকের কারাদণ্ড হয়েছে। নিশারে নাকি আব

বাগানের নাম	লাভ শতকরা।
রামকোরা	... ২০০
কাটালগুড়ি	... ২৫০
ডায়না	... ২০০
চুনিয়াকোরা	... ১২৫
গুরজংকোরা	... ৩০০
মোগলকাটা	... ৩১০

আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত বি, এ, ইংলণ্ড হটতে ইনকরপোরেটেড একাউন্টেন্ট হয়ে মঙ্গলবার প্রাতে এখানে পৌছছিলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে লাট সাহেব এখানে আসবেন।

বিশিষ্ট ভ্রমরোহিতগণের অনুরোধে স্থানীয় গোড়ার গাড়ীর অভাব দূরীকরণার্থ

ভালা গাড়ী ও গোড়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র লাহিড়ীর বহির্গতিস্থ আন্তরালে এবং দিনবাজারের মসজিদের সম্মুখে মহত্মম সুলতান নিকট অন্তঃস্থান করিয়া সংবাদ দিলে যথা সময়ে গাড়ী সরবরাহ করা হয়। তাড়া বাজার অপেক্ষা হ্রস্ত। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—

শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ দাশ,
জলপাইগুড়ি।

জলপাইগুড়ী সহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত।

কমলা আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসীতে অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধের জন্য অনুরোধ করুন।

চাবনপ্রাশ ৪, সের, মকরধ্বজ ৪, তোলা।

ব্যবস্থাপক কবিরাজ—

শ্রীপ্রবোধকুমার সেন গুপ্ত,
কবিরাজ।

একজন কালেক্ট তৈরী করা হচ্ছে। আমীব-কামেলে মনোমালিন্য হওয়ায় এদিকে সুরিধা হয়েছে। ইংরেজ আফগানে লড়াই বাধে বাধে অবস্থা। ইংলিশম্যান বলেছেন আমীরের জানা উচিত এবার ইংরেজের সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জামের অবস্থা ১৯১৯ সনের থেকে অনেক ভাল। উত্তরে আমিন-ই-আফগান পত্রে লিখেছে ইংরেজের সব সরঞ্জাম আছে বটে কিন্তু নাউ উদ্দীপনা, যা আফগানের আছে। এদিকে কামালের উপরে বোমা পড়ল, এদিকে নাকি শুনছি আমীরের বিরুদ্ধেও একটা বড় দল আফগানিস্থানে বেড়ে উঠেছে। এবার নাকি ইংরেজ আমীরকে বড় গ্রাহ্য করে না। ফলে কি হয় দেখা যাক।

KARR & CHATTERJEE,

Merchants, Agents & General Order
Suppliers.

JALPAIGURI, E. B. RY.

Supplies :—Mills, Factory, Loco Coal
and General Orders of Coal, Lime,
Cement, Paddy, Rice on
moderate Terms &
Commission.

Managing Proprietors :—

K. KARMOKERR,
S. CHATTERJEE,

BARENDRA

JALPAIGURI

1925

**A weekly news paper published every Thursday
of the week.**

Jyotish Chandra Sanyal—Editor-in-chief.

Vol. 1—3	The 15th October 1925.		Thursday.
Annual Subscription :—			
Dak-edition	...	Rs 4/-	Single Copy nine pies.
Town-edition	...	Rs. 3/-	Back number two annas.

'Sarbjalaraline'

Is a Wonderful Specific for
Malaria and Other Fevers and
Enlargement of Liver and
Spleen

Sarbjalaraline

has given Newlife to hundreds.
Thousands-Millions !!

Why don't you try and get
Permanent Relief ??

Sold everywhere.

Regtd.

Trade



Mark.

'Goitreline'

Sure Cure for

Goitre

Tried by Millions with
Success.

Sole Agent—Druggist's Hall, Jalpaiguri.

Managing Proprietor—Dr. S. C. Gupta, L.M.P. ; M.H.S.

(Govt. Medallist.)

15th October 1925.

Barendra

Post-prandial Speech.

The Indian Community of Simla gave the first farewell banquet in honour of Lord Reading at the Cecil Hotel on the eve of his departure from Simla. Sir Mahomed Safi who presided in the function paid a glowing tribute to His Excellency for his works and reviewed at a great length the substantial advance that has been made in all the departments of Administration notwithstanding the fact that he took up the Administration at the most trying times. The greatest achievement of His Excellency said Sir Mahomed was that he could persuade the conservative Government of England to commit itself to a revision of the

Government of India Act before the completion of the statutory period, provided co-operation was shown. This is a great achievement no doubt. But the famous speech of Lord Birkenhead in the House of Lords in which he flourished the sharp edge of the broad British sword was not certainly reassuring even to the most balanced of Indian minds. Even Sir Mahomed of un-impeachable sobriety had to observe that the gesture was yet to come and the famous speech of Lord Birkenhead was not a true gesture or at least not the thing which was expected. It chilled the hopes of the most robust optimists among the Indian liberals who had always pinned their faith in Indo-British Co-operation. Lord Reading however, an acute lawyer as he certainly is, turned the table on Sir Mahomed and said "All parties in England are desirous of befriending India,

All are waiting for a gesture of Co-operation and good will from India. I sometimes wonder, continued His Excellency that the practical sagacity of India has not rushed to grasp the hand held out. Indians could have said 'we still hold to our opinion, but as progress must depend upon Co-operation and good-will, we are prepared to alter it. If India had thus responded, a wave of generous feelings would have spread across the ocean to England and changed the whole out-look. Then as trust begets trust, they could have asked for results on that Co-operation; and in the words of Lord Birkenhead "would not have found England a niggardly bargainer." Noble words these are indeed and nobly said. But are not the Swarajists really Co-operating within the Legislative Councils? What have they done by way of Non-Co-operation except turning down the salaries of the self-seeking Ministers? Mr. Jinnah has truly observed that Pandit Motilal and his friends are to all practical purposes co-operating within the limitations that their position has imposed on them. His

Excellency however was not slow to appreciate the position and admitted that at present a more favourable atmosphere existed than had existed at any time during his Vice-royalty. He also knew the exigencies and the difficulties of the political leaders. What then is the difficulty? What then lies in the way of a lasting understanding conducive to both the high-contracting parties, Britain and India? Of course, it is difficult to please all; for it is only pleasing nobody. We hope that if the four and half years of His Excellency's Vice-royalty has been barren of any good results, the next half year would yield abundance. But! hopes deferred maketh the heart sick."

Birastami.

So Sreemati Sarala Devi's *Birastami Brata* was duly celebrated in Calcutta on the *Ashtami* day. Any one having any knowledge of the history of the Swadeshi movement and the part the *Brata* played in preparing the field for the great national upheaval must look forward to its inauguration with a feeling of genuine satisfaction.

The *Brata*, though nominally religious in conception, was intended to promote the physical regeneration of our young men and to impart to them a really scientific training in all manly exercises and sports. It must be said to the credit of Sreemati Sarala Devi that she for the first time discovered the immense possibilities of our primitive *Lathi* and introduced it in her programme of *Birastami*. In these days of scientific inventions, no one could dream of using the *Lathi* as a successful weapon of offence or defence, the crudest fire-arm being superior to it in that respect. But she realised that for a disarmed people like the Bengalis, the *Lathi*, was best calculated to rouse the dormant *rajas* of their character.

Swami Vivekananda had declared on more than one occasion that the *Tamas* of our character must be replaced by *rajas* before we could expect to attain to a truly *Satwik* state.

What were the last Swadeshi movement and its subsequent develop-

ments? Bengal was only casting off her *Tamasik* lethargy and inertia and slowly developing her innate *rajas*, when all of a sudden this natural process of self-revolution was arrested. Mahatma Gandhi appeared in the arena of our national struggle. His ideal of non-violence and his message of passive resistance captured the imagination of the people. But the result was disastrous for Bengal. All *Rajasic* activities, all efforts at physical culture were considered unnecessary and were sometimes denounced as fostering the spirit of *Hinsa*. Mahatmaji was not to blame. The leaders were not to blame. The people (and specially the students and congress volunteers) neglected physical culture, because for them the necessary incentive did not exist, because they thought, though wrongly that the new ideal of non-violence had rendered the cultivation of the body unnecessary superfluous. And we find to-day that *Tamas* our old enemy is reigning supreme all over Bengal.

Whether Sreemati Sarala Devi's efforts succeed or not, it is certainly a matter for congratulation that the genius of Bengal is asserting itself in and through her again.

Rumoured Arrest Of S. P.

Midnight Trespass

A. MURSHIDABAD

SENSATION.

It is reported that a European Police Superintendent of a mofussil district town has been charged with the serious offence of having attempted at dead of night to disturb a young Hindu lady travelling with her husband on the Murshidabad section of the E. B. Ry.

Both the lady and her husband belong to two well-known and wealthy aristocratic families of Bengal.

They were travelling in a second class compartment in which there was also happened to be a high Indian official of the Excise Dept as their fellow traveller. The Police Superintendent was in the next first class compartment, but at a certain station when the night was well advanced he suddenly entered the compartment in which the lady was sleeping, and it is alleged attempted to molest her when the Indian official, who was closely watching the European's conduct all the while jumped up from his seat and interfered. The European realising his position left the compartment at the next station and before the authorities could be informed he, it is stated, under cover of darkness made himself scarce leaving all his belongings in the train. In his hurry he even forgot to take his rifle and it was the rifle that gave the clue to his identity.

The case has created a good deal of sensation in the district concerned and it is rumoured that the European who is no other than a Police Superintendent has at last been placed under arrest.

Indians' Rights.

Strategic Bond With Australia.

Melbourne, Sept. 29
At last night's banquet in the

Parliament House, Mr. A. W. Moore of the "Statesman" (Calcutta) speaking on behalf of India said Mr Bruce (Australian Premier) announcement that domiciled Indian subjects of the King would be given full civic rights would be read with pleasure in India. Between India and Australia there was an ever-increasing strategic bond. Both were faced with a common danger and their safety lay in the cohesion of the Empire.—"Reuter."

The Ex-Kaiser.

Insuring Against His Return.

London, Oct. 9.

There has lately been a revival in the London market of demands for insurances to cover the "risk" of the ex-Kaiser's return to the German throne which was noted a year ago, states the City Editor of "The Times." Policies provide for the payment of total loss should the ex-Kaiser resume power in Germany during November, in accordance with the forecast of a "seer" in America, whose the orders are believed to have emanated.

Heavy insurances are known to have been written at fifteen guineas per cent.—"Times" Service.

Germany's Lost Colonies.

Return by League Mandate ?

London, Oct. 6

It is significant comment, the "Time" Berlin correspondent, that in a speech at Karlsruhe yesterday Dr Schacht, President of the Reichsbank raised the question of the former German Colonies.

There have been signs recently of the preparation of a campaign for the return of some of the former colonies under a mandate, if Germany joins the League but this is the first utterance of real importance in which it has been mentioned.

Dr. Schacht declared that Germany could more easily shoulder

the Dawes plan burdens if she were able to obtain raw material from her own colonies.

New Pattern Ten- Rupee Note.

A Press "Communique" says:—

To provide further safeguards against imitation and to render the serial number less liable to accidental destruction, the Government of India will shortly introduce into circulation a new pattern Rs 10 note.

District-Board.

The District Board nominations have not yet been gazetted. It is having a long incubation. Will it yield the expected results ?

Local.

Mr. Marr I.C.S. comes back as the Commissioner of Rajshahi Division and joins toward the end of this month.

Mr. Traverse O.C.E. returns from home by the end of this month.

Motor Accident Case

The son-in-law of Khanbahadur has been withdrawn by the Crown as the boy of the ill-fated mother had been amply compensated. Nobody wants that justice should be vindictive and public opinion here turned definitely towards Khanbahadur's son-in-law when it became known that the boy, the only child of the runaway mother, was generously provided for, we thank the authorities for the happy termination of the case.

Mr. J. M. Sen Gupta

Mr. J. M. Sen Gupta, the Bengal Swarajist leader and his party are coming down here by the up Darjeeling Mail of the 22nd Oct and they will leave for Dinajpur by mail next day. Arrangements are being made for a public meeting.

DASS & Co.
Bankers & Share Dealers,
JALPAIGURI.
Tel. Address:—"DASCO"

দেশের কার্যধারা।

দাশ এণ্ড কোং,
জলপাইগুড়ি।
এখানে বিভিন্ন লব্ধ অস্ত্রাদি
যেহে কোম্পানীর সেয়ারি খরিস ও
বিক্রয় হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

REG. NO. C. 1380.

Reserved
for
Jiten Roy
ROSHENA ILLUMINATION
CO.
JALPAIGURI.

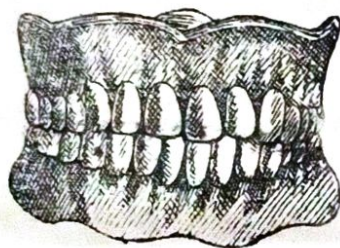


সম্পাদক—শ্রীহরেন্দ্র পাল, এম, এ, বি, এল।

২য় বর্ষ।

১০ই এপ্রিল, ১৯২৭, ২৭শে চৈত্র ১৩৩৩, রবিবার।

২১শ সংখ্যা।



দাঁত বাঁধাই ও দন্ত চিকিৎসা।

ডাক্তার—শ্রীচিন্তাহরণ গুপ্ত, এল, এম, এফ,

ডিপ্লোমা প্রাপ্ত সার্জন-ডেন্টিস্ট (জলপাইগুড়ি)

বিনা কষ্টে ও বিনা রক্তপাতে দাঁত তুলিয়া দেওয়া হয়।

কম্পাশ দন্ত, দাঁতের মাড়িতে পঁজ, পোকার খাঁড় দাঁত প্রতি সর্জনকারী দস্তাবেজ চিকিৎসা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—হাতের দস্ত Concession
দেওয়া হয়।

গোল্ড ক্রাউনিং, গোল্ড ব্রিজিং এবং ফিলিং অস্থি স্থলভে ও অস্থির নিপুণতা ও সতর্কতার
সহিত আধুনিক "আমেরিকান" প্রণালীতে করা হয়।

১। কৃত্রিম দন্ত তুল প্রেট (পাথরের)	৮০/- হইতে ১২৫/-	৬। বেমালুম দাঁত তোলা	৪০/- হইতে ৫০/-
২। ঐ স্বর্ণ নিখিত তুল প্রেট	৫০০/- ,, ৭০০/-	৭। স্বর্ণপ্রাপ্ত দাঁতের চিকিৎসা এবং গোল্ড, সিলভার ও সিমেন্ট ফিলিং	৪০/- ,, ২৫০/-
৩। প্রতি দহের জন্ত	৫/-, ৫/- ও ৮/-	৮। দাঁত স্কেলিং ও ব্রিজিং	১৫/-
৪। প্রেট ও কৃত্রিম দন্ত রিপেয়ারিং	৫/- হইতে ১০/-		
৫। ক্রাউন এবং ব্রিজ (অর্থাৎ প্রেট বিহীন দাঁত)	২৫/- ,, ৪০/-		

ড্রাগিস্ট্‌স্‌ হল, কালীকমল বিল্ডিং, জলপাইগুড়ি।

জলপাইগুড়ি পলিক্লিনিক

এখানে

যাবতীয় চক্ষুরোগ চিকিৎসা,
চক্ষু পরীক্ষা,
চশমা দেওয়া

রক্ত, মল, মূত্র, কফ প্রভৃতি
আণবিক পরীক্ষা

ও
সর্বপ্রকার ঔষধাদি বিক্রয়
হয়।

ডাক্তার—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, বি।

ওসিং ব্রাদার্স।

সিমেন্ট খরিস করিতে হইলে বেসার্স ওসিং ব্রাদার্স এণ্ড কোংর নিকট হইতে
অথবা হাট লাটান ড্র্যাও ক্যাটল ড্র্যাও পোর্ট ল্যাও সিমেন্ট স্থলভ হুগো খরিস করুন।

ঘোষ এণ্ড সঙ্গ।

"লক্ষী লোন আফিসের সম্মুখে"

সকল প্রকার মিলের ও তাঁতের কাপড়
খন্দর, সর্ববিধ কাটা কাপড়, শীত বস্ত্রাদি
স্থলভে বিক্রয় হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কার এণ্ড চার্জি।

সর্বপ্রকার চাউল, কয়লা, সিমেন্ট ইত্যাদি।

আবার তোর মানুষ হ'।

ত্রিশ্রোতা ।

২৭শে চৈত্র, ১৩৩৩ রবিবার ।

দেশের কার্যধারা ।

সর্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নির্ধারণশীলী মানিরা লইয়া প্রদেশের অবস্থা বিবেচনার তাহা পরিবর্তিত করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালন করাই হইল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য। বঙ্গদেশও এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সম্প্রতি বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যে অবস্থা তাহাতে মনে হয় না বাংলা এই নীতির অনুসরণ করিতেছে। কংগ্রেস কমিটি মূল ভূমিকা লাভে তাহার কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া বিবাদ সৃষ্টি করিয়া ব্যাচারা থাকিবার নিখ্যা চেষ্টাতেই যেন ব্যস্ত। ঐক্য জিতেঞ্জলাগ বানাজ্ঞা ও ঐক্য শাসন মূলক অর্থতাবে কংগ্রেস কমিটির কার্য করিবার তাগ করিতেছেন তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রই হজ্জার মরিয়া আছে। কংগ্রেসের নামের একটা মোহ আছে, সেই মোহ লইয়া এইরূপ বিবাদ সৃষ্টি করা শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেই যে হজ্জার

কথা ইহা বিবাদমান পক্ষগণ যে বুঝেন না তাহা নয়, কিন্তু সেই হজ্জাও নেতৃত্বমাহের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির কোনরূপ পার্থক্য হইবে বা সুযোগ প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই, কাজেই ইহার কর্তৃত্ব বাটোরার বিবাদ দেখিয়া মনে হয় রাষ্ট্র পরিচালনে এই কমিটির অধিকার হইলে নেতৃত্বগণের ব্যক্তিগণের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে। ক্ষমতাবিহীন দেশীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এই অবস্থা। তারপর, সরকার পরিচালিত ব্যবস্থাপক সভার কথা একবার বিবেচনা করা যাউক। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শ্রীনিবাস আয়ারজার হইতে আরম্ভ করিয়া মদরত নেতাগণ পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে বর্তমান শাসনসংস্থার গঠিত ব্যবস্থাপক সভার এমন কোনরূপ বিশেষ ক্ষমতা নাই বাহা দ্বারা স্বরাজ স্থাপনে স্থায়ী সহায়তা হইতে পারে। মন্ত্রীগণ মন্ত্রিত্ব করিয়া তাহাদের কার্যের অসারতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

এইরূপ অবস্থারও ব্যবস্থাপক সভার সমস্তপদ ও মন্ত্রিসভার জন্ত দেশবাসিগণের মধ্যে যে মনোমালিন্য, যে মনোবিবাদ যে মহত্বজনক কার্য তাহাতে মহত্বের উপরই ভিত্তি আসে। সর্বক্ষেত্রেই, সর্বক্ষেত্রেই এইরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত নেতৃত্বলোভ প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয় দেশের নেতাগণের স্বরাজ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের একটা অবলম্বন মাত্র। জাতীয় আন্দোলন এইরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইহা বিশেষ কোন ফল প্রদান করিতে পারিতেছে না। জাতির জন্ত ৬ দেশবন্দ, মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ণ নিঃস্বার্থ ত্যাগে দেশে যে কিছু কার্য হয় নাই তাহা নহে কিন্তু এইরূপ মুষ্টিমের নেতাগণের সহিত নেতৃত্বলিপ্সু নেতৃত্ব ও দেশবাসীকে স্বার্থহীনতার পরিচয় দিতে হইবে। এই স্বার্থহীনতা হই একদিনে অর্জিত হইবে না, ইহাকে অভ্যাসে পরিণত করিতে হইবে। সেই অভ্যাস গঠিত করিতে হইলে দেশবাসীকে মহত্ব অর্জন করিতে হইবে। মানুষ মাত্রই ইহা কার্য না করিলে যে তাহার ফল স্থায়ী হয় না, ইতিহাস স্পষ্টভাবে ইহা বুঝাইয়া দেয়। ভারতের অদৃষ্ট-বিধাতা ইংরাজগণও কার্যে বুঝাইয়া দিতেছেন যে ভারতকে স্বরাজ্যত্ব করিতে হইলে নিজ চেষ্টায় সজাগ হইবে। মানুষের জন্মগত অধিকার “স্বরাজ” অপরের দানের অপেক্ষা করে না। দেশবাসিগণের, এবং নেতৃত্বদের

এই মান্যত্ব সত্যটা উপলব্ধি করিবার প্রবৃত্তির অভাব দেখিয়া মুষ্টিমের প্রকৃত কর্মীর হৃদয়ে যে অবসাদের উদয় হয় তাহার প্রভাব অবহেলা করিয়া কর্মে প্রবৃত্তি হইবার শক্তি অতি জল্প সংখ্যক ব্যক্তিরই থাকে। এই ভাবেই হই স্বরাজ আন্দোলন পিছাইয়া পড়িতেছে।

সাময়িক ।

বাংলার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নূতন লাট জর জ্যাকসনকে অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন। অভিনন্দনপত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভাব অভিযোগ জানান হইয়াছে। লাটসাহেব কিন্তু অতি সতর্কভাবে সেইগুলির উত্তর দিয়াছেন। উত্তরে তাহার মনের অবস্থা প্রকাশ পায় নাই। প্রথম অবস্থায় শাসকগণের এই সতর্কতা থাকে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শাসন প্রণালী শাসকগণকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জর জ্যাকসন কি ইহার ব্যতিক্রম করিবেন? কার্যেই ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

লাট সাহেব যদিও সম্প্রদায়ের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছেন যে ভূমির ভর সংরক্ষিত বিভাগ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে চিরস্থায়ী স্বমোক্তের কোনরূপ পরিবর্তন হইবে না। এই উক্তিও যদিও সম্প্রদায়ের উপর দরদ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ দেশবাসী কিন্তু চিরস্থায়ী স্বমোক্তের বিরোধীদের পক্ষপাতী, কেন না দেশের যে অবস্থায় চিরস্থায়ী স্বমোক্ত প্রচলিত হইয়াছিল সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে।

আদর্শ বৃক বঙ্গ বাহারের সুকির নিমিত্ত সম্প্রদায় নির্দিষ্টপে সকলেই মত প্রকাশ করিতেছেন। আশা করি লাট সাহেব সাধারণের অভিমতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্গ বাহারকে সুকি দিয়া মহত্বের সম্মান রক্ষা করিবেন।

যুক্ত প্রদেশের কাউন্সিলে জেলবার মন্ত্রকের সময় জেল সংস্থার আলোচনা হইয়াছে। জেলে কয়েদীদিগকে বর বয়ন, কাঠের মিস্ত্রী ও গোছার মিস্ত্রীর কাজ শেখান হইবে। স্বরাজ্যমলের জনৈক সভ্য প্রস্তাব করেন যে কয়েদীদিগকে নৃত্য কুটা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। এই প্রস্তাবটা গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবটা যে অতি প্রয়োজনীয় ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমানে কয়েদীগণ কারাগার হইতে বাহির হইয়া সনাজের অস্পষ্ট

হয় এবং আবার কারাগারের কয়েদী সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহার পরিবর্তে তাহারা যদি স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ভারের সুযোগ পায় তাহা হইলে মানব সমাজের মহোপকার হইবে।

বিগাতে কয়েদীগণের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটা বিল পাশ করিবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এই বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। যে ব্যয় হইবে তাহার কিয়দংশ সরকার ও কিয়দংশ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বহন করিবে। কয়েদীগণকে পাকা কয়েদী না করিয়া তাহা দিগকে মানুষে পরিণত করিবার প্রয়াস যে অতি প্রশংসনীয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

হিন্দু-সম্মিলন ।

১৮৮১ সালে আদম হুমায়ীর রিপোর্টে দেখা যায় বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল অথচ ১৯২১ সনের সেন্সাসে দেখা যায় মুসলমানের অনুপাতে হিন্দুর সংখ্যা

স্থানীয় ।

অতিরিক্ত সাধারণ সভা ।

গুরুজংকোরা টী কোম্পানী লিমিটেড ।

গত ৩রা এপ্রিল তারিখে সকালে সভায় শতকরা ১২০, অর্থাৎ প্রতি অংশে ৬০, হিসাবে লাভ দেওয়া স্থির হয়, এবং গত ৬ই এপ্রিল হইতে লভ্যাংশ বিলি হইতেছে ।

ম্যানেজার কিম্বা বাগানের কোন কর্মচারীকে কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নাই । সদর অফিসের কর্মচারীগণ প্রত্যেকে চারি মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার পাইয়াছেন ।

পোনাবাগিয়ায় যে সমস্ত লোক নিহত হইয়াছেন তাহাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জং ২০০, দান করা হইয়াছে । স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানকে কিছুই দান করা হয় নাই ।

ডায়না টী কোম্পানী ।

ঐ তারিখে সকালে সভায় শতকরা ১০০, অর্থাৎ প্রতি অংশে ৫০, হিসাবে লাভ দেওয়া স্থির হয় । গত ৬ই এপ্রিল হইতে লভ্যাংশ বিতরণিত হইবার নির্ধারণ হইয়াছিল ।

ম্যানেজার ২৪৫০, পুরস্কার পাইয়াছেন । অত্যন্ত কর্মচারীগণ (সদর ও বাগান) প্রত্যেকে চারি মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার পাইয়াছেন । এই কোম্পানীর ইন্টার্ন সেক্রেটারী

৪০০, পুরস্কার পাইয়াছেন ।

পোনাবাগিয়ায় যাহারা হত হইয়াছেন তাহাদের পরিবারবর্গকে ২০০, দান করা হইয়াছে । স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান কোন সাহায্য পায় নাই ।

চামুচি টী কোম্পানী ।

ঐ তারিখে সকালে সভায় শতকরা ৬০, অর্থাৎ প্রতি অংশে ৩০, লাভ দেওয়া স্থির হয়,

এবং গত ৬ই এপ্রিল হইতে লভ্যাংশ বিলি হইতেছে ।

ম্যানেজার কিম্বা বাগানের কোন কর্মচারীকেই কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নাই । সদর অফিসের কর্মচারীকে চারি মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে ।

পোনাবাগিয়ায় নিহতগণের পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জং ১০০, দান করা হইয়াছে এবং স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানকে কিছুই দান করা হয় নাই ।

চুনিয়াকোরা টী কোম্পানী ।

ঐ তারিখে সকালে সভায় শতকরা ৫৬, অর্থাৎ প্রতি অংশে ২৮, হিসাবে লাভ দেওয়া স্থির হয় এবং গত ৬ই এপ্রিল হইতে লভ্যাংশ বিলি হইতেছে ।

আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কার্যকর দেখিয়া ম্যানেজার ও বাগানের কর্মচারীগণের পুরস্কার দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে; তবে সদর অফিসের কর্মচারীকে তিন মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া এই সভাতেই নির্ধারণ হইয়াছে ।

সাহায্য-প্রার্থনা-পত্রগুলি বিবেচনার ভার ডাইরেক্টরগণের উপর দেওয়া হইয়াছে ।

কংগ্রেস ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কনফারেন্সের ডেলিগেট নির্বাচিত

হইয়াছেন ।

শ্রীপ্রীতিনিধান রায়;
রিটানিং অফিসার ।

শ্রীযুক্ত তারাপদ সান্যাল, খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, সতীন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, হতীন্দ্র নাথ রায়, হুয়েন চন্দ্র পাল, নীরেন্দ্র বিনোদ সেন, প্রীতিনিধান রায়, শ্রীনাথ হোড়, শশধর কর, শ্রীযুক্ত হুলেখা দেবী, প্রীতিমতী দেবী, কমলা দেবী, প্রতিভা দাসগুপ্ত ।

ব্যাঙ্গ শিকারে চুখটিনা ।

গত সোমবারে একটি ব্যাঙ্গের মকান পাইয়া জঙ্গপুত্র টী এজেন্টের ম্যানেজার সদলবলে উহার শিকারে বাহির হন । বাগানের বাকিরা একটি জঙ্গলে বাঘটিকে দেখিতে পাওয়া গেলে একটি গুলি করা হয় । তাহার পর বাঘটী কোথায় অস্তিত্ব হইয়া যায় । যখন সকলে বাঘ অস্ত্র-মকানে বাস্তব, সেই সময় হঠাৎ বাঘ একটি খরের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া ম্যানেজারের ভাই শ্রীমান পরেশনাথ ভট্টাচার্যকে আক্রমণ করে । ম্যানেজারের পাচক ব্রাহ্মণ তাড়া করিলে বাঘ পরেশকে ত্যাগ করিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে । তখন ম্যানেজার বন্দকের বাঁটি দ্বারা বাঘের মস্তকে গুলি জোরে আঘাত করেন । ফলে বাঘটী তৎক্ষণাৎ মারা যায় । তৎপরে দিন পরেশকে জঙ্গলপাইগুড়ি সহরে তাহার মাতুল শ্রীযুক্ত মাধন লাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাসায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে । তাহার মস্তকে ও মুখে বাঘের আঘাত ঘা হইয়াছে । স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মজুমদার ও ডাঃ যোগেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত চিকিৎসা করিতেছেন । রোগীর অবস্থা কিছু ভাল বলিয়া মনে হয় । পাচক ব্রাহ্মণটী বাগানেই আছে । ভগবান রোগীরূপকে আরোগ্য করুন ।

অপঘাত ।

গত মঙ্গলবার ৮।৯ বঙ্গাব্দ বঙ্গবৎসর একটি মাদোয়ারী বালক দলগানের ছাদের উপর ঘুরি উড়াইতেছিল । অমনস্বপ্নতঃ চাদের উপর হইতে পড়িয়া যাইয়া বালকটীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে ।

আগমন ।

মিঃ কিরণ চন্দ্র দে, আই সি, এস; সি, আই, ই, সপ্তমীক গত শুক্রবার প্রাতে দার্জিলিং মেলে এখানে আসিয়াছিলেন । মিঃ জে, এন, রায় স্বাস্থ্যসাহী বিভাগের কমিশনার,

এ, সি ব্যানার্জি এণ্ড সন্স ।

জুয়েলারী, ঘড়ী ও চশমা বিক্রেতা ।

দার্জিলিং ও কলিকাতা ।

ব্রাঞ্চ—জলপাইগুড়ি ।

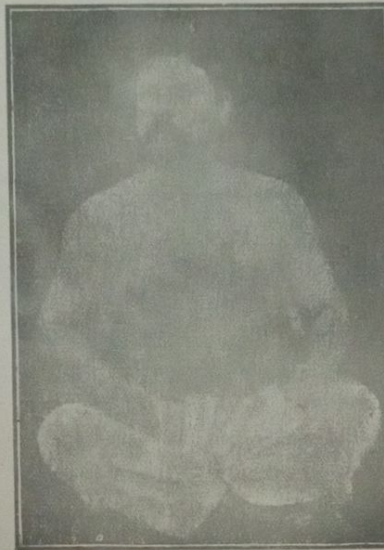
আমরা ঘড়ি, চশমা ও সোণা রূপার গহনা প্রভৃতি সুন্দররূপে মেরামত করিয়া গ্যারান্টি দিই ।

কলিকাতার দূরে অতি স্থলভে ঘড়ি, চশমা ও অলঙ্কারাদি বিক্রয় করি ও অর্ডার লইয়া গিনি সোণার যাবতীয় গহনা প্রস্তুত করাইয়া দেই । আমরা চক্ষু পরীক্ষা করিয়া ও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সমস্ত রকমের চশমা দিয়া থাকি । আমাদের দোকানে সকল নম্বরের চশমার পাখর, ফ্রেম, ব্যাণ্ডেল, কেপ ও রবিন চশমা প্রভৃতি পাওয়া যায় । ঘড়ি মেরামত করিয়া এক বৎসরের গ্যারান্টি দিই ।

রহম্পতিবার, ১৭ই আশ্বিন ১৩৪১ : ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।

সম্পাদকী।

সে আজ তেত্রিশ বৎসরের কথা, পুরো-
লোকগত শশীকুমার নিয়োগী এম এ, বি-এল,
৫ ভূজঙ্গপুর রায় চৌধুরী এম এ, বি-এল,
মহাশয়ের যুগ্ম-সম্পাদনে এই সহরে
“ত্রিশোত্তা” নামক একখানি মাসিক পত্রিকা
বাহির হত। সচর ছিল নিত্যন্ত সুস্থ, উচ্চ
শিক্ষিতের সাথ্যও ছিল নিত্যন্ত অল্প, স্বতরাং
মাত্র একটি বছর চলিয়া ‘ত্রিশোত্তা’ কালের
বাগুকাঁসকতে তাহার ধারা হারাইল। শশি
কুমার বাবসা ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়া
কমলার রূপালীভ করার আর বাকী জীবনে
বাণী সেবার অবসর থান নাই। ‘রীকা’—র
কপি ভূজঙ্গপুর শেষ জীবন পর্যান্ত বাণীর মন্দি-
রেরই পূজারী ছিলেন। আজ এগার বৎসর
হইল কতিপয় বছর উৎসাহে আমি সাপ্তাহিক
‘জেনমত’ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি।
পদবস্তি কালে সাধু মতান্তরের ফলে বহুগণের
সহকর্মীতা হারাইলেও তাহাদের শ্রদ্ধা হইতে
বঞ্চিত হই নাই, এবং সুখে, দুখে, বোগে,
শোকে একান্ত প্রাণে যতটুকু পারিয়াছি
‘জেনমতের’ সেবা করিয়া আসিতেছি। জেনমত
বাহির হওয়ার পর “ত্রিশোত্তা” নবধারা লাভ
করিয়া আবার প্রবাহিত হইতেছে, এবং
মসলেম সমাজ হইতে ‘নিশান’ও বাহির
হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি
সকলেই সফল হউক, মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হউক।
গত বৎসর এমনি শারদীয়া পূজার সময় জীবন
মরনের ছায়ালোকে থাকিয়া প্রতিদিন পর-
পারের আত্মান শুনিয়াছি, কিন্তু কি জানি
বিদ্যাতার কি ইচ্ছা; থেলা হয়ত শেষ হয় নাই,
তাই আবার কিছুদিনের মেয়াদে এপারেই
বহিয়া গেলাম। দেহটা ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু
মনের নবীনতা যেন এখনও আছে। এই



স্বর্গীয় শশীকুমার নিয়োগী।

জানি-ভেদ-ভাবনাকে অসমর্থ করিয়া মন যেন
এখনও কিছু করিতে চায়। তাই থেয়াল
হইল এবার পূজা উপলক্ষে ‘জেনমতের’ এক
খানি শারদীয়া সংখ্যা বাহির কবি। থেয়াল
হয়ত থেয়ালই থাকিয়া গাইত যদি না শ্রীমান
দীনেশচন্দ্র রায় বি-এল মহাশয়ের সহকর্মীতা
পাইতাম। সে উৎসাহী যুবক, সাহিত্যের
স্বর-গ্রাম ও লব বোধ তাহার আছে। পণের
ধূলার কুড়াইয়া পাওয়া মাণিকের মত সে
আসিয়াছিল ঠিক যেন আদিষ্ট হইয়াই।
আশীর্বাদ করি সে জীবনে সার্থক হউক।
আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা, তাও আবার স্থানীয়
প্রতিভার সাহায্যেই সমস্ত কার্যে পরিণত
করিব ইচ্ছা; এমিকে ছাপাখানার অল্পস্বল্প
বিদ্রাটত আছেই, স্বতরাং আশাহুত্বপ সফলতা
যে লাভ করি নাই তাহা জানি। অসফল
জীবনের বোঝা’ত বহিয়াই চলিয়াছি, কিন্তু
তবুও, যতটুকু, যাহা কিছু পারি করিতেই

হইবে। সবাই’ত আর জীবনে সফল হই না।
বাকী সব ধারা বজায় রাখে। আমরা না হব
সেই দলেই হইলাম। তবুও বাহারা ভবিষ্যতে
সফল হইবেন তাহাদের উদ্দেশে পূর্বোক্ত একটু
মাঙ্গলিকের আরোজন করিতে দোষ কি?
সমসাময়িকগণ না হয় তাহারিগকে আচার-
বাজক্ষেপ করিয়া প্রকৃ-চন্দনে অত্যাধনা
করিবেন। শারদীয়া সাংখ্যায় গল্প চাই, ইহাই
হইতেছে বর্তমান ধারা, বিশেষ করিয়া
পাঠিকা মহাশয়ারা নতুবা অসন্তোষ প্রকাশ
করিতে পারেন। মুসলমান সমাজের গৃহ-চিহ্ন
সম্বলিত একখানি গল্প মুসলমান বন্ধ বান্ধব-
গণের নিকট চাহিয়াও পাই নাই, স্বতরাং
নিজেই কসম ধরিয়াছি। সকল যে হই নাই
তাহা আমি নিজেই সব চেয়ে বেশী জানি।
নারীই সমাজের রূপ, অথচ সে রূপের পরিচয়
আমিত ভিন্ন সমাজের লোক, মসলেম সমাজের
লোকেবাই কতটুকু পাইয়াছে? ঘটনা চক্রে
আজ আমার মন লেখক, রচয়িতা জটিল
ঘটিয়াছে, সমস্ত পাঠক পাঠিকাগণ নিজ গুণে
কুটি মাঙ্গনা করিবেন। লেখক লেখিকা
গণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন
করিতেছি। প্রেসের কক্ষকর্তা শ্রীযুক্ত
বিঘ্ননাথ সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের তুলনা
নাই। বাহাদের সৌজন্যে ‘রুক’ গুলি
পাইয়াছি তাহারিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।
পরিশেষে ভালমন্দ, শুভাশুভ সকল কথাই
নারায়ণে অর্পণ করিতেছি।

“দদিও আমার, হৃদয় তুমার, বন্দ রহে গো
প্রভু,
হার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে চলিয়া
যেওনা প্রভু।”
“তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে সমাপন
হবে গো
ওগো রাজ—রাজ একাকী নীরবে দাঁড়াব
‘তোমার সম্মুখে’”

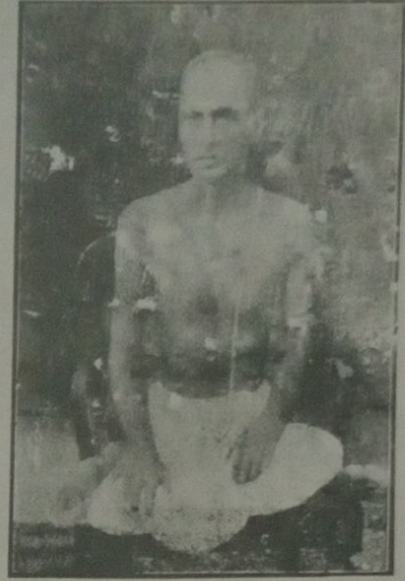


৩ জয়চন্দ্র সাত্তাল।

বঙ্গাব্দ ১২৫০শে ৩ জয়চন্দ্র সাত্তাল মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা জেলার অন্তর্গত বক্রিয়ারপুর গ্রাম এই সাত্তাল বংশের আদি স্থান। পিতা ৩রামচন্দ্র সাত্তাল মহাশয়ের তিন পুত্র ও এক কন্যা। স্নেহ পুত্র ৩ভগবান চন্দ্র জলপাইগুড়িতে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ভূটানের সহিত যুদ্ধে যখন নিম্নভূমি উয়ার প্রদেশ হারের পর তখন গত হইয়া ময়নাগুড়িতে প্রথম শাসন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়,

তখন সোভাগ্যবশী, উচ্চমণ্ডল ৩ভগবানচন্দ্র প্রথম যৌবনে ২২ বৎসর বয়সে মাসাবধিকাল কার্যক্রমে পরব্রজে নানা বিপদের মধ্য দিয়া ময়নাগুড়ি আসিয়া উকিল হন। তৎপর উয়ার প্রদেশে ভূই ভাগ হইয়া যায়। পূর্বউয়ার দাসামের অন্তর্গত হয়, এবং পশ্চিম উয়ার ও চাকলে বোদা, পাটগ্রাম ও বৈকুণ্ঠপুর-ব্রিটিশ রাজার লইয়া বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয় ও খরিয়া তাগকে শাসন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ৩ভগবানচন্দ্র বেশীদিন ওকালতী করিতে পারেন নাই। প্রায় দশ বৎসর ব্যবসা করার পর যক্ষ্মা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র ৩ভরতচন্দ্র এখানে মোক্তারী করিতেন। ৩ভগবানচন্দ্র অল্প-কাল মধ্যে প্রকৃত অর্থ উৎকর্ষ করিয়া এই বংশকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৩জয়চন্দ্র ভ্রাতার পরিত্যক্ত প্রতিপত্তি লইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন এবং দীর্ঘদিন জীবিত থাকিয়া আপন প্রতিভাবলে নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান হন। তাঁহার অন্নদান ও সদাশ্রিত সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রবাদ-বাক্যের মত আজও

চলিত আছে। তিনি একজন অগাধ দানবানী চাকর। যে কয়জন উচ্চমণ্ডল দানবানী মিলিয়া এই জেলার প্রথম চা-বাগান খোলেন তিনি তাহাদেরই একজন। তখন দাক্ষিণী প্রচেষ্টার অর্থ সাহায্য মিলিত না। এমন একদিন গিয়াছিল যখন আকমান চা-বাগানকে বন্ধা করিবার জন্য তিনি ও আরও দুইজন সহকর্মী পরিবারবর্গের আভরণ বন্ধক দিয়া বাগান চালাইয়া সফল হইয়াছিলেন। তাঁহার সততা ও একান্ত চেষ্টার যে ফল অর্জন করিয়াছিলেন এখনও সেই পুঞ্জির উপর প্রতিষ্ঠিত বহু প্রসারিত চা-বাগান চলিতেছে। তিনি ইংরাজী ১৯১০ সনে মানবধীলার অবসান করেন। তিনি চারি পুত্র রাখিয়া যান। ৩গণেশচন্দ্র কৰ্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান্ন করিয়া-ছিলেন কিন্তু ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার কৰ্ম-জীবন শেষ হয়। বর্তমানে একমাত্র পুত্র ডাঃ চাকচন্দ্র সাত্তাল জীবিত আছেন। ৩ভগবানচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা ৩দুর্গাচন্দ্র ওকালতী করিতেন, তিনি কবি ও সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তাঁহার পুত্র 'জন্মমত' সম্পাদক জ্যোতীশচন্দ্র সাহিত্যাদ্যুগ উত্তরাধিকার হস্তে প্রাপ্ত হইয়াছেন। চতুর্থ ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের পুত্র ভবতোষচন্দ্র ওকালতী করেন। জয়চন্দ্রের ভাগিনের কল্পীগোবিন্দ মৈত্র আকমান চা কোম্পানীর সেক্রেটারী।



৬ শ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

না, বা ধারে জিনিষ করা করিতেন না; এবং নিদিষ্ট দিবসে প্রতিশ্রুত টাকা নিজ হস্তে প্রদান করিতেন। আদায়-স্বজনকে নিদিষ্ট মত সাহায্য করিতেন, বহু লোককে অন্নদান করিতেন ও চাকুরী করিয়া দেন। সরকারী উকিল থাকা কালে, সরকারের সহিত আকমান চা কোম্পানীর এক মোকদ্দমা হয়, এই মোকদ্দমার, সরকার হার করে। তাঁহার মত

গ্রহণ করা হয়, তিনি সরকারের বিপক্ষে ও আকমান চা কোম্পানীর পক্ষে মত দেন, তাহাতে স্থানীয় কড়পক্ষ বিরক্ত হইয়া এই মত প্রকাশ করেন যে তিনি আকমান চা কোম্পানীর একজন অংশী স্বতরাং তিনি পক্ষপাতমূলক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহা জানিতে পারিয়া বন্ধুবান্ধব, পরিবারবর্গের কাহাকেও না জানাইয়া কথ্য ত্যাগ করেন। পরে সরকারের উপরিতন আইনোপদেষ্টাগণ রায় বাহাদুরের নতই ঠিক বখিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তিনি পুনরায় অল্পকাল হইয়াও আর চাকুরী গ্রহণ করেন না। তাঁহার মায় সমস্ত জীবন আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার চার পুত্র। ৩নৃপেন্দ্রনাথ বহুদিন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, শ্রীযুক্ত বিপুলেন্দ্রনাথ, মিউনিসিপ্যালির চেয়ারম্যান ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান, সিগলনাথ, প্রথম শ্রেণীর অষ্টমিক ম্যাজিষ্ট্রেট, চতুর্থ ভবকিষ্ণর উকিল ও চা-বাগানসহ সহিত সন্নিবিষ্ট।

৩রায় বাহাদুর শ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মভূমি ২৪ পরগণার অধীন বারাসত মহকুমায়। তাঁহার পিতাঠাকুর কলিকাতা হাইকোর্টে মোক্তারী করিতেন। তাঁহার চার ভ্রাতা। শ্রিয়নাথ বাবু, বি-এল পাশ করিয়া প্রথম কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। পরে জলপাইগুড়িতে সরকারী উকিল নিযুক্ত হইয়া এখানে আসেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ওকালতী করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার ছায় নীতি-মূলক জীবন খুব কমই দেখা যায়। অনেক দিক দিয়া তিনি আদর্শ জীবনব্যাপন করিয়া গিয়াছেন। অত্যা তাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই, জুগুপ্সা হইতে তিনি নিজেকে সর্বদাই দূরে রাখিতেন। নিজে কখনও পরনিষ্ঠা করিতেন না, তাঁহার সম্মুখে কেহ পরনিষ্ঠা করিলে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন। কখনও গণ করিতেন

মুক্তিযোদ্ধা

সাপ্তাহিক পত্রিকা, নগর মূল্য ২০ দুই পয়সা।

সম্পাদক - শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

প্রথম বর্ষ

জলপাইগুড়ি, ২৭শ ডিসেম্বর ১৯২৮ কৃষ্ণাষ্টমী, ৫ই পৌষ ১৩৩৭

দ্বিতীয় সংখ্যা।



সভাপতি—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু।

সমুদয় পরিচ্ছেদ

‘মরণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।’

LEST WE FORGET

“In celebrating the lives of those who have
gone before us, we renew our own lives.”

স্মরণে !

[পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে সহরের উকিল, মোক্তার, মোহরার, ডাক্তার, কবিরাজ .৩ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দেওয়া হইল। ইহারা কেহই আজ জীবিত নাই। গত ১৯৬৮ সনের বন্যায় পুরাতন কাগজপত্র সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। নচেৎ আরও বিস্তৃত ও সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইত। তবুও স্মৃতি হইতে যতখানি সম্ভব ১৮৭০ সন হইতে ক্রমান্বয়ে নামগুলি দিবার প্রয়াস করা হইল। হয়তো অনেক নাম বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে এতদিনে।

নামগুলি দেওয়া হইল কারণ তাঁহারা নিছক সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য স্থায়ী ব্যবসা করিতেন বটে কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই সমগ্র সহরটিকে এক সমাজ-ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দরিদ্রের সেবা ছিল প্রধান ব্রত; ধনী দরিদ্র সকলকে সমভাবে বিনা ব্যয়ে আনন্দ দানের ব্যবস্থা করিতেন; কেহ বিপদে পড়িলে সমগ্র সহরবাসী তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন; সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

আজ সে সমাজের সমাধি হইতে চলিয়াছে। তাই আজ পূর্বসূরীদের কথা শ্রদ্ধার সহিত মনে করিতেছি। জীবিত আছেন যাঁহারা তাঁহাদের নিকট সমাজ অনেক কিছু আশা করে।

স্থানীয় উকিল শ্রীকৃষ্ণলীকান্ত ভৌমিকের সৌজন্যে ও সহায়তায় নামগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এজন্য জানাই তাঁহাকে ধন্যবাদ।

— সম্পাদকমণ্ডলী]

উকিল

জগদীশ চন্দ্র সান্যাল

(প্রতিবেশ পাঠ্য) যাহ ইমি সর্বদায়ক হাণ্ডেল মনোভক্তি হইতে
কল্যাণকরিত আদ্যোপাধ্যায়)

প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রায় বাহাদুর)

(প্রথম সরকারী উকিল)

মহেশ চন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীনাথ রায়

জয়চন্দ্র সান্যাল

যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী

গোপাল চন্দ্র ঘোষ

হৃদয়নাথ বাগচি

মহিম চন্দ্র চক্রবর্তী

ঈশান চন্দ্র দাসগুপ্ত

অক্ষয় কুমার বসু

উমাগতি রায়

কেশব চন্দ্র ঘটক

সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

ক্ষীরোদ রঞ্জন ধর

শশীকুমার নিয়োগী

মহম্মদ হোসেন

তারিণী প্রসাদ রায়

শশীভূষণ স্থানপতি

ওয়ালিয়র রহমান (খান বাহাদুর)

শ্রীনাথ হোড়

তারাপ্রসাদ বিশ্বাস

জয়গোবিন্দ গুহ (রায় বাহাদুর)

পার্বতীচরণ বসু

কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (রায় বাহাদুর)

(দ্বিতীয় সরকারী উকিল)

শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাগতি ঘটক

দুর্গাচরণ সান্যাল

সুরেশ্বর সান্যাল

জৈলোকা নাথ মৌলিক

পূর্ণচন্দ্র রায়

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

জৈলোকা নাথ চক্রবর্তী

মশারফ হোসেন (নবাব, খান বাহাদুর)

পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

নগেন্দ্র নাথ সিকদার

অমুকুল মুখোপাধ্যায় (রায় বাহাদুর)

(তৃতীয় সরকারী উকিল)

আবদুল গণি

যোগেশ চন্দ্র ঘোষ

গোবিন্দ শঙ্কর সর্বাধ্যক্ষ

বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

অবিনাশ রায়

চাকচন্দ্র সেন

নগেন্দ্র নাথ মহালানবীশ

নলিনী রঞ্জন ঘোষ

লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার

মথলেছার রহমান

আবদাস সন্তার

পঞ্চানন রায়

নরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিপুরা সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগেশ চন্দ্র গুহ

রোহিনী কুমার সরকার

(গ)

মতিলাল বড়ুয়া

মধুসূদন রায়

অন্নদা চরণ সেন

কুমুদনাথ কর্মকার

মাখন লাল কুণ্ডু

সত্যকুমার বসু

ভবতোষ সাগুলাল

শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী

রমাশ্রম সরকার

(চতুর্থ সরকারী উকিল)

রণেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মোহিনী মোহন ঘোষ

উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ কর্মকার

চণ্ডিদাস চক্রবর্তী

জীতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার

সব্দর আলী আহাম্মদ

সুরেশ চন্দ্র পাল

নগেন্দ্র নাথ কর্মকার

সন্তোষ কুমার বসু

প্রমথ নাথ বসু

নীরেন্দ্র বিনোদ সেন

হেমলাল ঘোষ

মনমোহন রায়

যোগেন্দ্র চন্দ্র কুণ্ডু

প্রকাশ চন্দ্র মজুমদার

জীবনগতি রায়

ভবকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরাজ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তারানাথ ঘটক

সত্যেন্দ্র নাথ মৌলিক

দীনেশ চন্দ্র রায়

সত্যেন্দ্র শ্রম সরকার

হরিপদ সাগুলাল

জহরতউল্লা আহাম্মদ

নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী

সত্যেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বাস

মোক্তার

মহিম চন্দ্র ভৌমিক

ভরত চন্দ্র সাগুলাল

গোপাল চন্দ্র মজুমদার

মাধবচন্দ্র সাগুলাল

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী

রজনীকান্ত ঘোষ

গিরীশ চন্দ্র মৈত্র

ঈশ্বরচন্দ্র সেন

কামিনী কুমার রায়

অন্নদা প্রসাদ বিশ্বাস

গোবিন্দ মোহন দত্ত

ইন্দ্রকুমার চৌধুরী

যতুনাথ রায়

অন্নদা চরণ বর্দন

দেবেন্দ্র চন্দ্র সেন

রজনীকান্ত ভৌমিক

তারকেশ্বর বাগচি

জ্ঞানেন্দ্র নাথ মজুমদার

কমিরউদ্দীন আহাম্মদ

বিষ্ণুপ্রসাদ মিশ্র

রসিক চন্দ্র চক্রবর্তী

নজরউদ্দীন আহাম্মদ

(৮)

আব্দুল হামিদ
আব্দুল গফুর
মহেশচন্দ্র রায়
হেরম্বচন্দ্র সেন
কুঞ্জমোহন ঠাকুর
সবেরউদ্দীন আহাম্মদ
যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আশুতোষ মৈত্র
পূর্ণচন্দ্র দাস

নবকুমার দত্ত
আফজল হোসেন
জগবন্ধু বসু
পূর্ণচন্দ্র সরকার
নৃপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্যোতীশচন্দ্র সান্যাল
গণেশচন্দ্র সান্যাল
জগবন্ধু সরকার
জয়চন্দ্র চক্রবর্তী

উকিলের মোহরার

মদন মোহন ভৌমিক
মহেশ চন্দ্র পাল
বিপিন চন্দ্র চক্রবর্তী
রসিক লাল আচার্য্য
কেদার নাথ ভৌমিক
তারক নাথ চক্রবর্তী
গিরীশ চন্দ্র দত্ত
রামলাল মুখোপাধ্যায়
তারক নাথ সরকার
কেদার নাথ চন্দ
ভূষণ চন্দ্র বিশ্বাস
কেদার নাথ দত্ত
শিব নাথ সেন
নরেশ চন্দ্র সরকার
পীয়ারী ব্রহ্ম
তারক চন্দ্র গুহ
বসন্ত কুমার চৌধুরী
প্রসন্ন চন্দ্র চৌধুরী

গয়ানাথ দে
মোহিনী মোহন ঠাকুর
শ্যামাচরণ চক্রবর্তী
বামাচরণ চক্রবর্তী
যামিনী মোহন দাস
পার্বতী চরণ সরকার
জ্যোতি রঞ্জন মজুমদার
উপেন্দ্র নাথ ঘোষ
সুধা কুমার সোম
কালীকমল বসু
সৈয়দ আলতাফ আলী
মজর উদ্দীন আহাম্মদ
নিশিকান্ত ভৌমিক
মনমোহন দত্ত
নিকুঞ্জ মোহন সিংহ
মহম্মদ আজিবুল্লা
ইন্দুভূষণ দত্ত

(৬)

পূর্ণ চন্দ্র সরকার
তমিজউদ্দীন আহম্মদ
গঙ্গাধর বসুনায়া

গয়ানাথ ঘোষ
শ্রমথ নাথ দাস
সতীশ চন্দ্র বসু

ডাক্তার

অতুল চন্দ্র সেন
রাজ কুমার সেন
নকুল চন্দ্র সরকার (হোঃ)
নরেন্দ্র চন্দ্র দাস (হোঃ)
হেমচন্দ্র মজুমদার (হোঃ)
কালীকমল সেন
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাকান্ত চট্টোপাধ্যায়
হেমনারায়ণ রায়
শিশির কুমার মুখোপাধ্যায়
মনমোহন রায়

তারক নাথ কর্মকার
সুরেশ চন্দ্র সেন
সতীশ চন্দ্র গুপ্ত
যোগেশ চন্দ্র ঘোষ
অক্ষয় কুমার ভৌমিক
ধীরাজ মোহন সেন
শৈলেশ চন্দ্র ভৌমিক
চিন্তাহরণ গুপ্ত
সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত
সুধীর কুমার বসু

তারাপদ সান্ধ্যাল

কবিরাজ

রজনীকান্ত সেন
নিমাই চরণ সেন
রামদয়াল চক্রবর্তী

গোবিন্দ চন্দ্র সেন
প্রিয়নাথ মজুমদার
সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী

শিল্পী ও কলারসিক

[উপরোক্ত মহোদয়গণ ব্যতিরেকে আরও কয়েকটি নাম দিতেছি
যাঁহারা আর্থানাট্য সমাজ, বাঙ্কব নাট্য সমাজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে
জলপাইগুড়ির সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছেন।]

জগদীন্দ্র দেব রায়কত

ক্ষীরোদেন্দ্র দেব রায়কত

সরোজেন্দ্র দেব রায়কত

রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্মথ তলাপাত্র

গগন চন্দ্র মিত্র

যোগেন্দ্র নাথ নাগ

চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজেন্দ্র কুমার নিয়োগী

গঙ্গানাথ বাগচি

নলিনী কান্ত রায়ত

সারদা চরণ দত্ত

গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্রহ্মগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রমোহন দাস

বাসুদেব সেন

মতিলাল সেন

মোহিনী মোহন ভৌমিক

নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়নাথ গোস্বামী

Extracts from
The Proceedings of the Meeting of the Jalpaiguri District Centenary
Celebration Committee held on 20. 7. 68 at 3 P. M.
at the Gopalpur House, Jalpaiguri.

[Early in the year 1968, some prominent men of Jalpaiguri informally talked about the advisability of holding the Centenary of the district. About this time a letter over the signature of Prof. Nirmalendu Bhaumik appeared in the local weekly "*Janamat*" requesting the citizens of Jalpaiguri to observe the Centenary of the district. This letter gave a fillip to the movement and a series of meetings were held during the second half of the year. A grand committee was formed consisting of prominent ladies and gentlemen of the district. An ambitious programme was drawn up. The response was highly encouraging—in course of two months more than seventyfive thousand rupees was collected by way of donations. Highly encouraged, the Cultural Sub-Committee contacted the best artistes of the land ; the Exhibition Sub-Committee drew an elaborate plan of holding a mela where were to be exhibited the best products of Jalpaiguri as well as of West Bengal. The Souvenir Sub-Committee tried to collect as many articles as possible from the experts covering all aspects of the district. The whole town was astir. Then all on a sudden a dreadful calamity happened—a devastating flood unprecedented in its fury—consequences of continuous rains in the catchment area—overtook the sleeping town (with its neighbouring areas) in the morning of the 4th October, 1968. The whole town with the vast adjoining region lay prostrate for months together with hundreds dead and thousands missing..... The people of Siliguri played the part of Good Samaritans. Gradually the town came to herself. Sri S. B. Majumdar, the then D. C., on whom fell the herculean task of re-building the town, revived and revitalised the Celebration Committee. But the primary energy had been sapped and the committee took up a modest programme. The much expected "Souvenir" is out though in an attenuated form. The second part of the programme is to follow soon — but the memories of the devastating flood still haunt us.—Ed. Board]

PRESENT :—

Shri S. K. Banerji, M. C., I. A. S.,
Commissioner, Jalpaiguri Division.
Shri S. P. Mallik, I. A. S.,
Deputy Commissioner, Jalpaiguri
Chairman, D. B. I. T. A.
Chairman, T. A. I.
Shri M. K. Guha, Addl. Chief Engineer,
PWD, Jalpaiguri.
Shri A. K. Sen Gupta, Joint Director,
Agriculture, Jalpaiguri

Shri S. P. Roy, M. P.
,, B. C. Ghose.
,, A. C. Sen, s. p., Jalpaiguri.
,, M. N. Dutta Roy, C.M.O. (Health)
,, A. C. Ganguly, Suptdg. Engineer,
PWD, N. B. Circle
Dr. Charu Chandra Sanyal
Shri M. N. Roy, Chairman, Zila Parishad
,, T. K. Rahut
,, A. K. Roy

Shri D. K. Sanyal
„ S. P. Ram
Dr. A. D. Guha Neogi
Shri R. R. Mazumdar
„ Amiya Sen
Executive Engineer, PWD
Executive Engineer, PWD, Electrical
District Agriculture Officer
Administrator, Jalpaiguri Municipality
Chairman, Alipurduar Municipality
Subdivisional Officer, Alipurduar
Field Information Officer, Govt. of India
Field Information Officer,
Govt. of West Bengal
District Health Officer, Jalpaiguri
Divisional Forest Officer, Jalpaiguri Divn.
Divisional Forest Officer, Buxa Divn.
Divisional Forest Officer,
Baikunthapur Divn.
Dr. J. N. Moitra
Secretary, D. B. I. T. A.
Secretary, T. A. I.
Principal, Ananda Chandra B. T. College
Addl. S. P., Jalpaiguri
Agent, State Bank of India, Jalpaiguri
Dist. Industrial Officer, Jalpaiguri

Dist. Inspector of Schools, Jalpaiguri
Dist. Inspectress of Schools, Jalpaiguri
Income Tax Officer, 'A' Ward
Income Tax Officer, 'B' Ward
Supdt. Agricultural Marketing
District Medical Officer, Jalpaiguri
Asstt. Registrar of Co-operative Societies,
Jalpaiguri
Supdt. of Poultry Farm
Commercial Manager, Jalpaiguri Electric
Supply Co.
Shri Sabyasachi Roy
Dr. S. N. Mridha
Dr. Sarojit Bagchi
Shri G. Mahalanabis
„ Mukulesh Sanyal
„ Santosh Kr. Ghose
„ A. K. Banerji
Dr. Rebati Mohan Lahiri
Prof. Debesh Roy
Shrijukta Suniti Bala Chanda
Shri N. Kusari
„ T. Sen Gupta
„ Samarendra Deb Raikat
„ Satyen Roy

Shri S. K. Banerji, M. C., I. A. S., Commissioner, Jalpaiguri Division, took the chair.

The Deputy Commissioner, Jalpaiguri, opened the meeting and requested the Divisional Commissioner to preside over the meeting.

The Commissioner then explained to the members present about the nature of the celebrations to be held. The Centenary of this district falls due on 1. 1. 1969 and, consequently, the Centenary Celebrations of Jalpaiguri District will be opened on 1st January, 1969. The Commissioner emphasised the point that proper emphasis must be given on all the aspects of this district in the different phases of the Centenary Celebrations. The Hon. General Secretary of the Committee then presented a short outline about the proposed Celebrations to be held. The Secretaries of the different Sub-Committees, already formed, then presented the outlines of the Celebrations in their different aspects before the Centenary Committee.

A. Exhibition Sub-Committee :—

The Secretary of the Sub-Committee placed the plan outline of the Exhibition Ground,

viz., the 'Race Course' before the meeting. The plan was discussed in details and was approved by the General Committee.

B. Finance Sub-Committee :—

The Secretary, Finance Sub-Committee, presented the report of the Sub-Committee before the meeting. It was stated in the report that the celebrations would be financed by donations, sale of tickets, Govt. grants and from Exhibition stall rents. The report and recommendations of the Finance Sub-Committee were accepted.

C. Souvenir Sub-Committee :—

The Secretary of the Sub-Committee presented the report of the Sub-Committee at the meeting. The Sub-Committee recommended publication of a Souvenir which would contain articles on different aspects and features of Jalpaiguri district. It was also recommended that the Souvenir would be in the nature of a permanent record. The report of the Souvenir Sub-Committee was accepted.

D. Cultural Sub-Committee :—

The Secretary of the Cultural Sub-Committee presented the plans and programmes in connection with Centenary Celebrations. The proposed programme was discussed at the meeting and it was resolved that the cultural committee should draw up a programme which would provide for ample opportunity to the local institutions and Cultural groups for presenting cultural programmes in addition to the performers and groups who may be brought from outside the district. The Cultural Sub-Committee was entrusted with drawing up of the detailed programme with this view in mind.

It was resolved in the meeting to co-opt the representatives of different labour unions of this district as members of the General Committee.

It was also decided to have the following gentlemen as patrons of the Centenary Celebration Committee.

G. O. C., Divisional Headquarters, C/o. 99 A. P. O.
General Manager, N. F. Rly.
Shri A. C. Roy, Vice Chancellor, North Bengal University
Rai Bahadur Bipul Banerji, Jalpaiguri

Jalpaiguri District Centenary Celebration Committee

Patrons

1. Shri S. K. Banerji, M. C., I. A. S., Commissioner,
Jalpaiguri Divn., Patron-in-Chief
2. G. O. C. Divisional Headquarters, C/o. 99 A. P. O.

3. General Manager, N. F. Rly.
4. Shri A. C. Roy, Vice Chancellor, North Bengal University
5. Shri S. N. De Silva, I. P. S., D. I. G., Northern Range,
Jalpaiguri
- 6. Shri M. K. Guha, Addl. Chief Engineer, PWD, Jalpaiguri
7. Conservator of Forest, North Bengal Circle
8. Shri A. K. Sen Gupta, Jt. Director of Agriculture, Jalpaiguri
9. Dist. Judge, Jalpaiguri
10. Chairman, I. T. P. A. Jalpaiguri
11. Chairman, D. B. I. T. A. Jalpaiguri
13. Shri S. P. Roy. M. P., Jalpaiguri
14. Shri B. C. Ghose, Jalpaiguri
15. Prof. N. C. Bose, Principal, Engineering College, Jalpaiguri
16. Rai Bahadur Bipul Banerji, Jalpaiguri

President

1. Shri S. P. Mallik, I. A. S., Deputy Commissioner,
Jalpaiguri (1st. President) Left Oct, 1968.
2. Shri S. B. Majumder, I. A. S., D. C. (2nd President)
Left March, 1970
3. Shri S. Banerjee, I. A. S., D. C. (3rd President)
Left April, 1970
4. Shri N. Bagchi, I. A. S., D. C. (4th President)

Vice-Presidents

1. Shri L. B. Pariyar, I.A.S., Addl. Deputy Commissioner,
Jalpaiguri
2. Shri N. K. Some, Asstt. Commissioner, Income Tax, Jalpaiguri
3. „ A. C. Sen, Supdt. of Police, Jalpaiguri
4. „ A. C. Ganguly, Supdtg. Engineer, North Bengal Const.
Circle, Jalpaiguri
5. Supdtg. Engineer, Northern Circle, PWD, Jalpaiguri
6. Shri A. K. Ganguly, Supdtg. Engineer, State Electricity Board,
Siliguri
7. Shri B. B. Ghose, President, Bar Asscn, Jalpaiguri
8. „ S. Banerjee, Director, Siliguri Planning Organisation
9. „ K. L. Mitra, Supdtg. Engineer, N. B. Circle,
Irrigation, Jalpaiguri
10. Shri M. N. Dutta Roy, Chief Medical Officer, Jalpaiguri
11. Dr. Charu Chandra Sanyal, Jalpaiguri
12. Shri M. N. Roy, Chairman, Zila Parishad, Jalpaiguri
13. „ T. K. Rahut, Jalpaiguri

Joint Secretaries

1. Shri A. K. Roy, W.B.C.S., S. D. O. Sadar
2. „ D. K. Sanyal, W.B.C.S., Jalpaiguri
3. „ K. K. Chakrabarty, B.L.

Treasurer

1. Dr. A. D. Guha Neogi, Jalpaiguri

Asstt. Secretaries

1. Shri S. P. Ram, R. T. O., Jalpaiguri
2. „ R. R. Mazumdar, Asstt. Engineer, PWD.
3. „ Amiya Sen, Jalpaiguri

Executive Committee

- | | |
|--|---|
| 1. President—Deputy Commissioner, Jalpaiguri | 11. Shri A. K. Banerji |
| 2. Addl. Deputy Commissioner, Jalpaiguri | 12. S. D. O., Alipurduar |
| 3. Joint Secretaries | 13. Executive Engineer, PWD, Jalpaiguri |
| 4. Assistant Secretaries | 14. D. F. O., Jalpaiguri Division |
| 5. Shri S. P. Roy, M. P. | 15. D. F. O., Buxa Division |
| 6. „ B. C. Ghose, Jalpaiguri | 16. D. F. O., Baikunthapur Division |
| 7. Treasurer | 17. D. F. O., Cooch-Bihar Division |
| 8. Supdt. of Police, Jalpaiguri | 18. Shri T. Sen Gupta |
| 9. Shri R. N. Mukherji | 19. „ R. C. Chakrabarty |
| 10. „ N. Kusari | |

Jalpaiguri District Centenary Celebration Sub-Committees

A. Souvenir Sub-Committee

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Dr. Charu Chandra Sanyal—Chairman | 8. Prof. Debesh Ch. Roy |
| 2. Shri N. Kusari—Secretary | 9. Dr. Sarojit Bagchi |
| 3. „ Mukulesh Sanyal | 10. Srijukta Suniti Bala Chanda |
| 4. „ Santosh Kr. Ghose | 11. Sm. Kiran Roy |
| 5. „ Upendra Nath Barman | 12. Srijukta Santi Banerji |
| 6. Dr. Nirmalendu Bhaumik | 13. District Inspector of Schools |
| 7. Dr. Rebati Mohon Lahiri—Secretary | 14. District Inspectress of Schools |

B. Exhibition Sub-Committee

- | | |
|--|---|
| 1. Executive Engineer, PWD—Chairman | 16. „ J. N. Mohalanabis |
| 2. Shri R. N. Mukherji—Secretary | 17. „ A. K. Goswami, B. D. O., Sadar |
| 3. „ M. C. Chowdhary | 18. „ H. Sarkar |
| 4. „ P. C. Chakrabarty | 19. District Agricultural Officer, Jalpaiguri |
| 5. „ H. Chakrabarty | 20. Dr. Sarojit Bagchi, Jalpaiguri |
| 6. „ A. Bari | 21. District Industrial Officer, Jalpaiguri |
| 7. „ D. K. Roy | 22. Subdivisional Controller of Food & Supplies, Jalpaiguri |
| 8. „ N. R. Das | 23. Dr. S. N. Mridha, M. O., School Health Unit |
| 9. „ S. M. Chaki | 24. Field Information Officer, Govt. of India |
| 10. „ S. Banerji | 25. Field Information Officer, Govt. of West Bengal |
| 11. „ P. K. Chakrabarty | 26. Area Officer, N. F. Rly, New Jalpaiguri |
| 12. Asstt. Engineer, State Electricity Board | 27. Shri A. K. Bose, B. D. O., APD II |
| 13. Secretary, Jalpaiguri Club | |
| 14. Commercial Manager, Jalpaiguri Electric Supply Co. | |
| 15. Shri Sabyasachi Roy | |

C. Finance Sub-Committee

- | | |
|--|---|
| 1. Shri S. P. Roy, M. P.—Chairman | 9. Secretary, I. T. P. A. |
| 2. „ A. K. Banerji—Secretary | 10. Shri Promotha Mukherji, Gaikata |
| 3. „ B. C. Ghose | 11. „ Amiya Sen, Jalpaiguri |
| 4. „ Sitaram Kalyani | 12. „ A. Gupta, Agent, State Bank of India |
| 5. Secretary, North Bengal Chamber of Commerce | 13. „ K. K. Chakrabarty, Joint Secy., District Centenary Celebrations Committee |
| 6. Secretary, Jalpaiguri Club | 14. Shri A. D. Guha Neogi, Treasurer, Jalpaiguri District Centenary Celebration Committee |
| 7. Secretary, D. B. I. T. A. | |
| 8. Secretary, T. A. I., Siliguri | |

D. Cultural Sub-Committee

- | | |
|--|--|
| 1. Shri B. C. Ghose—Chairman | 12. „ Nitish Dutta Roy |
| 2. „ T. Sen Gupta | 13. „ Asesh Roy |
| 3. „ R. C. Chakrabarty | 14. „ Chinmoy Bhaduri |
| 4. Field Information Officer, Govt. of India | 15. „ Tarapada Bandopadhyaya, Arya Natya Samaj |
| 5. Field Information Officer, Govt. of West Bengal | 16. Bandhab Natya Samaj, to be represented by Secy. or his nominee |
| 6. Shri Samarendra Deb Raikat | 17. Shri Pran Hari Karanjai, Cultural Secretary of Babupara Pathagar |
| 7. „ A. K. Nandi, Silpa Bharati | 18. Shri Indu Bhusan Bhattacharyya, Jalpaiguri Sangit Samsad. |
| 8. „ Satyen Roy | |
| 9. Sm. B. Sanyal | |
| 10. Sm. Sefali Roy | |
| 11. Shri Prabir Roy | |

**E. Information & Public Relations
Sub-Committee**

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1. Shri Prafulla Mitra | 8. „ Babulal Sharma | |
| 2. „ Pabitra De | 9. Field Information | |
| 3. „ Santosh Ghose | Officer, Govt. of India | } Jt. Secretaries |
| 4. „ Biren Bose | 10. Field Information | |
| 5. „ Debabrata Mazumdar | Officer, Govt of W.B. | |
| 6. „ Bhaba Ranjan Ganguly | 11. Shri Pratul Ch. Ghatak | |
| 7. „ Satyajyoti Sen | 12. Subdivisional Publicity Officer, Alipurduar | |

Editorial Board

1. Dr. C. C. Sanyal—Chairman
2. Shri Priti Nidhan Roy, B.L
3. „ Kumudini Kanta Chakravarty, B.L.
4. Dr. R. M. Lahiri—Secretary

OUR CONTRIBUTORS

- Bagchi, Sarojit—
Physician, a Social Worker. Founder "*Dan Piteder Asar*". Founder Director "*Dan Piteder Samachar (Weekly) & Dan Piteder Asar (Monthly)*".
- Bari, Abdul—
Member, West Bengal Civil Service, formerly Deputy Magistrate & Deputy Collector, Jalpaiguri. Now Addl. Deputy Controller, Civil Defence, Asansol.
- Basu, Birendra Prasad—
M.A., B.T., Teacher & Journalist.
- Bhattacharyya, Samir—
M.A., Lecturer in History, Siliguri College, (Darjeeling).
- Bhattacharyya, Mandira—
M.A., Ex-U. G. C. Scholar (Archaeology).
- Bhattacharjee, S. K.—
Formerly, Special Officer, Tribal Welfare, Jalpaiguri. Now, Special Officer, Scheduled Castes & Tribes, Suri.
- Burman, Upendranath—
LL. B., Advocate, Ex-Minister, Government of Undivided Bengal. Ex-M.P. ; A Social Worker.
- Chakraborti, Himangshu—
Formerly Sub-Deputy Magistrate & Sub-Deputy Collector, Jalpaiguri. Now Rationing Officer, Baranagar (Calcutta).
- Chanda, Suniti Bala—
M.A., B.T., Saraswati, Ex-Head Mistress, Sadar Girls H. S. School, Jalpaiguri, Social worker, Recipient of "Rastrapati Award."
- Chaudhuri, Nirmal Chandra—
Addl. Rehabilitation Officer, Jalpaiguri, Student of Archaeology.
- Dutta Roy, Suranjan—
M.A., Professor of Bengal, Alipurduar College (Jalpaiguri).
- Gangopadhyaya, Anil—
Advocate, Alipurduar—Son of the illustrious Political worker (Late Rasiklal Gangopadhyaya, Advocate) of the Non Co-operation Days.
- Ganguly, Bhaba Ranjan—
Political Sufferer, Editor "*Trisrota*" a local weekly.
- Ghose, Birendra Chandra—
Ex-President, Indian Tea Planters Association. A Tea-Expert of International Repute. Represented India at the "All World Tea Convention." Canada.
- Ghosh, Santosh—
Journalist.

- Lahiri, Rebati Mohan (Dr)—** *M.A., LL. B., D. Phil., Professor of History. A. C. College, Jalpaiguri. Author of "The Annexation of Assam".*
- Mahalanabish, Jiten—** *Ex-Secy., Jalpaiguri Town Club.*
- Mazumdar, Arun Bhusan (Dr)** *M.A., D. Phil., Principal, A. C. College, Jalpaiguri.*
- Mitra, K. L.—** *Formerly, Superintending Engineer, North Bengal Circle (Irrigation), Jalpaiguri. Now Superintending Engineer, Central Irrigation Circle, Berhampur.*
- Mitra, Manindranath—** *District Panchayat Officer, Jalpaiguri.*
- Mullick, S. P.—** *Member, Indian Administrative Service. Formerly Deputy Commissioner, Jalpaiguri. Now Deputy Secy., Planning Commission, Government of India*
- Nandy, M. N.—** *Physician, Jalpaiguri.*
- Pakrashi, Amiya Kumar—** *Formerly, Asst. Inspector of Schools, Jalpaiguri—Now posted at Maldah. Son of the illustrious political worker (Sri Nalini K. Pakrashi) of the Non-Co-operation days.*
- Pal, Sunil—** *Teacher, Kamakhyaguri.*
- Roy, Dinesh—** *Labour Welfare Officer, Govt. of India, Andamans.*
- Roy, Dipak Kumar—** *M.A., Member West Bengal Civil Service. Deputy Magistrate & Deputy Collector, Jalpaiguri.*
- Roy, Manindranath—** *Ex-Chairman, Jalpaiguri Zilla Parishad, Chairman, Jalpaiguri Central Co-operative Bank.*
- Sanyal, Charu Chandra—** *M. Sc., Physician, Writer, Public Worker, Political Sufferer. Recipient of "Rabindra Puraskar" for "The Raj Bansis of North Bengal," Ex-M.L.C., Ex-Editor, "Janamat" a local Weekly.*
- Sanyal, Mukulesh—** *Political Worker, Editor "Janamat" a local Weekly.*
- Sarkar, Deben—** *Trade Unionist, Political Sufferer.*

CORRIGENDA

[এক প্লাবনের মধ্যে এই গ্রন্থ আরম্ভ হয় । অনেক পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয় ; কলিকাতার সাম্প্রতিক প্লাবনে মুদ্রিত লেখাগুলির প্রায় সমাধি হইয়াছিল । মহালয়ার পূর্বেই বই বাহির করিতে হইবে— এই সমস্ত অহবিধার মধ্যে শেষের এক মাস আমাদের কাজ করিতে হইয়াছিল বলিয়া মুদ্রণের অন্তিম থাকিয়া গেল । এজন্য আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট পূর্বাহ্নেই ক্ষমা চাহিয়া রাখিতেছি—প্রকাশক]

Page	Line	Read	for	Incorrect
2	12	বর্তমান	„	বন্তমান
„	footnote	অন্তর্ভুক্ত	„	অন্তর্ভুক্ত
7	29	hapless	„	hopless
11	2	সম্মুখ	„	সন্মুখ
11	12	ফোর্ট	„	ফোট
12	6	বিবাদমান	„	বিবাদমান
26	31	boundary	„	bounday
28	34	re : the pillar	„	the pillar
28	37	Assam	„	the Assam
29	29	faithful	„	faithtul
33	15	প্রশাসনিক	„	প্রাশাসনিক
33	19	ভূমি	„	ভুমি
„	23	প্রভুত্ব	„	প্রভুত্ব
„	29	অন্তর্ভুক্ত	„	অন্তর্ভুক্ত
34	18	শৃঙ্খলা	„	শৃঙ্খল
„	20	অস্তানা	„	অস্তানা
37	25	সেনানিবাস	„	সেনানীবাস
38	1	বিদ্রোহান্তর	„	বিদ্রোহন্তর
39	1st subheading	permanently	„	permanetly
42	last	reaching	„	eaching
43	23	been	„	beed
„	25	Baikunthapur	„	Baikuthapur
„	27	1800	„	180
45	1	negotiations	„	nogotiations
49	23	Jalpaiguri	„	the Jalpaiguri
51	27	the Duars	„	Duars
54	36	region.)	„	region
57	3	Sources of coal	„	coal
„	18	tele-communication centres	„	tele - communication
59	1	according	„	accoding
„	4	announcement	„	anouncement
62	16	was	„	were
63	15	the Duars	„	Duars
65	33	were	„	was
79	21	continuous	„	continuos
80	2	বিবর্তনের	„	বিত্তনের

Page	Line	Read	for	Incorrect
104	last	ভরসা	"	ভরবা
106	last	কাঁধ	"	কাথ
108	last	হুট	"	হুঠ
118	27	সরাণোর	"	সরাণোর
126	12	সন্তুতও	"	সন্তুতও
"	18	সত্য স্বাক্ষরপূরণের	"	সত্যাক্ষর পূরণের
127	25	ভাবে	"	ভাগে
131	last	রেনেলের	"	রেলেনের
137	16	জনবাণী	"	জনবানী
150	6	লক্ষণীয়	"	লক্ষনীয়
168	4	অধায়নরত	"	অধায়ণরত
171	29	জেনকিন্স	"	জেনকিস
179	2	করিয়েছে	"	করেছে
185	3	বোর্ড, বোর্ড	"	বোড, বোড
195	9	অনগ্রসর	"	অনগ্রসরে
196	28	সহযোগিতায়	"	সহযোগীতায়
"	29	মুক্তিবাণী	"	মুক্তিবানী
197	16	হুস্পাদনায়	"	হুস্পাদনার
"	20	সাহিত্য পত্রিকা	"	সাহিত্য
"	23	অর্থানুকূল্যে	"	অর্থানুকূল্যে
201	11	nearly	"	of nearly
204	6	hunting	"	hanting
"	27	with the	"	with
210	13	privileged	"	priviledged
211	8	levirate	"	leverate
212	28	well-being	"	well-beings
213	5	any	"	only
216	16	পার্বণ	"	পার্বন
217	15	পার্বণ	"	পার্বন
223	21	আচরণ	"	আচারণ
225	6	সপক্ষে	"	স্বপক্ষে
227	9	তার	"	তবে
"	20	শোবার	"	শুইবার
228	4	বনের	"	বোনের
250	8	এরিয়া	"	এড়িয়া
"	26	পরিগ্রহণ	"	পরিগ্রহন
251	7	রয়েছে	"	বা রয়েছে
"	last	লক্ষণীয়	"	লক্ষনীয়
255	18	অন্তর্ভুক্ত	"	অন্তর্ভুক্ত
257	2	দারিদ্র্য	"	দারিদ্ৰ
"	13	দারস্থ	"	দারস্থ
"	30	মনেই	"	মনেই
258	16	অব্যাহতি	"	অব্যাহতি
273	footnote	কর্তৃক	"	কর্তৃক
276	18	আধার	"	আধার
279	3	হইয়া	"	হয়ে

Page	Line	Read	for	Incorrect
281	13	till	"	still
287	last	1888. The	"	1888 the
290	34	The Duars	"	Duars
291	28	the	"	to the
300	25	constructed	"	constructucted
303	30	Total Cash	"	Tsage cotal
312	last	উচ্ছৃঙ্খল	"	উচ্ছৃঙ্খল
318	30	রক্ষণমূলক	"	রক্ষনমূলক
324	12	গণ সংযোগ	"	গন সংযোগ
335	10	অন্তরীণ	"	অন্তরীন
"	11	"	"	"
337	5	পরনে	"	পরণে
338	5	বিপণিকার	"	বিপনিকার
"	8	ডুয়াসে	"	ডুয়াসে
"	10	স্বতঃস্ফূর্ত	"	স্বতঃস্ফর্ত
"	17	ট্রান্সকার	"	ট্যান্সকার
"	23	প্রাপ্তন	"	প্রাপ্তন
339	15	বান্ধালী	"	বান্ধালী
340	5	রামমোহন	"	রামমোহন
"	11	স্বতঃস্ফূর্ত	"	স্বতঃস্ফর্ত
"	13	রিজুট	"	রিজুট
342	29	ইংরেজ	"	ইংরেজ
349	27	অঞ্জলির	"	অঞ্জলীর
351	15	মোহানার	"	মোহানার
"	17	"	"	"
"	26	ঘোড়ামারা	"	ঘোরামারা
"	28	"	"	"
367	30	সঙ্কোশ	"	সঙ্কোশ
370	7	গোনা	"	গোণা
"	25	প্রচেষ্টা	"	প্রচেষ্টার
372	24	কাজে তাঁরা	"	কাজে
374	27	থাকে	"	থাকেন
378	3	দায়িত্ব	"	দায়িত্ব
379	12	দাত্তী	"	দাত্ত
382	8	কৃতজ্ঞচিত্তে	"	কৃতজ্ঞতাচিত্তে
388	24	লক্ষণ	"	লক্ষণ
393	16	than	"	that
401	27	সম্পূর্ণ	"	সম্পূর্ণ
403	17	দুর্গবিধান	"	দুর্গবিধান
403	31	প্রত্নতাত্ত্বিকের	"	প্রত্নতাত্ত্বিকের
404	6	অপূর্ব	"	অপূর্ব
Under the heading Our Contributors Roy Dipak Kumar M.Sc.				Roy Dipak Kumar M.A.

